নববি কাফেলা

নেতৃত্ব, দক্ষতা, কুরবানি

মাহমুদ শীত খাত্তাব

ইফতেখার সিফাত
অনূদিত

দুই দুইটি সুপার পাওয়ারের দম্ভ যাঁরা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন, জাহিলিয়াতের ধ্বংসস্তূপের ওপর যাঁরা উড়িয়েছিলেন দ্বীনে ইসলামের বিপ্লবী ঝান্ডা, ইতিহাসের সেই সব মহানায়কদের সম্পর্কে জানতে আপনার মন কি কৌতূহলী হয়ে ওঠে না? তাঁদের জন্ম ও বেড়ে ওঠার রোমাঞ্চকর সময়গুলো—তাঁদের সংগ্রামমুখর জীবনের উত্তাল দিনগুলো সম্পর্কে জানতে আপনার মন ব্যাকুল হয় না? তাঁদের দুঃসাহসিক অভিযানগুলোর গল্প শুনতে কি আপনার মন আকুলি-বিকুলি করে না? তাদের কুরবানি ও শাহাদাতের লোমহর্ষক দৃশ্যগুলো দেখতে আপনার হৃদয়ে কি উৎসাহের ঢেউ জাগে না?

প্রিয় ভাই ও বোন,

আমরা তো এই মহান লোকদেরই ভাগ্যবান বংশধর। এই ইতিহাস তো আমাদেরই পূর্বপুরুষদের ইতিহাস। আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের এই আলো-ঝলমলে পাতাগুলো কি আমরা উলটাব না?

প্রিয় পাঠক,

ইতিহাসের এই আলোকিত দৃশ্যগুলো নিয়েই আপনাদের প্রিয় প্রকাশনী রুহামার নতুন আকর্ষণ, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সমরবিদ ও সিরাত-গবেষক শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাবের এক অমর অজর রচনা 'কাদাতুন নাবিয়্যি ﷺ'—'নববি কাফেলা'। গোটা ইসলামি কুতুবখানার দিকে হাত বাড়ালে এমন সমৃদ্ধ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ খুব বেশি দেখা যায় না।

শাইখ খাত্তাবের সামরিক প্রতিভা, গবেষকসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও বিপুল অধ্যয়নের ছাপ পাওয়া যায় বইটির পাতায় পাতায়। আল-মাদরাসাতুন নাবাবিয়াহ থেকে উত্তীর্ণ সামরিক ও প্রশাসনিক সাহাবি নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক কর্মগাথার রীতিমতো একটি বিশ্বকোষ এই বই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হাতে গড়া ৩১ জন মহান সামরিক কমাণ্ডার এবং প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দের জীবন, কর্ম ও অবদান নিয়ে ধাপে ধাপে নির্মাণ করা হয়েছে এই মূল্যবান গ্রন্থটি।

আসুন, আমরা আমাদের এই মহান পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জানি, কদম রাখি তাঁদের মতোই সাফল্যলাভের পথে—জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও যে পথের পথিকদের মুখে উচ্চারিত হয়, 'কাবার রবের শপথ, আমি সফলকাম হয়েছি!'...

নববি কাফেলা

নেতৃত্ব, দক্ষতা, কুরবানি

বই	নববি কাফেলা
মূল	মাহমুদ শীত খাত্তাব
অনুবাদক	ইফতেখার সিফাত
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

নেতৃত্ব, দক্ষতা, কুরবানি

মাহমুদ শীত খাত্তাব

রুহামা পাবলিকেশন

নববি কাফেলা

মাহমুদ শীত খাত্তাব

প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪৪৩ হিজরি / ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইসায়ি

বইমেলা পরিবেশক
ইতি প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৫৪৬ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

প্রখ্যাত গবেষক, ঐতিহাসিক, সমরবিদ
মাহমুদ শীত খাত্তাব রহিমাহুল্লাহর

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব জন্মেছিলেন ইতিহাসের এক উত্তাল সময়ে; চারদিকে তখন উত্থান-পতনের ফেনিল জোয়ার—বাঁধভাঙার গগনবিদারি আওয়াজ। তাই দুনিয়া-কাঁপানো অনেক ঘটনার সাক্ষী হতে পেরেছেন তিনি। ১৯১৯ সালে উত্তর ইরাকের মসুল শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা দুজনই আরব। পিতার দিক দিয়ে তিনি সাইয়িদুনা হাসান বিন আলি ﵁-এর বংশধর। তাঁর মা মুসেলের বিখ্যাত আলিম শাইখ মুস্তফা বিন খালিলের মেয়ে।

তার জন্মের কয়েক মাস পর তার দ্বিতীয় আরেকটি ভাইয়ের জন্ম হয়। ফলে এক বছরের মাথায় তিনি মায়ের কোল হারান—প্রতিপালিত হন তার দাদির কোলে। দাদি ছিলেন একজন দ্বীনদার পরহেজগার তাহাজ্জুদগুজার পুণ্যবতী নারী। তার মুবারক হাতেই তিনি তরবিয়ত লাভ করেন।

শৈশবেই তিনি কুরআন হিফজ করেন। তারপর মুসেলেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করেন। মুসেলের মসজিদে শাইখদের দরসগুলোতে তিনি নিয়মিত বসতেন। তাঁদের কাছ থেকেই তিনি আরবি ভাষা ও শরিয়াহর ইলম অর্জন করেন।

যুবক মাহমুদ চেয়েছিলেন আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করবেন। কিন্তু নিয়তি এসে তার নিয়তের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাকে ভর্তি হতে হয় সামরিক কলেজে। ঘুরে যায় তার পড়াশোনার মোড়। এভাবেই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তিনি হয়ে ওঠেন সামরিক বাহিনীর একজন মেজর জেনারেল আর মুসলিম উম্মাহ লাভ করে একজন প্রতিভাবান সমরবিদ, ঐতিহাসিক ও সিরাত-গবেষক।

সমরশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ইরাকি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ইলম অর্জনের পিপাসা

তাকে পৌঁছে দেয় এক অনন্য উচ্চতায়। সমরশাস্ত্রের মতো তিনি ইতিহাস, রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও ইসলামি শরিয়াহয়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি জামিয়া আজহারের ইসলামি গবেষণা বোর্ড, জর্দান ও দামেশকের আরবি ভাষা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। আরবি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। আরব-বিশ্বের বিখ্যাত অনেক রেডিও ও টিভি চ্যানেলে তিনি সিরাত, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন।

তার সব পরিচয় ছাপিয়ে তার লেখক ও গবেষক পরিচয়ই বড় হয়ে ওঠে। তার লেখা ও গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, সিরাতুন্নবি ﷺ, সাহাবিদের জীবনী, ইসলামের বিজয়-যুগের ইতিহাস, ইসলামের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের জীবনী, তাঁদের যুদ্ধকৌশল, ইসলামি সমরশাস্ত্র, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ইসরাইলের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। তার রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

আর-রাসুলুল কায়িদ।

আস-সিদ্দিকুল কায়িদ।

আল-ফারুকুল কায়িদ।

কাদাতুন নাবিয়্যি ﷺ।

কাদাতু ফাতহিল ইরাক ওয়াল জাজিরাহ।

কাদাতু ফাতহি ফারিস।

কাদাতু ফাতহিশ শাম ওয়া মিসর।

আল-আসকারিয়াতুল ইসরাইলিয়্যাহ।

বাইনাল আকিদাতি ওয়াল কিয়াদাহ।

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাবের রচনাবলি ইসলামি কুতুবখানার অনেক বড় একটি শূন্যতা পূরণ করেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের বড় বড় সেনাপতিদের যুদ্ধের ইতিহাস ও তাঁদের সমরকৌশল নিয়ে তার মতো বিশ্লেষণ ও গবেষণানির্ভর রচনা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি বললেই চলে।

বিভিন্ন ইসলামি সম্মেলন ও সেমিনারে তিনি আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করতেন। আরব-আজমের বড় বড় আলিমদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। সাইয়িদ কুতুব ﵀-সহ অনেক বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদদের সঙ্গে তিনি জেলে গিয়ে দেখা করেন। সাইয়িদ কুতুব ﵀-কে জেল থেকে মুক্ত করার জন্য তাদবির করেন।

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব ১৯৯৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান পরপারে। আল্লাহ তাআলা এই মহান মনীষীকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। (আমিন)

সূচিপত্র

ভূমিকা ⁝ ১৫

গাজওয়া ও সারিয়্যা ⁝ ১৬

নেতা নির্বাচন ⁝ ১৯

কমান্ডারগণের শেষ গন্তব্য ⁝ ২৭

নবিজির কমান্ডারগণের শাহাদাত লাভ বা মৃত্যুতালিকা ⁝ ২৯

কেন এ কিতাব রচনার প্রয়াস... ⁝ ৪৯

নবিজি ﷺ-এর কমান্ডারগণ

১. হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ ⁝ ৫৮

২. উবাইদা বিন হারিস বিন মুত্তালিব ﷺ ⁝ ৮৪

৩. আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আল-আসাদি ﷺ ⁝ ৯৩

৪. উমাইর বিন আদি আল-খাতমি আল-আওসি ﷺ ⁝ ১১২

৫. সালিম বিন উমাইর আল-আওসি ﷺ ⁝ ১১৮

৬. মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল-আওসি আল-আনসারি ﷺ ⁝ ১২৩

৭. জাইদ বিন হারিসা আল-কালবি ﷺ ⁝ ১৬১

৮. আব্দুল্লাহ বিন উনাইস আল-জুহানি ﷺ ⁝ ২০১

৯. আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর আল-আওসি আল-আনসারি ﷺ ⁝ ২০৮

১০. আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ আল-মাখজুমি ﷺ ⁝ ২১৮

১১. মুনজির বিন আমর আস-সায়িদি
আল-খাজরাজি আল-আনসারি ﷺ ⁝ ২৩৮
১২. মারসাদ বিন আবু মারসাদ আল-গানাবি ﷺ ⁝ ২৪৮
১৩. উক্কাশা বিন মিহসান আল-আসাদি ﷺ ⁝ ২৫৮
১৪. আব্দুর রহমান বিন আওফ আজ-জুহরি ﷺ ⁝ ২৭০
১৫. আব্দুল্লাহ বিন আতিক আল-আনসারি ﷺ ⁝ ৩১৮
১৬. আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ ⁝ ৩২৭
১৭. কুরজ বিন জাবির আল-ফিহরি ﷺ ⁝ ৩৫৬
১৮. আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরি আল-কিনানি ﷺ ⁝ ৩৬১
১৯. বাশির বিন সাদ আল-খাজরাজি আল-আনসারি ﷺ ⁝ ৩৮৭
২০. গালিব বিন আব্দুল্লাহ আল-লাইসি ﷺ ⁝ ৪০৪
২১. ইবনে আবুল আওজা আস-সুলামি ﷺ ⁝ ৪১৮
২২. শুজা বিন ওয়াহাব আল-আসাদি ﷺ ⁝ ৪২৩
২৩. কাব বিন উমাইর আল-গিফারি ﷺ ⁝ ৪৩৫
২৪. জাফর বিন আবু তালিব ﷺ ⁝ ৪৩৯
২৫. আবু কাতাদা বিন রিবয়ি আল-আনসারি ﷺ ⁝ ৪৬৭
২৬. সাদ বিন জাইদ আল-আওসি ﷺ ⁝ ৫০৩
২৭. তুফাইল বিন আমর আদ-দাওসি ﷺ ⁝ ৫১৩
২৮. উয়াইনা বিন হিসন আল-ফাজারি ﷺ ⁝ ৫২৩
২৯. কুতবাহ বিন আমির আল-খাজরাজি ﷺ ⁝ ৫৫৮
৩০. দাহহাক বিন সুফিয়ান আল-কিলাবি ﷺ ⁝ ৫৬৮
৩১. আলকামা বিন মুজাজজিজ আল-মুদলিজি ﷺ ⁝ ৫৭৮

নববি বাহিনী ⁞ ৫৯২

১. সিরাহ সারসংক্ষেপ ⁞ ৫৯২

২. নববি বাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ⁞ ৫৯৪

৩. সামরিক মসজিদের বার্তা ⁞ ৫৯৬

৪. পরিপূর্ণ মুসলিমরূপে গঠন ⁞ ৬০৫

৫. বাহিনী গঠনের ধাপসমূহ ⁞ ৬০৫

৬. মহান বিজয়ের নেতা ⁞ ৬০৯

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ
কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর
সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়
আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন।
তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।'

[সুরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ২৯]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

'তোমাদের যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে
আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ
করে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসুলের মধ্যে
রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

[সুরা আল-আহ্‌যাব, ৩৩ : ২১]

ভূমিকা

রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের মাঝে আরব ও মুসলিমদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা নবিদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর এবং তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজন ও সাহাবিদের ওপর।

কিতাব রচনার ক্ষেত্রে 'নববি কাফেলা' নামক কিতাবখানা থেকে আমি যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছি এবং উপভোগ করেছি, তা অন্য কোনো কিতাবের বেলায় হয়নি। এর রচনা ছিল আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপকারের একটি সম্মিলিত সুন্দর ও মনোরম সফর।

রচনা শেষে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিতাবটি পুনরায় পাঠ করলাম। এ পাঠ কোনো অর্থ ও মর্মের প্রতি পুনঃদৃষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। ফলে মূল কিতাবে কোনো শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিনি। নতুন কোনো চিন্তা বা মতামতও সংযোজন করিনি। শুধু এতটুকু করেছি, ভুলে কোনো শব্দের ফোঁটা বাদ গেলে ফোঁটা দিয়ে দিয়েছি এবং অনিচ্ছায় কোনো ভুল শব্দ লেখা হয়ে থাকলে তা সংশোধন করেছি। কিন্তু পুনরায় কিতাবটি পড়তে গিয়ে সময় একটু দীর্ঘায়ত হয়ে গেল। পাঠ উপভোগ করতে গিয়ে এবং ধারাবাহিক বিজড়িত প্রচুর চিত্রের মাঝে আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে একটু বেশি উপকৃত হওয়ার জন্য চার সপ্তাহ লেগে গেল। আর মানুষের জন্য সময়টা অনেক মূল্যবান বটে। দুনিয়াতে আমার সবচেয়ে দামি সম্পদ ও সবচেয়ে লোভনীয় বস্তু হলো এই সময়। বস্তুত বৈধ কোনো বিষয়ে বা উপকারী কোনো কাজে সময়ের ব্যবহার কখনো বৃথা যায় না।

এ কিতাব রচনা ও তা পুনরায় পাঠ করে যে স্বাদ উপভোগ করেছি এবং যত উপকার আমার অর্জন হয়েছে, তার গোপন ভেদ প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে না। বরং এ ভেদ উন্মোচন করা পাঠকের জিম্মায় রাখাই উত্তম মনে

হচ্ছে। যাতে রহস্য উদ্ধারের মিষ্টতা থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়। অবশ্য এটা হতে পারে, আমি যে স্বাদ পেয়েছি এবং আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে উপকার লাভ করেছি, সে স্বাদ ও অর্জন হয়তো অন্যরা নাও পেতে পারে।

এই কিতাব রচনা ও পুনরায় পাঠকালে আমি আল্লাহর কাছে আশা করেছি, যেন মুসলিমদের নেতারা উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি বসাতে রাসুল ﷺ-কে উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। শুধু সামরিক বিভাগেই নয়; বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল সেক্টরে যেন তারা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে। যাতে জাতিকে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা নেতৃত্ব দেয় এবং সামরিক ও বিভিন্ন সেক্টরে জাতিকে বিজয় ও উন্নতির দিকে পরিচালিত করে।

এ কিতাবে সর্বপ্রথম যে শিক্ষাটি আমি পেয়েছি, তা হলো বিভিন্ন অঙ্গনে যথাস্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে বসানোর ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর অভিনব পদ্ধতি এবং বুদ্ধিদীপ্ত নীতি। বিশেষত সামরিক সেক্টরে কমান্ডার নিয়োগের ক্ষেত্রে, যা পাঠক এই কিতাব পড়ামাত্রই বুঝতে পারবে। পাশাপাশি অন্যান্য সেক্টরেও বিভিন্ন কমান্ডার নিযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সুবাসিত সিরাতে উত্তম আদর্শ খুঁজে পাবে।

সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁর যেমন বিশেষ নীতি ও পদ্ধতি ছিল—যা এই কিতাবে একেবারেই সুস্পষ্ট—তেমনই অন্যান্য বেসামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর অনেক নীতি ও পদ্ধতি। যার মাধ্যমে তিনি সেরা নেতৃত্বের এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। ফলে মহান রব্বে কারিমের ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় বেসামরিক ও সামরিক অঙ্গনে বিরাট সংখ্যক নেতৃত্ব তিনি রেখে গিয়েছিলেন। যাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল স্ব স্ব সেক্টরে বিরাট ও স্থায়ী অবদান।

গাজওয়া ও সারিয়্যা

২৮টি যুদ্ধে স্বয়ং রাসুল ﷺ-ই ছিলেন যুদ্ধের জেনারেল। তন্মধ্যে মাত্র নয়টি ময়দানে ইসলাম ও কুফরের মাঝে যুদ্ধ বেধেছিল। আর বাকি ১৯টি ময়দানে যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হয়েছিল রাসুল ﷺ-এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য।

হিজরতের পর থেকে গাজওয়াসমূহে রাসুল ﷺ-এর জিহাদ সর্বমোট সাত বছর চলমান ছিল। দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে তিনি ওয়াদ্দান যুদ্ধে বের হন। এটাই ছিল প্রথম গাজওয়া, যেখানে তিনি নিজেই নেতৃত্ব দেন। আর নবম হিজরির রজব মাসে বের হন তাবুকের যুদ্ধে। এটিই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ।

কিন্তু রাসুল ﷺ-এর জিহাদ শুধু গাজওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাঁর জিহাদ গাজওয়ার সাথে সারিয়্যা অভিযানেও বিস্তৃত ছিল। গাজওয়া এবং সারিয়্যা অভিযানের মধ্যে পার্থক্য আছে। সরাসরি রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধকে বলে গাজওয়া আর তাঁর নির্দেশে কোনো সাহাবির নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধকে বলে সারিয়্যা।

রাসুল ﷺ-এর সারিয়্যার সংখ্যা ছিল ৪৭টি। আরেক বর্ণনামতে তার চেয়েও বেশি। তবে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। কারণ অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থ প্রথম মতের ওপর একমত পোষণ করেছে।

এই অভিযানগুলো নয় বছর চলমান ছিল। শুরু হয়েছিল প্রথম হিজরির রমাদান মাসে হামজা রা.-এর নেতৃত্বে ঈস অভিমুখে প্রেরণের মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছিল দশম হিজরিতে মাজহাজ অঞ্চলে আলি রা.-এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে।

এই সাত বছরের গাজওয়া ও নয় বছরের সারিয়্যার বড় ফলাফল ছিল ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাজিরাতুল আরব এই আরবেরই সন্তান মুসলিমদের নেতৃত্বের অধীনে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হয়। আরবের ভূমিকে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মুক্ত করা হয় এবং সমস্ত অঞ্চল থেকে মূর্তি ও প্রতিমাগুলোকে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। ফলে তাওহিদ ও ঐক্যের দ্বীন ইসলামের বদৌলতে পুরো আরব কোনো শরিকবিহীন এক ইলাহের ইবাদতকারী হয়ে যায়।

অভিযানসমূহে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ৩৭ জন সাহাবি। যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন মোট ৪৭টি অভিযানে। কেউ একটিতে, আবার কেউ বিভিন্ন সময়ে একাধিক সারিয়্যা পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তালিকায় আমরা ৩৮ জন কমান্ডারের নাম পাব। সেখানে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর আনসারি ﷺ-এর নামও যুক্ত করা হয়েছে। যিনি উহুদ যুদ্ধে তিরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পেশ করেছিলেন জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানি। পাহাড়ের ন্যায় অটল-অবিচল ছিলেন নিজ অবস্থানে। বীরত্ব, সাহসিকতা, আনুগত্য, অবিচলতা এবং ত্যাগ ও কুরবানির ক্ষেত্রে রেখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উত্তম আদর্শ। তাই তাঁর বরকতময় জীবনী নবিজি ﷺ-এর কমান্ডারগণের জীবনীর সাথে যুক্ত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাঁর নেতৃত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলির প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং তাঁর বিরল বীরত্বকে মূল্যায়ন করে এখানে তা যুক্ত করলাম। যাতে প্রতিটি মুসলিম সৈনিক ও কমান্ডারের সামনে উত্তম আদর্শ হিসেবে থাকতে পারে। তার ওপর আবার স্বয়ং রাসুল ﷺ-ই তাঁকে তিরন্দাজ বাহিনীর কমান্ডার নির্বাচন করেছিলেন। যারা উহুদে মুজাহিদ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। কারণ তাঁরাই সেদিন মুসলিম বাহিনীকে পেছনের দিক থেকে রক্ষা করেছিলেন। আর তাঁদের অবস্থানক্ষেত্রটিই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক, কঠিন ও কষ্টসাধ্য।

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ যদিও রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহ থেকে অন্য কোনো অভিযানে নেতৃত্ব দেননি। শুধু উহুদের যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কষ্টসাধ্য অংশের কমান্ডার ছিলেন। কিন্তু উহুদে তিরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দানের ব্যাপারটি অন্য কোনো অভিযানে বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার যোগ্যতা, সম্মান ও সক্ষমতার ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ অন্য কোনো কমান্ডারের চেয়ে কোনো অংশে কম নন।

গাজওয়া ও সারিয়্যাগুলোতে জিহাদের ফলাফলগুলো ছিল বাস্তবিকই পরিপক্ব। আর এমন ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বের ছিল চূড়ান্ত এবং যুগান্তকারী প্রভাব। সে প্রভাব ছিল গাজওয়া জিহাদে প্রত্যক্ষভাবে—রাসুল হয়ে কমান্ডিং করার কারণে এবং সারিয়্যা জিহাদে ছিল পরোক্ষভাবে—সবচেয়ে সেরা ব্যক্তিকে কমান্ডের দায়িত্ব দেওয়ার কারণে। অর্থাৎ যথাস্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়ার কারণে।

সারিয়্যাগুলোর নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর এই যে অনন্য নীতি ও পদ্ধতি, উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন জিম্মাদার নির্বাচনের এই যে অসামান্য

আকাঙ্ক্ষা; যাতে তা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর হয়—তার মাঝে অবশ্যই এমন উপদেশ ও শিক্ষা আছে, যা থেকে বর্তমানের নেতা ও অনুগত সবারই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যদি যুদ্ধে জয়ী হতে চাই এবং উন্নতি সাধন করতে চাই। কারণ সকল মুসলিমের জন্যই আজ বিজয় ও উন্নতি দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককালের বিজয়ী ও উন্নত জাতি আজ পরিণত হয়েছে পরাজিত ও অনুন্নত জাতিতে। এটা তখন থেকে হয়েছে, যখন থেকে তারা মুসলিমদের গড়ে তোলা ভিত থেকে সরে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে মানব ধ্বংসের পেছনে। এবং উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বসানোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অযোগ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়েছে। ফলে আমাদের কপালে ধ্বংস আর বরবাদিই নেমে এসেছে।

নেতা নির্বাচন

উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি বসানো সহজ কোনো কাজ নয়। এটা বাস্তব জীবনে নেতা ও অনুগত সবারই সফলতার রহস্য। যুদ্ধ ও শান্তিকালীন উভয় সময়েই।

অবশ্য এটা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। কারণ আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত বান্দা ছাড়া, সর্বদাই মন্দের নির্দেশদাতা মানবাত্মা নিজ থেকে জ্ঞান ও যোগ্যতায় উত্তম ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এ দুষ্ট আত্মা তার আশপাশ থেকে চাকচিক্যতা ছিনিয়ে নেওয়ার ভয় পায় এবং এর ফলে সে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কায় থাকে।

উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দান নেতা ও অনুগতদের সফলতার রহস্য। বরং এতে তাদের সফলতার অঙ্গনে রয়েছে আরও অনেক উন্নতির রহস্য। কারণ সৎ ও যোগ্য নেতাগণ তাদের জনগণকে যুদ্ধের সময় বিজয়ের দিকে পরিচালিত করে এবং শান্তিকালীন সময়ে উন্নতি ও সফলতার দিকে নিয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। এই সাহায্যের ছিল নিশ্চিত প্রভাব তাঁর সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হওয়ার ক্ষেত্রে, ফায়সালা ও বিধান দানের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ও পরিচালকের আসনে,

কমান্ডার ও সৈনিক হওয়ার ক্ষেত্রে, মুরব্বি ও শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিপূর্ণ মানব হওয়ার ক্ষেত্রে, এমন মানব—যার কাছে ওহি পাঠানো হয়।

এসব যোগ্যতাই হচ্ছে উত্তম আদর্শ। যে আদর্শকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য একজন বিবেকসম্পন্ন মুমিন অবশ্যই তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। কারণ এগুলো এমন যোগ্যতা, যা অর্জন করার জন্য যেকোনো অনুসরণীয় ব্যক্তিই সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাবে।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন :

اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

'আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি তাঁর রিসালাতকে কোথায় অর্পণ করবেন।'[১]

তবে ওহি দ্বারা সাহায্য একমাত্র নবি-রাসুলদের মাঝে সীমাবদ্ধ।

রাসুল ﷺ-এর সিরাত এবং তাঁর কমান্ডারগণের জীবনী অধ্যয়ন করে যে জিনিসটা আমি পেয়েছি, তা হলো, রাসুল ﷺ-এর সকল যোগ্যতার মধ্যে একটি বিরল যোগ্যতা ছিল উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার প্রতিভা।

তিনি এ যোগ্যতাকে তাঁর বরকতময় জীবনে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এটাকেই তিনি যুদ্ধের দিনে বিজয় অর্জন এবং শান্তির সময়ে আরও অধিক সফলতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুনিয়াবি মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন।

রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের জানতেন সবিস্তারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। প্রত্যেক সাহাবিকে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য সহকারে চিনতেন, যে বৈশিষ্ট্য নতুন ইসলামি সমাজের উপকারে আসবে। ফলে সেসব বৈশিষ্ট্যকে তিনি এই সমাজের উন্নতি ও কল্যাণে এবং সকল মুসলিমের কল্যাণে ব্যবহার করতেন।

---

১. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১২৪।

একই সময়ে তিনি সকল সাহাবির স্বভাবজাত ত্রুটি সম্পর্কেও খবর রাখতেন। সেসব ত্রুটির থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতেন, সেগুলোকে সংশোধনের চেষ্টা করতেন এবং সেগুলোর অনিষ্টতা থেকে দূরে রাখতেন। তিনি সকল সাহাবিকে তাঁদের উত্তম বৈশিষ্ট্যের সাথে স্মরণ করতেন এবং সেটার ব্যাপারে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি সাহাবিদেরকে তাঁদের মুসলিম ভাইদের দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে গিয়ে তাদের উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোকে মূল্যায়ন করার ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন।

রাসুল ﷺ তাঁর এই চমৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলির দ্বারা সাহাবিদের গড়ে তুলতেন। আর তাঁদের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তা উত্তম পন্থায় সংশোধন করতেন।

এই বিস্ময়কর পদ্ধতির মাধ্যমেই রাসুল ﷺ একজন মুসলিমকে গড়ে তুলতেন, তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতেন। বক্রতাকে সোজা করতেন, সোজা করতে গিয়ে ভেঙে ফেলতেন না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়টাকে একসাথে মজবুত করতেন। শুধু বর্তমান বা একটি সময়ের জন্য সংহত করতেন না।

সাহাবিদের মাঝে থাকা বৈশিষ্ট্যাবলি বেকার রেখে দিতেন না। বরং নতুন সমাজের কল্যাণে তা ব্যবহার করতেন। এর মাধ্যমে তাঁদের সেসব বৈশিষ্ট্য পরস্পর একীভূত হয়ে উম্মাহর ভিতকে শক্তিশালী করত এবং উম্মাহকে বিজয় ও নির্মাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেত।

রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন। তাঁদের কারও কোনো যোগ্যতাকেই তিনি ছোট মনে করতেন না এবং উপেক্ষা করতেন না কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির যোগ্যতাকে। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার সাথে আরও যোগ্যতা এসে যোগ হতো। এরপর তাঁর মাঝে সে যোগ্যতাগুলো চমকাতে থাকত।

তিনি প্রত্যেক উত্তম যোগ্যতার অধিকারীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে নির্বাচন করতেন।

যে দুই শর্তকে সামনে রেখে রাসুল ﷺ নেতৃত্ব প্রদান করতেন, সে দুই শর্ত হলো ইসলাম এবং যোগ্যতা। আর মজবুত আকিদা ছিল নেতৃত্ব পাওয়ার মৌলিক শর্ত; যাতে নেতা তার কাজের মূল ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তার কর্মের ফল যেন থাকে সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত; যেন তা পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছায়। কারণ এ ধরনের বিশ্বাসী কমান্ডার তার যোগ্যতা আর আকিদার ভিত্তিতে সঠিক পথে ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে কাজ করতে পারে। নিজের এবং পরিবারের তুলনায় সে তার আকিদা ও সমাজের জন্য বেশি কাজ করে। আর এটাই হচ্ছে আকিদা-বিশ্বাসহীন কমান্ডারের ওপর অথবা যে কমান্ডারের খারাপ আকিদা থাকে—ফলে সে তার খারাপ বিশ্বাসের কারণে সমাজ বা জনকল্যাণের জন্য কাজ না করে নিজের জন্য কাজ করে—তাদের ওপর বিশ্বাসী কমান্ডারদের শ্রেষ্ঠত্বের গোপন রহস্য।

তা ছাড়া উচ্চতর যোগ্যতাও ছিল নেতৃত্ব পাওয়ার একটি মৌলিক শর্ত। যাতে কমান্ডার তার দায়িত্ব আদায়ে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং তার কর্ম সন্দেহ-সংশয় থেকে দূরে থেকে পরিপূর্ণতার কাছাকাছি থাকে। কারণ যোগ্যতাসম্পন্ন কমান্ডার যোগ্যতার বলে এর নির্ভরতা নিয়ে কাজ করে। অস্থির ও এলোপাতাড়ি কাজ করে না। যোগ্যতা তাকে ভুল থেকে বাঁচিয়ে সঠিকতার দিকে পরিচালিত করে। তাড়াহুড়া থেকে দূরে রেখে সুচিন্তিত কাজের নিকটবর্তী করে।

রাসুল ﷺ-এর ৩০ জন কমান্ডার সূচনালগ্নেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাঁদের ২১ জন বদরি সাহাবি। যাঁরা রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা ছিলেন খাঁটি এবং গভীর ইমানের অধিকারী। তাঁদের আকিদায় ইখলাস ও একনিষ্ঠতা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। তাঁরা দৃঢ়ভাবে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এ কারণে রাসুল ﷺ তাঁদের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখতেন। নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যদের ওপর তাঁদেরই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাঁদের মাঝে শুধু কুরজ বিন জাবির আল-ফিহরি ﷺ হিজরতের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে একটি সারিয়্যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন দুঃসাহসী অশ্বারোহী ও নির্ভীক বীর। নিপুণভাবে আক্রমণ ও পশ্চাদ্ধাবন করতে পারতেন। তিনি যে অভিযানের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন,

তা অশ্বারোহীদের দ্বারা গঠিত ছিল। যাদের কাজ ছিল দ্রুত লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করা। আর এ কাজের জন্য কুরজ বিন জাবির ﷺ ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি।

তাঁর কমান্ডারগণের মধ্যে একজন উহুদ যুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল হিজরি তৃতীয় সনে। তিনি হলেন আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরি ﷺ। অনন্য বীরত্ব এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসার কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে কমান্ডার বানিয়েছিলেন। তিনি উত্তমভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

পাঁচজন কমান্ডার মক্কা-বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, ইবনে আবুল আওজা আস-সুলাইমি, খালিদ বিন ওয়ালিদ আল-মাখজুমি, আমর ইবনুল আস আস-সাহমি, উয়াইনা বিন হিসন আল-ফাজারি ও আলকামা বিন মুজাজ্জিজ আল-মুদলিজি ﷺ।

ইবনে আবুল আওজা ﷺ নিজ কওমের প্রতি একটি দাওয়াতি অভিযানের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন। যেহেতু তাঁর কওমের ব্যাপারে অন্যের তুলনায় তিনিই বেশি জানতেন। তাদের ভেতরে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথগুলোর ব্যাপারে জানতেন। কওমের লোকেরাও তাকে ভালো করে জানত। অন্যের তুলনায় তাঁর দাওয়াতেই তারা বেশি সাড়া দেবে। ইসলাম কবুলের জন্য প্রভাব ফেলতে তিনিই বেশি যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি; বরং কুফরের ওপরই অটল থাকে।

রাসুল ﷺ উয়াইনা বিন হিসন ﷺ-কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি গাতাফান গোত্রের সর্দার ছিলেন। তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর কথা শুনত এবং মানত। সবাই তাঁকে সমীহ করত। রাসুল ﷺ একবার তামিম গোত্রের একটি শাখা গোত্রের কাছে জাকাত উসুলের জন্য এক সাহাবিকে প্রেরণ করলেন; কিন্তু তারা তাঁর কাছে জাকাত দিতে অস্বীকার করল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'এরা যে কাজটা করল, তার সমাধান করার মতো কে আছে?' সর্বপ্রথম উয়াইনা ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন রাসুল ﷺ তাঁকে ৫০ জন বেদুইন ঘোড়সওয়ার দিয়ে প্রেরণ করলেন। তাঁদের মাঝে কোনো মুহাজির বা আনসারি সাহাবি ছিলেন

না। সম্ভবত উয়াইনা ﷺ স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সবার আগে প্রস্তুত হওয়ার কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে এমন দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যেখানে কোনো আনসার বা মুহাজির সাহাবি ছিলেন না। কারণ তাঁরা ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিম, যাঁদের ওপর তাঁদের মতোই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের থেকে নেতৃত্বের উচ্চতর যোগ্যতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কারও কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করা সমীচীন নয়। তবে কোনো বিশেষ প্রয়োজনে ভিন্ন হতে পারে অথবা চূড়ান্ত কোনো প্রজ্ঞার কারণে, যা কোনো বিবেকবান ব্যক্তির কাছে অস্পষ্ট রবে না।

স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, রাসুল ﷺ কখনোই প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের ছাড়া উয়াইনা ও তার মতো নতুন ইসলাম গ্রহণকারী কাউকে তাঁর কোনো সারিয়্যার কমান্ডার নিযুক্ত করতেন না, যদি উয়াইনা অন্যদের পূর্বেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে না আসত। যদি ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের থেকে কেউ তার পূর্বে এগিয়ে আসত, তাহলে তিনিই হতেন নেতৃত্ব গ্রহণের অধিক উপযুক্ত। সুতরাং শুধু ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা ও ইসলামকে একনিষ্ঠভাবে সাহায্য করা ব্যক্তিকে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অগ্রগামী করে দিত এবং যুদ্ধের সেনাদের নেতৃত্ব দানের পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করত।

রাসুল ﷺ-এর সারিয়্যাগুলোর কমান্ডারদের জীবনী অধ্যয়ন থেকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন শুরু যুগের ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসার। তাঁদের মধ্যে ৮০ শতাংশই ছিলেন মুহাজির ও আনসার। ৬০ শতাংশ ছিলেন বদরি সাহাবি, আর বদরি সাহাবিগণ তো অন্যান্য সাহাবিদের থেকে মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

রাসুল ﷺ কোনো বেদুইন ও গ্রাম্য ব্যক্তিকে সভ্য ও শহুরে লোকের ওপর আমির বানাননি। ৩৭ জন কমান্ডারের মধ্যে ৩৫ জনই ছিলেন শহরের আর দুজন ছিলেন গ্রামের অধিবাসী। উয়াইনা বিন হিসন, যিনি নেতৃত্বের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং দাহহাক বিন সুফিয়ান কালানি ﷺ, যিনি ছিলেন একজন সেরা বীর, যাকে শত অশ্বারোহীর সমপর্যায়ের গণ্য করা হতো; তা ছাড়াও তিনি মদিনাতে নবিজি ﷺ-এর পাশে তরবারি ধারণকারী হিসেবে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেছেন। মোটকথা এ দুজনকে নেতৃত্ব দেওয়া

হয়েছিল বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে। শহরের লোককে রাসুল ﷺ নেতৃত্ব দিতেন, যেহেতু শহুরে ব্যক্তি গ্রাম্য লোকের চেয়ে যুদ্ধবিদ্যায় বেশি পারদর্শী। এবং যুদ্ধের কষ্ট-ক্লেশ সহ্যের ক্ষেত্রে তারা গ্রাম্য লোকের চেয়ে অধিক সক্ষম ও ধৈর্যধারণকারী।

সারকথা, নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য মৌলিক দুটি শর্ত : ইসলাম এবং যোগ্যতা। এই দুটো শর্ত কোনো ভিন্নতা ছাড়াই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অন্য শর্তসমূহ হচ্ছে, আগে ইসলাম গ্রহণকারী, বদরি সাহাবি, শহুরে ব্যক্তি হওয়া। তবে প্রয়োজনের খাতিরে এই শর্তগুলোর বিপরীতও হতে পারে।

রাসুল ﷺ এবং আবু বকর ও উমর ؓ নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা উম্মাহর মধ্য থেকে আকিদা ও যোগ্যতায় সেরা ও নির্বাচিত ব্যক্তিদের নেতৃত্বের দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছিলেন। যাতে তাঁরা যুদ্ধে উম্মাহর বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারেন এবং শান্তিকালীন সময়ে উম্মাহকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন।

সেই জাতি কতই না ভাগ্যবান, যাদেরকে দ্বীন ও যোগ্যতায় সেরা ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দান করে!

রাসুল ﷺ ও তাঁর দুই খলিফা প্রতিটি মুসলিমের গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগাতেন। ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে সেগুলোকে ইট হিসেবে চয়ন করতেন। ফলে যে স্থানে যে ইট রাখা দরকার, সে স্থানে সে ইটই রাখতেন। যাতে এই প্রাসাদ নিরাপদে উঁচু হতে হতে মজবুত ও শক্তিশালী হয়।

উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত কমান্ডারকে নিয়োগ করাই ছিল রাসুল ﷺ ও তাঁর খলিফাদ্বয়ের যুদ্ধ এবং শান্তিকালীন সময়ে সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে বিজয় ও সফলতার অন্যতম কারণ।

রাসুল ﷺ ইনতিকালের সময় ইসলামি সমাজে অনেক কমান্ডার, আমির, আলিম, ফকিহ ও মুহাদ্দিস রেখে যান। যাঁরা উম্মাহকে ইসলামের সকল অঙ্গনে বিজয়, সফলতা ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করেন। উম্মাহকে এগিয়ে নিয়ে যান সম্মান, মর্যাদা, সৌভাগ্য, হক ও হিদায়াতের পথে।

এই কমান্ডার ও নেতাগণ ছিলেন রাসুল ﷺ-এর মাদরাসা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

কমান্ডার নির্বাচনের এই জীবন্ত শিক্ষা বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আরব ও সকল মুসলিমের গ্রহণ করা উচিত। কমান্ডার হোক বা সাধারণ লোক, শাসক হোক বা জনগণ—তাদের উচিত এসব যোগ্যতা থেকে উপকৃত হওয়া এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে দেওয়া।

তবে অবশ্য প্রত্যেক নেতাই যোগ্য ব্যক্তি তৈরি করতে পারে না এবং যোগ্যতাকে চয়ন করে ঠিক জায়গায় রাখতে পারে না।

রাসুল ﷺ ছিলেন উম্মাহর কল্যাণে নিজের স্বার্থকে ভুলে গিয়ে উম্মাহকে নিয়ে চিন্তা-ফিকিরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চূড়ায়। এ কারণে তাঁর বিদ্যাপীঠ থেকে বের হয়েছে বিভিন্ন সেক্টরের এবং বিভিন্ন অঙ্গনের সর্বকালের সর্বসেরা যোগ্য ব্যক্তিগণ।

এটা কোনো সহজ বিষয় নয়। বিশেষত উম্মাহর স্বার্থে নিজের স্বার্থকে ভুলে যাওয়া। নিশ্চয় এটা ওই নেতাদের জন্য খুবই কঠিন কাজ, যারা অন্যের স্বার্থের জন্য নয়; বরং ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নেতৃত্বের পদে সমাসীন হয়।

রাসুল ﷺ সত্যই বলেছেন :

> مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ وخانَ رَسُولَهُ وخانَ الْمُؤْمِنِينَ
>
> 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায় থেকে এমন লোককে দায়িত্ব দিল; অথচ সে সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক আছে, যে তার চেয়েও আল্লাহকে অধিক সন্তুষ্ট করতে পারে, তবে সে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের সাথে খিয়ানত করল।'[২]

এটি মানবজীবনের এমন এক সামগ্রিক বয়ান, রাসুল ﷺ সেটা কয়েক শব্দে বলে দিয়েছেন। কিন্তু এ কয়েকটি শব্দ কয়েক খণ্ড কিতাবের কাজ করে দিয়েছে।

---

২. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭১২৬। দেখুন, মুখতাসারুল জামিয়িস সগির : ২/২৮৭।

কমান্ডারগণের শেষ গন্তব্য

নবিজি ﷺ-এর কমান্ডারগণ শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বমূলক যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ হলো, তাঁরা ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের সাথে যত যুদ্ধেই জড়িয়েছিলেন, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া তার প্রতিটি যুদ্ধেই তাঁরা বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন; অথচ শত্রুরা ছিল শক্তি ও সংখ্যায় তাঁদের তুলনায় অনেক বেশি।

অনন্য বীরত্ব একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা একজন যোগ্য নেতার জন্য আবশ্যকীয় গুণ। আর এই অনন্য বীরত্ব রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল।

রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের অনন্য বীরত্বের অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে, তাঁদের মাঝে ২২ জন কমান্ডার শাহাদাত লাভ করেছেন। আর ১৫ জন কমান্ডার স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করেছেন শতকরা ৬০ জন আর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন শতকরা ৪০ জন।

অতীতে ও বর্তমানে সকল যুদ্ধের ইতিহাসে রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের শাহাদাতের পরিমাণের তুলনায় বেশি কমান্ডার নিহত হওয়ার ঘটনা আমার জানা নেই। কারণ স্বাভাবিকভাবেই সৈনিকের প্রাণহানির চেয়ে কমান্ডারের প্রাণহানি অনেক কম হয়। আর ভালো পরিস্থিতিতে তো কখনো কমান্ডারের প্রাণহানি শতকরা একজনেও পৌঁছে না।

রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের মাঝে এত পরিমাণে শাহাদাতের কারণ হিসেবে তাঁদের সর্বোচ্চ বীরত্বকে উপস্থাপন করলে তা সঠিক ও যুক্তিসংগত হবে ঠিক; কিন্তু এটাই পরিপূর্ণ বাস্তবতা নয়। পরিপূর্ণ বাস্তবতা হচ্ছে, এর কারণ ছিল তাঁদের সর্বোচ্চ বীরত্ব এবং গভীর ইমান। শাহাদাত অন্বেষণের ক্ষেত্রে গভীর ইমানের মতো অন্য কোনো শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র চালিকাশক্তি আর হতে পারে না—যে শাহাদাত সীমিত জীবন থেকে মুক্ত করে অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

শাহাদাতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবন লাভের যে আদর্শ ও বিশ্বাস ইসলাম নিয়ে এসেছে, অন্য কোনো আসমানি ধর্মের যুদ্ধের শিক্ষাতেও তার কোনো উপমা নেই। পুরো দুনিয়ার যুদ্ধবিদ্যায় এটি অনন্য এক আদর্শ, এর মাধ্যমে ইসলামি সমরবিদ্যা হয়েছে অতুলনীয়। অন্য কোনো সমরবিদ্যা এখন পর্যন্ত তার সমকক্ষ আদর্শ ও বিশ্বাস দিতে পারেনি।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নিকট তারা রিজিকপ্রাপ্ত।'[৩]

---

৩. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৬৯।

নবিজির কমান্ডারগণের শাহাদাত লাভ বা মৃত্যুতালিকা

ক্রমিক নং	কমান্ডার	ইসলাম গ্রহণ	সমাপ্তি	শাহাদাত বা মৃত্যুর স্থান	শাহাদাত বরণ বা মৃত্যুসন	
					হিজরি	খ্রিষ্টাব্দ
১	হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	উহুদ	৩	৬২৪
২	উবাইদা বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	বদর-প্রান্তর	২	৬২৩
৩	আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	উহুদের ময়দান	৩	৬২৪
৪	উমাইর বিন আদি ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	উহুদের ময়দান	৩	৬২৪
৫	সালিম বিন উমাইর ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতকাল	
৬	মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	৪৩	৬৬৩

৭	সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	৫৫	৬৭৫
৮	জাইদ বিন হারিসা ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	মুতা-প্রান্তর	৮	৬২৯
৯	আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	স্বাভাবিক মৃত্যু	গাজা	৫৪	৬৭৩
১০	আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	উহুদ	৩	৬২৪
১১	আবু সালাম বিন আব্দুল আসাদ ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	মদিনা	৪	৬২৫
১২	মুনজির বিন আমর ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	বিরে মাউনা	৪	৬২৫
১৩	মারসাদ বিন আবু মারসাদ ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	রাজি	৪	৬২৫
১৪	উক্কাশা বিন মিহসান ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	বুজাখানাহ	১১	৬৩২

১৫	আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ؓ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	মহামারিতে মৃত্যু	আমওয়াস	১৮	৬৩৯
১৬	আব্দুর রহমান বিন আওফ ؓ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	৩২	৬৫২
১৭	আলি বিন আবু তালিব ؓ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	কুফা	৪০	৬৬০
১৮	আব্দুল্লাহ বিন আতিক ؓ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	ইয়ামামা	১১	৬৩২
১৯	আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	মুতা	৮	৯২৯
২০	কুরজ বিন জাবির ؓ	হিজরতের পর	শহিদ	মক্কা	৮	৬২৯
২১	আমর বিন উমাইয়া ؓ	উহুদের যুদ্ধের পর	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	মুআবিয়া ؓ-এর খিলাফতকালে।	
২২	উমর বিন খাত্তাব ؓ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	মদিনা	২৩	৯৪৩

২৩	আবু বকর সিদ্দিক ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	১৩	৬৩৪
২৪	বাশির বিন সাদ ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	আইনে তামর	১২	৬৩৩
২৫	গালিব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	স্বাভাবিক মৃত্যু	–	–	–
২৬	ইবনে আবুল আওজা ﷺ	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	শহিদ	বনু সুলাইমের এলাকা	৭	৬২৮
২৭	শুজা বিন ওয়াহাব ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	ইয়ামামা	১১	৬৩২
২৮	কাব বিন উমাইর ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	জাতে আতলাহ	৮	৬২৯
২৯	জাফর বিন আবু তালিব ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	মুতা	৮	৬২৯
৩০	আবু কাতাদা বিন রিবয়ি ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	৫৪	৬৭৩

৩১	খালিদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	স্বাভাবিক মৃত্যু	হিমস	২১	৬৪১
৩২	আমর ইবনুল আস رضي الله عنه	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	স্বাভাবিক মৃত্যু	কায়রো	৪৩	৬৬৪
৩৩	সাদ বিন জাইদ رضي الله عنه	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	স্বাভাবিক মৃত্যু	–	–	–
৩৪	তুফাইল বিন আমর رضي الله عنه	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	ইয়ামামা	১১	৬৩২
৩৫	উয়াইনা বিন হিসন رضي الله عنه	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	উসমান رضي الله عنه-এর খিলাফতকালে।	
৩৬	কুতবাহ বিন আমির رضي الله عنه	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	উসমান رضي الله عنه-এর খিলাফতকালে।	
৩৭	দাহহাক বিন সুফিয়ান رضي الله عنه	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	বনু সুলাইমের এলাকা	১১	৬৩২
৩৮	আলকামা বিন মুজাজ্জিজ رضي الله عنه	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	শহিদ	হাবশা	২০	৬৪০

রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারদের মাঝে এত বেশি পরিমাণে শাহাদাতের সংখ্যা প্রমাণ করে শাহাদাতের প্রতি তাঁদের ছিল সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ও অতুল প্রত্যাশা। কারণ শাহাদাত বরণ করা হচ্ছে প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদের জীবনের সর্বোচ্চ আশা। আর রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারদের ব্যাপারে তো এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আবার রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের এত পরিমাণে শাহাদাতের সংখ্যা এটাও প্রমাণ করে যে, তাঁরা সামনে থেকে তাঁদের সৈনিকদের পরিচালনা করতেন। তাঁদের বলতেন, আমার অনুসরণ করো। বীরত্ব ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে তাঁদের জন্য সর্বোত্তম উপমা পেশ করতেন। তাঁরা সৈনিকদের রেখে নিজেরাই বিপজ্জনক স্থানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন আর সৈনিকদের রাখতেন নিরাপদ দূরত্বে। আর এ ধরনের কমান্ডারগণই তাদের সৈনিকদের জন্য আস্থা ও ভরসার পাত্রে পরিণত হন।

তাঁরা যে সৈনিকদের পেছনে থেকে পরিচালনা করতেন না, তার প্রমাণ হলো, তাঁরা সৈনিকদের 'সামনে অগ্রসর হও' বলে নিরাপদ স্থানে ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন না। যেমনটা বর্তমানে স্বার্থপর নেতারা করে থাকে, যারা সৈনিক ও উম্মাহর কল্যাণের ওপর নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের স্লোগান ছিল :

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

'বলুন, "তোমরা তো আমাদের জন্য কেবল দুটি কল্যাণের একটির অপেক্ষা করছ।"'[৪] (অর্থাৎ বিজয় অথবা শাহাদাত।)

এটাই প্রথম বাস্তবতা; যা রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের বিস্তারিত জীবনী পাঠ থেকে প্রকাশিত হয়। শতকরা ৬০ জন কমান্ডার শাহাদাত বরণ করা যুদ্ধের ইতিহাসে সর্বোচ্চ শতকার হার। এটা রাসুল ﷺ-এর এ কথার সত্যতার প্রমাণ—

---

৪. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৫২।

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ....

'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো আমার জমানার মানুষ, এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষ.... ।'[৫]

এটা সামরিক দিক থেকে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই তার বৈশিষ্ট্যের অবস্থান থেকে এই হাদিস শরিফ দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে পারেন।

কিন্তু দ্বিতীয় বাস্তবতা প্রথম বাস্তবতা থেকে আরও আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর। তা হলো, রাসুল ﷺ-এর বীর কমান্ডারগণ জিহাদের ময়দানেই শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু যাঁরা ছিলেন বিরল বীরত্বের অধিকারী কমান্ডার, তাঁরা নিজ বাড়িতে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।

আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, যেসব কমান্ডার নিজ বাড়িতে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁরা শাহাদাত বরণকারী কমান্ডারগণের চেয়ে ছিলেন অধিক সাহসী এবং অতি বীর।

এটা জানা কথা যে, বীরত্ব মানুষের অন্যতম মানবিক গুণ। আর এই বীরত্ব বা অতি বীরত্ব প্রমাণিত হয় যুদ্ধের ময়দানে। তাই রাসুল ﷺ-এর যে কমান্ডারগণ ময়দানে বীরত্ব প্রমাণ করে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের বীরত্বটা অবশ্যই উচ্চ পর্যায়ের এবং অন্যদের বীরত্বের চেয়ে সেরা। এ কারণে আমি শহিদ কমান্ডারদের বীরত্বকে শ্রেষ্ঠ বীরত্ব বলে উল্লেখ করেছি; কিন্তু যাঁরা বাড়িতে মারা গেছেন, তাঁদের বীরত্বকে আমি বিরল বীরত্ব বলে অভিহিত করেছি, যা সাধারণ বীরত্ব থেকে অনেক উর্ধ্বে। আর প্রত্যেক বিরল বীরত্বই সেরা বীরত্ব; কিন্তু প্রত্যেক সেরা বীরত্ব বিরল বীরত্ব নয়।

দ্বিতীয় বাস্তবতা প্রকাশ করে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই বিষয়টি সাব্যস্ত করা যে, কাপুরুষতা জীবন দান করে না আর বীরত্ব মৃত্যুবরণ করায় না। আল্লাহ সত্য বলেছেন :

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

৫. সহিহুল বুখারি : ২৬৫২, সহিহ মুসলিম : ২৫৩৩।

'আর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় (মৃত্যুক্ষণ) চলে আসবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছাতে পারবে, না এগুতে পারবে।'[৬]

যে ১৫ জন কমান্ডার নিজ বাড়িতে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁরা হৃদয়ের গভীর থেকে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করতেন। কিন্তু তাঁদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। ফলে মৃত্যুমুহূর্তেও জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছা থেকে তাঁরা চুল পরিমাণও সরেননি।

যারা এই কমান্ডারগণের বিরল বীরত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত এবং সরাসরি জানতে চায়, তারা এই কিতাবে তাঁদের জীবনী পাঠ করলে জানতে পারবেন। কিন্তু সংক্ষিপ্তাকারে তাঁদের বিরল বীরত্ব উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি। যদিও সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিস্তারিত আলোচনার কাজ দেবে না—তারপরও এটা সর্বাবস্থায় ফায়দাশূন্য থাকে না।

এখন আমি এই কমান্ডারদের বিরল বীরত্বের উদাহরণ পেশ করব। নেতৃত্বে অগ্রগামিতা হিসেবে তাঁদের বীরত্বকে পেশ করব। তখন আমরা দেখতে পাব, যিনি বীর, তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন আর যিনি অতি বীর, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।

সালিম বিন উমাইর আনসারি ﷺ নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছেন। দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে প্রথমবারের মতো নেতৃত্ব পেয়েছিলেন। তিনি আবু আফাককে হত্যা করতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের মাঝে গিয়ে পরিবার-সম্প্রদায়ের মাঝেই তাকে হত্যা করেছিলেন। এই আবু আফাক রাসুল ﷺ ও মুসলিমদের সাথে দুশমনির জন্য অন্যদের উসকে দিত। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা বানাত। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'আমার হয়ে এই খবিসটার পাওনা কে মিটিয়ে দেবে?' তখন সবার মাঝ থেকে সালিম ﷺ স্বেচ্ছায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল-আনসারি ﷺ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয় হিজরি রবিউল আওয়াল মাসে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পান।

৬. সুরা ইউনুস, ১০ : ৪৯।

তিনি সেই বীরদের একজন ছিলেন, যারা উহুদের ময়দানে রাসুল ﷺ-এর সাথে অটল-অবিচল ছিলেন। সেই যুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর পাশে ১৪ জন সাহাবি অবিচল ছিলেন—সাত জন মুহাজির ও সাত জন আনসার, তাঁদের একজন ছিলেন মাসলামা ﷺ। অনেক যুদ্ধে তিনি রাসুল ﷺ-এর পাহারাদারির দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তিনিই ইহুদিনেতা কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেছিলেন। তিনিও এ নরাধমকে হত্যার জন্য স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং তার সম্প্রদায় ও পরিবার-পরিজনের মাঝেই তাকে হত্যা করেছিলেন। এক অভিযানে মুশরিক বাহিনীর ওপর মাত্র ৩০ জন সৈনিক নিয়ে জয় লাভ করেছিলেন। তিনি সেই মহান ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, যাঁরা সত্যের ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করতেন না। দ্বীন বাঁচাতে বড় ফিতনার সময় একাকিত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। অতঃপর ইসলামি বিজয়ধারার বিখ্যাত কমান্ডারগণের একজনে পরিণত হন। উমর ﷺ-এর খিলাফতকালে কাদিসিয়া যুদ্ধে তিনি কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যে যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য ইরাক-বিজয়ের পথ খুলে যায়। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামের হয়ে কাফিরের প্রতি তির নিক্ষেপ করেছিলেন। উহুদে নাজুক পরিস্থিতির সময় রাসুল ﷺ-এর সাথে অটল ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর পাশে থেকে তির-বর্শা দিয়ে কাফিরদের প্রতিহত করেছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে তির-বর্শা এগিয়ে দিয়ে টার্গেট সফল হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন আর বলছিলেন, 'নিক্ষেপ করো, তোমার প্রতি আমার বাবা-মা উৎসর্গ হোক!' আলি বিন আবি তালিব ﷺ বলতেন, 'সাদ ﷺ ছাড়া অন্য কারও জন্য রাসুল ﷺ স্বীয় পিতামাতাকে উৎসর্গ করতে শুনিনি।'

এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে সাদ ﷺ বিরল বীরত্বের অধিকারী ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন উনাইস আনসারি ﷺ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। চতুর্থ হিজরির মুহাররম মাসে প্রথমবারের মতো তিনি কমান্ডারের দায়িত্ব পান। রাসুলের দুশমন সাল্লাম বিন আবুল হুকাইককে খাইবারে গিয়ে তার সম্প্রদায় ও পরিবার-পরিজনের মাঝে হত্যা করেছিলেন। তিনি খাইবারে ইসলাম ও মুসলিমদের

আরেক ঘোর দুশমন ইহুদি বুসাইর বিন রিজামকেও হত্যা করেছিলেন—যে রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বনু গাতাফান গোত্রকে একত্রিত করছিল ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তার ঘোরতর শত্রুতার ফলে।

এই আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ একাই খালিদ বিন সুফিয়ান হুজালিকে হত্যা করেছিলেন—যে রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেনাসমাবেশ করছিল। আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ তাকে তার সৈন্যসামন্তের মাঝেই হত্যা করেছিলেন, যাদেরকে সে যুদ্ধের জন্য জমা করেছিল।

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﷺ ১৮ হিজরিতে মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন। যারা মহামারিতে মারা যায়, তারা শহিদ; কিন্তু আমি তাঁকে শহিদদের কাতারে শামিল করছি না। কারণ তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমি যাঁরা জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছেন, তাঁদেরকেই শহিদের তালিকাভুক্ত করার নীতি নির্ধারণ করেছি। আবু উবাইদা ﷺ ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আখির মাসে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আপন পিতাকে হত্যা করেছিলেন। উহুদের ময়দানে তাঁদের সাথে ছিলেন, যাঁরা রাসুল ﷺ-এর সাথে অবিচল ছিলেন এবং তাঁকে বীরের মতো প্রতিরক্ষা করেছেন।

রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় অনেক অভিযানের কমান্ডার হয়েছিলেন। যার একটিতে আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ সৈনিক হিসেবে ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর উমর ﷺ-এর খিলাফতকালে তিনি হয়ে যান ইসলামি বিজয়ধারার অন্যতম জেনারেল। তাঁর নেতৃত্বেই বিজয় হয়েছিল শাম ও জাজিরাতুল আরবের বিস্তৃত অঞ্চল।

১৮ হিজরিতে মহামারি প্রকট আকার ধারণ করলে উমর ﷺ মহামারি এলাকা থেকে আবু উবাইদা ﷺ-কে বের করতে চাইলেন। কিন্তু আবু উবাইদা ﷺ উমর ﷺ-এর কাছে পত্র লিখলেন, 'মুসলিম বাহিনী ছেড়ে আমার মন অন্যদিকে যেতে চাচ্ছে না; তাই তাঁদের থেকে বিচ্ছেদ হতে চাচ্ছি না।' এরপর তিনি তাঁর সৈনিকদের সাথে থেকে যান। ফলে মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ ধরনের বীরত্বের প্রকাশ বারবার ঘটে না।

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁ স্বীয় বিছানায় ইনতিকাল করেন। ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পান। বদরের চূড়ান্ত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। একজনকে বন্দী, একজনকে হত্যা এবং কিছু বর্ম গনিমত লাভ করেন।

উহুদের নাজুক পরিস্থিতির সময় তিনিও রাসুল ﷺ-এর সাথে অবিচল ছিলেন, যখন অল্প কয়েকজন সাহাবি সেখানে অটল ছিলেন। রাসুল ﷺ-কে রক্ষা করতে গিয়ে কঠিন যুদ্ধের ফলে শরীরে ২১টি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার মধ্যে পায়ে একটি আঘাত পান। যার কারণে সারা জীবন খুঁড়িয়ে হাঁটেন। তাঁর সামনের দুই দাঁত ভেঙে যায়। সেদিন তিনি দুজন মুশরিককে হত্যা করেন।

ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার্থে তাঁর বীরত্ব ছিল অগণিত।

আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরি ﵁ নিজ বাড়িতে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। ষষ্ঠ হিজরিতে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন আরবের সবচেয়ে দুঃসাহসী এবং দানশীল বীরপুরুষ। তাঁর দুঃসাহসিকতার একটি উদাহরণ হলো, কুরাইশরা খুবাইব বিন আদি ﵁-কে তানয়িম নামক স্থানে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। এরপর লাশ শূলে ঝুলিয়ে রেখে প্রহরা বসিয়ে দেয়। কিন্তু এই প্রহরার ভেতরে গিয়ে আমর ﵁ খুবাইব ﵁-এর লাশ ছিনিয়ে মদিনায় নিয়ে আসেন।

আবু সুফিয়ান বিন হারব এক মুশরিককে রাসুল ﷺ-কে গুপ্তহত্যার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে ব্যক্তির বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় আর সে ইসলাম কবুল করে।

আবার রাসুল ﷺ আমর বিন উমাইয়া ﵁-কে সালামা ﵁-কে সাথে দিয়ে আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সুযোগমতো পেলে তাকে হত্যা করবে।

তাঁরা মক্কায় গেলেন। আমর ﵁ রাতে বাইতুল্লাহ গিয়ে তাওয়াফ করছিলেন। তাঁকে মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান দেখে চিনে ফেলে এবং মুশরিকদের তাঁর ব্যাপারে সতর্ক করে। কুরাইশরা এটা শুনে ভয় পেয়ে যায় এবং তাঁকে খুঁজতে

শুরু করে। যেহেতু তিনি জাহিলি যুগেই গুপ্তঘাতক ছিলেন; ফলে তিনি এবং সালামা ﷺ চলে আসতে বাধ্য হন। ফেরার পথে তাঁরা মুশরিক উবাইদুল্লাহ বিন মালিক তামিমিকে পেয়ে হত্যা করেন। আরেক মুশরিককেও হত্যা করেন, কারণ সে তখন এই কবিতা আবৃত্তি করছিল—

'জীবন থাকতে মুসলিম হব না *** মুসলিমদের ধর্ম গ্রহণ করব না।'

এ ছাড়াও কুরাইশ থেকে প্রেরিত আরও দুই ব্যক্তিকে পান, যারা মুসলিমদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করছিল; ফলে তাদের একজনকে হত্যা করেন এবং অপরজনকে বন্দী করেন।

আমর ﷺ মদিনায় এসে রাসুল ﷺ-এর কাছে ঘটনা বলছিলেন আর রাসুল ﷺ তা শুনে হাসছিলেন।

এ ছাড়াও আমর ﷺ-এর অনেক বীরত্বপূর্ণ ঘটনা আছে। তিনি জাহিলি যুগেও বীর ছিলেন এবং বীর ছিলেন ইসলামের যুগেও।

আবু বকর সিদ্দিক ﷺ আপন বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন। সপ্তম হিজরির শাবান মাসে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পান। তিনি সেই সাত মুহাজিরের অন্যতম, যারা উহুদে রাসুল ﷺ-এর সাথে অটল-অবিচল ছিলেন। তিনি একক নেতৃত্বের এক উচ্চতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অনেক সংখ্যক মুশরিক সৈন্যের ওপর জয় লাভ করেছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর সাথে অটল-অবিচল ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর তিরোধানের পর আমরা এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। আমরা তো ধ্বংসই হয়ে যেতাম, যদি আল্লাহ আবু বকরকে দিয়ে আমাদের অনুগ্রহ না করতেন।' এ কথা বলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মুরতাদদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধের দৃঢ় সংকল্প এবং অভাবনীয় বিজয়।

আবু রজা আল-উতারি ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি মদিনায় প্রবেশ করে লোকদের জমায়েত দেখতে পেলাম। এরপর দেখলাম, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির মাথায় চুমু খাচ্ছে আর বলছে, "আমি আপনার জন্য উৎসর্গ! আপনি না থাকলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।" তখন আমি বললাম, "কে

কাকে চুমু খাচ্ছে?" লোকেরা বলল, "ইনি হচ্ছেন উমর, তিনি আবু বকরের মাথায় চুমু খাচ্ছেন। কারণ আবু বকর ﷺ জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অবশেষে তারা লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এসেছে।'"

আমাদের জন্য আলি ﷺ-এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তাঁর সাথিদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বলো তো, কে সবচেয়ে সেরা বীর?' লোকেরা উত্তরে বলেছিল, 'আপনি।' তখন আলি ﷺ বলেছিলেন, 'আমি তো যার সাথেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়েছি, তার সাথেই সমান সমান থেকেছি। কিন্তু তোমরা বলো, সবচেয়ে সেরা বীর কে?' লোকেরা বলেছিল, 'আমরা জানি না।' তখন আলি ﷺ বলেছিলেন, 'আবু বকর। বদরের দিন আমরা রাসুল ﷺ-এর জন্য একটি বসার স্থান বানালাম। বললাম, "রাসুল ﷺ-এর সাথে কে থাকবে? যাতে কোনো মুশরিক তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস না করে। আল্লাহর শপথ, আমাদের কেউ নিকটবর্তী হয়নি একমাত্র আবু বকর ﷺ ব্যতীত, তিনি খোলা তরবারি নিয়ে রাসুল ﷺ-এর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে যান। সুতরাং তিনি ছিলেন সবচেয়ে সেরা বীরপুরুষ।'

আবু বকর ﷺ-এর বিরল বীরত্ব একটি বহুল প্রসিদ্ধ বিষয়।

গালিব বিন আব্দুল্লাহ আল-লাইসি ﷺ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। সপ্তম হিজরির রমাদান মাসে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পান। তিনি একাধিক অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। সামান্য শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে মুশরিকদের বড় বড় শক্তির ওপর সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেছেন। প্রকৃতপক্ষেই তিনি রাসুল ﷺ-এর একজন অসাধারণ কমান্ডার ছিলেন। যেমন মক্কা-বিজয়ের দিন তিনি রাসুল ﷺ-এর অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্ব ছিল অসাধারণ।

গালিব ﷺ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ইরাক-বিজয়ের যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হাতে গোনা সেরা মুসলিম বীরদের একজন। ১৩ হিজরিতে বুওয়াইব যুদ্ধে তিনি একাই নয়জন পারসিক সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন।

১৪ হিজরিতে কাদিসিয়ার যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সম্মানজনক। সে যুদ্ধে তিনি সেকালের আলবাব শহরের বাদশাহ হুরমুজকে ক্যাসপিয়ান সাগরের তীরে হত্যা করেছিলেন। সেদিন হুরমুজ ছিল পারস্যের সর্বোচ্চ কমান্ডার।

গালিব ﷺ ছিলেন বিরল বীরত্বের অধিকারী আত্মোৎসর্গী বীরপুরুষ।

আবু কাতাদা বিন রিবয়ি আল-আনসারি ﷺ নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন। অষ্টম হিজরির শাবান মাসে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পান। আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﷺ-এর নেতৃত্বে আবু রাফি হত্যার অভিযানে তিনিও শরিক ছিলেন। আবু কাতাদা ﷺ আবু রাফিকে হত্যার স্থানে ভুলে তাঁর ধনুকটি ছেড়ে এসেছিলেন। কিছুদূর আসার পর ধনুক আনার জন্য আবারও তিনি সেখানে ফিরে গিয়েছিলেন; কিন্তু তখন তিনি ইহুদির পক্ষ থেকে কোনো ভয়ের আশঙ্কা করেননি বা তাদের তিনি গোনায়ও ধরেননি।

মুরাইসির যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর পতাকা বহন করেছিল সাফওয়ান জুশ-শুকর। তিনিই সাফওয়ানকে কুপোকাত করেছিলেন। ফলে সেদিন মুসলিমদের বিজয় হয়েছিল।

জি-কারাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেদিন তিনি মাসআদাহ বিন হাকামাহ এবং হাবিব বিন উয়াইনাকে হত্যা করেছিলেন। যার কারণে রাসুল ﷺ সেদিন বলেছিলেন, (خَيْرُ فُرْسَانِنَا أَبُو قَتَادَةَ) 'আমাদের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার হলো আবু কাতাদা।'[৭] সেদিন থেকে তিনি রাসুলের অশ্বারোহী বলে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহ থেকে দুটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এটা প্রমাণ করে, তিনি ছিলেন একজন দীপ্তিমান কমান্ডার।

হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে এক মুশরিককে হত্যা করেন। কিন্তু একজন নব মুসলিম আবু কাতাদা ﷺ-এর হাতে নিহত ব্যক্তির সামানাপত্র নিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করল। সে রাসুল ﷺ-কে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, এই নিহত ব্যক্তির সামানাপত্র আমার কাছে আছে। আপনি তাকে (আবু কাতাদাকে) আমার পক্ষ থেকে সন্তুষ্ট করে দিন।' কিন্তু তখন আবু বকর ﷺ বলে উঠলেন, 'না, কক্ষনো হতে পারে না। তিনি তোমার পক্ষ হয়ে তাঁকে

৭. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ৬২৫২।

সন্তুষ্ট করবেন না। আল্লাহর যে সিংহ আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়াই করেছে, তাঁর হাতে নিহত ব্যক্তির সামানাপত্রে তুমি ভাগ বসাবে, এটা হতে পারে না। নিহত ব্যক্তির সামানাপত্র তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও।' আর এই আল্লাহর সিংহ ছিলেন আবু কাতাদা ﵁।

আবু কাতাদা ﵁-এর বিরল বীরত্বের আলোচনা করলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ ﵁ উটের মতো নিজ বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করেন। যে কথা তিনি নিজেও মৃত্যুর সময় বলেছিলেন। অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে প্রথমবারের মতো মুতা যুদ্ধের কমান্ডার হন। একে একে তিনজন সেনাপতি শাহাদাত বরণের পর স্বয়ং মুসলিমরাই তাঁকে সেনাপতি নির্ধারণ করেছিলেন। মুসলিমরা তাঁকে এক কঠিন এবং হতাশাজনক পরিস্থিতিতে কমান্ডার বানিয়েছিলেন। আর তিনি তাঁর অনন্য বীরত্ব ও সাহসিকতার মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন।

রাসুল ﷺ তাঁকে অষ্টম হিজরির রমাদান মাসে প্রথমবারের মতো একটি অভিযানের নেতৃত্বে নিয়োগ করেছিলেন। তারপর নতুন করে অপর দুটি অভিযানের কমান্ডার নিয়োগ করেন। অনুরূপ মক্কা-বিজয়কালে তাঁকে বাহিনীর একটি অংশের কমান্ডার বানিয়েছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খালিদ ﵁ মুসলিমদের বিরুদ্ধে তিনটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইরতিদাদের ফিতনায় তিনটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন—যে তিনটি যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক বিপজ্জনক। ইরাকে পারস্য এবং তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে ১৫টি যুদ্ধ করেছেন। ইরাক থেকে সিরিয়ার পথে আরও চারটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সিরিয়ায় সাতটি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। সামরিক জীবনে অংশ নেওয়া তাঁর যুদ্ধের সংখ্যা হলো ৪৪টি। তাঁর সবকটি যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুস্পষ্ট বিজয়। যা ইসলামি ইতিহাসে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

একাধিক যুদ্ধে তিনি একাকী আক্রমণ করে শত্রুর কমান্ডারকে হত্যা করেছিলেন। যেটা শত্রু বাহিনীকে মানসিক পরাজয় এবং মুসলিমদের সামনে আত্মসমর্পণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

তাঁর সুস্পষ্ট বিজয়সমূহ তাঁকে আজও বিখ্যাত জেনারেল হিসেবে বিশ্বের বুকে পরিচিত করে রেখেছে। শুধু আরব বা ইসলামি বিশ্বেই নয়, তাঁর যুদ্ধসমূহ বিধর্মীদের কলেজ ও সামরিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান করানো হয়, যেমনটা আরবের ইসলামি সামরিক কলেজ ও অন্যান্য কলেজগুলোতে পড়ানো হয়।

পশ্চিমা অনেক চমকপ্রদ কমান্ডারের কথা আমরা শুনি বা পড়ি, যারা এই জন্য গর্ব করে যে, তারা এমন সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে, যা তারা খালিদ বিন ওয়ালিদ ﵁-এর যুদ্ধ-পরিকল্পনা থেকে শিখেছে। এভাবে আমরা ভিনদেশি কমান্ডারদের ব্যাপারে শুনি বা যতই পড়ি যে, তারা খালিদ ﵁-এর মতো বীর কমান্ডার; কিন্তু বাস্তবে তারা তাঁর মতো কখনো হতে পারবে না। মূল এবং প্রকৃতি উভয়টার মাঝেই যোজন যোজন তফাত থেকে যাবে।

তাঁর সম্পর্কে রাসুল ﷺ-এর এ উক্তিই যথেষ্ট—

لَخَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

‘খালিদ আল্লাহর তরবারিসমূহ থেকে একটি তরবারি—যে তরবারিকে আল্লাহ মুশরিকদের ওপর উন্মুক্ত করেছেন।’[৮]

কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে খালিদ ﵁ বলেছিলেন, ‘বরফ আচ্ছাদিত ওই এক রাতের চেয়ে জমিনে আমার কাছে কোনো অতি প্রিয় রাত ছিল না—যে রাতে আমি মুহাজির সৈনিকদের সাথে নিয়ে প্রত্যুষে দুশমনের ওপর আক্রমণের জন্য বলছিলাম, “তোমরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকো।”’

সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েও শাহাদাত না পাওয়ার দুঃখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, ‘একশটি বা প্রায় একশটি যুদ্ধের ময়দানে লড়েছি। শরীরে এক বিঘত জায়গা এমন নেই, যেখানে তির, তরবারি বা বর্শার আঘাত লাগেনি। তারপর এই আমি আজ উটের মতো নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরছি! কাপুরুষদের চোখে ঘুম না আসুক!’

---

৮. আল-মুসনাদু লিশ-শাশি : ৬১৭।

আমর বিন আস ﷺ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। অষ্টম হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। দুটি অভিযানের কমান্ডার হয়েছিলেন। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর আমর ﷺ রিদ্দার যুদ্ধ ও শাম বিজয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণ করেন মিসর, লিবিয়া ও ফিলিস্তিন বিজয়ের যুদ্ধেও।

তাঁর বিচক্ষণতা ও বিরল বীরত্বের একটি প্রমাণ হলো, তিনি ফিলিস্তিনে আজনাদিনে অবস্থান করছিলেন, যেখানে রোমান সেনাপতির বিষয়ে তিনি কিছুই করতে পারছিলেন না এবং কোনো দূতও তাকে আশ্বস্ত করতে পারছিল না। তখন আমর ইবনুল আস ﷺ দূত সেজে নিজেই তার কাছে গেলেন। আরতাবুন তাঁকে বুঝে ফেলে। সে বলে, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ব্যক্তি হয়তো নিজেই মুসলিম বাহিনীর আমির হবে অথবা সে এমন ব্যক্তি হবে, যার কথা আমির গ্রহণ করে।' তাই সে তার এক ব্যক্তিকে আমর ﷺ-এর রাস্তায় ওত পেতে থাকার নির্দেশ দেয় এবং ফেরার সময় তাঁকে হত্যা করতে বলে। আমর ﷺ আরতাবুনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝতে পারেন। তাই তিনি তাকে বললেন, 'আপনি আমার কথা শুনেছেন, আমিও আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা আমার কাছে কিছুটা অনুকূল মনে হয়েছে। আমি ওই ১০ জনের একজন, যাদেরকে উমর ﷺ এই আমিরের সাথে পাঠিয়েছেন, তাঁকে সাহায্য-সমর্থন এবং তাঁর বিষয়াদি দেখাশুনা করতে। আমি এখন ফিরে গিয়ে তাঁদেরকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। আমার কাছে যে মতামত পেশ করেছেন, তাঁরা যদি তাতে একমত পোষণ করে, তবে সামরিক কর্মকর্তা এবং আমিরও একমত পোষণ করবে।' আরতাবুন বলল, 'জি ঠিক আছে।' এবং যে ব্যক্তিকে সে আমর ﷺ-কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল, তাকে নিবৃত্ত করল। আমর ﷺ তার কাছ থেকে বের হয়ে চলে আসলেন। এরপর আরতাবুন বুঝতে পারল যে, আমর ﷺ তাকে ধোঁকা দিয়েছেন। সে বলল, 'এই লোক তো আমাকে ধোঁকা দিল। এ তো দেখি, সৃষ্টির সেরা বিচক্ষণ লোক!' এ ঘটনা উমর ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে উমর ﷺ বললেন, 'সত্যিই আমর অনেক বিচক্ষণ।'

আমর ﷺ জাহিলি যুগে কুরাইশের একজন আলোচিত বীর অশ্বারোহী ছিলেন। ছিলেন নির্ভীক দুঃসাহসী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি, যেমন বিবরণ স্বয়ং আবু বকর

رضي الله عنه দিয়েছেন। তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং বিরল বীরত্বের সাথে লড়াই করতেন। এ কারণে তিনি রাসুল ﷺ এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাদের আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রতি রাসুল ﷺ-এর আস্থা ও ভরসার ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেন, 'ইসলাম গ্রহণের পর থেকে যুদ্ধে রাসুল ﷺ খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমার সাথে কোনো সাহাবির তুলনা করেননি।' আমর رضي الله عنه সত্যিই বলেছেন। রাসুল ﷺ-এর আস্থাই তাঁর প্রশংসার জন্য যথেষ্ট।

সাদ বিন জাইদ আনসারি رضي الله عنه স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। অষ্টম হিজরির রমাদান মাসে প্রথমবারের মতো তিনি কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। জি-কারাদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহী দলের কমান্ডার হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উয়াইনা বিন হিসনের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, যে মুসলিমদের চারণভূমিতে আক্রমণ করেছিল। এক বর্ণনামতে, তিনি হাবিব বিন উয়াইনাকে হত্যা করেন। আরেক বর্ণনামতে হাবিবকে আবু কাতাদা رضي الله عنه হত্যা করেন।

সাদ رضي الله عنه উত্তমরূপে তাঁর অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং উত্তমরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও কিছু অভিযানে সৈনিক হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন আর কিছু অভিযানে কমান্ডার হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। জিহাদের ময়দানে তিনি এমন দৃষ্টান্তমূলক দায়িত্ব পালন করেছেন, যা গভীর মূল্যায়নের দাবি রাখে। অংশগ্রহণ করা প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি বিরল বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

উয়াইনা বিন হিসন আল-ফাজারি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামের আগে এবং পরে আরবের গুটিকয়েক বীর ও সর্দারদের একজন ছিলেন।

তিনি তাদের একজন ছিলেন, যাদের মনস্তুষ্টির জন্য সদাকার সম্পদ দেওয়া হতো। আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। রাসুল ﷺ তাদেরকে সদাকার সম্পদ দিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের শান্ত রাখতেন।

তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম জাররার বা দুঃসাহসী, যিনি দশ হাজার লোকের নেতৃত্ব দিতেন। জাররার উপাধি তাকে দেওয়া হতো, যে কমপক্ষে এক হাজার লোকের নেতৃত্ব দিত। গাতাফান গোত্র থেকে তাগলিব গোত্র পর্যন্ত তিনি নেতৃত্ব দিতেন। তিনি ইসলামের পূর্বে আরবের অনেক ঘটনায় তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আবার ইসলাম গ্রহণের পরেও সৈনিক হয়ে এবং কখনো কমান্ডার হয়ে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহ থেকে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। সে অভিযান ছিল তামিম গোত্রের জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে। রাসুল ﷺ তাঁকে অভিযানের কমান্ডার নির্ধারণ করেন, যেহেতু যুদ্ধের জন্য তিনিই প্রথম দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আবার তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে মুসলিমদের সুধারণা ছিল। অল্পসংখ্যক সৈন্য দিয়ে বহু সংখ্যক শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করার ক্ষেত্রে তাঁর বীরত্বের অনেক প্রভাব ছিল।

তাঁর জীবন ধারাবাহিক যুদ্ধাভিযানের সাথে যুক্ত ছিল। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী।

রাসুল ﷺ-এর ১৫ তম কমান্ডার কুতবাহ বিন জাদিদাহ আনসারি رضي الله عنه-ও স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। নবম হিজরির সফর মাসে প্রথমবারের মতো কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। বদর যুদ্ধে তিনি উভয় বাহিনীর মাঝে একটি পাথর রেখে বলেন, 'এই পাথর যতক্ষণ পলায়ন না করছে, ততক্ষণ আমিও পলায়ন করছি না।' সে যুদ্ধে তিনি পাহাড়ের ন্যায় অটল-অবিচল ছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন বীরবিক্রমে। তিনি কুরাইশের একজন প্রখ্যাত বীরকে বন্দী করেন।

উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেই দক্ষ তিরন্দাজদের একজন ছিলেন, যাঁরা ওই যুদ্ধে মুসলিমদের জন্য রক্ষাপ্রাচীর হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শরীরে বড় বড় নয়টি আঘাত প্রাপ্ত হয়েও পরের দিন রাসুল ﷺ-এর সাথে বদরে সুগরা হামরাউল আসাদে পৌঁছেছিলেন মুশরিকদের ধাওয়া করার জন্য। এ যুদ্ধের কারণে একদিকে মুসলিমদের মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটে, অপরদিকে মুশরিকদের ঘটে মানসিক বিপর্যয়।

তিনি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরপর তিন কমান্ডার শাহাদাত বরণের কারণে মুসলিম বাহিনীর ওপর পরাজয় নামতে থাকে। শাহাদাত বরণ করতে থাকেন মুসলিম সৈনিকগণ। তখন কুতবাহ ﷺ চিৎকার দিয়ে বললেন, 'ভাইগণ, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নিহত হওয়ার চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হওয়া অনেক উত্তম।'

তিনি মক্কা-বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। কুদাইদে গিয়ে রাসুল ﷺ অনেকগুলো ঝান্ডাবাহী প্রস্তুত করেন। সেখানে বনু সালামা গোত্রের ঝান্ডা কুতবাহ ﷺ-এর হাতে দেন। আর ঝান্ডা কেবল সে ব্যক্তির হাতেই দেওয়া হয়, যে শত্রুদের থেকে ঝান্ডার ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা করতে পারবে।

কুতবাহ ﷺ যখন রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহ থেকে একটি অভিযানের দায়িত্ব পান, তখন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে অভিযান পরিচালনা করেন। এবং শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করেন। অথচ তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল কম আর শত্রুর সৈন্যসংখ্যা ছিল তাঁর চেয়ে অনেক বেশি।

তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কোনো যুদ্ধ থেকে পিছপা হননি। এমনকি অন্য কমান্ডারের নেতৃত্বেও অনেক অভিযানে শরিক হয়েছিলেন। অংশগ্রহণ করা প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি প্রদর্শন করেছেন অনন্য দুঃসাহসিকতা এবং বিরল বীরত্ব।

আর এই দ্বিতীয় বাস্তবতা তথা বীরত্ব এবং দুঃসাহসিকতার কারণেই বেশির ভাগ কমান্ডার যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছেন।

সম্ভবত ১৫ হিজরির শুরুর দিকে প্রথমবারের মতো এই খাঁটি বাস্তবতা একটি গোপন বার্তা প্রকাশ করেছিল। যে বার্তা কাপুরুষদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, হায়াত আল্লাহর হাতে। কাপুরুষতা হায়াতকে বাড়াতে পারে না এবং বীরত্ব হায়াতকে কমাতে পারে না। কত সত্যি কথাই না বলেছে, যে বলেছে, 'তুমি মৃত্যুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ো, তোমার জীবনায়ু বাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

এই সরল হিসেবমতেই অতি বীর মৃত্যুবরণ করে আর শাহাদাত লাভ করে বীর।

কেন এ কিতাব রচনার প্রয়াস...

রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারদের সম্পর্কে কিতাব লেখার চিন্তা আমাকে সব সময় তাড়া করে ফিরত। এটা ওই সময় থেকে, যখন ১৩৫৬ হিজরি মুতাবিক ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের ছাত্র ছিলাম। এবং হিজরি ১৩৬৭ ও ১৩৬৮ মুতাবিক ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ—এই দুই বছর ইরাকি সামরিক স্টাফ কলেজে কর্মরত ছিলাম। উভয় কলেজে যুদ্ধ-ইতিহাসের পাঠে প্রথম স্তরে গুরুত্ব দিত ইরাকি যুদ্ধ ইতিহাস আর ফিলিস্তিন যুদ্ধ ইতিহাসকে। সে ইতিহাস হচ্ছে ইরাকে ও ফিলিস্তিনে বৃটিশদের উপনিবেশের ইতিহাস।

অনুরূপ সামরিক বিভাগে অধ্যয়নকালে দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্ব দিত (১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল) প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে। আর ইরাকি স্টাফ কলেজে গুরুত্ব দিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে।

আর ইরাকি সামরিক কলেজ ও স্টাফ কলেজের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তা অন্যান্য ইসলামি বিশ্বের সামরিক কলেজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই সমস্ত সামরিক কলেজসমূহে যুদ্ধের ইতিহাস পাঠের পদ্ধতি সীমাবদ্ধ থাকে শুধু ইসলামি দেশসমূহে উপনিবেশের ইতিহাসে এবং সীমাবদ্ধ থাকে উপনিবেশ এলাকা বানানোর যুদ্ধ এবং উপনিবেশবাদীদের কমান্ডারদের নিয়ে।

অন্যদিকে ইসলামি যুদ্ধসমূহের ইতিহাস—যেগুলো মানসিকতা উন্নত করে এবং আত্মবিশ্বাস জন্ম দেয়—সামরিক কলেজ এবং আরব ও অন্যান্য সামরিক স্টাফ কলেজে অনুপস্থিত।

অনুরূপভাবে মুসলিম কমান্ডারদের কথা—যাঁদের প্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসুল ﷺ ও ইসলামি বিজয়াভিযানের কমান্ডারগণ এবং যেসব কমান্ডার মুসলিমদের হয়ে যুদ্ধ করে শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন—তাঁদের আলোচনা এই সামরিক কলেজ ও স্টাফ কলেজসমূহে একেবারেই নেই।

আর সর্বসাকুল্যে ইসলামি সমরবিদ্যা ও তার মর্ম আলোচনা সে কলেজগুলোতে একেবারেই অনুপস্থিত। অতীতেও ছিল না বর্তমানেও নেই।

আরব এবং ইসলামি সামরিক কলেজগুলোতে ইসলামি সমরবিষয়ক ইতিহাসকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ইসলামি সমর ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত সকল ঘটনাপ্রবাহকে।

তার পরিবর্তে পরিপূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে আরব এবং ইসলামি দেশগুলোকে কীভাবে উপনিবেশ বানানো হয়েছে, সেই সমর ইতিহাসের দিকে। মুসলিম দেশের ছাত্ররা সেগুলোই অধ্যয়ন করছে এবং সেগুলোর ওপর পরীক্ষা দিচ্ছে। যার ওপর নির্ভর করে তাদের পাস-ফেলের ভবিষ্যৎ।

ব্রিটেন, ইতালি ও ফ্রান্সের সামরিক কলেজে তাদের ছাত্রদের যে পদ্ধতিতে যুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে, হুবহু সেই পদ্ধতিতেই যুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে মুসলিম ছাত্রদের আরব ও অন্যান্য ইসলামি বিশ্বের সামরিক কলেজগুলোতে। এখানে পদ্ধতিগতভাবে মৌলিক বিষয়ে কোনো পার্থক্য রাখা হয়নি; যদিও শাখাগত সামান্য কিছু বিষয়ে পার্থক্য আছে; কিন্তু সে পার্থক্য মূল বিষয়ে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

আর দশজন সামরিক ছাত্রের মতোই আমি একজন ছাত্র ছিলাম। আমাদের দেশসমূহকে উপনিবেশ বানানোর যুদ্ধের ইতিহাস পাঠদানের উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এ পাঠদানের উদ্দেশ্যের শুধু একটি সহজ কারণ বুঝতে পারতাম, তা হচ্ছে, আমার এবং আমার মতো সামরিক ছাত্রদের মানসিক শক্তি বিধ্বস্ত করা এবং সামরিক কলেজ থেকে তাদেরকে অধঃপতিত ও বিধ্বস্ত মানসিকতার সনদ প্রদান করা। তাদের এমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট বানানো, যা তাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের দিকে ঠেলে দেবে।

ভিনদেশের সামরিক কলেজে উপনিবেশ বানানোর যুদ্ধ-ইতিহাসের পাঠদানের একটি সংগত কারণ আছে। তা হচ্ছে, তাদের ছাত্রদের মানসিক অবস্থার উন্নতি করা। কারণ এই পাঠে তারা দেখাবে, আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে তারা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য মুসলিম দেশ ও পরাজিত রাষ্ট্রের সামরিক কলেজে উপনিবেশবাদের এই যুদ্ধ-ইতিহাস পাঠদানের কী সংগত কারণ থাকতে পারে? মানসিক শক্তি বিধ্বস্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে কি? আর যে সামরিক বাহিনীর মানসিক অবস্থা বিধ্বস্ত

হবে, সে বাহিনী তো কখনো বিজয় অর্জন করতে পারবে না। সে বাহিনী কখনো যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারবে না। এটা একেবারেই সহজ সমীকরণ।

নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করতাম, আমি কীভাবে তাদের কমান্ডারদের জীবনী শিখছি, যারা আমার দেশকে উপনিবেশ বানিয়েছে, আমার উম্মাহকে বানিয়ে রেখেছে দাস। আমি কেন মুসলিম বিজয়ী কমান্ডারদের জীবনী শিখছি না, যারা দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করেছেন।

কীভাবে আমার দেশকে উপনিবেশ বানানোর এবং আমার উম্মাহকে দাস বানানোর যুদ্ধসমূহ অধ্যয়ন করছি। অথচ আল্লাহর দিকে আহ্বানের জন্য এবং বাতিলকে দূর করে সত্যকে সত্য হিসেবে প্রমাণিত করার জন্য নবিজি ﷺ-এর যুদ্ধসমূহ অধ্যয়ন করছি না! কেন অধ্যয়ন করছি না রিদ্দার যুদ্ধ, মহান ইসলামি বিজয়াভিযানসমূহ! কেনই বা অধ্যয়ন করছি না মুসলিমদের প্রতিরক্ষার যুদ্ধের ইতিহাসগুলো!

অথচ উপনিবেশবাদী কমান্ডারদের এক অংশ এতটাই নিচে নেমেছে যে, এক কমান্ডার সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀-এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বিজয়ের অহংকারে খোলা তরবারি নিয়ে বলেছিল, 'হে সালাহুদ্দিন, আমরা দ্বিতীয়বার এখানে ফিরে এসেছি। আজকে মাত্র ক্রুসেড যুদ্ধের ইতি হলো।'

এই যে কমান্ডার, যে তার সৈনিকদের বীরত্ব এবং নিজ নেতৃত্বের বিচক্ষণতার কারণে বিজয় অর্জন করতে পারেনি; বরং অস্ত্র, রসদ ও পরিবহন-যানের উন্নতির কারণে বিজয় লাভ করতে পেরেছে—সে যেন ভুলে না যায়, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀ এমন অনেক বাহিনীকে নাকানিচুবানি খাইয়েছিলেন, যাদেরকে কমান্ড করত স্বয়ং তাদের বাদশাহ এবং যুবরাজরা। তিনি কুদস ও মুসলিম অঞ্চলগুলো থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেছেন। কিন্তু তিনি সেই ইনসাফভিত্তিক যুদ্ধনীতি অনুসরণ করে যুদ্ধ করেছিলেন, যে নীতি ইসলামি শিক্ষা আবশ্যক করেছে। যুদ্ধ করেছেন এমন বীরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে, যা তাঁর স্বভাবজাত বীরত্ব অবধারিত করেছিল। তাই তো, ইংরেজ বাদশাহ ও তাদের যুদ্ধের কমান্ডার রিকোর্ডাস যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হলে আইয়ুবি ﵀ নিজের বিশেষ

চিকিৎসককে তার চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। এই বাদশাহর সুস্থতার জন্য তার আপনজন এবং সম্প্রদায়ের চেয়ে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির অবদানই বেশি ছিল। যেটা স্বয়ং ভিন্ন ধর্মের ঐতিহাসিকরাও লিপিবদ্ধ করেছে। আজ কত দিন হলো সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀ ইনতিকাল করেছেন। কত যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপরও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀ ইতিহাসের এক অধ্যায়ে পরিণত হয়ে আছেন। আর আজ এই ভিনদেশি কমান্ডার এসে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀-এর কবরের পাশে তাঁর মোকাবিলা করছে; অথচ তিনি কবরে বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে লাশ হয়ে আছেন। কিন্তু সে ভীতু কমান্ডার এখন এসে লাশের ওপর তরবারি উন্মুক্ত করে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে, যখন তার জন্য পরিবেশ নিরাপদ!

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম সামরিক ছাত্রদের কাছে কাঙ্ক্ষিত বিষয় হয়ে গেছে যে, তারা এই কাপুরুষ উপনিবেশবাদী ভিনদেশি কমান্ডার ও তার মতো কমান্ডারদের জীবনী শিক্ষা করবে। আর বীর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀-এর জীবনী ভুলে যাবে, যিনি ক্রুসেডারদের নাপাক হাত থেকে বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং ইসলামি দেশ থেকে ভিনদেশিদের বিতাড়িত করেছিলেন।

অনুরূপ ছাত্রদের সিলেবাসে এটাও আছে যে, তারা এই ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে, যে সমস্ত ভারতীয় মুসলিম সৈনিকরা তাদের দ্বীনি ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্য ভিনদেশি বাহিনীর সারি থেকে পালিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হয়েছিল, তারা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক এবং এমন অপরাধী, যার কারণে তারা গুলি করে হত্যার উপযুক্ত। কারণ তারা ভিনদেশিদের সাথে খিয়ানত করেছে এবং যারা তাদের দ্বীনি ভাইদের হত্যা করছে, তাদের আদেশ লঙ্ঘন করেছে। এই উপনিবেশবাদীরা সেই ভারতীয় মুসলিম সৈনিকদের থেকে যাদের ধরতে পেরেছে, তাদের গুলি করে হত্যা করেছে।

ছাত্রদের কাছে এটাও আশা করা হয় যে, যারা এই ভারতীয় মুসলিম সৈনিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের আত্মগোপনের জায়গা বলে দিয়েছিল, তারাই প্রকৃত নির্দোষ ও সৎ; আর ভারতীয় মুসলিমরাই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক।

ইসলামি এবং আরব সামরিক কলেজগুলোতে যুদ্ধ ইতিহাসের পাঠের মানদণ্ড পুরোটাই নষ্ট ও বিশৃঙ্খলপূর্ণ। কিন্তু সেখানের সামরিক ছাত্ররা সুস্পষ্টভাবে জানে যে, জবরদখলকারী বাহিনীর কমান্ডাররাই তাদের দেশের শত্রু। দখলদার বাহিনীই মূলত অপরাধী জবরদখলকারী। যারা ভিনদেশিদের সারিতে যুদ্ধ করেনি, তারাই নির্দোষ। আর যারা তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন, তারা শহিদ। তারা তাদের রবের কাছে রিজিকপ্রাপ্ত।

প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণিতে পড়াকালে ইতিহাস অধ্যয়ন করার আকাঙ্ক্ষা করতাম। কিন্তু সামরিক কলেজ ও স্টাফ কলেজে এসে ইতিহাসকে অপছন্দ করতে লাগলাম।

তা ছাড়া মুসলিম কমান্ডার ও তাদের গৌরবময় যুদ্ধসমূহ এবং ইসলামি সমরবিদ্যা সম্পর্কে ছাত্রদের জানাশোনা ছিল খুবই কম এবং অস্পষ্ট। কারণ ইসলামি লাইব্রেরিগুলো ছিল এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উৎসগ্রন্থ থেকে শূন্য। তাই আমি ওই দিন থেকে আল্লাহর কাছে আশা করলাম, এই শূন্যতা পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাব।

১৩৭৩ হিজরি মোতাবিক ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অল্প অল্প করে আমার এ আশা বাস্তবায়ন হতে লাগল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাসুল ﷺ-এর সামরিক জীবন অধ্যয়ন করলাম। যেহেতু তিনি সকল কমান্ডারের সর্দার এবং সকল সর্দারের কমান্ডার। ওই বছর আমার গবেষণার ফসল কাগজের পাতায় টুকে রাখলাম। মসুলের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত আকরা পাহাড়ি শহরের গ্যারিসনে আমার পদের সদ্ব্যবহার করলাম। যার কারণে ইসলামিক সামরিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমার প্রথম আশা 'আর-রাসুলুল কায়িদ'[৯] কিতাবখানা পূর্ণতা পেল।

বাহিনীতে সামরিক দায়িত্ব আমাকে আমার আশার আরেকটি অংশ বাস্তবায়ন করতে বিরত রাখল। একপর্যায়ে ১৩৭৯ হিজরি মোতাবিক ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে মসুলে বিদ্রোহের পর ইরাকের কাসিম কারাগারে বন্দিত্ব বরণ করলাম। ফলে দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গিয়ে আমার পুরাতন আশা বাস্তবায়নের কাজে লেগে

৯. অর্থাৎ কমান্ডার নবি (ﷺ)।

গেলাম। সামরিক ভাষা, ইসলামি সমরবিদ্যা, বিজয়ের যুদ্ধ এবং ইসলামি বিজয়াভিযানের কমান্ডারদের জীবনী অধ্যয়ন করার জন্য পরিপূর্ণ অবসর পেলাম।

এক বছরের বেশি সময় পর জেলখানা থেকে মুক্তি পেলাম। তখন বাড়িতে স্বাধীন থাকতাম; কিন্তু বাড়ির বাইরে গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের কঠোর নজরদারিতে থাকতাম। তাই জাজিরাতুল আরব ও ইরাক বিজেতা, পারস্য বিজেতা, মিসর ও শাম বিজেতা কমান্ডার বইগুলো রচনায় নিজেকে নিয়োগ করলাম। এবং ১৩৮৪ থেকে ১৩৮৬ হিজরি মোতাবিক ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ, এই দুই বছরে বইগুলো পাঠকের জন্য পরিপূর্ণভাবে বের করলাম। কারাবরণ, বাহিনী থেকে অব্যাহতি এবং পেনশন আমার জন্য আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত হয়ে দেখা দিল। যদি আমার এমন অবসর না আসত, তবে এই কিতাবগুলো পাঠকের সামনে আনা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

যারা আমার কিতাব 'কাদাতু ফাতহিশ শাম ওয়া মিসর'[১০] অধ্যয়ন করেছেন, তারা দেখতে পেয়েছেন, সেখানে আমি 'কাদাতুন নাবিয়্যি ﷺ'[১১] কিতাবটি অতি সত্বর বের করার জন্য নিজের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু ১৪০১ হিজরি পর্যন্ত আমার ওয়াদা পূরণ করতে পারলাম না। কেননা, তখন অনেক ব্যস্ততার মধ্যে পড়ে যাই। যেমন : জোরপূর্বক সরকারি রাজনৈতিক পোস্টে দায়িত্ব, ১৩৮৭ হিজরিতে আরব ও জায়োনিস্ট ইহুদির মাঝে যুদ্ধ, ফিলিস্তিন-বিষয়ক গবেষণা করে বইপুস্তক, পেপার-পত্রিকায় প্রকাশ করা এবং তা ইরাক ও আরবের সামরিক ও সিভিল কলেজে পাঠদানের দায়িত্ব। এরপর আরব বাহিনীর জন্য সামরিক পরিভাষা একত্রকরণ এবং সাধারণ মানুষের জন্য চারটি অভিধান একত্রে বের করা। এই একত্রিত করার কাজে ১৩৮৮ থেকে ১৩৯৩ হিজরি মোট পাঁচ বছর লেগে গেল।

প্রায় ছয় বছর কায়রোতে এই দায়িত্ব পালনের পর ১৩৯৩ হিজরিতে দেশে ফিরে প্রায় দুই বছর রোগাক্রান্ত ছিলাম। একটু সুস্থতা অনুভব করতেই সবকিছু ভুলে আমার একাডেমিক দায়িত্বে মগ্ন হলাম। কিন্তু হঠাৎ ইরাকি শিক্ষা

---

১০. মিসর ও শাম বিজেতা কমান্ডারগণ।

১১. অর্থাৎ নবিজির কমান্ডারগণ।

একাডেমির সদস্যপদ থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। একাডেমির প্রধানকে অব্যাহতির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বলতে পারল না। এরপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রশ্ন করে কোনো কারণ জানতে পারল না। কারও মাধ্যমে কারণ জানতে না পেরে আমি নিজেও কাউকে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম না। এই অব্যাহতি পেয়ে আমি খুশিই হয়েছিলাম। কারণ একমাত্র অবসরই আমাকে মুসলিমদের সামরিক ইতিহাসের খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার সুযোগ করে দিতে পারে। আর এটা আমার ওপর এবং সকল মুসলিমের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত সকল কাজ থেকে অধিক জরুরি।

আকরা পর্বতের নিরিবিলি পরিবেশ আমাকে 'আর-রাসুলুল কায়িদ' কিতাব রচনার সুযোগ করে দিল। কারাগারের নির্জনতা আমার জন্য সহজ করে দিয়েছিল ইসলামি বিজয়াভিযানের কমান্ডারদের নিয়ে লেখার বিষয়টিকে। বাড়িতে পেনশন অবস্থার অবসর আমার জন্য সহজ করে তুলেছিল চারখণ্ডে ইসলামি বিজয়াভিযানের কমান্ডারদের নিয়ে বই রচনা করতে। মিসরে অবসরতা আমাকে চার খণ্ডে সামরিক পরিভাষাগুলো একত্রিত করার সুযোগ করে দিল। ইরাকি শিক্ষা একাডেমি থেকে অব্যাহতি আমার জন্য সুযোগ তৈরি করে 'কাদাতুন নাবিয়্যি ﷺ' (যা আমরা নামকরণ করেছি 'নববি কাফেলা' নামে) কিতাবটি আলোর মুখ দেখানোর।

অবসর আমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বিরাট নিয়ামত। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষত যখন মুসলিমদের ইতিহাসের খিদমতে আমার শ্রম ফলদায়ক হয়েছে। এটা শুধু আরববিশ্বে নয়; বরং অন্য সকল মুসলিম দেশেও ফলদায়ক হয়েছে। আরব উপদ্বীপ ও ইসলামি দেশসমূহে বিস্তৃত পরিসরে সামরিক কলেজ, স্টাফ কলেজ ও সামরিক ভার্সিটিগুলোতে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, বিজয়াভিযান ও কমান্ডার সম্পর্কিত আরব এবং ইসলামি সমরবিদ্যা অনেক গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হচ্ছে। তারপরও ইসলামি লাইব্রেরিগুলোতে একটি শূন্যতা থেকে গেছে। বিশেষত 'কাদাতুন নাবিয়্যি ﷺ' বইটির শূন্যতা। আল্লাহ চান তো সুদৃঢ় আশা এই শূন্যতা পূরণ করবে।

আমার মাঝে এই এক অনুভূতি কাজ করত, করে এবং আগামীতেও করবে যে, ইসলামি সমরবিদ্যা এমন একটি বার্তা, যা বহন করা এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া আমার একান্ত দায়িত্ব।

আবার কিতাবাদি গবেষণা ও বিস্তৃত অধ্যাপনার যে একটা আশা করতাম, তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এখনো তার কিছু প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

এই কিতাব—যা মূলত ইসলামি সমরপদ্ধতির কিছু পদক্ষেপমাত্র—হিজরি ১৪০১ সালের ফসল। এই বছর মুসলিমরা হিজরতের ১৪০০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার উপলক্ষে ব্যক্তিগতভাবে আবার দলগতভাবে সভা-সেমিনারের আয়োজন করে। আমার এ কিতাব সেই ধারাবাহিকতার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অংশ। আর হিজরত ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এই বছর আরব দেশগুলোর মাঝে অনেক মতভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি হয়। যেন এই দেশগুলো চোখে দেখতে পায় না, তাদের দুশমনরা তাদের দেশকে ধ্বংস ও নিজেদের অনুগত করার কী কী চক্রান্ত করছে। যাদের মূলে আছে জায়োনিস্ট ইহুদি। যে আরব দেশসমূহে তার আধিপত্য বিস্তারের মন্দ আশা করে। যেন তাদের রাষ্ট্রের সীমানা নীলনদ থেকে ফুরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

রাসুল ﷺ আল্লাহর অনুগ্রহে গোটা আরবকে ইসলামের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এই সংঘবদ্ধ করার একটি কার্যকর পদক্ষেপ ছিল, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বসানো।

আমি বারবার বলি এবং অনেক বছর ধরেই এই কথা বলি, রাসুল ﷺ কীভাবে এই আরবদের একত্রিত করতে পেরেছিলেন, যারা কিনা শপথ করে বসেছিল একতাবদ্ধ হবে না?

তিনি উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতেন। তাই আদর্শে এবং সক্ষমতায় উম্মাহকে তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা শাসন করেছে। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা একতাবদ্ধ হতে পেরেছে। এবং ঐক্য ও একতার মাধ্যমে বিশ্ব জয় করেছে।

সুদৃঢ় আকিদা ও উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা কখনো মতভেদ করে না। কারণ তারা নির্মাণ করে, ধ্বংস করে না। সংশোধন করে, নষ্ট করে না।

যাদের কোনো আকিদা নেই, যোগ্যতা নেই, তারাই মতানৈক্য করে। তারা ধ্বংস করে। যেহেতু তারা জানে না, কীভাবে নির্মাণ করতে হয়। তারা শুধু নষ্ট করে। কারণ তারা জানে না, কীভাবে সংশোধন করতে হয়।

তবে কি মুসলিমদের জন্য উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ উত্তম আদর্শ হবেন না?!

ব্যক্তি গঠনে কি রাসুল ﷺ আরব ও অন্যান্য মুসলিমদের আদর্শ হবেন না?!

নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহর কাছে দুআ করি আরব ও অন্যান্য মুসলিমরা যেন কিতাবটি থেকে এই জীবন্ত শিক্ষাটাই গ্রহণ করতে পারে। উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতি অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। ব্যক্তিত্বের অবমূল্যায়ন এবং বিশেষ করে নিফাকমুক্ত সুদৃঢ় আকিদার ব্যক্তিদের অবমূল্যায়ন বহু লম্বা হয়েছে। দীর্ঘতর হয়েছে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ধ্বংসের খেলা।

আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সকল প্রশংসা তাঁরই। সকাল-সন্ধ্যার স্তুতি-গুণগান তাঁরই দরবারে প্রেরণ করছি। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবির ওপর।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সিংহ সাইয়িদুশ শুহাদা

হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ

তাঁর বংশধারা ও ইসলামপূর্ব জীবন

হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ আল-কুরাশি আল-হাশিমি।[১২] তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালিব আমৃত্যু কুরাইশের সর্দার ছিলেন।[১৩]

তাঁর মাতা হালাহ বিনতে উহাইব বিন আবদে মানাফ বিন জুহরাহ।[১৪] হালাহ রাসুল ﷺ-এর মাতা আমিনার চাচাতো বোন ছিলেন। হামজা ﷺ জুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ-এর মাতা সাফিয়া ﷺ-এর আপন ভাই ছিলেন।[১৫]

চাচা মুত্তালিবের পরে পিতা আব্দুল মুত্তালিব হাজিদের পানি পান করানো এবং সাহায্য-সহযোগিতা করার দায়িত্ব লাভ করেন। তার পূর্বপুরুষগণ কওমের জন্য যেসব সেবা ও কর্ম সম্পাদন করে এসেছিলেন, তিনিও তা আঞ্জাম দিতে থাকেন। একপর্যায়ে কওমের মধ্যে তার সম্মান ও মর্যাদা এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছে, পূর্বপুরুষদের মধ্যে কারও মর্যাদা যেখানে পৌঁছতে পারেনি। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিল। কওমের মধ্যে তার

১২. নাসবু কুরাইশ : ১৭ পৃ., জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৫ পৃ.। বিস্তারিত দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/১-২।

১৩. আনসাবুল আশরাফ : ১/৬৪।

১৪. নাসবু কুরাইশ : ১৭ পৃ.।

১৫. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৬৮।

অনেক সম্মান ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৬] তার স্থায়ী কর্মগুলোর মধ্যে আজও যে কর্মটি বিদ্যমান আছে, তা হলো জমজম কূপ খনন।[১৭]

হামজা ﷺ একদিকে ছিলেন রাসুল ﷺ-এর চাচা আরেক দিকে দুধভাই। আবু লাহাবের আজাদকৃত দাসী সুওয়াইবা রাসুল ﷺ-কে কিছু দিন দুধ পান করিয়েছিলেন। তাঁর আগে তিনি হামজা ﷺ-কে দুধ পান করিয়েছিলেন।[১৮]

তিনি রাসুল ﷺ-এর চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলেন। একটি দুর্বল মতানুসারে চার বছরের বড় ছিলেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।[১৯] কারণ রাসুল ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে আর তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে।

হামজা ﷺ দ্বিতীয় হারবুল ফুজ্জারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আব্দুল মুত্তালিবের ইনতিকালের ১২ বছর পরে এবং হস্তি বাহিনীর ২০ বছর পরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আরব ইতিহাসে এমন বড় ও প্রসিদ্ধ যুদ্ধ দ্বিতীয়টি আর নেই। হারবুল ফুজ্জার বা পাপিষ্ঠদের যুদ্ধ এ কারণে বলা হয়, কারণ এ যুদ্ধে কিনানা ও কাইস দুই পক্ষই সম্মানিত বস্তুসমূহকে লাঞ্ছিত করেছিল।

কাইস পক্ষের মিত্রবাহিনী ছিল সাকিফ ও অন্যান্য গোত্র। আর কুরাইশ পক্ষের মিত্রবাহিনী ছিল কিনানা, আহাবিস ও আসাদ বিন খুজাআহ গোত্র। উকাজের[২০] মেলায় সংঘটিত এ যুদ্ধে কুরাইশ তার শত্রুপক্ষের ওপর জয় লাভ করেছিল।[২১]

যে সময় তিনি হারবুল ফুজ্জারে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২২ বছর। কারণ তিনি হস্তিবাহিনী ঘটনার দুবছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আর রাসুল ﷺ জন্মগ্রহণ করেন হস্তিবাহিনীর বছরেই।[২২]

---

১৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/১৫৩।
১৭. বিস্তারিত জানতে দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/১৫৪-১৬৪।
১৮. আনসাবুল আশরাফ : ১/৯৪।
১৯. উসদুল গাবাহ : ২/৪৬।
২০. উকাজ, জাহিলি যুগে মক্কা থেকে তায়িফের দিকে তিন দিনের দূরত্বে একটি বাজার বসত। তাকে উকাজ মেলা বলে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৬/২০৩।
২১. বিস্তারিত দেখুন, ইবনুল আসির : ১/৫৮৮-৫৯৫।
২২. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/১৭১।

হারবুল ফুজ্জার ছিল হামজা ﷺ-এর জন্য যুদ্ধের প্রথম বাস্তব প্রশিক্ষণক্ষেত্র। এ যুদ্ধে তিনি ভালোভাবে অস্ত্র ও অশ্বচালনা রপ্ত করেন। অর্জন করেন যুদ্ধের কলাকৌশল, ময়দানের পরিস্থিতি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর।

তিনি বড় শিকারপ্রেমী ছিলেন।[২৩] এর থেকে প্রতীয়মান হয় তিনি অশ্বচালনা ও নিখুঁত তিরন্দাজিতে কতটা দক্ষ ছিলেন। এই দুই সমরবিদ্যার জন্য শিকার একটি বাস্তব অনুশীলনও বটে।

আম্মাজান খাদিজা ﷺ-এর সাথে রাসুল ﷺ-এর বিবাহে হামজা ﷺ-এর বড় ভূমিকা ছিল। খাদিজা ﷺ ছিলেন কুরাইশের মধ্যম পর্যায়ের বংশের আর সম্মান ও সম্পদে সেরা নারী। তাঁর সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে প্রবল আগ্রহী ছিল। কিন্তু তিনি কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নিজেই রাসুল ﷺ-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। রাসুল ﷺ ব্যাপারটি তাঁর চাচাদের সাথে আলোচনা করেন। তখন চাচা হামজা ﷺ তাঁকে নিয়ে খাদিজা ﷺ-এর পরিবারের কাছে যান এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে বিবাহ করিয়ে দেন।[২৪]

যখন রাসুল ﷺ-এর প্রতি এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলো—

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

'আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।'[২৫]

তখন রাসুল ﷺ বনি মুত্তালিবকে একত্রিত করে একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তারা প্রায় ৪০ জন বা এর বেশি ছিল। তাদের মধ্যে চাচা আবু তালিব, আবু লাহাব ও হামজা ﷺ-ও ছিলেন।[২৬]

---

২৩. উসদুল গাবাহ : ২/৪৬, ইবনুল আসির : ২/৮৩।
২৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/২০৫। ইবনুল আসিরে আছে (২/৪৫) খাদিজা ﷺ-কে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য রাসুল ﷺ-এর সাথে হামজা ও আবু তালিব গিয়েছিলেন।
২৫. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২১৪।
২৬. ইবনুল আসির : ২/৬২।

এরপর থেকে মুশরিকরা রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া শুরু করল। চাচাদের মধ্যে আবু লাহাব আব্দুল উজ্জাও রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দিতে লাগল। বরং সে রাসুল ﷺ ও মুসলিমদের প্রতি একটু বেশি কঠোর ছিল। রাসুল ﷺ-কে সর্বদা কষ্ট দিত। রাসুল ﷺ-এর প্রতিবেশী হওয়ার কারণে বাড়ির দরজায় ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখত। তাই রাসুল ﷺ বলতেন, 'হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, প্রতিবেশীর প্রতি এটা কেমন আচরণ?'

একদিন হামজা ؓ তাকে দেখে ফেলেন। তখন তিনি ময়লা নিয়ে আবু লাহাবের মাথায় মারেন। আবু লাহাব মাথা থেকে ময়লা ঝাড়ে আর বলে, 'আমার ভাই দেখছি বোকা মানুষ।' এরপর থেকে সে তার মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু অন্যকে এ মন্দ কাজের জন্য নিযুক্ত করে।[২৭]

হামজা ؓ এভাবেই ভাইয়ের সন্তানকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। কারণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর ভাই-ই জালিম আর ভাতিজা মাজলুম। তাই জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুমকে সাহায্য করেছেন। এটা তাঁর পবিত্র আত্মা এবং সত্যের প্রতি সহজাত আকর্ষণ থাকার কারণে হয়েছে। তিনি রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর এ ভালোবাসা চাচা কিংবা দুধভাই হওয়ার কারণে ছিল না; বরং তিনি তাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর স্বভাব ও সাহসী মানসিকতার কারণে।

হামজা ؓ-এর ইসলাম গ্রহণ

আবু জাহেল একবার রাসুল ﷺ-এর পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। রাসুল ﷺ তখন সাফা পাহাড়ের কাছে বসা ছিলেন। যাওয়ার কালে আবু জাহেল রাসুল ﷺ-কে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে কষ্ট দিল। তাঁর দ্বীনকে নিয়ে কটূক্তি করল। আবু জাহেলের এসব কাণ্ডকীর্তি আব্দুল্লাহ বিন জুদআনের এক দাসী শুনে ফেলল। এরপর আবু জাহেল কাবা চত্বরে কুরাইশের সভাকক্ষ দারুন নাদওয়ায় গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর হামজা ؓ শিকার থেকে ফিরে এলেন। তিনি কোথাও থেকে এলে আগে কাবাঘর তাওয়াফ করতেন, তারপর

২৭. ইবনুল আসির : ২/৭০।

পরিবারের কাছে যেতেন। কুরাইশের সভাকক্ষে গিয়ে সবার সাথে কুশল বিনিময় করতেন। তিনি ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে কঠোর এবং জেদি প্রকৃতির মানুষ। ততক্ষণে রাসুল ﷺ বাসায় ফিরে গেছেন। হামজা ؓ যখন আব্দুল্লাহ বিন জুদআনের দাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দাসী তাকে বলল, 'হে আবু উমারাহ, আপনার ভাতিজা মুহাম্মাদকে আবুল হাকাম বিন হিশাম যে গালিগালাজ করেছে, যদি আপনি নিজে দেখতে পেতেন, তবে এতক্ষণে কিছু একটা ঘটে যেত। কিন্তু মুহাম্মাদ তাকে কিছুই বলেননি। চুপচাপ বাড়িতে ফিরে গেছেন।'

এটা শুনে হামজা ؓ কারও সাথে কোনো কথা না বলে সোজা আবু জাহেলের দিকে রওয়ানা হলেন। মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন, সে মানুষের মাঝে বসা। এরপর কাছে গিয়ে ধনুক দিয়ে তার মাথায় এমন আঘাত করলেন, এক আঘাতে তার মাথা ফেটে গেল। তাকে বললেন, 'তুমি তাঁকে গালিগালাজ করো, এখন আমি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলাম। সে যা বলে, আমিও তা বলব। পারলে আমাকে ঠেকাও দেখি!'

আবু জাহেলকে সাহায্য করার জন্য বনু মাখজুম গোত্রের কিছু লোক দাঁড়িয়ে গেল। আবু জাহেল বলল, 'থাক, আবু উমারাহকে কিছু বলো না, আমি তার ভাতিজাকে মন্দ ভাষায় গালি দিয়েছি।'

হামজা ؓ যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন কুরাইশরা বুঝতে পারল, মুহাম্মাদ এখন শক্তিশালী হয়ে গেছে। হামজা এখন তাঁকে রক্ষা করবে। ফলে তারা খারাপ আচরণ করা থেকে কিছুটা বিরত থাকল।[২৮] রাসুল ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির দুই বছর পরে হামজা ؓ ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৯] একটি দুর্বল মতানুসারে রাসুল ﷺ দারুল আরকামে প্রবেশের পর হামজা ؓ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমার মতে প্রথম মতটিই অগ্রগণ্য। কারণ অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থ প্রথম বর্ণনার ব্যাপারে একমত।

---

২৮. উসদুল গাবাহ : ২/৪৬-৪৭, ইবনুল আসির : ২/৮৩। দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/ ৩১২-৩১৩।

২৯. উসদুল গাবাহ : ২/৪৬, আল-ইসাবাহ : ২/৩৭, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৬৮, আল-ইসতিআব : ১/৭৬৯।

হামজা ﷺ উমর ﷺ-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। উমর ﷺ যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন দুজনের মাধ্যমে ইসলাম অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে গেল। মুশরিকরা বুঝতে পারল, তাঁরা এবার আল্লাহর রাসুল ও মুসলিমদের রক্ষা করবে।[৩০]

শিআবে আবু তালিবে অবস্থান

কুরাইশরা দেখল, রাসুল ﷺ-এর সাথিগণ হাবশায় গিয়ে স্থিতিশীলতার মধ্যে নিরাপদ জীবনযাপন করছে। বাদশাহ নাজ্জাশি তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণকারীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। এদিকে উমর ও হামজাও ইসলাম গ্রহণ করেছে। আস্তে আস্তে বিভিন্ন গোত্রে ইসলাম প্রসার লাভ করছে। তখন তারা সকলে মিলে একটি চুক্তিনামা লিখল। সেখানে তারা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের প্রতি এই মর্মে বয়কট জারি করল যে, 'তাদের কাউকে বিয়ে করবে না এবং তাদের কাছেও কাউকে বিয়ে দেবে না। তাদের কাছে কেউ কিছু বিক্রি করবে না এবং তাদের থেকেও কেউ কিছু ক্রয় করবে না।' এ চুক্তির ওপর সকলে ঐক্যবদ্ধ হলো। এরপর সেটি নিজেদের ওপর অলঙ্ঘনীয় করার জন্য বাইতুল্লাহর গায়ে ঝুলিয়ে দিল।

বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সকলেই আবু তালিবের কাছে জড়ো হলো। এরপর তারা আবু তালিব নামক পাহাড়ের গিরিপথে প্রবেশ করল। বনু হাশিম থেকে আবু লাহাব বের হয়ে কুরাইশের সাথে মিলিত হলো। এবং আপন ভাই-ভাতিজাদের বিপক্ষে অবস্থান নিল।

এই অঙ্গীকারনামার কারণে তারা দুই বা তিন বছর সেখানে দুর্বিষহ জীবনযাপন করল। এই সময়ে তাদের কাছে কোনো কিছুই পৌঁছত না। কেউ নিজ উদ্যোগে পৌঁছাতে চাইলে চুপিসারে এবং অতি সংগোপনে পৌঁছাতে হতো। একদিন আবু জাহেল হাকিম বিন হিজামকে দেখল, কিছু গম নিয়ে খাদিজা ﷺ-এর উদ্দেশ্যে গিরিপথের দিকে যাচ্ছে। আবু জাহেল তাকে ধরে বলল, 'তুমি কি খাবার নিয়ে বনু হাশিমের কাছে যাচ্ছ? আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে মক্কায়

---

৩০. ইবনুল আসির : ২/৮৪।

লাঞ্ছিত না করে ছাড়ছি না।' সেখানে আবুল বুখতারি এসে হাজির হলো, সে বলল, 'তার সাথে এমন করছ কেন!' আবু জাহেল বলল, 'সে বনু হাশিমের কাছে খাবার নিয়ে যাচ্ছে।' আবুল বুখতারি বলল, 'তার ফুফুর জন্য কিছু খাবার তার কাছে ছিল। সেটাই সে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি তার খাবার তার কাছে যেতে দেবে না? পথ ছাড়ো।' আবু জাহিল পথ ছাড়ল না। একপর্যায়ে দুজনের মাঝে দ্বন্দ্ব বাজল। আবুল বুখতারি উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে আবু জাহেলের মাথা ফাটিয়ে দিল। তাকে খুব অপদস্থ করে ছাড়ল। হামজা ﵁ এসব নিকট থেকেই দেখছিলেন। অথচ কুরাইশরা চাচ্ছিল, এসব ঘটনার খবর যাতে রাসুল ﷺ ও তাঁর সাথিদের কাছে কোনোভাবে না পৌঁছে। অন্যথায় তারা এক বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। অপরদিকে রাসুল ﷺ রাতদিন সকাল-সন্ধ্যা, গোপনে ও প্রকাশ্যে লোকদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো মানুষের পরোয়া করছিলেন না।[৩১]

অবশেষে অঙ্গীকারনামাটি একদিন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং বয়কটের সমাপ্তি ঘটল। বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল। তাদের সাথে হামজা ﵁-ও ফিরে এলেন। ফিরে এলেন আগের তুলনায় নবিজি ﷺ ও মুসলিমদের রক্ষায় অধিক শক্তিশালী হয়ে।[৩২]

হিজরত

রাসুল ﷺ মুসলিমদের নিরাপত্তার মূল ঘাঁটি মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে অন্যদের মতো হামজা ﵁-ও মদিনায় হিজরত করলেন। তিনি হিজরত করলেন রাসুল ﷺ-এর হিজরতের অল্প কিছু দিন পূর্বে। হামজা, জাইদ বিন হারিসা এবং হামজা ﵁-এর মিত্র আবু মারসাদ কান্নাজ বিন হিসন ও তাঁর ছেলে মারসাদ গানাবি কুবায়[৩৩] কুলসুম বিন হাদামের কাছে মেহমান হলেন। যিনি বনু আমর বিন আওফের ভ্রাতৃগোষ্ঠী ছিলেন। অপর মতানুসারে তাঁরা

---

৩১. বিস্তারিত দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৭১-৩৯৬।
৩২. বিস্তারিত দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৯৭-৪০৬।
৩৩. মদিনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত গ্রামের নাম কুবা। সেখানে মাসজিদুত তাকওয়া অবস্থিত। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৭/২০-২১।

সাদ বিন খাইসামার কাছে মেহমান হয়েছিলেন। আরেক মতে হামজা ﷺ বনু নাজ্জারের ভ্রাতৃগোষ্ঠী আসআদ বিন জুরারার কাছে মেহমান হয়েছিলেন।[৩৪]

মদিনায় রাসুল ﷺ স্বীয় আজাদকৃত গোলাম জাইদ বিন হারিসা এবং হামজা ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দেন। উহুদের দিন তাঁর কাছেই হামজা ﷺ জীবনের শেষ অসিয়ত করেছিলেন।[৩৫]

ইসলামের প্রথম পতাকা

মক্কা থেকে হিজরত করে রাসুল ﷺ যেদিন মদিনায় পৌছলেন, সেদিনটি ছিল ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার। এটি সর্বসম্মত মত। এরপর সাত মাসের মাথায় রমাদান মাসে একটি সাদা ঝান্ডা দিয়ে হামজা ﷺ-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। এটি ছিল ইসলামের প্রথম ঝান্ডা। সে ঝান্ডাটি বহন করেছিলেন হামজা ﷺ-এর মিত্র আবু মারসাদ কান্নাজ আল-গানাবি ﷺ। এই বাহিনীর ৩০ জনের সকলেই ছিলেন মুহাজির।

আবু জাহেলের নেতৃত্বে ৩০০ জনের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা শাম থেকে মক্কায় ফিরছিল। সেই কাফেলাকে ধরার জন্য হামজা ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। উভয় দল সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকা ঈসে[৩৬] এসে মুখোমুখি হলো। এরপর যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হলো। কিন্তু ওই সময় সে পথ দিয়ে মাজদি বিন আমর আল-জুহানি যাচ্ছিল। সে উভয়পক্ষের মিত্র ছিল। তাই সে উভয় বাহিনীর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল এবং দুই পক্ষের মাঝে সমঝোতা করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিল।

আবু জাহেল তার কাফেলা নিয়ে মক্কার পথ ধরল আর হামজা ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন।[৩৭]

৩৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৯০।

৩৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১২৪। তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৬৮। আল ইসাবাহ : ১/৩৭।

৩৬. বনু সুলাইম গোত্রের এলাকায় একটি জায়গার নাম ঈস। সেখানে একটি পানির উৎস আছে, যাকে জানিবানুল ঈস বলা হয়। এটি সমুদ্রতীরে জুল মারওয়ার এক প্রান্ত। যা কুরাইশের সিরিয়াগামী পথে অবস্থিত। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৬/২৪৮।

৩৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৬, ইবনুল আসির : ২/১১১। দেখুন, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৯৬ এবং আল-ইসতিআব : ১/৩৭০।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিমগণ কুরাইশ কাফেলার মনোবলে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার কারণে সংখ্যায় বেশি হওয়ার পরও এই গুটিকয়েক মুসলিম সেনা থেকে তাদের পিছু হটতে হয়েছিল। ব্যাবসায়িক কাফেলার ব্যাপারে তারা বাস্তবিকই মুসলিমদের নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই অভিযানের মাধ্যমে কুরাইশদের ওপর শুরু হয় অর্থনৈতিক অবরোধ। কুরাইশের সিরিয়াগামী ব্যাবসায়িক রোড বন্ধের মাধ্যমে শুরু হয় তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ।

এখানে এ অভিমতও আছে যে, রাসুল ﷺ উবাইদা বিন হারিস ﷺ-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো, হামজা ও উবাইদা ﷺ-কে পরপর দুটি অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। প্রথম অভিযান প্রেরণ করেছিলেন রমাদান মাসে হামজা ﷺ-এর নেতৃত্বে এরপর উবাইদা ﷺ-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করেছিলেন শাওয়াল মাসে। কিন্তু মানুষের কাছে বিষয়টি তালগোল পাকিয়ে গেছে।[৩৮] অথচ তালগোল পাকানোর কোনো কারণই নেই, যেহেতু হামজা ﷺ-কে প্রেরণ করা হয় রমাদানে, পক্ষান্তরে উবাইদা ﷺ-কে প্রেরণ করা হয় শাওয়াল মাসে। প্রায় এক মাস পরে।

বদর যুদ্ধে হামজা ﷺ

দ্বিতীয় হিজরির রমাদানের আট দিন গত হওয়ার পর রাসুল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে মদিনা থেকে বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। সাথে ছিল ৭০টি উট। সাহাবিগণ পালাক্রমে উটে আরোহণ করে বদর প্রান্তরে যাচ্ছিলেন। হামজা, জাইদ বিন হারিসা এবং রাসুল ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম আবু কাবশাহ ও আনাস—এ চারজন একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করে বদরে পৌঁছেছিলেন।[৩৯]

---

৩৮. দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২২০।
৩৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৫১।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ মাখজুমি সৈন্যের সারি থেকে বের হয়ে আসলো। সে বড় দুশ্চরিত্রের লোক ছিল। সে বলল, 'আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করছি, আমি তাদের হাওজ থেকে পানি পান করব, অথবা তা ভেঙে ফেলব, অন্যথায় সেখানে মৃত্যুবরণ করব।' তার স্বাদ মেটানোর জন্য বীর হামজা ﷺ সামনে বাড়লেন। পরস্পর কাছে আসতেই হামজা ﷺ এক আঘাতে তার একটি পা আলাদা করে দিলেন। ততক্ষণে সে হাওজের কাছে এসে পৌঁছেছিল। সে চিত হয়ে পড়ে গেল আর তার পা থেকে সজোরে রক্ত বের হচ্ছিল। এরপর সে শপথ পূর্ণ করার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে হাওজের মধ্যে ঝাঁপ দেয়। হামজা ﷺ তার অনুসরণ করে হাওজের মধ্যেই তাকে হত্যা করলেন।

তারপর উতবা বিন রবিআ তার ভাই শাইবা ও ছেলে ওয়ালিদকে সঙ্গে নিয়ে বের হলো। সে সৈন্যসারি থেকে বের হয়ে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল। তাদের মোকাবিলায় তিনজন আনসার বের হলেন। তারা বলল, 'তোমরা কারা?' উত্তর দিলেন, 'আমরা আনসার।' তারা বলল, 'তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের।' তারপর একজন ডাক দিয়ে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আমাদের সম্প্রদায় থেকে আমাদের সমকক্ষ কাউকে পাঠাও।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'উবাইদা, হামজা ও আলি, তোমরা যাও।' তাঁরা বের হয়ে তাদের কাছে গেলে তারা বলল, 'তোমরা কারা?' তাঁরা নাম উল্লেখ করলেন। তখন তারা বলল, 'হ্যাঁ, এবার উপযুক্ত লোক এসেছে।'

উবাইদা ﷺ এই ছয় জনের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় ছিলেন। তিনি উতবা বিন রবিআর মোকাবিলায় দাঁড়ালেন, হামজা ﷺ শাইবার মোকাবিলায় আর আলি ﷺ ওয়ালিদের মোকাবিলায়। হামজা ﷺ চোখের পলকেই শাইবাকে শেষ করে দিলেন এবং আলি ﷺ-ও চোখের পলকে ওয়ালিদকে খতম করলেন। উবাইদা ﷺ আর উতবা উভয়ে উভয়কে আঘাত করে আহত করল। হামজা ও আলি ﷺ কালবিলম্ব না করে মুহূর্তেই উতবাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন এবং উবাইদা ﷺ-কে কোলে করে নিজ এরিয়ায় ফিরে এলেন।[৪০]

৪০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৬৫, ইবনুল আসির : ২/১২৪-১২৫।

এ যুদ্ধে হামজা ﷺ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। একাই দুটি তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করেন।[৪১] উমাইয়া বিন খালাফ বন্দী হওয়ার পর আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বুকে নিদর্শন লাগানো লোকটি কে ছিল?' আব্দুর রহমান ﷺ বলেছিলেন, 'আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র হামজা ﷺ।' তখন উমাইয়া বলেছিল, 'সে-ই আমাদের আজ যত সর্বনাশ করেছে।'[৪২]

চূড়ান্ত ফায়সালাকারী এই ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে হামজা ﷺ-এর ভূমিকা কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না। বরং তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। কুরাইশের সবচেয়ে সেই দুঃসাহসী ও বীর-বাহাদুরকে তিনি হত্যা করেছিলেন, যে মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছিল, মুসলিমদের হাওজ থেকে পানি পান করবে অথবা তা ভেঙে ফেলবে। তিনি শাইবাকে হত্যা করেছিলেন এবং উতবার হত্যায়ও শরিক হয়েছিলেন। আর তারা দুজন ছিল কুরাইশের সবচেয়ে সম্মানিত এবং বিখ্যাত বীর। এতে কুরাইশ বাহিনীর মনোবলে গভীর প্রভাব পড়েছিল। তাদের এমন বিখ্যাত আর দুঃসাহসী বীরদের হারিয়ে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর যে বাহিনী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, সে বাহিনী কখনো জয়লাভ করতে পারে না।

বদরে তিনি প্রচলিত নিয়মে যুদ্ধ না করে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছিলেন। ফলে অনেক মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তছনছ করে দিয়েছিলেন তাদের দুর্ভেদ্য সামরিক সারি। অনেক কঠিনভাবে তাদের ওপর হামলে পড়েছিলেন। ঐতিহাসিক এই বদর যুদ্ধে হামজা ﷺ প্রকৃতপক্ষেই একজন আত্মোৎসর্গী বীর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই নতুন করে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে প্রতিশোধ স্পৃহায় কাফিররা যে তাঁর জীবনকে টার্গেট বানাবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

---

৪১. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৬৮।
৪২. ইবনুল আসির : ২/১২৭।

বনু কাইনুকার যুদ্ধে

বদর থেকে ফিরে এসে রাসুল ﷺ দেখতে পেলেন, আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দেওয়ার কারণে ইহুদিরা হিংসার আগুনে জ্বলছে। হিংসার প্রচণ্ডতায় তারা মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে বসেছে; অথচ রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরতের পরই তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। রাসুল ﷺ তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কথা জানতে পেরে বনু কাইনুকার বাজারে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাদের সকলকে একত্রিত করে বললেন, 'কুরাইশের পরিণতি থেকে তোমরা সতর্ক হও। সময় থাকতে আত্মসমর্পণ করো। কারণ তোমরা ভালোভাবেই জানো, আমি আল্লাহর প্রেরিত নবি।' তারা বলল, 'হে মুহাম্মাদ, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ এক জাতির সাথে মুখোমুখি হয়ে সুযোগ কাজে লাগিয়েছ, এ কারণে প্রতারিত হয়ো না।' এরাই প্রথম ইহুদি জাতি, যারা রাসুল ﷺ-এর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছিল।

তাদের কুফরি ও ওয়াদা ভঙ্গ চলাকালে এক মুসলিম নারী বনু কাইনুকার বাজারে এল। সেখানে এক স্বর্ণকারের কাছে তাঁর অলংকারের জন্য বসল। এক ইহুদি এসে তাঁর অজান্তে চাদরের এক কোনা পেছনে বেঁধে দিল। প্রয়োজন শেষে উঠতে গেলে কাপড় টান খেয়ে তাঁর সতর খুলে গেল। এটা দেখে ইহুদিরা হাসিতে ফেটে পড়ল। এই পরিস্থিতি লক্ষ করে এক মুসলিম সেই নরাধমকে তরবারির আঘাতে হত্যা করলেন। এরপর ইহুদিরাও তাঁকে হত্যা করল। এভাবে তারা রাসুল ﷺ-এর চুক্তির অবমাননা করে বসল। এরপর তারা তাদের দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করল। রাসুল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৫ দিন পর্যন্ত তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। এরপর তারা তাঁর নির্দেশে আত্মসমর্পণ করে বের হয়ে আসে। এবং রাসুল ﷺ তাদের মদিনা থেকে বের করে আজরুআত[৪৩] অঞ্চলে নির্বাসন করেন।

বনু কাইনুকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের ২০ মাসের মাথায় শাওয়ালের মাঝামাঝি সময়ে শনিবার।[৪৪] সেদিন মুসলিম বাহিনীর ঝান্ডা বহন করেছিলেন হামজা ﵁। ঝান্ডার রং ছিল সাদা।[৪৫]

---

৪৩. আজরুআত অঞ্চলটি বর্তমানে পূর্ব জর্ডানে অবস্থিত।

৪৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/২৮-২৯।

৪৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/২৮-৩০, ইবনুল আসির : ২/১৩৭-১৩৮।

এটা জানা কথা যে, স্বাভাবিকভাবে ঝান্ডা এমন ব্যক্তিই বহন করে, যার বীরত্ব ও সাহসিকতার ব্যাপারে সবার আস্থা থাকে। যে ঝান্ডাকে রক্ষা করবে এবং কোনোভাবেই অবনমিত হতে দেবে না; বরং জীবন বাজি রেখে ঝান্ডাকে উঁচু এবং সমুন্নত রাখবে।

উহুদ যুদ্ধে

১. রণাঙ্গনে

উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তৃতীয় হিজরিতে। নির্দিষ্ট করে বললে, হিজরতের ৩২ মাসের মাথায় শাওয়ালের সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শনিবারের দিনে।[৪৬] রাসুল ﷺ উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে মদিনামুখী হয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ-এর নেতৃত্বে পেছনে ৫০ জনের একটি তিরন্দাজ বাহিনী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের প্রতি এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তির ও বর্শার সাহায্যে কাফিরদের অশ্ববাহিনীকে আমাদের থেকে প্রতিহত করবে। যাতে পেছন থেকে (শত্রুরা) আমাদের ওপর চড়াও হতে না পারে। আমাদের জয় হোক বা পরাজয় হোক, তোমরা এ স্থানেই অটল থাকবে।' রাসুল ﷺ সেদিন দুটি বর্ম পরে ময়দানে নেমেছিলেন। ঝান্ডা দিয়েছিলেন মুসআব বিন উমাইর ﷺ-এর হাতে। জুবাইর বিন আওয়াম ﷺ-কে অশ্ববাহিনীর আমির নিযুক্ত করেছিলেন। মিকদাদ ﷺ-কে তাঁর সাথে দিয়েছিলেন। হামজা ﷺ অংশগ্রহণ করেন সম্মুখ বাহিনীতে।[৪৭]

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল উভয় বাহিনীতে। প্রত্যেকেই মরিয়া হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপ দিল। মুসলিমদের মধ্যে হামজা, আলি ও আবু দুজানা ﷺ বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মুশরিক বাহিনী পরাজয় দেখতে পেল। তাদের নারীরা পলায়ন করে পাহাড়ে উঠতে লাগল। ফলে মুসলিম বাহিনী গনিমত সংগ্রহে নেমে পড়ল। এটা দেখে তিরন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশরাই গনিমতের দিকে মনোযোগ দিল এবং সে স্থান ছেড়ে গনিমত সংগ্রহে যোগ

৪৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৩৬।
৪৭. ইবনুল আসির : ২/১৫২।

দিল। আর তাঁদের অল্পসংখ্যক লোক বলল, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ মান্য করব। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সরব না।' তাঁরা নিজের অবস্থানে অটল থাকলেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলিমদের তিরন্দাজ বাহিনীর স্থান খালি দেখে পেছন থেকে ঘুরে এসে অবশিষ্ট তিরন্দাজদের শহিদ করল। এরপর সেদিক থেকে ময়দানে ঢুকে মুসলিমদের ওপর চড়াও হলো। কাফিররা যখন দেখল, তাদের অশ্ববাহিনী ময়দানে যুদ্ধ করছে, তখন তারা ফিরে এসে সম্মুখ থেকে মুসলিমদের ওপর হামলে পড়ল। এভাবে মুসলিম বাহিনীর ওপর বিপদ নেমে আসলো। বিজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে পরাজয়ের শিকার হতে হলো।[৪৮]

এ যুদ্ধে হামজা ﷺ তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে জিহাদ করেছিলেন। ফলে একাই ৩১ জন কাফির সেনাকে হত্যা করেছিলেন।[৪৯]

২. শাহাদাত বরণ

হামজা ﷺ লড়াই করছিলেন, এমন সময় তাঁর পার্শ্ব দিয়ে সিবা বিন আব্দুল উজ্জা যাচ্ছিল। তাকে আবু নিয়ার বলে ডাকা হতো। হামজা ﷺ তাকে দেখে বললেন, 'আমার কাছে আয়, হে লজ্জাস্থান কর্তনকারিণীর বেটা!' তার মা আনমার ছিল শরিক বিন আখনাসের আজাদকৃত দাসী। সে মক্কায় নারীদের খতনা করাত। সিবা হামজা ﷺ-এর মুখোমুখি হলে হামজা ﷺ তাকে এমন এক আঘাত করলেন, এক আঘাতেই তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

জুবাইর বিন মুতইমের গোলাম ওয়াহশি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি লক্ষ করছিলাম, হামজা ﷺ তরবারি দিয়ে লোকদের কচুকাটার মতো করে কাটছিলেন, যেন তাঁর সামনে কোনো কিছুই রক্ষা পাচ্ছিল না। হঠাৎ দেখি, সিবা বিন আব্দুল উজ্জা আমাকে পেছনে রেখে তাঁর কাছে গেল। তিনি বলে উঠলেন, "আমার কাছে আয়, হে লজ্জাস্থান কর্তনকারিণীর বেটা!" এরপর তাকে এমন এক আঘাত করলেন, যেন মুলা বা গাজরে আঘাত করেছেন। আমি আমার বর্শা নিয়ে প্রস্তুত হলাম। এরপর যখন তাঁর কাছাকাছি পৌঁছলাম,

---

৪৮. ইবনুল আসির : ২/১৫৩-১৫৪।
৪৯. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৬৯, আল-ইসাবাহ : ২/৩৭, উসদুল গাবাহ : ২/৪২।

তখন তাঁর তলপেটে তা ঢুকে দিয়ে পেছন দিয়ে বের করে দিলাম। তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন; কিন্তু সেখানেই পড়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে আমি আমার বাহিনীতে ফিরে এলাম। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া সেদিন আমার ভিন্ন কোনো দায়িত্ব ছিল না।'[৫০]

ওয়াহশি জুবাইর বিন মুতইমের গোলাম ছিলেন। জুবাইরের চাচা তুআইমা বিন আদি বদরে নিহত হয়েছিল। কুরাইশরা উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলে জুবাইর ওয়াহশিকে বলল, 'যদি তুমি মুহাম্মাদের চাচা হামজাকে হত্যা করতে পারো, তবে তুমি আজাদ।' কুরাইশ বাহিনীর সাথে ওয়াহশিও উহুদ যুদ্ধে বের হয়। সে ছিল হাবশি গোলাম। হাবশার লোকদের মতোই সে বর্শা চালনায় দক্ষ ছিল। তার টার্গেট খুব কমই ব্যর্থ হতো। যখন উভয় বাহিনীর মাঝে যুদ্ধ বাধল, তখন সে হামজা ﵁-এর অপেক্ষায় থাকল। একসময় হামজা ﵁-কে সুযোগমতো পেয়ে সে তার টার্গেট পুরা করল। সে কেবল দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি লাভের আশায়ই হামজা ﵁-কে শহিদ করেছিল। তাই মক্কায় ফিরে এসে চুক্তি অনুসারে দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি পেল।[৫১]

হামজা ﵁ তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে শনিবার শাহাদাত বরণ করেন।[৫২]

যুদ্ধ শেষে রাসুল ﷺ হামজা ﵁-কে তালাশ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে উপত্যকার এক নিচু ভূমিতে তাঁকে পেলেন। তাঁর বুক ফেড়ে কলিজা বের করা হয়েছে, নাক-কান কেটে দিয়ে তাঁর লাশকে বিকৃত করা হয়েছিল। রাসুল ﷺ তাঁকে এ অবস্থায় পেয়ে মর্মাহত হয়ে পড়লেন। রাসুল ﷺ-কে এ অবস্থায় দেখে মুসলিমরাও অনেক ব্যথিত হলেন। তারা রাসুল ﷺ-কে তাঁর চাচার হত্যাকারীর প্রতি উত্তেজিত করে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আল্লাহ যদি কখনো আমাদের বিজয় দান করেন, তবে তাদের এমনভাবে বিকৃত করব, যা কোনো আরবের লোক করেনি।'

---

৫০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/১৫।

৫১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/১৭, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/১৮।

৫২. উসদুল গাবাহ : ২/৪৭, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২৬৯।

হামজা ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে রাসুল ﷺ বললেন, 'আপনার মতো এমন পরিস্থিতির শিকার কেউ কখনো হবে না। কখনো এর চেয়ে হৃদয়বিদারক কোনো ঘটনার মুখোমুখি হইনি।'[৫৩]

একটি চাদরে হামজা ﷺ-কে দাফন করা হয়। চাদরটি এমন ছোট ছিল, মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত, আবার পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। অবশেষে মাথা ঢেকে দিয়ে পায়ের ওপর ইজখির ঘাস দেওয়া হয়।

শুহাদায়ে উহুদের জানাজা আদায়ের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ প্রথমে হামজা ﷺ-এর জানাজা পড়েন। এরপর তাঁর পাশে আরেক জন শহিদকে রেখে উভয়ের জানাজা পড়েন। তাকে উঠিয়ে নিয়ে আরেক শহিদকে তাঁর পাশে রেখে আবার উভয়ের জানাজা পড়েন। এভাবে সেদিন তিনি ৭০ বার হামজা ﷺ-এর জানাজার সালাত আদায় করেছিলেন।[৫৪]

দাফনের পূর্বে সাফিয়া ﷺ হামজা ﷺ-কে দেখার জন্য এগিয়ে আসলে রাসুল ﷺ তাঁর ছেলে জুবাইর বিন আওয়াম ﷺ-কে বললেন, 'তোমার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে ফিরিয়ে দাও। তাঁর ভাইয়ের এ অবস্থা দেখে সে ঠিক থাকতে পারবে না।' জুবাইর ﷺ বললেন, 'মা, আল্লাহর রাসুল ﷺ আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন।' সাফিয়া ﷺ বললেন, 'কেন, আমি তো জানতে পেরেছি, আমার ভাইয়ের লাশকে বিকৃত করা হয়েছে। আর এটা আল্লাহর রাস্তায় হয়েছে। এর চেয়ে আমাদের খুশির আর কী হতে পারে! আল্লাহ চান তো আমি ধৈর্যধারণ করব এবং বিনিময়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করব।' জুবাইর ﷺ রাসুল ﷺ-কে এ কথা জানালে রাসুল ﷺ বললেন, 'আচ্ছা, তাঁকে যেতে দাও।' সাফিয়া ﷺ হামজা ﷺ-কে দেখে 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন এবং তাঁর জন্য মাগফিরাতের দুআ করলেন।[৫৫]

হামজা ﷺ-এর মতো এমন হৃদয়বিদারক কোনো ঘটনা রাসুল ﷺ দেখেননি। তাই হামজা ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'প্রিয় চাচা, আল্লাহ আপনার প্রতি

---

৫৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪৭।
৫৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৫-১৬।
৫৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪৮।

রহম করুন। আপনি ছিলেন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অতি মমতাময়। আপনি অধিক কল্যাণকামী। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ যদি তাদের ওপর আমাকে বিজয় দেন, তবে আমি তাদের ৭০ জনের লাশকে অঙ্গহানি করব।'[৫৬] তাঁর এ কথার প্রেক্ষিতে অল্প কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

'আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ওই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করো, যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তবে ধৈর্য তো ধৈর্যশীলদের জন্য কল্যাণকর। আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনার ধৈর্যধারণ তো কেবল আল্লাহর জন্য হবে। তাদের কারণে দুঃখ করবেন না। এবং তাদের চক্রান্তের কারণে আপনি মন ছোট করবেন না।'[৫৭]

তখন রাসুল ﷺ ক্ষমা করে দিয়ে ধৈর্যধারণ করলেন এবং সাহাবিদেরকে কাফিরদের লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করলেন।[৫৮]

রাসুল ﷺ শহিদদের লাশ দাফন করতে বললেন। তাই উহুদের ময়দানে হামজা ﷺ-কে দাফন করা হলো। তাঁর সাথে ভাগিনা আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ-কে দাফন করা হলো। তাঁকেও বিকৃত করা হয়েছিল।[৫৯] আব্দুল্লাহ বিন জাহশের মা হলেন উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। উহুদের ময়দানে গেলে আজও এ দুজনের কবর সহজে চেনা যায়।

উহুদ থেকে ফিরে এসে রাসুল ﷺ শুনতে পেলেন, বনু আশহালের নারীরা উহুদের শহিদদের জন্য কান্নাকাটি করছে। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'হামজার জন্য কাঁদার কেউ নেই।' তখন কিছু মহিলা একত্রিত হয়ে হামজা ﷺ-এর জন্য

---

৫৬. আল-ইসতিআব : ১/৩৭৪।

৫৭. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৬-১২৭।

৫৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪৫-৪৬।

৫৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/৪২।

কাঁদা আরম্ভ করে দিল। তাদের কান্না শুনে রাসুল ﷺ বললেন, 'এরা কারা?' বলা হলো, 'আনসারি মহিলা।' রাসুল ﷺ বের হয়ে তাদের বললেন, 'তোমরা ফিরে যাও, আজকের পর থেকে আর কাঁদতে হবে না।'[৬০] রাসুল ﷺ তাদের জন্য এবং তাদের সন্তানাদি ও পরিবার-পরিজনের জন্য রহমত ও বরকতের দুআ করলেন।[৬১]

রাসুল ﷺ উহুদের ময়দান থেকে মদিনায় ফেরার পথে বনু দিনার গোত্রের এক মহিলার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ যুদ্ধে মহিলার স্বামী, বাবা ও ভাই শাহাদাত বরণ করেছিল। যখন তাঁকে তাঁদের শাহাদাতের খবর দেওয়া হলো, তখন সে বলল, 'আল্লাহর রাসুল কেমন আছেন?' বলা হলো, 'তিনি ভালো আছেন, তুমি যেমনটা আশা করো।' মহিলা বলল, 'আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি তাঁকে দেখব।' তখন রাসুল ﷺ-এর দিকে ইশারা করা হলে সে রাসুল ﷺ-কে দেখে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার সুস্থতা আর নিরাপত্তার পরে সকল বিপদই আমার কাছে নগণ্য।'[৬২]

ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ হামজার ﷺ-এর কবরের নিকট আসতেন, সেটাকে সংস্কার ও মেরামত করে দিতেন।[৬৩]

হামজা ﷺ নিজ আকিদা-বিশ্বাসের তরে এভাবেই জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের জীবন রক্ষার্থে আকিদা-বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দেননি। এ জন্যই তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সিংহ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।[৬৪] খেতাব পেয়েছেন সকল শহিদের সর্দার হিসেবে।[৬৫] তাঁর মৃত্যুতে রাসুল ﷺ যতটা শোকাহত হয়েছিলেন, তা অন্য কারও মৃত্যুতে হননি। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'হামজা হলেন সাইয়িদুশ শুহাদা (সকল শহিদের সর্দার)।'[৬৬] তিনি রাসুল ﷺ-এর সম্মুখে থেকে একাই দুটি তরবারি নিয়ে লড়াই করেছেন। তাঁর

---

৬০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৮।
৬১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১৩/১৮, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৫০।
৬২. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৫১।
৬৩. তাবাকাতু ইবনে সাদ- ৩/১৯।
৬৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪৭।
৬৫. আল-ইসাবাহ : ২/৩৭।
৬৬. আল-ইসতিআব : ১/৩৭২।

বীরত্ব আর সাহসিকতা দেখে মানুষ অভিভূত হয়েছিল। ফলে তাঁর সম্পর্কে শত্রুপক্ষেরই কেউ বলেছিল, 'এই সিংহটা কে?'

তাঁর শাহাদাত ছিল সকল মুসলিমের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। এ ক্ষতি শুধু তাঁর পরিবার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন উম্মাহর মাঝে এক ব্যক্তি এবং এক ব্যক্তির মাঝে এক উম্মাহ। তিনি শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকেননি; বরং সকল মুসলিমের জন্য বেঁচে ছিলেন।

ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন

আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিমের সন্তানদের থেকে কেবল হামজা ﷺ ও আব্বাস ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৭]

হামজা ﷺ-এর সন্তান : উমারাহ, তাঁর মা হচ্ছেন খাওয়া বিনতে কাইস বিন ফাহাদ আনসারি। এবং ইয়ালা ও আমির, এদের মা হলেন একজন আনসারি মহিলা। তাঁর এক কন্যাকে বিয়ে করেন সালামা বিন আবু সালামা মাখজুমি ﷺ।[৬৮]

হামজা ﷺ-এর উপনাম ছিল আবু উমারাহ এবং আবু ইয়ালা।[৬৯] অবশ্য তাঁর পরে তাঁর কোনো ছেলে জীবিত থাকেনি।[৭০]

তাঁর মেয়ের নাম উমামা। রাসুল ﷺ উমামাকে সালামা বিন আবু সালামা ﷺ-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর বাড়িতে নেওয়ার আগেই তিনি ইনতিকাল করেন।[৭১]

জাইদ বিন হারিসা ও হামজা ﷺ-এর মাঝে যেহেতু ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই এই অধিকারের ভিত্তিতে জাইদ ﷺ হামজা ﷺ-এর

---

৬৭. আল-ইসতিআব : ১/৩৭১, জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৭।
৬৮. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৭ পৃ.।
৬৯. আল-ইসতিআব : ১/৩৬৯।
৭০. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৭ পৃ.।
৭১. আল-মুহাব্বার : ৬৪ পৃ.।

কন্যার প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য দাবি করেছিলেন। যথারীতি তিনি আলি ؓ ও জাফর ؓ-এর সাথে এ নিয়ে বিবাদ করেছিলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ জাফর ؓ-এর জিম্মায় তার প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[৭২] কারণ তখন জাফর ؓ-এর বিবাহ বন্ধনে ছিল তার খালা আসমা বিনতে উমাইস ؓ।[৭৩]

তিনি সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তিশালী করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর অবস্থান কখনো নেতিবাচক ছিল না। বরং তিনি সর্বদা আল্লাহর নবি ﷺ ও মুসলিমদের পক্ষে উপকারী ও প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই অবস্থানে থেকে তিনি অবশেষে শাহাদাত বরণ করেছেন। মুসলিম উম্মাহর জন্য নিজের জীবনকে উপহার হিসেবে পেশ করেছেন। ফলে নিজে লাভবান হয়েছেন বটে; কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তাঁকে হারিয়ে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছে।

তিনি ছিলেন ইসলামের জন্য প্রেরণা। ভাতিজার ওপর আবু জাহেলের অন্যায় আচরণ দেখে যিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন, কারণ এই নির্যাতন ছিল একমাত্র আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার ফলে। তাই তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে কুরাইশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন আবু জাহেলের অহমিকাপূর্ণ আচরণের।[৭৪] ইমানের শিকড় তাঁর হৃদয়ের গভীরে গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর আপন চাচা এবং সমবয়সি। ফলে রাসুল ﷺ-কে চিনতে পেরেছিলেন প্রকৃত অর্থে। কারণ নবিজি ﷺ-কে তিনি মানুষ হিসেবে যেমন অতি কাছ থেকে দেখেছেন, তেমন দেখেছেন নবি হিসেবে গভীর পর্যবেক্ষণের সাথে। রাসুল ﷺ-এর প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন আস্থা ও বিশ্বাস। এ কারণে রাসুল ﷺ-এর কষ্ট দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেননি। গর্জে উঠে কাফিরদের মজলিশে প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন একত্ববাদের।

---

৭২. আল-মুহাব্বার : ৭০-৭১ পৃ.।

৭৩. আল-মুহাব্বার : ১০৬ পৃ., আত-তামবিহু ওয়াল ইশরাফ : ২৩৬ পৃ.।

৭৪. উসদুল গাবাহ : ২/৪৬-৪৭, ইবনুল আসির : ২/৮৩। দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩১২-৩১৩।

হামজা ﷺ ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে প্রবল শক্তিশালী এবং জেদি ব্যক্তি।[৭৫] তাঁর ইসলাম গ্রহণ মুসলিমদের জন্য শক্তির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হয়েছিল।[৭৬] হাসসান বিন সাবিত ﷺ তাঁর শোকগাথায় সতিই বলেছেন :

'হামজা ছিলেন আমাদের আশ্রয়স্থল এবং দুর্গ, আমাদের প্রতিটি বিপদে প্রতিটি দুর্যোগে।'

অনুরূপ কাব বিন মালিক ﷺ-ও তাঁর শোকগাথায় সত্য বলেছেন :

'তাঁকে হারিয়ে মুসলিম উম্মাহ আজ মর্মাহত, স্বয়ং রাসুল ﷺ-ও তাঁকে হারিয়ে শোকাহত।'

কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, মুসলিমগণ তাঁর মতো অনন্য বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ ব্যক্তিকে হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাব বিন মালিক ﷺ তাঁর শোকগাথায় সত্যই বলেছেন :

'তিনি ছিলেন আমাদের এতিমদের শক্তি এবং রণাঙ্গনের নিদর্শনযুক্ত সিংহশার্দূল।'

তাঁর ব্যাপারে বাস্তব কথা হলো, তিনি ইসলামের জন্য মুসলিমদের প্রতি তেমন ছিলেন, যেমন বাবা তার সন্তানের প্রতি হয়ে থাকে।

তিনি তো সেসব লোকের মধ্য হতে ছিলেন, যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠ উপমার জন্য। তাই তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল উত্তম আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তিনি উত্তম আদর্শের বাইরে ভিন্ন কিছু চিন্তাও করতেন না। যার কারণে এই উত্তম আদর্শের জন্য কাজ করেছেন এবং এই আদর্শকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন বিলীন করেছেন। আমরা জানি না, তিনি কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কি না। এবং কোনো সম্পদের জন্য নিজেকে কষ্টের মাঝে ফেলেছেন কি না। কারণ ফকিরি হালে পার হয়েছিল তাঁর জীবন

৭৫. উসদুল গাবাহ : ২/৪৬।
৭৬. ইবনুল আসির : ২/৮৪।

এবং ফকিরি হালে হয়েছে তাঁর মরণ। মৃত্যুর সময় রেখে গেছেন না কোনো টাকাপয়সা, না কোনো বাস্তুভিটা। বস্তুগতভাবে ছিলেন দরিদ্র; কিন্তু তাঁর আত্মা ছিল প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯। এ হিসাব তার মতে, যে বলে, তিনি রাসুল ﷺ থেকে চার বছরের বড়। আরেক দুর্বল মতানুসারে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।[৭৭]

যেহেতু আমাদের কাছে এটা প্রমাণিত যে, তিনি রাসুল ﷺ-এর চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলেন[৭৮] এবং শাহাদাত বরণ করছেন তৃতীয় হিজরিতে। সে হিসেবে তিনি আয়ু পেয়েছেন চন্দ্রবর্ষ হিসেবে ৫৬ বছর এবং সৌরবর্ষ হিসেবে ৫৫ বছর।

তিনি নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে সর্বদা ব্যবহার করেছেন স্বীয় আকিদা-বিশ্বাসের সেবায়। কখনো নিজের সেবায় কোনো মানুষকে বা নিজের আকিদাকে ব্যবহার করেননি। ইসলামের তরে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি; বরং স্বেচ্ছায় আনন্দচিত্তে সঁপে দিয়েছেন প্রিয় জীবন। তাঁর প্রাণ ছিল দ্বীনে হানিফের সুরম্য প্রাসাদের এক মজবুত প্রস্তর। অবশেষে পরিচ্ছন্ন জবান, নির্মল জীবন, উন্নত মস্তক এবং প্রশংসার সুরভিত স্তবক নিয়ে হাজির হয়েছেন মহান রবের সান্নিধ্যে।

কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

হামজা ﷺ ছিলেন নির্ভীকতা ও বীরত্বে খ্যাত প্রথম সারির মুসলিম বীর। সম্ভবত তাঁর অসাধারণ বীরত্বই ইসলামের আগে এবং পরে মানুষকে তাঁর প্রতি অতি সংবেদনশীল করে তুলেছিল; ফলে তারা তাঁকে অনেক সম্মান করত। সেই সাথে তাঁর আরও অনেক যোগ্যতা ছিল, যাকে বলা যায় অশ্বারোহী প্রতিভা।

রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে তিনি আবু জাহেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন মসজিদে হারামের ভেতরে, স্বয়ং আবু জাহেলের গোত্রের মাখজুমি

৭৭. উসদুল গাবাহ : ২/৪৯।
৭৮. উসদুল গাবাহ : ২/৪৬।

লোকদের সামনে; অথচ তারা ছিল মক্কার প্রতাপশালী গোত্র। তখন মাখজুম গোত্রের লোকেরা আবু জাহেলের সাহায্যে দাঁড়িয়েছিল। ওই পরিস্থিতিতেও তিনি তাদের সামনে এ বলে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, 'কীসে আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে, যখন আমার সামনে তাঁর বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সে আল্লাহর রাসুল, সে যা বলে, তা হক। আল্লাহর শপথ, আমি এর থেকে ফিরে যাব না। তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাকে বাধা দাও দেখি।' তখন আবু জাহেল নিরুপায় হয়ে বলল, 'থাক, আবু উমারাহকে কিছু বলো না। আমি তো তাঁর ভাতিজাকে খুব মন্দ ভাষায় গালি দিয়েছি।'[৭৯]

আবু জাহেল তার গোত্রকে তার পক্ষ হয়ে হামজা ﷺ-কে কিছু করতে নিষেধ করেছে। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল, কিছু করলে এটা তাকেও বিপাকে ফেলবে এবং তার গোত্রকেও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেবে। তাই হামজা ﷺ-এর চ্যালেঞ্জের সামনে নিজের গোত্রের লোকদের মাঝেও লাঞ্ছনা আর অপমানকে মেনে নিয়েছে। এটা হামজা ﷺ-এর প্রতি দয়াবশত করেনি; বরং তাঁকে ভয় পেয়েই এমন করেছে। তাঁর বীরত্ব তাঁকে এভাবেই দুশমনের প্রতি কঠোর করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত বীর। তাই তো বদর-উহুদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুরাইশের অনেক বীরকে একাই ধরাশায়ী করেছিলেন।

তাঁর বিস্ময়কর বীরত্বের প্রমাণ হিসেবে আমাদের এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসুল ﷺ তাঁকে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সিংহ' বলে খেতাব দিয়েছেন।

হয়তো তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের প্রমাণ এটাই হবে, রাসুল ﷺ তাঁকে ইসলামের প্রথম ঝান্ডা দিয়ে অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁকে ৩০ জন মুহাজিরের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আবু জাহেলের নেতৃত্বে ৩০০ কাফিরের মোকাবিলা করতে। তবে যদিও সেখানে কোনো যুদ্ধ বাধেনি; কিন্তু হামজা ﷺ মুশরিকদের অন্তরে কঠিন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি জীবনে কখনো মৃত্যুর ভয় করেননি। যুদ্ধের ময়দানে তিনি মাথায় অথবা বুকে কোনো নিদর্শন যুক্ত করতেন। এটা তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য করতেন না; বরং অন্যান্য মুজাহিদদের থেকে আলাদা হয়ে নির্ভীক ও

৭৯. উসদুল গাবাহ : ২/৪৭।

দুঃসাহসিকভাবে কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে করতেন। পরবর্তী সময়ে যে চ্যালেঞ্জ তাঁর জীবনের মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাঁর প্রতি সীমাহীন আস্থা ও আত্মবিশ্বাস থাকার কারণেই মূলত রাসুল ﷺ তাঁকে ইসলাম ও কুফরের প্রথম লড়াইয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যার কারণে উভয়পক্ষে সুদূরপ্রসারী মানবিক প্রভাব পড়েছিল। আর এই নববি আস্থাই ছিল তাঁর নেতৃত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

তিনি রাসুল ﷺ-এর যেমন আস্থার পাত্র ছিলেন, তেমন সকল মুসলিমেরও আস্থার পাত্র ছিলেন। তারও ছিল সকল মুসলিমের প্রতি গভীর আস্থা ও আত্মবিশ্বাস। আর সৈনিক ও কমান্ডারের মাঝে পারস্পরিক আস্থাই হচ্ছে একজন আদর্শ জেনারেলের বৈশিষ্ট্য।

তিনি যেমন রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসার পাত্র ছিলেন, তেমন সকল মুসলিমের ভালোবাসার মানুষ ছিলেন। এই ভালোবাসা ও সম্মানের ফলে তিনিও তাঁদের সমান ভালোবাসতেন।

নেতৃত্বের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হামজা ؓ-এর মধ্যে ছিল। আল্লাহ-প্রদত্ত প্রতিভা, অর্জিত জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে যেমন স্বভাবজাত নেতৃত্বের যোগ্যতা দান করেছিলেন, তেমন দিয়েছিলেন অতুলনীয় মেধাশক্তি। একইভাবে বীরত্বও ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

সম্ভবত যুদ্ধের ময়দানে তাঁর নিজের প্রতি এমন সুউচ্চ হিম্মত ও মনোবল এসে ছিল তাঁর বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বীরত্ব থেকে। ফলে এই আল্লাহ-প্রদত্ত স্বভাব আরও সুসংহত হয়েছে ময়দানে অশ্বচালনা এবং অস্ত্রের ব্যবহার করে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে। অতঃপর সুশোভিত হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এবং আল্লাহর ফায়সালার প্রতি অগাধ ইমান ও বিশ্বাসের মাধ্যমে।

যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা তো তিনি শৈশবকালেই অর্জন করেছেন হারবুল ফুজ্জারে। এরপরে যুদ্ধের ময়দানে তা আরও শক্তিশালী হয়েছে। অবশেষে

উহুদের ময়দানে এসে যুদ্ধ করে জীবন দিয়েছেন। তিনি রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে ছিলেন; কিন্তু তখনো তাঁর হাত থেকে তরবারি ছুটেনি।

নেতৃত্বের শাখাগত বা দ্বিতীয় স্তরের অধিকাংশ এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর মধ্যে ছিল।

তিনি ছিলেন সুসংহত সংকল্পের অধিকারী এবং দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। পরিপূর্ণরূপে দায়িত্ব পালন করতেন। দায়িত্ব থেকে কখনো পলায়ন করতেন না এবং অন্যের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিতেন না। তাঁর ছিল একটি অবিচল ও সুসংহত মানসিক শক্তি, যা জয়-পরাজয় কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হতো না। সৈনিকদের সক্ষমতা ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ছিল তাঁর পূর্ণ সচেতনতা—যেহেতু তিনি তাঁদের মাঝেই বাস করতেন এবং তাঁদের মাঝেই কাটাতেন নিজের অধিকাংশ সময়। তাঁর ছিল এক প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব, অনন্য গ্রহণযোগ্যতা এবং গৌরবময় স্বচ্ছ অতীত।

তিনি ছিলেন এমন কমান্ডার, যিনি যুদ্ধের নীতিগুলো বাস্তবায়ন করতেন : টার্গেট নির্ধারণ করতেন এবং তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতেন। আত্মরক্ষা নয়; বরং আক্রমণই ছিল তাঁর নীতি। যুদ্ধের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি আকস্মিক আক্রমণের প্রতি থাকত তাঁর পূর্ণ মনোযোগ। টার্গেট বাস্তবায়নে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করতেন। শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতেন, কখনো শক্তির অপচয় করতেন না। সৈনিকদের নিরাপত্তার প্রতি রাখতেন বিশেষ দৃষ্টি, বিশেষত যখন আশঙ্কা আঁচ করতেন এবং তাদের আশ্বস্ত রাখতেন। তাঁর পরিকল্পনা হতো যুদ্ধের দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার উপযোগী। পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি বাস্তবায়ন করতেন খুব দক্ষতার সাথে। সর্বদা চাঙা রাখতেন সৈনিকদের মানসিক অবস্থা, এই ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সাথিদের মানসিক উন্নতির সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তিনি সর্বদা গুরুত্ব দিতেন তাঁর অধীনে পরিচালিত সৈনিকদের নিরাপত্তা ইস্যুকে।

তিনি নিজেকে অন্য সৈনিকদের সমান অবস্থানে রাখতেন। কোনো সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে তাদের থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখতেন না। কিন্তু কষ্ট

ও পরিশ্রমের বেলায় ঠিকই সবার চেয়ে এগিয়ে থাকতেন। সৈনিকদের সাথে পরামর্শ না করে একাকী কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না।

তিনি নেতৃত্বের ময়দানে তেমন একটা সময় পাননি। অতি দ্রুতই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তা না হলে রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় যুদ্ধের ময়দানে যেমন তাঁর বিরাট ভূমিকা এবং অবস্থান হতো, তেমন মহা অবদান হতো পরবর্তী সময়ে ইসলামি বিজয়াভিযানে।

ইতিহাসে হামজা ﷺ

তিনি জাহিলি যুগে কুরাইশের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ইসলামের কারণে ইসলাম ও মুসলিমগণ শক্তিশালী হয়েছিল। তিনি মক্কা মুকাররমায় ইসলাম ও মুসলিমের বীর ছিলেন এবং মদিনা মুনাওয়ারাতেও ইসলাম ও মুসলিমের বীর হয়েছিলেন।

ইসলাম ও কুফরের মাঝে সংঘাতের সূচনাপর্বে সর্বপ্রথম ইসলামের পক্ষে ঝান্ডা ধারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এই হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ।

তিনি বদর রণাঙ্গনে ইসলাম ও মুসলিমদের বীর। এই চূড়ান্ত যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ে সবচেয়ে বিরাট ভূমিকা ছিল তাঁর অসাধারণ বীরত্বের। তিনি উহুদ রণাঙ্গনে ইসলাম ও মুসলিমদের বীর। এ যুদ্ধে তিনি স্বীয় আদর্শের জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। জীবন রক্ষার্থে আদর্শের জলাঞ্জলি দেননি।

তিনি যেমন শান্তিকালীন সময়ে ইসলাম ও মুসলিমদের সেবা করেছেন, তেমনই যুদ্ধাবস্থায়ও ইসলাম ও মুসলিমদের সেবা করেছেন।

তিনি ইতিহাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের তরবারি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সিংহ এবং শহিদদের সর্দার বলে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আল্লাহ এ মহান সাহাবির প্রতি তাঁর বিশেষ রহমত নাজিল করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

উবাইদা বিন হারিস বিন মুত্তালিব ﷺ

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

উবাইদা বিন হারিস বিন মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই আল-কুরাশি।[৮০] আবদে মানাফ পর্যন্ত এসে উবাইদা ও তাঁর ভাইগণ রাসুল ﷺ-এর বংশধারার সাথে মিলে যায়।

তাঁর মাতা সুখাইলা বিনতে খুজায়ি বিন হুওয়াইরিস বিন হাবিব বিন মালিক বিন হারিস বিন জুশাম বিন কাসি।[৮১] ইনি সাকিফ গোত্রের মূল ব্যক্তি।

তিনি ৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসেবে তিনি রাসুল ﷺ-এর চেয়ে ১০ বছরের বড়।[৮২] আমরা তাঁর জাহিলি যুগের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতে পারিনি।

তিনি এবং আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ, আব্দুল্লাহ বিন আরকাম মাখজুমি ও উসমান বিন মাজউন ﷺ—এ চারজন একই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮৩]

---

৮০. নাসবু কুরাইশ : ৯২-৯৩ পৃ., আল-ইসতিআব : ৩/১০২০।
৮১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫০।
৮২. উসুদুল গাবাহ : ৩/৩৫৬, আল-ইসাবাহ : ৪/২০৯-২১০।
৮৩. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৫৬।

তিনি সূচনাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[৮৪] তিনি ইসলামে প্রবেশ করেন রাসুল ﷺ দারুল আরকাম থেকে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করার আগে।[৮৫]

রাসুল ﷺ মক্কায় তাঁর ও বিলাল ﵁-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দেন।[৮৬] হিজরতের আগে মুহাজির সাহাবিদের মাঝে অধিকার ও পারস্পরিক সহমর্মিতার ভিত্তিতে রাসুল ﷺ ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দিতেন।

মুসলিমদের ওপর কুরাইশের নির্যাতন অতি মাত্রায় বেড়ে গেলে রাসুল ﷺ সাহাবিদের হিজরতের অনুমতি দান করেন। তখন উবাইদা ﵁ তাঁর দুই ভাই তুফাইল ও হুসাইন বিন হারিস এবং মিসতাহ বিন উসাসার সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁরা মদিনায় এসে আব্দুল্লাহ বিন সালামা আজলানি ﵁-এর কাছে মেহমান হন।[৮৭] মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাঁরা মক্কার নিকটবর্তী উপত্যকা বাতনে নাজিহতে একত্রিত হবে বলে ঠিক করেন। কিন্তু মিসতাহ ﵁ পথিমধ্যে কীট দ্বারা দংশিত হয়ে পেছনে পড়ে যান। সকালবেলা বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর খোঁজে বের হন এবং মক্কার ওপরে হাসাস পাহাড়ে তাঁকে পান। এরপর তাঁকে বহন করে মদিনায় পৌঁছেন।[৮৮]

মদিনা মুনাওয়ারায়

উবাইদা ﵁ হিজরতের পরে তাঁর দুই ভাই ও আত্মীয়দের নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে ইসলাম রক্ষায় জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি মানসিক ও আর্থিক সকল শক্তি ব্যয় করেন।

মদিনা মুনাওয়ারায় রাসুল ﷺ তাঁর ও উমাইর বিন হুমাম আনসারি ﵁-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দেন। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে তাঁরা উভয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।[৮৯]

---

৮৪. আল ইসাবাহ : ৪/২০৯, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫১।

৮৫. আল-ইসতিআব : ৩/১০২০।

৮৬. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৭০, আল-মুহাব্বার : ৭১ পৃ.।

৮৭. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৫৭। তাবাকাতু ইবনি সাদে (৩/৫১) আছে, তিনি ছিলেন আব্দুর রহমান।

৮৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫১।

৮৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫১, আল-মুহাব্বার : ৭১ পৃ.। আনসাবুল আশরাফে (১/২৭০) আছে, উবাইদা ﵁ এবং হুমাম বিন জামুহ ﵁-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দিয়েছিলেন। আবার বলা হয়, আমর বিন জামুহ। প্রথমটিই অধিক বিশুদ্ধ।

উবাইদা ﷺ তাঁর সাথিদের নিয়ে কুবায় আব্দুল্লাহ বিন সালামা ﷺ-এর বাড়িতে মেহমান হয়েছিলেন।[৯০] এটা ছিল মক্কার দিকে মদিনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। রাসুল ﷺ তাঁর জন্য এবং তাঁর দুই ভাইয়ের জন্য মদিনায় একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দেন। রাসুল ﷺ মালিকহীন ভূমি অথবা আনসারি সাহাবিদের দানকৃত ভূমি মুহাজির সাহাবিদের বণ্টন করে দিতেন। এই হিসেবে উবাইদা ﷺ-এর বাড়িটি মদিনার প্রাণকেন্দ্রে মসজিদে নববির সন্নিকটে হয়েছিল।

রাসুল ﷺ-এর কাছে উবাইদা ﷺ-এর বিরাট মর্যাদা এবং অবস্থান ছিল।[৯১] এটা তাঁর গভীর ইমান, উন্নত বৈশিষ্ট্য ও যথেষ্ট যোগ্যতার কারণে হয়েছিল।

উবাইদা ﷺ-এর সারিয়্যা

মদিনা মুনাওয়ারায় এসে সর্বপ্রথম রাসুল ﷺ হামজা ﷺ-এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। এরপর হিজরতের অষ্টম মাস শাওয়ালের শুরুতে একটি সাদা ঝান্ডা দিয়ে উবাইদা ﷺ-কে বাতনে রাবিগ[৯২] অভিমুখে প্রেরণ করেন।[৯৩] এ বাহিনীর ঝান্ডা বহন করেছিলেন মিসতাহ বিন আসাসা ﷺ। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০ জন, যাঁদের সকলেই ছিলেন মুহাজির। তাঁরা বাতনে রাবিগের আহইয়া নামক পানির উৎসের কাছে আবু সুফিয়ান বিন হারবের দেখা পায়। তার নেতৃত্বে কুরাইশের ২০০ সৈন্য ছিল। বাতনে রাবিগ ছিল জুহফা এলাকা থেকে ১০ মাইল দূরে। কুরাইশ বাহিনী মূল পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরেছিল তাদের কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য। এরপর উভয় বাহিনীর মাঝে শুধু তির বিনিময় আর বাদানুবাদ হয়, এ ছাড়া কোনো যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ সেদিন সর্বপ্রথম তির নিক্ষেপ করেছিলেন। এটাই ছিল ইসলামের পক্ষ থেকে কুফরের বিরুদ্ধে নিক্ষেপিত প্রথম তির। এরপর উভয় বাহিনী আপন এলাকায় ফিরে যায়।[৯৪]

---

৯০. জাওয়ামিউস সিরাহ : ৮৯ পৃ.।
৯১. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৫৭।
৯২. মক্কা-মদিনার পথে জুহফাহ এবং ওয়াদ্দান এলাকার মাঝে একটি উপত্যকার নাম রাবিগ।
৯৩. তাবাকাতু বিন সাদ : ৩/৫১।
৯৪. তাবাকাতু বিন সাদ : ২/৭। দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২২৪।

সেদিন বনু জুহরার মিত্র মিকদাদ বিন আমর বাহরানি এবং বনু নাওফালের মিত্র উতবাহ বিন গাজওয়ান ﷺ মুশরিকদের থেকে পলায়ন করে মুসলিমদের কাছে চলে আসে। তাঁরা দুজন আগে থেকে মুসলিম ছিলেন, শুধু মুশরিকদের ব্যবহার করে মুসলিমদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যই তাঁরা এ বাহিনীর সাথে বের হয়েছিলেন। অপর বর্ণনামতে, মুশরিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল ইকরামা বিন আবু জাহেল।[৯৫]

যাহোক, এ অভিযানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। সে হিসেবে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজয় অমীমাংসিত থেকে গেলেও মানসিকভাবে যে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ মাত্র ৬০ জন মুসলিম বাহিনীর সামনে থেকে ২০০ জন অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর ফিরে যাওয়া প্রমাণ করে মুসলিমদের মনোবল ছিল সুদৃঢ় ও অটল এবং মুশরিকদের মনোবল ছিল বিচলিত ও পরাজিত; আর মানসিক বিজয়ের গুরুত্ব বাহ্যিক বিজয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যদিও বাহ্যিক বিজয় মানসিক বিজয়ের থেকে অধিক প্রভাবশীল ও গুরুত্বপূর্ণ।

এই অভিযানের ফলাফলে মুসলিমগণ আনন্দিত হয়েছিল। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, এই অভিযানের প্রভাব সম্পর্কে অধিক পরিমাণে কবিতা রচিত হওয়া। যদিও কবিতাবিষয়ক অধিকাংশ আহলে ইলম কবিতাটিকে রচয়িতার দিকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে সংশয় পোষণ করেছেন।[৯৬] তবুও মুসলিমদের ইতিহাসের সূচনাকালে এই অভিযানের ফলাফলের ব্যাপারে সারিয়্যাটি অবশ্যই গুরুত্ব রাখে।

শাহাদাত বরণ

দ্বিতীয় হিজরির রমাদানের আট দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সাথে নিয়ে বদর রণাঙ্গনের দিকে রওয়া হন। সাথে ছিল ৭০টি উট। সাহাবায়ে কিরাম পালাক্রমে কয়েকজন মিলে একটি করে উটে বদর ময়দানে পৌঁছেছিলেন। পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হতো এমন একটি উট

---

৯৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২২৪-২২৫। দেখুন, তাবাকাতু বিন সাদ : ২/৭।
৯৬. বিস্তারিত দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২২৫-২২৯।

উবাইদা ﷺ ক্রয় করেছিলেন আবু দাউদ আনসারি ﷺ থেকে।[৯৭] সে উটে পালাক্রমে আরোহণ করে উবাইদা, তুফাইল, হুসাইন ও মিসতাহ ﷺ বদরে পৌছেন।

যুদ্ধের সূচনাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো। কাফির বাহিনী থেকে উতবা, শাইবা ও উতবার ছেলে ওয়ালিদ বের হয়ে আসলো। তারা মোকাবিলার জন্য আহ্বান জানাল। তাদের জবাব দেওয়ার জন্য একদল আনসারি বের হলেন। তারা বলল, 'তোমরা কারা?' সাহাবিগণ উত্তর দিলেন, 'আমরা আনসার সম্প্রদায়।' তারা বলল, 'তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের।' তাদের একজন ডাক দিয়ে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আমাদের কওমের মধ্য হতে আমাদের সমকক্ষ কাউকে পাঠিয়ে দাও।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'হে উবাইদা, ওঠো। হে হামজা, ওঠো। হে আলি, ওঠো।' তাঁরা উঠে তাদের নিকটে গেলে তারা প্রশ্ন করল, 'তোমরা কারা?' সাহাবিগণ তাঁদের নাম বললেন। তখন তারা বলল, 'হ্যাঁ, এবার আমাদের উপযুক্ত লোক এসেছে।' উবাইদা ﷺ ওই ছয়জনের মাঝে বয়সে সবচেয়ে বড় ছিলেন। তিনি উতবার মোকাবিলায় গেলেন, হামজা ﷺ শাইবার মোকাবিলায় আর আলি ﷺ ওয়ালিদের মোকাবিলায়।

হামজা ﷺ চোখের পলকেই তাঁর প্রতিপক্ষকে শেষ করে দিলেন। আলি ﷺ-ও তাঁর প্রতিপক্ষকে নিমিষেই খতম করলেন। পক্ষান্তরে উবাইদা ﷺ ও তাঁর প্রতিপক্ষ উভয়ে উভয়কে আঘাত করে আহত হয়ে পড়ে যায়। তখন আলি ও হামজা ﷺ মুহূর্তে উতবাকে হত্যা করে ফেলেন। এবং উবাইদা ﷺ-কে নিজেদের এরিয়ায় নিয়ে আসেন।[৯৮]

উবাইদা ﷺ ছিলেন এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আমির। তাঁর নেতৃত্বে লড়াই করেন হামজা ﷺ ও আলি ﷺ।[৯৯] তাই এই চূড়ান্ত ফায়সালাকারী বদর যুদ্ধে উবাইদা ﷺ-এর ছিল বিরাট মর্যাদা।[১০০]

---

৯৭. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৮৯।
৯৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৬৫, ইবনুল আসির : ২/১২২-১২৫।
৯৯. ইবনুল আসির : ২/১২৫।
১০০. আল-ইসতিআব : ৩/১০২০।

উতবা বিন রবিআর আঘাতে উবাইদা ﷺ-এর পা কেটে গিয়েছিল।[১০১] তাঁকে রাসুল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলো। তাঁর জখম থেকে রক্ত বের হতে হতে রক্ত ফুরিয়ে আসছিল। তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, যদি আবু তালিব বেঁচে থাকতেন, তবে তার এ কথার প্রতিফলন আজ স্বচক্ষে দেখতে পেতেন—

"তোমরা মিথ্যুক, বাইতুল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদের কারণে পরাজিত হবো না, যখন তাঁর হয়ে তির-বর্শা চালাইনি।

তাঁকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করব না, যতক্ষণ না তাঁর সামনে নিহত হই এবং স্ত্রী-সন্তান বিস্মৃত হই।"'

উবাইদা ﷺ-এর মাথা রাসুল ﷺ-এর হাঁটুর ওপর রাখা ছিল।[১০২] সেদিন তিনি বদরে অংশগ্রহণকারী সকলের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।[১০৩] যুদ্ধ শেষে রাসুল ﷺ-এর সাথে মদিনায় ফিরে আসছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে সাফরা নামক স্থানে এসে জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

এভাবেই উবাইদা ﷺ-এর জিহাদি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষায় দীর্ঘ সময় ধরে নিজের আত্মাকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে অবশেষে সাফরা নামক স্থানে আরামের নিদ্রায় শায়িত হন।

ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন

সন্তান : ছেলেদের থেকে ছিল—মুআবিয়া, আওন, মুনকিজ, হারিস, মুহাম্মাদ ও ইবরাহিম। মেয়েদের থেকে ছিল—রাইতাহ, খাদিজাহ, সুখলাহ ও সাফিয়্যা।[১০৪]

স্ত্রী : জাইনাব বিনতে খুজাইমা বিন হারিস বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর।[১০৫] তাঁকে উম্মুল মাসাকিন বলা হতো। জাহিলি যুগে তাঁকে এ উপনামে ডাকা হতো।

---

১০১. আল-ইসাবাহ : ৩/২১০। দেখুন, আল-ইসতিআব : ৩/১০২০।
১০২. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৫৭।
১০৩. আল-ইসতিআব : ৩/১০২০, উসদুল গাবাহ : ৩/৩৫৭।
১০৪. তাবাকাতু বিন সাদ : ৩/৫০।
১০৫. আল-মুহাব্বার : ৮৩ পৃ.।

তৃতীয় হিজরির রমাদান মাসে রাসুল ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। রাসুল ﷺ-এর কাছে আট মাস সংসার করে চতুর্থ হিজরির রবিউল আওয়ালের শেষে ইনতিকাল করেন। রাসুল ﷺ জানাজা পড়ে নিজ হাতে তাঁকে দাফন করেন।[১০৬]

সাহাবায়ে কিরাম শহিদদের স্ত্রীদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে শহিদদের সম্মান করতেন। সেই প্রেক্ষিতে রাসুল ﷺ উবাইদা ؓ-এর স্ত্রীর দায়িত্বভার নিজ জিম্মায় নিয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় রাসুল ﷺ-এর মনে উবাইদা ؓ-এর প্রতি কতটা সম্মানবোধ ছিল!

উবাইদা ؓ-এর অপর স্ত্রী আতিকা বিনতে জাইদ বিন আমর বিন নুফাইল বিন আব্দুল উজ্জা।[১০৭]

তাঁর দুই ভাই, তুফাইল ও হুসাইন। তুফাইল ؓ বদরসহ রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর উসমান ؓ-এর খিলাফতকালে ৩২ হিজরিতে ৭০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আর হুসাইন ؓ-ও বদরসহ রাসুল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনিও উসমান ؓ-এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন, তুফাইল ؓ-এর ইনতিকালের কয়েক মাস পরে।[১০৮]

রাসুল ﷺ-এর কাছে উবাইদা ؓ-এর সম্মান ও অবস্থান ছিল অনেক উঁচু।[১০৯] এটা হয়েছিল তাঁর ইমানি চেতনা ও উন্নত মানবিক গুণাবলির কারণে। রাসুল ﷺ মানুষের যথাযথ মূল্যায়ন করতেন। প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপযুক্ত আসনে স্থান দিতেন।

রাসুল ﷺ থেকে প্রাপ্ত জায়গাতে তিনি যে বাড়ি বানিয়েছিলেন, সে বাড়ি ছাড়া তাঁর অন্য কোনো টাকাপয়সা সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আবার বাড়িটিও ছিল অন্যান্য সাহাবির মতোই অতি সাধারণ।

---

১০৬. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪২৯।
১০৭. আল-মুহাব্বার : ৪৩৭ পৃ.।
১০৮. নাসবু কুরাইশ : ৯৫ পৃ., দেখুন, তাবাকাতু বিন সাদ : ৩/৫২-৫৩।
১০৯. আল-ইসতিআব : ৩/১০২০।

তিনি যেহেতু রাসুল ﷺ-এর চেয়ে ১০ বছরের বড় ছিলেন এবং দ্বিতীয় হিজরিতে বদরে শাহাদাত বরণ করেছেন; তাই তাঁর বয়স হয়েছিল সৌরবর্ষ হিসেবে ৬২ বছর এবং চন্দ্রবর্ষ হিসেবে ৬৩ বছর।[১১০] তিনি সুন্দর গোলগাল চেহারাবিশিষ্ট ছিলেন।[১১১]

বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ যখন কোনো এক যুদ্ধের সফরে সাফরা নামক স্থানে নামলেন, তখন সাহাবিগণ বললেন, 'আমরা মিশকের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'পাবে না কেন! এখানে যে আবু মুআবিয়ার কবর আছে।'[১১২]

তাঁর উপনাম ছিল আবু মুআবিয়া এবং আবু হারিস। সম্ভবত হারিস মারা যাওয়ার পর তাঁকে দ্বিতীয় উপনামে ডাকা হতো।

এভাবেই তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য নিজের সবকিছু পেশ করে মহান রবের সান্নিধ্যে চলে গেছেন। কিন্তু নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করেননি। ফলে তিনি আকিদা-বিশ্বাসে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে পরিণত হয়েছেন।

কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

রাসুল ﷺ-এর কাছে তাঁর একটা বিশেষ অবস্থান ছিল। ফলে আসাদুল্লাহ হামজা ﷺ-এর পর ইসলামের দ্বিতীয় অভিযানে তাঁকেই প্রেরণ করেছিলেন। এটাই প্রমাণ করে, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ছিল তাঁর বিশেষ এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য। যেমন : বীরত্ব, নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা, উত্তম পরিচালনা এবং সে যুগে যুদ্ধের উপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান।

তাঁর বীরত্ব ও নির্ভীকতার প্রতি রাসুল ﷺ-এর আস্থা ও বিশ্বাস থাকার কারণেই তাঁকে তিনি কুরাইশের প্রখ্যাত বীরদের মোকাবিলায় এগিয়ে দিয়েছিলেন।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি উদঘাটন করা একটু কঠিন। কারণ ইসলামের খুব কম যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন। অন্যথায়

---

১১০. তাবাকাতু বিন সাদ : ৩/৫২, আল-ইসতিআব : ৩/১০২০, উসদুল গাবাহ : ৩/৩৫৭।
১১১. আল-ইসতিআব : ৩/১০২১, উসদুল গাবাহ : ৩/৩৫৭।
১১২. আল-ইসতিআব : ৩/১০২১।

একটু হায়াত পেলে অন্যান্য যুদ্ধে এবং রাসুল ﷺ-এর পরে ইসলামের বিজয় অভিযানসমূহে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্যাবলি অবশ্যই প্রকাশ পেত।

তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরিপূর্ণরূপে খতম করতে না পারা; বরং প্রত্যেকে একে অপরকে আহত করা, এটা তাঁর বয়সের নাজুকতার কারণে হতে পারে। কারণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত শারীরিক শক্তি, অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্য ও বীরত্ব। অস্ত্রচালনায় যেমন ছিল তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্য, তেমন ছিল তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা। কিন্তু তাঁর শারীরিক শক্তির ব্যাপারে একটু সংশয় থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ তিনি ছিলেন ৬৩ বছরের এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। আলি ﷺ-এর মতো টগবগে যুবকও ছিলেন না এবং হামজা ﷺ-এর মতো প্রৌঢ় বয়সেরও ছিলেন না। তাই প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে সক্ষম হননি।

উবাইদা ﷺ-এর মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি রাসুল ﷺ-এর প্রথম পর্যায়ের কমান্ডারদের একজন ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতার জন্য এটাই জ্বলন্ত প্রমাণ। আবার তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং লাভ করেছেন রাসুল ﷺ-এর পতাকাতলে জিহাদ করার অনন্য মর্যাদা।

ইতিহাসে উবাইদা ﷺ

তিনি সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। সে কারণে অন্যান্য মুসলিমদের মতো তিনিও ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফিরদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন।

তিনি ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন কমান্ডার। যিনি বিশ্বাসের কারণে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন; কিন্তু জীবন রক্ষার্থে নিজের আকিদা-বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দেননি।

তিনি ছিলেন প্রথম সারির মুসলিম বীরদের মধ্যে অন্যতম এবং ইসলামের প্রথম শহিদদের একজন।

আল্লাহ এ মহান বীর শহিদের প্রতি তাঁর বিশেষ রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আল-আসাদি ﵁

'আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আরবে আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী।'

- মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ

'আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ছিলেন আমাদের চেয়ে উত্তম।'

- সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﵁

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ বিন রিআব বিন ইয়ামার বিন সাবিরা বিন মুররা বিন কাসির বিন গানাম বিন জুদান বিন খুজাইমা আল-আসাদি।[১১৩]

তাঁর মা উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। যিনি রাসুল ﷺ-এর ফুফু।[১১৪] তিনি বনু আবদে শামশের মিত্র ছিলেন। একটি দুর্বল মতে, হারব বিন উমাইয়া বিন আবদে শামশের মিত্র ছিলেন। যেটাই হোক তিনি আবদে শামশের মিত্র ছিলেন।[১১৫]

---

১১৩. আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৭, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১, আনসাবুল আশরাফ : ১/৮৮।
১১৪. তাবাকাতু বিন সাদ : ৩/৮৯।
১১৫. উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১, আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৭।

তিনি সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন।[১১৬] রাসুল ﷺ আরকাম বিন আরকামের বাড়ি থেকে ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম শুরু করার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[১১৭]

আব্দুল্লাহ ﷺ ও তাঁর ভাই আবু আহমাদ আবদু বিন জাহশ সেই মুহাজিরদের মধ্যে ছিলেন, যারা হাবশায় দুবার হিজরত করেছিলেন।[১১৮] প্রথম হিজরতের পর মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণের ভুয়া খবর শুনে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। এরপর তিনি ও তাঁর ভাই উবাইদুল্লাহ বিন জাহশ দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরত করেন। উবাইদুল্লাহর সাথে তার স্ত্রী উম্মে হাবিবা ﷺ-ও ছিলেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ হাবশায় গিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যায় এবং সেখানেই মারা যায়। আর আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ মক্কায় ফিরে আসেন।[১১৯] পরে উম্মে হাবিবা ﷺ-কে রাসুল ﷺ বিয়ে করেন।[১২০]

রাসুল ﷺ যখন মদিনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন, তখন তৃতীয়তম যিনি মদিনায় হিজরত করেন, তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ। সাথে পরিবার ও তাঁর ভাই আবদ বিন জাহশ ﷺ-কেও নিয়ে যান—যাকে আবু আহমাদ বলা হয়। আবু আহমাদ দৃষ্টিহীন লোক ছিলেন। তিনি কোনো গাইড ছাড়াই মক্কার সর্বত্র চলাফেরা করতেন। তিনি আবার কবিও ছিলেন। আবু সুফিয়ানের মেয়ে ফারিআহ তাঁর বিবাহ বন্ধনে ছিল।[১২১] আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ হিজরত করে কুবায় মুবাশশির বিন মুনজির ﷺ-এর কাছে মেহমান হন। বনু গানম বিন দুদান ছিল আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ-এর ইসলামি পরিবার। তাঁরা সপরিবারে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছিলেন।[১২২] আবু সুফিয়ান জাহশ গোত্রের ভিটেমাটি দখল করে বিক্রি করে দেয়।[১২৩]

---

১১৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/২৬৮-২৭১, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৪৫-৫১।
১১৭. আল-ইসাবাহ : ৩/৮৭৭, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১।
১১৮. আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৭, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৬।
১১৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৮৯।
১২০. উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১।
১২১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৭৮-৭৯।
১২২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৮৯।
১২৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১১৭।

মদিনা মুনাওয়ারায় রাসুল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ؓ ও আসিম বিন সাবিত ؓ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন। আসিম ؓ-এর নাম ছিল কাইস।[১২৪]

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ও তাঁর পরিবার-পরিজন এভাবেই হিজরতের পথের সকল দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন।

নাখলাহ অভিমুখে অভিযান[১২৫]

হিজরতের ১৭ মাসের মাথায় দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে রাসুল ﷺ নাখলাহ অভিমুখে ১২ সদস্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। বাহিনীর আমির নিযুক্ত করেন আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ؓ-কে। বাহিনীর সকলেই মুহাজির সাহাবি ছিলেন।[১২৬] একেকটি উটে দুজন করে আরোহণ করে তাঁরা এ অভিযানে গিয়েছিলেন।

সাথে আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ؓ-কে রাসুল ﷺ একটি পত্র দিয়েছেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন দুই দিন পথ চলার পূর্বে সেটি খুলে না দেখে। দুই দিনের পথ অতিক্রমের পর খুলে দেখেন, যাতে তিনি আদেশ অনুযায়ী এগিয়ে যান এবং কোনো সাথিকে যেতে বাধ্য না করেন। তিনি নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন। আধুনিক সামরিক পরিভাষায় এ ধরনের পত্রকে আমরা বলি 'গোপন বার্তা'।

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ؓ-এর সৈনিকদের মাঝে ছিলেন আবু হুজাইফা বিন উতবা বিন রবিআ, উক্কাশা বিন মিহসান আসাদি, উতবা বিন গাজওয়ান বিন জাবির, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আমির বিন রবিআ, ওয়াকিদ বিন আব্দুল্লাহ

---

১২৪. আল-মুহাব্বার : ৭২ পৃ.। আল-ইসাবায় (৪/৪৬) আছে, তিনি হচ্ছেন, আসিম বিন সাদিক। তবে আমরা যেটা ওপরে উল্লেখ করেছি, সেটাই বিশুদ্ধ।

১২৫. মক্কা ও তায়িফ রোডে অবস্থিত ইবনে আমিরের বাগানের নাম নাখলাহ। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/২৭৫।

১২৬. তাবাকাতু বিন সাদ : ২/১০। আর সিরাতু ইবনি হিশামে (২/২৩৯) আছে, বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল আটজন মুহাজির।

আত-তামিমি, খালিদ বিন বুকাইর লাইসি, সুহাইল বিন বাইদা আল-ফিহরি ﷺ। ইবনে হিশাম তাঁর সিরাতগ্রন্থে এদের নামই উল্লেখ করেছেন।[১২৭]

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে দুই দিন পথ চলার পর রাসুল ﷺ-এর পত্রখানা খুললেন। পত্রে লেখা ছিল, 'যখন আমার এ পত্র খুলে দেখবে, তখন মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে নাখলায় অবতরণ করবে। সেখানে আত্মগোপন করে কুরাইশের খবর নিয়ে আমাদের জানাবে।'

আব্দুল্লাহ ﷺ রাসুল ﷺ-এর পত্র পাঠ করে বললেন, 'শুনলাম এবং মানলাম।' এরপর তাঁর সাথিদের উদ্দেশে বললেন, 'রাসুল ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন নাখলায় গিয়ে আত্মগোপন করি। এবং কুরাইশের খবরাখবর জেনে তাঁর কাছে ফিরে যাই। আমাকে তোমাদের কাউকে সেখানে যাওয়ার জন্য বাধ্য করতে নিষেধ করেছেন। তাই তোমাদের যে শাহাদাতের তামান্না করে, সে যেন আমাদের সাথে যায়। আর যে শাহাদাত অপছন্দ করে, সে যেন ফিরে যায়। আর আমি রাসুল ﷺ-এর হুকুম তামিল করব।'

আব্দুল্লাহ ﷺ পথ চলা শুরু করলেন, সাথে তাঁর সাথিগণও চললেন। কেউই পিছপা হলেন না। তিনি বুহরান[১২৮] নামক স্থানে পৌঁছলে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও উতবা বিন গাজওয়ান তাঁদের উটটি হারিয়ে ফেললেন, যেটাতে আরোহণ করে তাঁরা যাচ্ছিলেন। ফলে তাঁরা দুজন উটের সন্ধানে পেছনে পড়ে যান।

এদিকে আব্দুল্লাহ ﷺ বাকিদের নিয়ে তাঁর গন্তব্যপানে চলা অব্যাহত রেখে একসময় নাখলায় গিয়ে অবতরণ করেন। এরপর সেদিক দিয়ে কিশমিশ ও চামড়া নিয়ে কুরাইশের একটি ব্যাবসায়িক কাফেলা যাচ্ছিল। কাফেলায় ছিল উসমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুগিরা ও তার ভাই নাওফাল বিন মুগিরা। হিশাম বিন মুগিরার আজাদকৃত গোলাম হাকাম বিন কাইসান। তাদের নেতৃত্বে ছিল আমর বিন হাদরামি। মুশরিকরা মুসলিমদের এ অবস্থায় দেখে ভয় পেয়ে যায়। উক্কাশা বিন মিহসান ﷺ তাদের উঁকি মেরে দেখলেন, আর তখন তাঁর মাথা মুণ্ডানো

---

১২৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৩৯।

১২৮. মদিনা ও ফারা এলাকার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম বুহরান। মদিনা ও ফারা এর মাঝে চার বারিদের দূরত্ব। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ২/৬৫।

ছিল। মুশরিকরা তাঁকে দেখে নিজেদের নিরাপদ মনে করল। তারা বলল, 'তাঁরা উমরা পালনকারী। তাঁদের ব্যাপারে তোমাদের কোনো শঙ্কা নেই।'

মুসলিমগণ পরস্পর পরামর্শ করে বললেন, 'যদি এই রাতে ছেড়ে দাও, তবে তারা হারামের সীমানায় ঢুকে পড়বে। ফলে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের থেকে বাঁচতে পারবে। আর যদি তাদের হত্যা করো, তবে নিষিদ্ধ মাসে তাদের হত্যা করবে।'

মুসলিম বাহিনী দ্বিধা-সংকোচে পড়ে গেল। নিষিদ্ধ মাসের বিষয়টি ভেবে মুশরিকদের ওপর আগ বাড়িয়ে হামলা করতে ভয় করল। এরপর নিজেরাই অনুপ্রাণিত হয়ে যাদের ধরতে পারবে, তাদের হত্যা করতে একমত হলো। ফলে ওয়াকিদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তামিমি ﵁ আমর বিন হাদরামিকে তির বিদ্ধ করল। এতে সে নিহত হলো। উসমান বিন আব্দুল্লাহ ও হাকাম বিন কাইসানকে বন্দী করা হলো। কিন্তু নাওফাল বিন আব্দুল্লাহ মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। ফলে তাকে আর ধরা গেল না।

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﵁ দুই বন্দী ও ব্যবসার মালসহ উট নিয়ে মদিনার পথ ধরলেন। তাঁর সাথিদের বললেন, 'আমরা যে গনিমত লাভ করেছি, তার মধ্যে রাসুল ﷺ-এর জন্য এক-পঞ্চমাংশ থাকবে।' এ কথা তিনি ওই সময় বলেছিলেন, যখন আল্লাহ তাআলা তখনও গনিমতের কোনো বিধান নাজিল করেননি। এরপর তিনি ব্যাবসায়িক কাফেলার সমুদয় সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাসুল ﷺ-এর জন্য আলাদা করলেন এবং বাকিটা সাথিদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

তাঁরা মদিনায় পৌঁছলে রাসুল ﷺ তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি।' তাই দুই বন্দী ও ব্যবসার কাফেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত করলেন এবং সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

গনিমতের সম্পদ তাঁদের হাতেই থেকে গেল। তাঁরা ধারণা করে বসলেন যে, তাঁরা ধ্বংস হয়ে গেছেন। এ কৃতকর্মের কারণে তাঁদের মুসলিম ভাইগণও তাদের তিরস্কার করতে লাগল।

অপরদিকে কুরাইশরা বলতে লাগল, 'মুহাম্মাদ আর তাঁর সাথিরা তো নিষিদ্ধ মাসকে বৈধ করে নিয়ে নিল। তাঁরা নিষিদ্ধ মাসে রক্তপাতের সূত্রপাত করল এবং সম্পদ লুণ্ঠন ও বন্দী করা শুরু করে দিল।' তখন মক্কায় যে মুসলিমগণ ছিলেন তাঁরা কুরাইশদের এ বলে জবাব দিল যে, তাঁরা যা করেছে, তা কেবল শাবান মাসে করেছে, রজবে করেনি।'

ইহুদিরা এ সুযোগটাকে গনিমত হিসেবে লুফে নিল। মুসলিমদের নিন্দা করতে লাগল এবং কুরাইশদের ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করল। যখন এ ব্যাপারে মানুষ বেশি বলা শুরু করে দিল, তখন আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-এর ওপর ওহি নাজিল করলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ

'তারা আপনাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দিন, "তাতে যুদ্ধ করা বড় পাপ। তবে আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সাথে কুফরি করা, মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়ে রাখা এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা তা থেকেও মারাত্মক বড় পাপ।"'[১২৯]

অর্থাৎ তোমরা যদি সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করে থাকো, তবে তারা তো আল্লাহর সাথে কুফরি করার সাথে সাথে তোমাদেরকে তাঁর পথে বাধা দিচ্ছে। মসজিদে হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখছে। তোমরা সেখানকার অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সেখান থেকে বের করে দিয়েছে। এসব তোমাদের হত্যার চেয়েও আল্লাহর কাছে অনেক বড় অপরাধ।

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ

'আর—ধর্মের ব্যাপারে—ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা বড় পাপ।'[১৩০]

১২৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৭।
১৩০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৭।

অর্থাৎ তারা মুসলিমদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলে দিচ্ছে। ইমান গ্রহণের পর তাঁদের পুনরায় কুফরে ফিরিয়ে নিচ্ছে। এটা আল্লাহর কাছে হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ।

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

'বস্তুত তারা তো সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে, যদি তারা সক্ষম হয়।'[১৩১]

অর্থাৎ তারা তাদের ঘৃণ্য কাজে শুধু অটল-অবিচলই থাকবে না; বরং তোমাদেরকেও দ্বীন থেকে বিমুখ করার জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কিন্তু এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না।

যখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করে আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ও তাঁর সৈনিকদের ভয় ও শঙ্কা দূর করে দিলেন, তখন রাসুল ﷺ গনিমত লব্ধ ব্যাবসায়িক সম্পদ ও বন্দীদের গ্রহণ করলেন।

কুরাইশরা তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ পাঠিয়ে দেয়। তখন রাসুল ﷺ বলেন, 'আমরা তোমাদের লোকের বিনিময়ে মুক্তিপণ গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও উতবা বিন গাজওয়ান ফিরে আসছে। কারণ তাঁদের ব্যাপারে আমরা তোমাদের আশঙ্কা করছি। যদি তাঁদের হত্যা করো, তবে তাঁদের বিনিময়ে আমরাও এদের হত্যা করব।' অতঃপর সাদ ও উতবা ﷺ ফিরে আসলে রাসুল ﷺ মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের মুক্ত করে দেন। হাকাম বিন কাইসান ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে থেকে যান। অতঃপর বীরে মাউনার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। আর উসমান বিন আব্দুল্লাহ মক্কায় চলে যায় এবং সেখানে কাফির অবস্থায় মারা যায়।

এই অভিযানে মুসলিমগণ সর্বপ্রথম গনিমত লাভ করেন। আমর বিন হাদরামিকে সর্বপ্রথম মুসলিমগণ হত্যা করে। উসমান বিন আব্দুল্লাহ ও হাকাম বিন কাইসান ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়।[১৩২]

---

১৩১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৭।

১৩২. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৩৮-২৪৩। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১০-১১।

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ ইসলামে সর্বপ্রথম গনিমত বণ্টন করেন এবং এক-পঞ্চমাংশ রাসুল ﷺ-এর জন্য আলাদা করেন।[১৩৩] ইসলামের এই অভিযানে সর্বপ্রথম তাঁকে আমিরুল মুমিনিন নাম দেওয়া হয়।[১৩৪]

এই অভিযান প্রেরণের পেছনে রাসুল ﷺ-এর যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা ছিল না। এ অভিযানের লক্ষ্য ছিল কেবল কাফিরদের গতিবিধি লক্ষ করে তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু আব্দুল্লাহ ﷺ-এর বীরত্ব ও উদ্দীপনা তাঁকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে দিয়েছিল। যেটা তখনকার আরবদের কাছে প্রথাবিরোধী কাজ ছিল। ফলে কুরাইশরা এটাকে অপূর্ব সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল, যেমন ইহুদি এবং অন্যান্য সকল মুশরিক মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে।

এত কিছুর পরও এ অভিযানের ফলে কুরাইশের মনোবলে মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। কারণ মুসলিমরা মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী জায়গার এত গভীরে এসে আক্রমণ করতে পারে, এটা তারা কখনো কল্পনা করেনি। আগ বাড়িয়ে আক্রমণের ফলে কুরাইশের মানসিক অবস্থা টালমাটাল হয়ে গিয়েছিল। কারণ এ অভিযানের কারণে কুরাইশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধের পরিধি শুধু সিরিয়াগামী কুরাইশের চালিকাশক্তি তুল্য ব্যাবসায়িক রোড পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং অর্থনৈতিক এ অবরোধের পরিধি তাদের সিরিয়াগামী দ্বিতীয় ব্যাবসায়িক রোড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে মুসলিমগণ কুরাইশের ব্যাবসায়িক রোডের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ফলে তাদের সামনে ইয়েমেন হয়ে মক্কার দক্ষিণের সিরিয়াগামী পথ ছাড়া কোনো পথই খোলা থাকে না।

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ-এর এই অভিযানের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সে ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর সর্বোচ্চ আশা-ভরসা ছিল। সে কথা তিনি মুখ খুলেও বলেছেন :

لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ، أَصْبَرُكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ

১৩৩. আল-মুহাব্বার : ৮৬ পৃ., উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১, আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৯।
১৩৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯০।

'আমি এমন ব্যক্তিকে তোমাদের আমির নিযুক্ত করছি, যে তোমাদের চেয়ে উত্তম নয় বটে; কিন্তু সে ক্ষুধা-পিপাসায় তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ধৈর্যশীল।'[১৩৫]

এ বলে তিনি আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﵁-কে আমির হিসেবে প্রেরণ করেন।[১৩৬] অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসুল ﷺ বলেন, 'এ অভিযানের ঝান্ডা এমন ব্যক্তির হাতে দেবো, যে ক্ষুধা-পিপাসায় তোমাদের চেয়ে অনেক ধৈর্যশীল।'

এ কথা বলে রাসুল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﵁-কে ঝান্ডা দিলেন। তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি এ অভিযান নিয়ে যাব? অথচ আমি যে এক নবীন তরুণ!' রাসুল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি নিয়ে যাবে।' এরপর তিনি অভিযান পরিচালনা করলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিজয় দান করলেন।[১৩৭]

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﵁-এর বাহিনীর দায়িত্ব আজকের যুগের হুবহু ইসতিশহাদি গ্রুপ বা স্পেশাল ফোর্সের মতোই ছিল। যে ফোর্সের নিতে হয় ক্ষুধা-পিপাসা ও সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্যের কঠোর প্রশিক্ষণ। অভ্যস্ত হতে হয় যত সব ভয়াবহ ও নাজুক অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতায়।

এদের বাছাই করা হয় সবচেয়ে শক্তিশালী ও কঠোর আক্রমণকারীদের থেকে এবং তাদের কমান্ডার হয়ে থাকেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও কঠোর আক্রমণকারী। আর সেই কমান্ডার ছিলেন বীরত্ব, সাহসিকতা আর ধৈর্যে এমনই দুর্দান্ত শক্তির অধিকারী সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﵁।

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﵁ দ্বিতীয় হিজরির ১৭তম রমাদানে মীমাংসাকারী ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাই তিনিও মহান বদরি সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।[১৩৮]

---

১৩৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৫৩৯।

১৩৬. আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৮।

১৩৭. আল-মুহাব্বার : ৮৮ পৃ.।

১৩৮. আল-মুহাব্বার : ২৭৮ পৃ., উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১, আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৮, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২৬৩, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩২৬।

এ যুদ্ধে তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। শক্তির শেষ বিন্দুটুকু ঢেলে যুদ্ধ করেন ইসলামের বিজয় চূড়ান্ত করতে। ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদকে বন্দী করেন। ওয়ালিদের মুক্তির জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদ ও তার ভাই হিশাম বিন ওয়ালিদ মদিনায় আসে। কিন্তু ওয়ালিদ ভাইদের থেকে পলায়ন করে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩৯] এবং মক্কা-বিজয়ের পূর্বে মদিনায় হিজরত করেন।[১৪০]

বদরের কয়েদিদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন জাহশ, আবু বকর সিদ্দিক ও উমর ‎-এর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন।[১৪১] সম্ভবত তাঁর মতামত আবু বকর ‎-এর মতামতের মতোই ছিল। আবু বকর ‎ বলেছিলেন, 'এরা আপনার সম্প্রদায়ের লোক, আপনার পরিবারের লোক। তাদের সময় দিন। হয়তো আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। মুক্তিপণ গ্রহণ করুন, এর দ্বারা আপনার সাথিদের শক্তিশালী করুন।'[১৪২]

কয়েদির ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ‎-এর কাছে রাসুলের পরামর্শ চাওয়া নিশ্চয় প্রমাণ করে সাহাবিদের মাঝে তাঁর মতামতের দূরদর্শিতা এবং রাসুল ﷺ-এর কাছে তাঁর বিশেষ অবস্থান ছিল। এবং বদরে যে তাঁর অসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষা ছিল তারও ইঙ্গিত বহন করে।

শাহাদাত বরণ

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ‎ বলেন, 'উহুদের দিন প্রত্যুষে আমি আর আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ‎ আলাদা হয়ে এক পাশে বসে দুআ করলাম। দুআয় আমি বললাম, "হে আল্লাহ, যুদ্ধ শুরু হলে একজন প্রচণ্ড শক্তিশালী ঘোরতর দুশমনকে আমার মোকাবিলায় পাঠাবেন; যেন আমি বীরবিক্রমে আক্রমণ করি এবং সেও বীরবিক্রমে আক্রমণ করে। অতঃপর আমি যেন তাকে হত্যা করে তার সব মালপত্র ছিনিয়ে নিই।" এরপর আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ‎ বললেন, "হে আল্লাহ, আমার সাথে মোকাবিলার জন্য একজন প্রচণ্ড শক্তিশালী ঘোরতর

---

১৩৯. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩০২।

১৪০. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৪৭ পৃ.।

১৪১. আল-ইসতিআব : ৩/৮৮০।

১৪২. তাফসিরুল কাশশাফ লিজ জামাখশারি : ২/২০।

দুশমনকে পাঠাবেন; যাতে আমিও তার ওপর প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করি এবং সেও প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে বসে। অতঃপর আমার ওপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে আমাকে শহিদ করে দেয়। আমার সবকিছু কেড়ে নেয়। অতঃপর আমার নাক-কান কেটে আমার লাশ বিকৃত করে ফেলে। যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব, তখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, "হে আব্দুল্লাহ, তোমার এ অবস্থা কেন?" আমি বলব, "তোমার জন্য হে রব।" আল্লাহর শপথ, ওই দিন বিকেলে দেখলাম, তাঁকে শহিদ করা হয়েছে। তাঁর নাক-কান কেটে একটি সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে।' সাদ ﵁ বলতেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﵁ আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন।'[১৪৩] সাদ ﵁ এ কথাও বলতেন, 'আমার দুআর চেয়ে আব্দুল্লাহর দুআ শ্রেষ্ঠ ছিল।'[১৪৪]

উহুদের দিন তাঁকে এই দুআ বলতে শোনা গেছে, 'হে আল্লাহ, আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি, আমাদের শত্রুর মুখোমুখি করে দিন। শত্রুর মুখোমুখি হলে যেন শত্রুর ওপর প্রচণ্ড বেগে হামলা করি। এরপর তারা যেন আমাকে আক্রমণ করে হত্যা করে এবং পেট ফেড়ে আমার লাশ বিকৃত করে। যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব, তখন আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, "কীসের জন্য তোমার এ অবস্থা?" আমি বলব, "আপনার জন্য।"' এরপর তিনি শত্রুর মুখোমুখি হন এবং শত্রু তাঁকে শহিদ করে তাঁর পেট ফেড়ে লাশ বিকৃত করে দেয়। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ﵀ বলেন, 'আমি আশা করি, আল্লাহ তাঁর শপথের শেষ অংশও পূর্ণ করবেন।'[১৪৫]

উহুদ যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। শাহাদাতের তামান্নায় মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেন। ফলে যুদ্ধ করতে করতে তাঁর তরবারি ভেঙে যায়। তখন রাসুল ﷺ তাঁকে 'আরজুন' নামক একটি নতুন তরবারি দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ওই তরবারি একের পর এক বিভিন্ন জনের কাছে হাত বদল হতে থাকে। অবশেষে বাঘা তুরকির কাছে ২০০ স্বর্ণমুদ্রায় তরবারিটি বিক্রি হয়।[১৪৬] যখন কিনা একটি ছাগল আধা দিরহামে পাওয়া যেত।

---

১৪৩. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৬৭ পৃ., উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১, আল-ইসাবাহ : ৪/৪৬, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৯০, তাহজিবু আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২৬৩।

১৪৪. উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১।

১৪৫. উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১-১৩২।

১৪৬. আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৯, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১।

উহুদের ময়দানে তাঁর শাহাদাতের তামান্না পূরণ হয়েছিল। তাঁকে হত্যা করেছিল আবুল হাকাম বিন আখনাস বিন শুরাইক নামক এক মুশরিক।[১৪৭] তাঁকে ও হামজা ﷺ-কে এক কবরে দাফন করা হয়।[১৪৮] রাসুল ﷺ নিজে তাঁর জানাজা পড়ান।[১৪৯] শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশের ওপরে।[১৫০]

মুশরিকরা আব্দুল্লাহ ﷺ-এর নাক-কান কেটে দেয় এবং পেট ফেড়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে। এ কারণে তাঁকে 'আল্লাহর জন্য কর্তিত' বলা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি এ বিশেষ নামে পরিচিত হন। তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তির দায়িত্ব রাসুল ﷺ নিয়ে নেন এবং তা দিয়ে খাইবারে তাঁর ছেলের জন্য সম্পদ ক্রয় করেন।[১৫১]

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ হলেন সেই প্রথম প্রস্তর, যার রক্তের ওপর নির্মিত হয় ইসলামের প্রাসাদ। ফলে তিনি যেমন অতীতেও মুসলিমদের উত্তম আদর্শ ছিলেন, তেমন বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও মুসলিমদের উত্তম আদর্শরূপে ভাস্বর থাকবেন।

ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন

নাখলায় পরিচালিত আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ-এর অভিযান মুশরিক ও ইহুদিদের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাদের মতে যেহেতু মুসলিমরা সম্মানিত মাসের অবমাননা করেছে, এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক বিদ্বেষমূলক যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়াতে থাকল।

সেই সময়টাতে মুশরিক ও ইহুদিদের আক্রমণ এবং যুদ্ধের আহ্বান শুধু কবিতা আর ছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিমগণও কবিতা আর ছন্দের মাধ্যমে তাদের মোকাবিলা করে যাচ্ছিল। এই আক্রমণাত্মক কবিতা-যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ-ও ছিলেন।

১৪৭. আল-ইসাবাহ : ৪/৪৬, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১।
১৪৮. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩২২, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১, আল-ইসাবাহ : ৪/৪৬।
১৪৯. আল-ইসাবাহ : ৪/৪৬, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১, আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৮।
১৫০. আল-ইসাবাহ : ৪/৪৬, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১।
১৫১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯১, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩১।

'সম্মানিত মাসে যুদ্ধকে তোমরা বিরাট দোষের বলছ; অথচ বিবেক বলছে, তোমরা তার চেয়ে বড় অপরাধী।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথে বাধা দিচ্ছ, তাঁকে অমান্য করছ—তা তো আল্লাহ দেখছেন এবং শুনছেন।

বাইতুল্লাহর অধিবাসীকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছ; যাতে সেথায় আল্লাহর সিজদাকারী না থাকে।

যদিও হত্যার কারণে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করেছ, ইসলামের কুৎসা রটেছ অন্যায় আর হিংসাবশত।

আমরা কিন্তু হাদরামির বেটাকে ঠিকই বর্শা বিদ্ধ করেছি, নাখলায়—যখন যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে হয়েছে।

আব্দুল্লাহর বেটা উসমান আমাদের বন্দিশালায় আছে, চামড়ার হাতকড়া তাকে বদ্ধ ঘরে আটকে রেখেছে।'

এই কবিতাগুলো তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। যদি তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা সঠিক হয়ে থাকে, তবে প্রমাণিত হলো তিনি একজন কবি ছিলেন। ইসলামের সেবায় শুধু তরবারি আর সম্পদ নিযুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি; বরং জবানকেও কাজে লাগিয়েছেন। এভাবেই তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের খিদমতে নিয়োজিত করেছিলেন নিজের মানসিক শক্তি এবং বস্তুগত সামর্থ্য।

সম্ভবত তাঁর উত্তরসূরি থেকে থাকবে। অবশ্য তাদের সংখ্যা ও নামধাম সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। কারণ আমার কাছে নির্ভরযোগ্য কোনো উৎসগ্রন্থে তাদের কোনো আলোচনা পাইনি।

আব্দুল্লাহ ﷺ-এর ভাই দুজন; আবু আহমাদ আবদু, তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উসমান ﷺ-এর খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। আরেকজন হলো উবাইদুল্লাহ। যে হাবশায় গিয়েছিল এবং খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে খ্রিষ্টধর্মের ওপর মৃত্যুবরণ করে। বলা হয়, সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সাগরে ডুবে মারা যায়। আবার বলা হয়, নেশায় বুঁদ হয়ে মারা যায়। তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন

আবু সুফিয়ানের কন্যা রমলাহ ﷺ। উবাইদুল্লাহর ঘরে একটি কন্যাসন্তান জন্ম হয়। যার নাম ছিল হাবিবা, সে অনুসারে রমলাহ ﷺ-কে বলা হয় উম্মে হাবিবা। যাহোক, রামলাহ তথা উম্মে হাবিবা ﷺ ইসলামের ওপর কায়িম থাকেন। পরে তাঁকে রাসুল ﷺ বিয়ে করেন। সেটা এভাবে হয়েছিল যে, আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরি ﷺ রাসুল ﷺ-এর পত্র নিয়ে বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে যান। সে পত্রে রাসুল ﷺ বাদশাহকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন এবং সাথে এ আদেশ দেন যে, তাঁর পক্ষ হয়ে উম্মে হাবিবা ﷺ-কে বিয়ের প্রস্তাব দান করবেন। তখন উম্মে হাবিবা ﷺ হাবশায় অবস্থানরত সবচেয়ে নিকটতম ভাই সাইদ বিন আস ﷺ-কে বিয়ের দায়িত্ব দেন। সাইদ ﷺ তাঁকে রাসুল ﷺ-এর কাছে বিয়ে দিয়ে দেন।

আর আবু আহমাদ আবদু বিন জাহশ ﷺ হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি মক্কা-বিজয়ের দিন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাসুল ﷺ-এর সামনে সামনে হাঁটছিলেন আর আবৃত্তি করছিলেন :

> 'কত সুন্দর মক্কার সে উপত্যকা, যেখানে থাকত আমার পরিবার ও অর্থকড়ি।
>
> সেখানে আমার সন্তানাদি প্রতিপালিত হতো, সেখানে আমি হাঁটতাম নির্দেশনা বিহীন।'

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ হাবিবা বিনতে উম্মে হাবিবা ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ﷺ সেসব বদরি সাহাবির একজন ছিলেন, যাঁরা রাসুল ﷺ-এর ফুফু সাফিয়্যা ﷺ-এর কাছে আসা-যাওয়া করতেন। সাফিয়্যা ﷺ সম্পর্কে তাঁর খালা ছিলেন। কারণ তাঁর মা উমাইমা হলেন সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের আপন বোন।

ইসলামে সর্বপ্রথম গনিমত আসে আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ-এর বাহিনীর মাধ্যমে। কুরআনে গনিমতের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি সর্বপ্রথম রাসুল ﷺ-এর জন্য গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করেন। ইসলামে তাঁকে সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনিন নাম দেওয়া হয়।

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﵁-এর বোন হামনাহ বিনতে জাহশ ﵂ সেই অনন্য নারী, যার ভাই আব্দুল্লাহ, মামা হামজা ﵁ এবং স্বামী মুসআব বিন উমাইর ﵁ উহুদে এক সাথে শহিদ হয়েছিলেন।[১৫২] আর তিনি এতে উত্তম ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার অসংখ্য হামদ-সানা আদায় করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে এটা ইসলামের পথে আব্দুল্লাহ ﵁ ও তাঁর পরিবারের সর্বোচ্চ কুরবানি। তাঁর ত্যাগ ও কুরবানি উল্লেখ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি 'আল্লাহর জন্য কর্তিত' বলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।[১৫৩] তিনি ঘন চুলবিশিষ্ট মধ্যম গড়নের ছিলেন।[১৫৪]

তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﵁। তাঁর থেকে বর্ণনা করেন সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব। তবে ইনি সরাসরি আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে হাদিস শোনেননি।[১৫৫] তিনি জাইনাব বিনতে জাহশ ﵂-এর সূত্রে রাসুল ﷺ-এর আত্মীয় ছিলেন।

তিনি শাহাদাত বরণ করেন যৌবনের শিখরে এবং প্রৌঢ়ত্বের সূচনাতে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় রেখে যান সৌরভময় জীবনালেখ্য।

কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

তাঁর কমান্ডিংয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অনন্য বীরত্ব, বিরল সাহসিকতা এবং যুদ্ধের বিভীষিকাময় কষ্ট-ক্লেশে অতুলনীয় সহ্যক্ষমতা।

তাঁর বাহিনী ছিল প্রখ্যাত বীর মুহাজিরদের থেকে বাছাইকৃত সেরা বীরপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত। নিঃসন্দেহে তাঁরা মুহাজিরদের মাঝে গেরিলা ছিলেন। তাই তো ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাঁদের নাম লেখা আছে বীরত্ব, সাহসিকতা আর বিজয়ধারায়।

---

১৫২. আল-মুহাব্বার : ৪০২-৪০৩ পৃ.।
১৫৩. আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৮।
১৫৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯১।
১৫৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/১০৮।

আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ-এর বাহিনী গঠিত হয়েছিল মুহাজিরদের থেকে শীর্ষ বীরপুরুষদের দ্বারা। আর আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ ছিলেন সেই শীর্ষ বীরদেরও সেরা বীর। এ কারণেই তো রাসুল ﷺ তাঁকে সে বাহিনীর আমির মনোনীত করেছিলেন।

তাঁর বীরত্বের ব্যাপারে আমাদের এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আরবে আমাদের সেরা অশ্বারোহী হলো আব্দুল্লাহ বিন জাহশ।'[১৫৬]

বিরল সাহসিকতার কারণেই তিনি মূলত মুষ্ঠিমেয় সৈনিক নিয়ে ইসলামের নিরাপদ দুর্গ থেকে বহু দূরে মক্কা ও তায়িফের অভ্যন্তরীণ রোডে গিয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন।

স্বয়ং নবি ﷺ-ও নাখলায় পরিচালিত অভিযানকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে আদেশ করেছিলেন, তোমার বাহিনীর কেউ স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে তাঁকে বাধ্য করবে না। এ ব্যাপারে তাঁদের স্বাধীনতা দেবে। চাইলে তোমার সঙ্গ দেবে, অন্যথায় তিরস্কৃত হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে।

আমার জানা নেই, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ-এর বাহিনী ছাড়া অন্য কোনো বাহিনী জিহাদি কার্যক্রমের একেবারে শুরুতে এত স্বল্প-সংখ্যক সৈন্য আর সামর্থ্য নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় গিয়ে শত্রুর নাকের ডগায় হামলা করেছে কি না।

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ ছুটে গেছেন প্রচণ্ড দুঃসাহসিকতা নিয়ে। পৌঁছে গেছেন অভিযানের লক্ষ্যস্থানে। কল্পনাতীতভাবে টার্গেট সফল করেছেন সাহসিকতা আর বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার মাধ্যমে।

আর যুদ্ধের যন্ত্রণাদায়ক কষ্টের ব্যাপারে তো তিনি এক বিশাল পাহাড়। কুরাইশের ব্যাবসায়িক কাফেলা আর তার প্রহরীদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাদের বাধ্য করেছিলেন এক লাঞ্ছনাকর যুদ্ধে। এরপর যাকে হত্যা করার তাকে হত্যা করেছেন আর যাকে বন্দী করার তাকে বেঁধে এনেছেন। গনিমত আর কয়েদি নিয়ে মদিনায় ফিরেছেন বিজয়ীবেশে।

---

১৫৬. আল-মুহাব্বার : ৮৭ পৃ.।

যুদ্ধে তাঁর ধৈর্যের বিবরণ যতই দেওয়া হোক, তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ স্বয়ং রাসুল ﷺ তাঁর ধৈর্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ক্ষুধা-পিপাসায় সবার চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল।[১৫৭] আর এ সাক্ষ্যের যেকোনো মানদণ্ডেই বিশাল ওজন রয়েছে।

তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুশৃঙ্খল। আর এটি বিশেষ সৈনিক এবং বিশেষ কমান্ডারের একটি অন্যতম গুণ। তাই রাসুল ﷺ-এর পত্র পাঠ করে হৃদয়ের গভীর থেকে বলে উঠেছিলেন, 'শুনলাম এবং মানলাম।' এরপর কোনো দিকে না তাকিয়ে দায়িত্ব আদায়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি দ্রুতই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন। মুশরিকরা কোনোভাবে সাহায্য পাওয়ার আগেই তাদের ওপর হামলা করে বসেছিলেন। ফলে সন্ধ্যার আগে সকালেই তিনি তাদের পাঠ চুকেছিলেন। যেমনটা আরব প্রবাদে বলে।

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিলেন। আদেশ পাওয়ামাত্রই পালন করে ফেলতেন—সে আদেশ পালন করা তাঁর পক্ষে যত কষ্টসাধ্যই হোক না কেন।

দায়িত্ব আদায়ে ছিলেন পূর্ণ একনিষ্ঠ। দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী, সে দায়িত্ব যত ঝুঁকিপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্য হোক না কেন। ভয়ে কখনো দায়িত্ব থেকে পলায়ন করতেন না বা অন্যের ঘাড়েও চাপিয়ে দিতেন না। ছিলেন স্থিরচিত্তের অধিকারী। জয়-পরাজয় কোনো পরিস্থিতিই তাঁর মনে প্রভাব ফেলতে পারত না। কখনো ব্যক্তিস্বার্থের জন্য কাজ করতেন না। বরং ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর সাধনা।

তাঁর গতির ক্ষিপ্রতা যেন দৃষ্টিসীমাকে হার মানাত। নাখলাহ ও মদিনার এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন অবিশ্বাস্য গতিতে। যার কারণে কুরাইশরা তাদের ব্যাবসায়িক কাফেলা ও বন্দীকে মুক্ত করার কোনো সুযোগই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। অথচ কুরাইশের অবস্থানস্থল মক্কা থেকে নাখলাহর দূরত্বের চেয়ে বহুগুণে বেশি ছিল নাখলাহ থেকে মদিনার দূরত্ব।

১৫৭. আল-মুহাব্বার : ৮৮ পৃ., আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৮।

সৈনিকদের মানসিক অবস্থা ও শারীরিক সক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর ছিল পূর্ণ সচেতনতা। যেহেতু ইসলামের আগে-পরে তাঁদের সাথেই কাটিয়েছেন জীবনের সুদীর্ঘ সময়।

রাসুল ﷺ হলেন সমস্ত মুসলিমের সর্বোচ্চ কমান্ডার। সেই রাসুল ﷺ-এরই আস্থার পাত্র ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ। ফলে তাঁর ওপর সমস্ত মুসলিমের আস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনিও তাঁদের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখতেন। আর তাঁদের সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল—আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করা।

রাসুল ﷺ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সৈনিকরা তাঁকে অনেক ভালোবাসত, তিনিও তাঁদের অনেক ভালোবাসতেন। মূলত সেই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ইসলামি সমাজে তখন ভালোবাসা আর মহব্বতের এমনই জোয়ার বয়ে চলত।

তাঁর ছিল একটি প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব। পরিবেশ এবং মানুষের মাঝে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রভাব ফেলতে পারত। কিন্তু তিনি পরিবেশ ও পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হতেন না। তবে হক ও হক্কানিয়াতের বেলায় সেটা ভিন্ন ছিল। তিনি ছিলেন সেই বনু আসাদ গোত্রের প্রধান ব্যক্তিদের একজন, যে গোত্র সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আসাদ গোত্র আরবের খতিব।'[১৫৮]

তাঁর ছিল এক অনন্য যোগ্যতার সুঠাম শরীর। বরং এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উত্তম উপমা। মুসলিমদের ব্যাপক কল্যাণকর কাজে, দাওয়াত ও আমলে একনিষ্ঠতায় এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় ছিলেন সফল কার্যকর ব্যক্তি। যুদ্ধ-কৌশল ও সমরবিদ্যায় ছিলেন পূর্ণ অভিজ্ঞ। দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতেন যুদ্ধের কৌশল। সিদ্ধহস্তে সেসব কৌশল বাস্তবায়ন করতেন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং যুদ্ধের আগে ও পরে।

নিজেকে অন্য সৈনিকদের সমান মনে করতেন। বরং বিপদের বেলায় নিজেকে বাড়িয়ে দিতেন আর নিরাপত্তা ও স্বস্তির ক্ষেত্রে অধীনস্থ সৈনিকদের প্রাধান্য দিতেন।

---

১৫৮. আল-মুহাব্বার : ৮৭ পৃ.।

তাই রাসুল ﷺ যে তাঁর প্রতি বিনাবাক্যে আস্থা রাখবেন এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বিশেষ সাহাবিদের ওপর তাঁকে কমান্ডারের দায়িত্ব দেবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

তিনি ছিলেন সবার শ্রদ্ধেয় আস্থাভাজন কমান্ডার।

ইতিহাসে আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ؓ

তিনি ছিলেন সূচনালগ্নে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। ইসলামের পথে হিজরত করেন দুবার—প্রথমে হাবশায় এরপর মদিনায়। পরিচালনা করেন রাসুল ﷺ-এর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান। তাঁর সাথে ছিল রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে লিখিত বার্তা, যা ছিল সমর ইতিহাসে এই নতুন রীতির প্রথম ব্যবহার।

তিনি হলেন সেই সেনাদলের কমান্ডার, যে দল সর্বপ্রথম ইসলামে একজন মুশরিককে হত্যা করে এবং বন্দী করে দুজন মুশরিককে। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামে গনিমত লাভ করেন এবং রাসুল ﷺ-এর জন্য বণ্টন করেন গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ। অথচ তখনও সে বিষয়ে কুরআনে বিধান নাজিল হয়নি। ইসলামে তাঁকেই প্রথম আমিরুল মুমিনিন নাম দেওয়া হয়।

বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে এবং উহুদের ময়দানে। অধীর আগ্রহে শাহাদাত চাইতেন মহান আল্লাহর কাছে। ফলে সে আশা তাঁর পূর্ণ হয় উহুদের ময়দানে।

'আল্লাহর জন্য কর্তিত' হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। আদর্শের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু জীবনের জন্য আদর্শকে বলি দেননি। খেজুর গাছের মতো অবিচল দাঁড়িয়ে জীবন দিয়েছেন। শরীরের রক্ত ঝরেছে, তবু হাত থেকে তাঁর তরবারি পড়েনি।

এই মহান বীর অশ্বারোহী সাহাবির প্রতি আল্লাহ তাঁর রহমতের করুণাধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

উমাইর বিন আদি আল-খাতমি আল-আওসি ﵁

'তুমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সাহায্য করলে হে উমাইর।'

- মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

উমাইর বিন খারাশাহ বিন উমাইয়া বিন আমির বিন আব্দুল্লাহ বিন জাশাম বিন মালিক বিন আওস। আব্দুল্লাহ হলেন আওসের শাখাগোত্র খাতমাহ সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ।[১৫৯]

তিনি সূচনাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। খাতমাহ গোত্র থেকে তিনিই প্রথম ইসলামে প্রবেশ করেন। বনু খাতমাহ গোত্রে এমন দিন অতিবাহিত হয়েছে, যখন তিনি ব্যতীত সে গোত্রে কোনো মুসলিম ছিল না।[১৬০] তিনি বনু খাতমাহর মূর্তি ভাঙতেন।[১৬১] এর থেকে বোঝা যায় তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী সক্রিয়

১৫৯. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৩৪৩ পৃ.।
১৬০. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৬৯ পৃ.।
১৬১. আল-ইসতিআব : ৩/১২১৭।

মুসলিম, কোনো নিষ্ক্রিয় মুসলিম নয়, যে শুধু নিজের ব্যক্তিগত ইবাদত আর নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে—এর বাইরে ইসলামের কোনো সেবা করবে না।

তাঁর জন্মসন সম্পর্কে আমরা জানতে পারিনি। এবং ইসলামপূর্ব জীবন সম্পর্কেও বিস্তারিত তেমন কিছু জানতে পারিনি। ইসলাম গ্রহণের পরে তাঁকে কারি বলে ডাকা হতো। কুরআনের কিছু অংশ হিফজ করেছিলেন। বনু খাতমায় তিনি ইমামতি করতেন।[১৬২] তাঁর পিতা একজন কবি ছিলেন।[১৬৩]

চোখের সমস্যার কারণে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তিনি অন্ধ ছিলেন।[১৬৪] বলা হয়, তাঁর চোখ ঠিক ছিল, শুধু জ্যোতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[১৬৫] আমি এ মতটি অগ্রগণ্য মনে করি যে, তাঁর চোখ ঠিক ছিল; কিন্তু শুধু জ্যোতি কমে গিয়েছিল। কারণ তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমন কিছু দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন, যা আঞ্জাম দেওয়া একজন অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে দুষ্কর। একটু পরে আমরা তাঁর একটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করব।

তাঁর অভিযান

উমাইর ﷺ-এর অভিযান পরিচালিত হয়েছিল উমাইয়া বিন জাইদ গোত্রের মারওয়ানের মেয়ে আসমাকে লক্ষ্য করে। অষ্টম হিজরির রমাদানের শেষের দিকে। আসমা ছিল ইয়াজিদ বিন জাইদ বিন হিসনের স্ত্রী। সে ইসলামের ব্যাপারে কটু কথা বলত আর রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দিত।

সে তার নিম্নোক্ত কবিতায় ইসলাম ও মুসলিমদের শানে কটু কথা বলেছে,[১৬৬]

> 'হে বনু মালিক, বনু নাবিত ও বনু আওফের অযোগ্য উত্তরসূরিরা, হে খাজরাজের অযোগ্য বংশধরেরা,

---

১৬২. আল-ইসতিবসার : ৬৯ পৃ.।
১৬৩. আল-ইসতিআব : ৩/১২১৮।
১৬৪. আল-ইসাবাহ : ৫/৩৪।
১৬৫. আল-ইসতিবসার : ২৬৮ পৃ.।
১৬৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/২৭।

'এক অপরিচিত লোকের অনুসরণ করে বসেছ তোমরা, যে মুরাদ গোত্রেরও নয় এবং মুজহিজ গোত্রেরও নয়।

গোত্রপতিদের নিহতের পরে তাকেই আশার বস্তু বানিয়েছ, যেমন সুস্বাদু খাবারের সুস্বাদু ঝোল।

তবে জেনে রেখো, অহংকারী অসতর্কতার সুযোগ খোঁজে, এরপর আশান্বিত ব্যক্তির আশা নষ্ট করে।'

রাসুল ﷺ-এর কবি হাসসান বিন সাবিত ؓ এর জবাবে বলেন :

'ওয়াইল গোত্র, ওয়াকিফ গোত্র আর খাতমাহ গোত্র, খাজরাজ গোত্র ছাড়া।

যখনই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে, তখনই তাদের মাঝে মৃত্যু আর কান্নার রোল পড়ে গেছে।

কারণ তারা তো আত্মমর্যাদাবান যুবককে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, যে ঘরে-বাইরে সবখানেই সম্মানিত।

সে ওই মহিলাকে রক্তে লাল করে দিয়েছে, রাতের নীরবতা আসার পরে, এতে কোনো অন্যায় করেনি।'

রাসুল ﷺ-এর কাছে যখন আসমা বিনতে মারওয়ানের কথা পৌঁছল, তখন বললেন, 'কেউ কি নেই, যে আমার হয়ে মারওয়ানের মেয়ের বিষয়টি চুকিয়ে ফেলবে?' তখন উমাইর রাসুল ﷺ-এর কাছেই অবস্থান করছিলেন। রাসুল ﷺ-এর কথা শুনে তিনি ওই রাতেই মারওয়ানের মেয়ে আসমার বাড়িতে গেলেন এবং তাকে হত্যা করেন।

উমাইর ؓ সকালে রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি ওই মহিলাকে হত্যা করে এসেছি।' এটা শুনে রাসুল ﷺ বললেন, 'তবে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সাহায্য করেছ হে উমাইর।' উমাইর ؓ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তার জন্য কি আমার ওপর কোনো জরিমানা আসবে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'একটি খেজুরবিচিও আসবে না।'

উমাইর ﷺ নিজ গোত্রে ফিরে দেখতে পেলেন আসমাকে নিয়ে খাতমাহ গোত্রে শোরগোল পড়ে গেছে। সে সময় আসমার ছিল পাঁচজন সামর্থ্যবান ছেলেসন্তান। উমাইর ﷺ রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে ফিরে গিয়ে বললেন, 'হে খাতমাহ সম্প্রদায়, মারওয়ানের মেয়েকে আমি হত্যা করেছি। তোমরা সকলে মিলে আমার কিছু করতে চাইলে করো। আমাকে কোনো অবকাশ দিয়ো না।' আসমার পাঁচ ছেলে ও ভাইগণ চুপ করে থাকল। কিছুই বলার সাহস করল না। সেদিনই খাতমাহ গোত্রে প্রথম ইসলাম শক্তিশালী হয়। এর আগে সেখানে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা নিজেদের ইসলাম গোপন করে রেখেছিল। আসমাকে হত্যার দিনে খাতমাহ গোত্রের আরও কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করল।[১৬৭]

সম্ভবত আসমার ছেলেরা ও ভাইয়েরা উমাইর ﷺ-এর পক্ষ থেকে প্রতিশোধের ভয়ে চুপ ছিল। কারণ উমাইর ﷺ ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে হাতে গোনা কয়েকজন সম্মানিত লোকদের একজন।[১৬৮] আবার সেই সম্মানিত লোকদের মাঝেই ইসলামের প্রসার ঘটেছিল। বদরে বিজয় অর্জনের পরে মুসলিমদের যে মারমুখী শক্তি হাসিল হয়েছিল, সে কারণেও তারা মুসলিমদের ভয় পেয়েছিল। মোটকথা এসব কারণে বা তার কোনো একটি কারণেই তারা মুখ বন্ধ করে ছিল। এ ছাড়া তাদের কোনো কিছু করারও ছিল না।

শাহাদাত বরণ

উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে উমাইর বিন আদি ﷺ-ও ছিলেন।[১৬৯] এক বর্ণনায় আছে, তিনি রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন উমাইর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এ বর্ণনাটি নিশ্চিত নয়।[১৭০] আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি উহুদ ও তার

---

১৬৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১৩-৩১৫। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/২৭-২৮। ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৭২-১৭৪।

১৬৮. আল-মুহাব্বার : ২৯৮ পৃ.।

১৬৯. আদ-দুরার ফি ইখতিসারিল মাগাজি ওয়াস সিয়ার : ১৫৩ পৃ.।

১৭০. আল-ইসাবাহ : ৫/৩৪।

পরবর্তী যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন।[১৭১] আরেক বর্ণনামতে, চোখের সমস্যার কারণে তিনি উহুদ ও খন্দকে অংশগ্রহণ করেননি।[১৭২]

'তিনি উহুদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং উহুদেই শাহাদাত বরণ করেছেন' আমি এ বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেবো। কারণ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর যারা তাঁর শাহাদাতের বিষয়ে কলম ধরেছেন, তারা বেশি বিশ্বস্ত।

এভাবেই উমাইর ﷺ স্বীয় আকিদার কারণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। অথচ তাঁর জন্য বৈধ ছিল, তিনি কোনো তিরস্কার ছাড়াই যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে থাকা। যেহেতু চোখে দেখতেন না বা চোখের জ্যোতি কম ছিল। আর এটি শরিয়াহসম্মত ওজর, যার কারণে যুদ্ধের ময়দান থেকে পেছনে বসে থাকার সুযোগ আছে।

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

ব্যক্তি হিসেবে তাঁর জীবনের উপাখ্যান সামান্যই বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত আছে, তিনি রাসুল ﷺ-কে কটূক্তির কারণে আপন বোনকে হত্যা করেছিলেন[১৭৩]—যেমন নিজ কওমের নারী আসমাকে হত্যা করেছিলেন। খাতমাহ গোত্রের মূর্তি ভেঙেছিলেন। তাঁকে কারি বলে ডাকা হতো। রাসুল ﷺ-এর জমানায় তিনি সালাতের ইমামতি করতেন। এ সকল আমল তাঁর গভীর ইমান ও দৃঢ় আকিদা-বিশ্বাসের স্বাক্ষর বহন করে।

একবার উমাইর ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন রাসুল ﷺ তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর পাশে উপস্থিত সাহাবিদের বলেছিলেন, 'চলো, বনু ওয়াকিফে বসবাসরত (অন্তর)-দৃষ্টিসম্পন্ন লোকটির সেবাযত্ন করতে যাই।'[১৭৪]

১৭১. আল-ইসতিআব : ৩/১২১৮, আল-ইসতিবসার : ২৬৮-২৬৯ পৃ.।
১৭২. আল-ইসতিআব : ৩/১২১৮।
১৭৩. আল-ইসতিআব : ৩/১২১৭।
১৭৪. আল-ইসাবাহ : ৫/৩৪।

তাঁর থেকে তাঁর ছেলে আদি বিন উমাইর হাদিস বর্ণনা করেন।[১৭৫]

তাঁকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কমান্ডার গণ্য করার চেয়ে গেরিলা বা ফিদায়ি বলা বেশি যুক্তিযুক্ত। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আসমাকে হত্যা করা তাঁর ফিদায়ি হওয়ার দলিল। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য ঝুঁকি নেওয়ার আগ্রহ এবং দুঃসাহস, নির্ভীকতা আর বীরত্ব ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির মুজাহিদ। ইসলামকে শক্তিশালী করেছিলেন বীরত্ব, সাহসিকতা আর নির্ভীকতার মাধ্যমে। রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন অন্ধত্ব বা দুর্বল দৃষ্টিশক্তি নিয়ে। তার ওপর অর্জন করেছেন রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার মর্যাদা এবং রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য। জীবনের সমাপ্তি টেনেছেন শাহাদাতের সুধা পানের মাধ্যমে।

ইতিহাসে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলামে প্রবেশ করেন। ইসলামকে শক্তিশালী করেন ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন আসমাকে হত্যা করার মাধ্যমে। তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর আস্থা ও ভালোবাসার পাত্র। মুসলিমদের প্রথম সারির কারিদের একজন। ইসলামের সেবায় স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গী মুজাহিদ। স্বীয় আকিদার জন্য জীবনোৎসর্গী মুসলিম। অবশেষে লাভ করেন রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে শাহাদাতের মর্যাদা।

আল্লাহ এই মহান বীর সাহাবির প্রতি তাঁর রহমতের করুণাধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

---

১৭৫. আল-ইসতিবসার : ২৬৯ পৃ.।

ফিদায়ি মুজাহিদ

সালিম বিন উমাইর আল-আওসি ﷺ

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

সালিম বিন উমাইর বিন সাবিত বিন নুমান বিন উমাইয়া বিন ইমরুউল কাইস বিন সালাবা বিন আমর বিন আওফ। ইনি খাওয়াত বিন জুবাইর বিন নুমানের চাচাতো ভাই।[১৭৬]

দুর্বল বর্ণনামতে তাঁর বংশধারা এভাবে বলা হয়, সালিম বিন উমাইর বিন কুলফা বিন সালাবা বিন আমর বিন আওফ আনসারি আওফি আমরি আল-আওসি।

তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী আনসারদের একজন। আকাবার বাইআতে উপস্থিত ছিলেন।[১৭৭] বদর, উহুদ ও খন্দকসহ রাসুল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[১৭৮]

এক আওফি বলে বোঝানো হয়, আমর বিন আওফের বংশধর। আরেক আওফি বলে বোঝানো হয় আওফ বিন মালিক বিন আওসের বংশধর। সালিম ﷺ ছিলেন আমর বিন আওফ বংশের।

১৭৬. উসদুল গাবাহ : ২/২৪৮।

১৭৭. উসদুল গাবাহ : ২/২৪৯, আল-ইসাবাহ : ৩/৫৫।

১৭৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৮০, আল-ইসতিআব : ২/৫৬৭, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৮০, আল-ইসতিআব : ২/৫৬৭।

সালিম ﷺ হলেন সে পুণ্যাত্মাদের একজন, যাঁরা তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাসুল ﷺ-এর কাছে অশ্রুসজলে এসে বলেছিলেন, 'আমাদের বাহনের ব্যবস্থা করুন না!' আর রাসুল ﷺ বলেছিলেন, 'আমার কাছে এমন কিছু নেই যে, তোমাদের তাতে আরোহণ করাব।' তখন তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে এ দুঃখে ফিরে গিয়েছিল যে, আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য কিছুই পাচ্ছে না।[১৭৯] তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সাতজন। আমর বিন আওফ গোত্র থেকে সালিম বিন উমাইর ﷺ। ওয়াকিফ গোত্র থেকে হারামিউ বিন আমর ﷺ। হারিসা গোত্র থেকে উলবা বিন জাইদ ﷺ। মাজিন বিন নাজ্জার গোত্র থেকে আবু লাইলা আব্দুর রহমান বিন কাব ﷺ। সালিমা গোত্র থেকে আমর বিন উতবা ﷺ। জুরাইক গোত্র থেকে সালামা বিন সাখর ﷺ। এবং সুলাইম গোত্র থেকে ইরবাজ বিন সারিয়া আস-সুলামি ﷺ।[১৮০] এঁদের শানেই অবতীর্ণ হয় আল্লাহর এ বাণী :

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ

'আর তাদের ওপরও কোনো অভিযোগ নেই, যারা আপনার কাছে এসেছে; যেন আপনি তাদের বাহন দান করেন। তখন আপনি বলেছেন, "আমার কাছে এমন কোনো বস্তু নেই, যার ওপর আমি তোমাদের আরোহণ করাব।" ফলে তারা অশ্রু ফেলতে ফেলতে এ দুঃখে ফিরে গেল যে, তাদের এমন কোনো বস্তু নেই, যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে।'[১৮১]

বনু কুরাইজা যুদ্ধে তিনি এক ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন।[১৮২] তিনি মৃত্যুবরণ করেন মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতকালে।[১৮৩] তাঁর পরে তাঁর বংশধারা বাকি ছিল।[১৮৪]

---

১৭৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৮০।

১৮০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৯৩-৯৯৪ এবং ৩/১০২৪, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/১৭২, আল-মুহাব্বার : ২৮১ পৃ., আদ-দুরার : ২৫৪ পৃ.।

১৮১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৯২।

১৮২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫১৬।

১৮৩. আল-ইসতিআব : ২/৫৬৭, উসদুল গাবাহ : ২/২৪৯, আল-ইসাবাহ : ৩/৫৫।

১৮৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৮০।

সম্ভবত সালিম ﷺ-এর প্রধান কর্ম হচ্ছে, বনু আমর বিন আওফের সদস্য আবু আফাক নামক এক কাফিরকে হত্যা করা।[১৮৫] আবু আফাকের নিফাক প্রকাশ পেয়েছিল ওই সময়, যখন রাসুল ﷺ হারিস বিন সুওয়াইদ বিন সামিতকে হত্যা করেছিলেন।

তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'কে এই খবিসটার পাওনা মিটিয়ে দেবে?'[১৮৬]

আবু আফাক অনেক বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তার বয়স হয়েছিল ১২০ বছর। রাসুল ﷺ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন সে রাসুল ﷺ-এর প্রতি দুশমনির জন্য মানুষকে উৎসাহ দিতে লাগল। রাসুল ﷺ যখন বদরে গেলেন এবং সেখান থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন, তখন সে হিংসা করতে লাগল। রাসুল ﷺ ও মুসলিমদের নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা বানাল।[১৮৭]

সালিম ﷺ বললেন, 'আমি নিজের ওপর আবশ্যক করে নিলাম যে, হয় তাকে হত্যা করব, না হয় আমি শেষ হয়ে যাব।'

এরপর তিনি একটু সময় নিলেন। একটা সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। গ্রীষ্মকালে আবু আফাক ঘুমাত আমর বিন আওফ গোত্রে কাছারির প্রাঙ্গণে। গ্রীষ্মের কালো রাতের অন্ধকার সবকিছুকে ছেয়ে নিল। রাতের মৃদু বাতাসে আবু আফাক হারিয়ে গেল গভীর ঘুমে। সালিম ﷺ সেদিকে এগিয়ে গেলেন সন্তর্পণে। এরপর হাতের তরবারি ঢুকিয়ে দিলেন আবু আফাকের বুকের ভেতরে। আরেকটু চাপ দিলেন তরবারির হাতলে। তরবারি গিয়ে আঘাত করল বিছানাপৃষ্ঠে।

আবু আফাক আর্তনাদ করে উঠল। তার অনুসারীরা তার দিকে ছুটে গেল। ততক্ষণে সালিম ﷺ অপারেশন শেষ করে নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন। ধরাধরি করে আবু আফাকের লাশ বাড়িতে নেওয়া হলো। এরপর কবরস্থ করা হলো। তার অনুসারীরা বলাবলি করল, 'যদি জানতে পারতাম, তাকে কে হত্যা করল,

১৮৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১২।
১৮৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১৩।
১৮৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৭৪-১৭৫।

তবে যেকোনো মূল্যে আমরাও তাকে হত্যা করতাম।' এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে উমামাহ মুজাইরিয়া কবিতা আবৃত্তি করেন :

'তুমি আল্লাহর দ্বীন আর মহামানব আহমাদকে মিথ্যা বলো! ওই সত্তার শপথ, যে তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে।

আঘাত হানতে নিকষ আঁধার তোমার উদ্দেশে হামাগুড়ি দিয়েছিল, এই নাও আবু আফাক, বৃদ্ধ বয়সে।

যদি তোমার হন্তারককে জানতাম, যে তোমাকে রাতের কালো চাদরে ঘুম পাড়িয়েছে, সে মানুষ নাকি জিন!?'

আবু আফাককে হত্যা করা হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে।[১৮৮]

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

সালিম ﵁-এর জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারিনি। এবং অন্যান্য মানুষের মতো তাঁর সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কেও আমরা তেমন একটা জানতে পারিনি।

ইসলামি বিজয়াভিযানের জিহাদি ধারায় তাঁর কোনো কর্মতৎপরতা আমাদের জানা সম্ভব হয়নি। অথচ জিহাদ থেকে তিনি পিছিয়ে থাকবেন, সেটা কল্পনাও করা যায় না।

তবে আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

আর তাঁর নেতৃত্ব, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল ইসলাম ও মুসলিমদের এক দুশমনকে হত্যা করতে। তিনি তাঁর টার্গেটে সফল হয়েছেন। এর মাধ্যমে

১৮৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৭৪-১৭৫, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১২-৩১৩, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/২৮।

আবু আফাকের মতো অন্যদের জন্য উপযুক্ত উপমা দাঁড় করিয়েছিলেন। যা কখনো ভোলার মতো নয়।

নিঃসন্দেহে তিনি ফিদায়ি মুজাহিদ ছিলেন। আকিদার প্রতি তাঁর আত্মমর্যাদাবোধই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আবু আফাককে হত্যা করতে।

ইতিহাসে সালিম ﵁

সালিম ﵁ ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আনসারিদের একজন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন হিজরতের পূর্বে আকাবার বাইআতে। রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে বদরসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আপন বোনকে হত্যা করেছিলেন তিনি। কারণ সে রাসুল ﷺ-এর শানে এমন কথা বলেছিল, যা সালিম ﵁-এর মতো একজন সত্যনিষ্ঠ মুসলিমের পছন্দ হয়নি।

তিনি সেসব ক্রন্দনকারী পুণ্যাত্মাদের একজন ছিলেন, যাঁদের শানে অবতীর্ণ হয়েছিল মহান আল্লাহর বাণী। যা ইখলাসের চূড়ান্ত উপমা হিসেবে পঠিত হতে থাকবে কিয়ামত অবধি।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির প্রতি তাঁর অসংখ্য অগণিত রহমত বর্ষণ করুন। আমিন।

আল্লাহর নবির ঘোড়সওয়ার[১৮৯]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল-আওসি আল-আনসারি ﵁

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা বিন সালামা বিন খালিদ বিন আদি বিন মাজদাআহ বিন হারিসা বিন হারিস বিন খাজরাজ বিন আমর। এই আমর হলেন নাবিত বিন মালিক বিন আওস।[১৯০] যিনি আওসের শাখা গোত্র আব্দুল আশহালের মিত্র।[১৯১]

তাঁর মাতার নাম উম্মে সাহল। আসল নাম খুলাইদা বিনতে আবু উবাইদ বিন ওয়াহাব বিন লাওজান বিন আবদে উদ্দা বিন জাইদ বিন সালাবা বিন খাজরাজ বিন সায়িদা বিন কাব। ইনি খাজরাজ গোত্রের লোক।[১৯২]

তাঁর উপনাম, আবু আব্দুর রহমান। বলা হয় তাঁর উপনাম আবু আব্দুল্লাহ।[১৯৩] সম্ভবত তাঁর বড় ছেলের নামে তাঁকে আবু আব্দুর রহমান বলে ডাকা হতো।

---

১৮৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৫।

১৯০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৩, আল-ইসতিআব : ৩/১৩৭৭, উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩০।

১৯১. আল-ইসাবাহ : ৬/৬৩, উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩০, আল-ইসতিবসার : ২০৫ পৃ., জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৩৩৯ পৃ.।

১৯২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৩।

১৯৩. আল-ইসতিআব : ৩/১৩৭৭, উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩০, তাহজিবুত তাহজিব : ৯/৪৫৪।

আব্দুর রহমান মৃত্যুবরণ করার পর তাঁকে আবু আব্দুল্লাহ বলে ডাকা হয়। এটা আরবের প্রাচীন যুগ থেকে আসা একটি রীতি, বড় ছেলের নামে তাদের উপনাম রাখা হয়। বড় ছেলে মারা গেলে তার পরের ছেলের নামে উপনাম রাখা হয়।

মুহাম্মাদ ﷺ মদিনায় মুসআব বিন উমাইর ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৯৪] উসাইদ বিন হুজাইর ও সাদ বিন মুআজ ﷺ-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৯৫] জাহিলি যুগেই তাঁর নাম মুহাম্মাদ রাখা হয়।[১৯৬] তখন হাতে গোনা কয়েকজন লোকের নাম মুহাম্মাদ ছিল। সে সময় মানুষের মাঝে এ নামের কিছুটা প্রসার ঘটেছিল। কারণ তখন মানুষের মাঝে এটা আলোচনা হচ্ছিল যে, আরবে একজন নবির আবির্ভাব ঘটবে, যার নাম হবে মুহাম্মাদ। আবার পূর্বের ধর্মানুসারীদের মাঝে আলোচনা হচ্ছিল, অতি সত্বর সে আরবে নবির আগমন হবে। এভাবে তখন তাঁর ও সেখানের অধিবাসীদের মধ্যে নতুন ধর্ম গ্রহণের একটা প্লাটফর্ম তৈরি হয়েছিল।

রাসুল ﷺ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও মুহাম্মাদ বিন মাসালামা ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন।[১৯৭]

জিহাদের কার্যক্রম শুরু হলো; একদিকে ছিল মুসলিম বাহিনী ও আরেক দিকে কুফফার বাহিনী। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বসে থাকলেন না, যোগ দিলেন জিহাদের কার্যক্রমে। বদরসহ সকল রণাঙ্গনে শরিক হলেন রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে।[১৯৮] শুধু তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। কারণ তখন রাসুল ﷺ তাঁকে মদিনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন।[১৯৯] সশরীরে যেতে না

---

১৯৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৩।
১৯৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৩, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২৮।
১৯৬. আল-ইসাবাহ : ৬/৬৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৫৩৮।
১৯৭. আল-মুহাব্বার : ৭৫ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/২২৪ এবং ১/২৭১।
১৯৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩৩৩, উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩০, আল-ইসতিআব : ৩/১৩৭৭, আল-ইসতিবসার : ২৪১ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ১২৪ পৃ.।
১৯৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৬৮, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৯৫।

পারলেও সম্পদ দিয়ে অংশ নিয়েছিলেন এ যুদ্ধে।[২০০] সাধ্যের ভেতরে যতটুকু পারলেন তা নিয়ে রাসুল ﷺ-এর সামনে হাজির হলেন। সামনেই আমরা অন্যান্য যুদ্ধ ও অভিযানে তাঁর অবদান ও ত্যাগের কথা সবিস্তারে আলোকপাত করব।

যুদ্ধের ময়দানে

১- মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বনু কাইনুকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হয়তো এ যুদ্ধে তিনি বীরবিক্রমে লড়াই করেছিলেন। এ কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে সম্মাননা হিসেবে একটি বর্ম উপহার দিয়েছিলেন।[২০১] যেমন তাদেরকে উৎখাত এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[২০২]

২- উহুদ যুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল গৌরবান্বিত। রাসুল ﷺ তাঁকে ৫০ জন সৈন্য দিয়ে প্রহরার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ঘুরে ঘুরে মুসলিম বাহিনীর পাহারাদারি করেছেন।[২০৩] সেদিন যখন লোকেরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছিল, তখন তিনি তাঁদের সাথে ছিলেন, যাঁরা অটল থেকে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।[২০৪] রাসুল ﷺ ১৪ জন সাহাবিকে নিয়ে ময়দানে অটল-অবিচল ছিলেন। সাতজন মুহাজির আর সাতজন আনসার। আনসার সাতজনের মধ্যে একজন ছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ।[২০৫] তিনি বলেন, 'আমার দুই কান শুনেছে, আমার দুই চোখ দেখেছে, সেদিন রাসুল ﷺ বললেন, "হে অমুক, আমার কাছে আসো। আমার কাছে আসো। আমি আল্লাহর রাসুল।" কারও চোখ-কান সেদিকে পড়তেই তাঁর কাছে ছুটে যেত।'[২০৬] সেটা একেবারে সর্বোচ্চ সংকটপূর্ণ অবস্থান ছিল।

উহুদের ময়দান থেকে ফিরে আসার পর মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ নারীদের সাথে পানির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। উহুদে আহতদের সেবা করার জন্য

২০০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৯১।
২০১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৭৯, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩০৯।
২০২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৭৮।
২০৩. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩১৫।
২০৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৩।
২০৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৪০।
২০৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৩৭।

১৪ জন নারী এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাসুল ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা ﷺ-ও ছিলেন। তাঁরা পিঠে করে আহতদের কাছে খাবার ও পানি নিয়ে যেতেন। তাদের চিকিৎসা করতেন।[২০৭] মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর তৎপরতা যুদ্ধের মধ্যেই সীমিত ছিল না। বরং তাঁর কর্মচাঞ্চল্য পরিচালনার কাজেও বিস্তার লাভ করেছিল। যেসব কাজ মুসলিম নারীরা আঞ্জাম দিচ্ছিল, সেসব কাজের তিনি দেখাশুনা করেছেন। যখন তাদের কাছে পানি পাননি, তখন পানির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। কারণ তখন রাসুল ﷺ-এর খুব পিপাসা পেয়েছিল। তাই তিনি একটি পানপাত্র নিয়ে উপত্যকার দিকে গেলেন এবং সেখানে পাথরের একটি ছোট গর্ত থেকে পানি ভরলেন। এরপর রাসুল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলে তিনি সেই সুপেয় পানি পান করে তাঁর জন্য কল্যাণের দুআ করেন।[২০৮]

৩- বনু নাজির যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল রাসুল ﷺ-এর সাথে ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা। সেদিন রাসুল ﷺ ইহুদিদের কাছে গিয়েছিলেন দুজন লোকের ফিদইয়া আদায়ে সহযোগিতা নেওয়ার জন্য। যাদেরকে মূলত একজন মুসলিম হত্যা করেছিল। রাসুল ﷺ মদিনায় ফিরে এলেন, সাথে সাহাবিগণও ফিরে এলেন। আবু বকর ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি উঠে চলে এসেছেন আমরা বুঝতেও পারিনি। রাসুল ﷺ বললেন, 'ইহুদিরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছা করেছিল।' মদিনায় এসেই রাসুল ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর কাছে খবর পাঠালেন।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ হাজির হলে রাসুল ﷺ বললেন, 'বনু নাজিরের ইহুদিদের কাছে গিয়ে বলো, "রাসুল ﷺ আমাকে এই বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর দেশ থেকে বের হয়ে যাবে।"'

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ এসে ইহুদিদের বললেন, 'রাসুল ﷺ আমাকে তোমাদের কাছে এ কথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন, "আমি তোমাদের সাথে যে চুক্তি করেছিলাম, তা তোমরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভঙ্গ করেছ। তোমরা আমার দেশ থেকে বের হয়ে যাবে। এর জন্য আমি তোমাদের ১০ দিন সময় দিলাম। এর পরে যাকে পাওয়া যাবে, তার মাথা নামিয়ে দেওয়া হবে।"

২০৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৪৯।
২০৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৫০।

ইহুদিরা বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আমরা মনে করতাম না, আওস গোত্রের কোনো লোক আমাদের কাছে এমন বার্তা নিয়ে আসবে।'[২০৯] এটা বলার কারণ হলো, আওস গোত্র বনু নাজির গোত্রের মিত্র ছিল।

বনু নাজিরকে রাসুল ﷺ ১৫ দিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাদের বের করা এবং তাদের সম্পদ ও অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার দায়িত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ।[২১০]

বনু নাজিরকে বিতাড়িত হওয়ার বার্তা পৌঁছে দেওয়া, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া এবং তাদের ধনসম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার দায়িত্ব মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে এ জন্যই দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ছিলেন আওস গোত্রের। আর আওস গোত্র ছিল বনু নাজির গোত্রের মিত্র। এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ প্রমাণ করেছেন, তাঁর বন্ধুত্ব কেবল ইসলামের জন্য হবে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো কারণে হবে না; যদিও সে তাঁর মিত্র বা নিকটতম আত্মীয় হোক। এর মাধ্যমে জাহিলিয়াতের অন্ধ অনুকরণের স্থানে ইসলামের আদর্শ স্থান করে নিয়েছিল। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ যা করেছেন, তা ছিল মূলত জাহিলিয়াতের অনুকরণ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন ইসলামি আদর্শের ওপর খাঁটি ইমানের কার্যত পরীক্ষা।

৪- দুমাতুল জানদালের[২১১] যুদ্ধে মুশরিকরা বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। রাসুল ﷺ তাদের চারণক্ষেত্রে অবতরণ করে দেখতে পেলেন, সেখানে তাদের কেউ নেই। সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে বিভিন্ন দিকে অভিযান প্রেরণ করেন। তারা একদিন একরাত সময় ধরে রাসুল ﷺ থেকে দূরে থাকে। এরপর সকলে ফিরে আসে। তাদের কেউই কিছু করতে পারেনি। শুধু মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ একজনকে ধরে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে পেশ করেন। রাসুল ﷺ শত্রুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে দিল, 'তারা তখনই পালিয়ে গেছে, যখন

---

২০৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৬৬-৩৬৭।

২১০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৭৪ এবং ১/৩৭৭।

২১১. দামেশক থেকে সাত মানজিল দূরে অবস্থিত দুর্গের নাম দুমাতুল জানদাল। মদিনা ও সিরিয়ার মাঝে তায়ি পাহাড়ের কাছে একটি দুর্গ এবং কয়েকটি গ্রামের আবাস। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৪/১০৬।

শুনতে পেয়েছে, আপনি তাদের গবাদি পশু নিয়ে নিয়েছেন।' রাসুল ﷺ লোকটির সামনে কয়েক দিন ধরে ইসলাম পেশ করলেন। এরপর লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে। আর রাসুল ﷺ মদিনায় ফিরে আসেন।[২১২]

৫- মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২১৩] এক রাতে খালিদ বিন ওয়ালিদ ১০০ অশ্বারোহী নিয়ে এগিয়ে আসে। তারা এসে রাসুল ﷺ-এর তাঁবুর বরাবর অবস্থান নেয়। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ তখন মুসলিমদের প্রহরী বাহিনীর প্রধান আব্বাদ বিন বিশর ﷺ-কে সতর্ক করেন। এরপর খালিদ তিনজন সৈনিক সাথে নিয়ে আরও সামনে আগ্রসর হয়। খালিদ বলে, 'এটা হলো মুহাম্মাদের তাঁবু। তির মারো, তির মারো।' তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ তাদের মোকাবিলা করেন। এরপর তিনি ও তাঁর সাথের সৈনিকেরা খন্দকের পার্শ্বে অবস্থান নেন। খন্দকের অপর পার্শ্বে অবস্থান নেয় খালিদ বিন ওয়ালিদ। তাঁরা বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করে খালিদের বাহিনীকে সেখান থেকে ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দেন।[২১৪] মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ উল্লেখ করেন, 'তিনি একদল মুসলিমের সাথে রাসুল ﷺ-এর তাঁবু পাহারা দিচ্ছিলেন। এমন সময় দেখা গেল হঠাৎ কিছু অশ্বারোহী সালআ[২১৫] পাহাড়ে উঠে পড়েছে। আব্বাদ বিন বিশর ﷺ তাদের দেখে মুসলিম বাহিনীকে সতর্ক করেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ ব্যাপারটি অশ্বারোহী বাহিনীকে জানাতে যান। তখন আব্বাদ ﷺ রাসুল ﷺ-এর তাঁবুর দরজায় খোলা তরবারি নিয়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর অপেক্ষা করতে থাকেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বলেন, 'খন্দকে আমাদের রাত দিনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ স্বস্তি দান করেন।'[২১৬] তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, কুরাইশের আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কায় এবং রাসুল ﷺ ও মুসলিমদের হিফাজতের তাড়নায় তাঁরা সারা রাত প্রহরা দিয়ে কাটিয়েছেন।

---

২১২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৪০৩-৪০৪।
২১৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৩।
২১৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৬৭-৪৬৮।
২১৫. মদিনা ও উহুদ পাহাড়ের মাঝে এবং মদিনা নিকটবর্তী পাহাড়ের নাম সালআ। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৫/১০৭।
২১৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৬৮।

৬- বনু কুরাইজার যুদ্ধে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিলেন।[২১৭] তিনি উল্লেখ করেন, মুসলিম বাহিনী ইহুদিদের ফজরের আগে অবরোধ করে। দুর্গের কাছে গিয়ে থেমে থেমে বর্শা আর তির নিক্ষেপ করতে থাকে। অবরোধ চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাসুল ﷺ মুসলিম বাহিনীকে ধৈর্য ও যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। মুসলিম বাহিনী দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে রাত যাপন করল। ইহুদিরা যুদ্ধ ছেড়ে রাসুল ﷺ-এর সাথে আলোচনার আবেদন করল। রাসুল ﷺ আলোচনায় সম্মত হলেন। তারা নাব্বাশ বিন কায়িসকে পাঠাল। সে রাসুল ﷺ-কে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, বনু নাজির যে শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে, আমরাও সেই শর্তে আত্মসমর্পণ করতে চাই। আমরা আমাদের পরিবার-পরিজন আর জীবন নিয়ে তোমাদের দেশ থেকে বের হতে চাই। বিনিময়ে আমাদের ধন-সম্পদ ও অস্ত্র তোমরা নিয়ে নেবে। শুধু উটের পিঠে যতটুকু সামানা নেওয়া যায়, ততটুকুই নিয়ে যাব।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'এ হতে পারে না, আমার হুকুমে তোমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে।'[২১৮]

অবরোধ আরও জোরদার হলো। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ রাসুল ﷺ-এর পাহারাদারির দায়িত্বে ছিলেন। প্রহরীদের কাছ দিয়ে আমর বিন সুদা যাচ্ছিল। সে ইহুদিদের চুক্তি ভঙ্গের পক্ষে ছিল না। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বললেন, 'তুমি কে?' সে বলল, 'আমর বিন সুদা।' মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বললেন, 'আল্লাহ যেন আমাকে সম্মানী লোকদের ভুলত্রুটি এড়িয়ে যাওয়ার তাওফিক দেন।' এরপর তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। আমর বিন সুদা সোজা মসজিদে নববিতে চলে গেলেন। সেখানে রাত্রি যাপন করে সকালে কোথায় চলে গেছেন, সে খবর এখন পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। তার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসুল ﷺ বলেন, 'সে এমন লোক, যাকে আল্লাহ আনুগত্যের কারণে মুক্তি দিয়েছেন।'[২১৯]

অবরোধের কারণে যখন ইহুদিরা চরম সংকটে পড়ে গেল, তখন রাসুল ﷺ-এর ফায়সালার ভিত্তিতে অবতরণ করল। অতঃপর রাসুল ﷺ তাদেরকে বন্দী করার

---

২১৭. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অশ্বারোহী এবং অন্যান্য সৈনিকদের নাম জানতে ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি দেখুন, ২/৪৯৮।

২১৮. বিস্তারিত দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫০১-৫০৩।

২১৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫০৪, আদ-দুরার : ১৯১ পৃ.।

নির্দেশ দিলেন। তাদের পিঠমোড়া করে বাঁধা হলো। এ কাজের দায়িত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ।[২২০]

সে পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ এক পার্শ্বে গিয়ে বসে পড়লেন। আওস গোত্র রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, এদের মিত্র আমরা, খাজরাজ গোত্র নয়। আর অতীতে বনু কাইনুকার কী পরিস্থিতি করেছিলেন, তা আমাদের ভালোভাবে জানা আছে। তারা ছিল বিন উবাইয়ের মিত্র। তার কথায় আপনি বর্মহীন ৪০০ আর বর্ম পরিহিত ৪০০ লোকের মুক্তি দিয়েছিলেন। আমাদের মিত্ররা তো চুক্তিভঙ্গের কারণে অনুতপ্ত হয়েছে। তাই আমাদের জন্যও তাদের ব্যাপারে সুযোগ দান করুন।" রাসুল ﷺ চুপ ছিলেন, কোনো কথা বলছিলেন না। একপর্যায়ে আওস গোত্র অনেক পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, "তোমরা কি এতে রাজি হবে, তাদের বিচারটা তোমাদেরই একজনের কাছে ন্যস্ত করা হবে।" তারা বলল, "অবশ্যই রাজি হব।" রাসুল ﷺ বললেন, "তাদের ফায়সালা সাদ বিন মুআজের কাছে ন্যস্ত করা হলো।" তখন সাদ ﷺ মসজিদে নববিতে আহত অবস্থায় চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

সাদ ﷺ এসে পৌঁছলে আওস গোত্র তাঁর কাছে ভিড় জমাল। তারা বলল, "সাদের এখন সুযোগ এসেছে, আল্লাহর জন্য সে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার তোয়াক্কা করবে না।" সাদ ﷺ রাসুল ﷺ-এর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, "আমি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করছি, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে এবং ধন-সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা হবে।" তখন রাসুল ﷺ বলে উঠলেন, "তুমি সেই ফায়সালাই করেছ, যে ফায়সালা মহান আল্লাহ সাত আসমানের ওপর থেকে করেছেন।"[২২১]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ সেদিন এক নারী ও তার দুই ছেলেসহ মোট তিনজন দাস ক্রয় করেছিলেন ৪৫ দিনারের বিনিময়ে। এ অর্থ তাঁর ও তাঁর ঘোড়ার অংশ হিসেবে এসেছিল। সেদিন রাসুল ﷺ ঘোড়সওয়ারির জন্য তিনটি অংশ নির্ধারণ করেছিলেন, সওয়ারির এক অংশ আর ঘোড়ার দুই অংশ।[২২২]

---

২২০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫১০।
২২১. শারহু আবি জার : ৩০৬ পৃ.। বিস্তারিত দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫১০-৫২৫।
২২২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫২৪।

৭- হুদাইবিয়ার যুদ্ধে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ অগ্রগামী অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিলেন।[২২৩] ২০ জন সৈনিকের এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আব্বাদ বিন বিশর ﷺ।[২২৪]

হুদাইবিয়ায় রাসুল ﷺ সাহাবিদের রাতে পাহারাদারি করতে বলেছিলেন। ফলে তিনজন সাহাবি পালাক্রমে সারা রাত পাহারাদারি করেন। তাঁদের একজন ছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ। এক রাতে রাসুল ﷺ-এর অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ। উসমান ﷺ তখনও মক্কায় অবস্থান করছেন। আরেক রাতে কুরাইশরা ৫০ জন লোককে পাঠায়। উদ্দেশ্য ছিল তারা রাসুল ﷺ-এর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে কাউকে বন্দী করবে অথবা কোনো অসতর্কতাকে কাজে লাগাবে। কিন্তু মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ ও তাঁর সাথিরা তাদের ধরে ফেলেন। তাদের আটক করে রাসুল ﷺ-এর সামনে হাজির করেন। উসমান ﷺ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করে কুরাইশকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। সে সময়ে কিছু মুসলিম রাসুল ﷺ-এর কাছে অনুমতি নিয়ে মক্কায় পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। রাসুল ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, উসমান ﷺ ও তাঁর সাথিদের শহিদ করা হয়েছে। তখনই রাসুল ﷺ গাছতলায় বসে সাহাবিদের কাছে মৃত্যুর ওপর বাইআত নেন। অপরদিকে কুরাইশরা জানতে পারল, তাদের লোকদের আটক করে রাখা হয়েছে। তখন তারা রাসুল ﷺ-এর কাছে একদল লোক পাঠাল।

এরপর মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে সন্ধি স্থাপন হলো। সেদিন সন্ধিচুক্তির সময় একদল সাহাবির সাথে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-ও উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক, উমর বিন খাত্তাব, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, উসমান বিন আফফান, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﷺ প্রমুখ সাহাবি।[২২৫]

---

২২৩. হুদাইবিয়া, মক্কা থেকে নয় মাইল দূরে একটি ছোট গ্রামের নাম হুদাইবিয়া। দেখুন, শারহুজ জারকানি আলা মাওয়াবিল লাদানিয়্যা : ২/২১৬।

২২৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৭৪।

২২৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬১২, আনসাবুল আশরাফ : ২/৩৫০।

৮- মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ খাইবার[২২৬] যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সে যুদ্ধে রাসুল ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন, 'শত্রুর দুর্গ থেকে দূরে কোথাও আমাদের জন্য একটি নিরাপদ জায়গার সন্ধান করো, যেখানে আমরা নিরাপদে রাত যাপন করতে পারব।' মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ নিরাপদ জায়গার সন্ধানে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে রাজি নামক স্থান পর্যন্ত চলে গেলেন।[২২৭] ফিরে এসে রাসুল ﷺ-কে সংবাদ জানালেন, 'জায়গা পাওয়া গেছে।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ বরকত দান করুন।' সন্ধ্যা হলে রাসুল ﷺ রাজির উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন এবং সাহাবিদেরও নির্দেশ দিলেন।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ খাইবারের অন্যতম দুর্গ নাতাতের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত খেজুর গাছ কর্তনের কাজে অংশগ্রহণ করেন। কাবিস খেজুরের ছোট ছোট গাছের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, 'আমি এই ছোট ছোট গাছগুলো কাটছিলাম, এমন সময় শুনতে পেলাম, বিলাল ﷺ রাসুল ﷺ-এর এক ঘোষণা দিচ্ছেন, "আর যেন গাছ কাটা না হয়।" ঘোষণা শুনে আমরা বিরত হলাম।'[২২৮]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর ভাই মাহমুদ বিন মাসলামা ﷺ-ও খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে দিনটি ছিল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের দিন। সেদিন রাসুল ﷺ প্রথম নাতাত দুর্গবাসীর সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। মাহমুদ বিন মাসলামা ﷺ গরমের কারণে অস্থির হয়ে পড়লেন। একটু ছায়া পাওয়ার আশায় নাইম দুর্গের নিচে বসলেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, সেখানে একজন যোদ্ধা আছে। ধারণা করেছিলেন সেটা একটি মালসামানা রাখার ঘর হবে। নাইম ছিল ইহুদির কয়েকটি দুর্গের একটি। মারহাব নামক এক ইহুদি ওই দুর্গের ওপর থেকে জাঁতাকলের একটি চাকা ফেলে দেয়। চাকাটি এসে মাহমুদ বিন মাসলামা ﷺ-এর মাথায় পড়ে। আর তিনি এতেই শাহাদাত বরণ করেন।[২২৯]

---

২২৬. খাইবার মদিনা থেকে সিরিয়ার পথে ১৬ মানজিল দূরে অবস্থিত। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/৪৯৫।

২২৭. রাজি-খাইবারের নিকট একটি উপত্যকার নাম। দেখুন, ওয়াফাউল ওয়াফা : ২/৩১৫।

২২৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৪৫।

২২৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৪৫।

মারহাব অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দুর্গ থেকে বের হয়ে দাম্ভিকতার সাথে বলতে লাগল :

'পুরো খাইবার অঞ্চল জানে, আমি মারহাব কেমন, সম্পূর্ণ সশস্ত্র, বীর, যুদ্ধের অভিজ্ঞ।

কখনো বিদ্ধ করি কখনো করি আঘাত, আমার আক্রমণে সরে পড়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষকও।'

এরপর সে বলতে লাগল, 'কে আছে, আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়াবে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'কে আছ, এর মোকাবিলা করবে?' মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বললেন, 'আমি হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর শপথ, আমি হচ্ছি ধনুকের টানটান তার। কারণ আমার ভাই গতকাল শহিদ হয়েছে।' রাসুল ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে যাও। হে আল্লাহ, তাঁকে সাহায্য করুন।' যখন পরস্পর কাছাকাছি হলো, তখন তাদের মাঝে একটি বহু বয়সি আঠালো গাছ প্রতিবন্ধক হলো। উভয়ে একে অপরের থেকে গাছের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করছিল। যখনই কেউ আঘাত করছিল, তখনই তা গিয়ে গাছে পড়ছিল। একসময় উভয়ে আড়াল ছেড়ে সামনাসামনি হলো। আর গাছটি যেন তাদের পাশে একজন মানুষের মতো করে দাঁড়িয়ে থাকল। এরপর মারহাব আঘাত করল। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। মারহাবের তরবারি গিয়ে পড়ল আঠালো গাছের ডালে। এবং তরবারি গাছে শক্ত করে আটকে গেল। এবার মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ আঘাত হানলেন। আঘাত সফল হলো। ইহুদি মারা পড়ল।[২৩০]

তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, যার ওপর অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও জীবনীকার একমত যে, আলি বিন আবি তালিব ﷺ মারহাবকে হত্যা করেছিলেন।[২৩১]

তারপর বের হয়ে আসলো উসাইর নামক এক ইহুদি। সে বড় মজবুত গড়নের লোক ছিল। তবে একটু বেঁটে ছিল। সে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, 'কে আছে, আমার সাথে যুদ্ধে জড়াবে?' তার মোকাবিলায় মুহাম্মাদ বিন মাসলামা

---

২৩০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩৮৩। দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৫৪-৬৫৭, আদ-দুরার : ২১১-২১২।

২৩১. আল-ইসতিআব : ৩/১৩৭৭, উসদুল গাবাহ : ৪/৫৩৩।

ﷺ বের হলেন। উভয়ের সাথে পালটাপালটি আঘাত চলতে থাকল। একপর্যায়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ তার ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানলেন এবং তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।[২৩২]

ইহুদিরা দুর্গ থেকে মুসলিমদের ওপর তির-বর্শা নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল। এমনকি রাসুল ﷺ-কেও তারা হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। যাঁরা রাসুল ﷺ-এর প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-ও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বলেন, 'যারা ঢাল হয়ে রাসুল ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন, আমিও তাঁদের একজন ছিলাম। সাথিদের চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলাম, "আপনারা তির নিক্ষেপ করুন।" তাঁরা তা-ই করল। আমরা তির নিক্ষেপ করা চালিয়ে গেলাম। একপর্যায়ে আমার ধারণা হলো, সাথিগণ তির নিক্ষেপ করা হয়তো বন্ধ করবে না। দেখলাম, রাসুল ﷺ একটি তির নিক্ষেপ করলেন। তির লক্ষ্যভেদ করল। তাঁর তিরে এক ইহুদি নিহত হলো। রাসুল ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। একসময় মুসলিম বাহিনীর ওপর সাহায্য আসলো। মুসলিম বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করল।'[২৩৩]

যখন মুসলিমদের কঠোর অবস্থানের কারণে একটি দুর্গের পতন হলো, তখন রাসুল ﷺ কিনানা বিন আবুল হুকাইক নামক ইহুদিকে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর কাছে সোপর্দ করলেন। তিনি তাঁর শহিদ ভাইয়ের বদলা হিসেবে কিনানাকে হত্যা করলেন।[২৩৪] এ যুদ্ধে তিনি জমিন থেকে গনিমতের অংশ গ্রহণ করেন এবং অন্যদের থেকেও তিনি সেখানে জমি ক্রয় করেন।[২৩৫] খাইবার বিজয়ের পর ইহুদিরা রাসুল ﷺ-এর কাছে আবেদন জানাল, 'হে মুহাম্মাদ, আমরা খেজুর গাছের মালিক ছিলাম, তাই খেজুরের পরিচর্যা সম্পর্কে আমাদের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে।' তখন রাসুল ﷺ খেজুর আর শস্যের একটি নির্ধারিত অংশের বিনিময়ে তাদের চাষের অধিকার দিলেন। খেজুর গাছের নিচে অন্য ফসল চাষ হতো। ইহুদিদের উদ্দেশে রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমাদের এখানে থাকতে দিলাম, যতক্ষণ আল্লাহ থাকতে দেন।' এরপর তারা আবু বকর ﷺ-এর খিলাফতকাল

---

২৩২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৬৭।
২৩৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬২২।
২৩৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/ ৬৭২-৬৭৩, ইবনুল আসির ২/২২১।
২৩৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৯৬০।

এবং উমর ﷺ-এর খিলাফতের প্রথম দিকে কিছু দিন খাইবারে অবস্থান করে।[২৩৬] তারপর উমর ﷺ তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। আর খাইবারে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর জমির অংশ তাঁর মালিকানায় থেকে যায়।[২৩৭]

৯- উমরাতুল কাজার উদ্দেশ্যে বের হয়ে রাসুল ﷺ যখন জুল-হুলাইফায়[২৩৮] পৌছলেন, তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর নেতৃত্বে ১০০ জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনী অগ্রে প্রেরণ করলেন।[২৩৯] মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে মাররুজ জাহরানে পৌছে কুরাইশের একদল লোক দেখতে পেলেন। তারা রাসুল ﷺ-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'এই তো, আল্লাহ চাইলে আগামীকাল রাসুল ﷺ এখানে এসে সকাল করবেন।' তারা বাশির বিন সাদ ﷺ-এর সাথে অস্ত্র দেখে দ্রুত ফিরে গিয়ে কুরাইশদের কাছে বিষয়টি জানাল। কুরাইশরা বলতে লাগল, 'হায় আল্লাহ, আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি। আমরা আমাদের চুক্তির ওপরে আছি। তাহলে মুহাম্মাদ তাঁর সাথিদের নিয়ে কী জন্য আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে?!' এদিকে রাসুল ﷺ মাররুজ জাহরানে এসে পৌছে বাতনে ইয়াজাজে[২৪০] অস্ত্র পাঠিয়ে দিলেন, যেখান থেকে হারামের স্থাপনাগুলো দৃষ্টিগোচর হয়। কুরাইশরা মিকরাজ বিন হাফস বিন আহনাফের নেতৃত্বে একদল লোক পাঠায়। তারা বাতনে ইয়াজাজে এসে দেখে রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সাথে কুরবানির পশু আর অস্ত্র নিয়ে সবেমাত্র পৌছেছেন। তারা বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আমাদের ছোট থেকে ছোট কোনো বিশ্বাসঘাতকতার কথা তো শুনতে পাননি। তাহলে কীভাবে হারামের ভেতর আপনার কওমের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে ঢুকবেন? অথচ শর্ত করেছেন, শুধু সফরের সম্বল হিসেবে একটি অস্ত্র সাথে রাখবেন। তরবারি থাকবে কোষবদ্ধ।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আমরা শর্তমতোই সেখানে প্রবেশ করব।'[২৪১]

---

২৩৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৯০-৬৯১।

২৩৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৭২১ পৃ.।

২৩৮. জুল-হুলাইফা একটি গ্রামের নাম। তার মাঝে এবং মদিনার মাঝে ছয় বা সাত মাইল দূরত্ব। এটা মদিনাবাসীর মিকাত। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/৩২৯।

২৩৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৪। ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৩৩।

২৪০. বাতনু ইয়াজুজ, মক্কা থেকে আট মাইল দূরে একটি জায়গার নাম। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/৪৯০।

২৪১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৩৪।

১০- এভাবেই মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁ রাসুল ﷺ-এর পরিচালিত যুদ্ধসমূহে নিজের সকল শক্তি ঢেলে দিয়েছেন। জিহাদ করেছেন রাসুল ﷺ-এর পতাকাতলে আদর্শ কমান্ডার হয়ে।

সারিয়্যার কমান্ডার

১- ইহুদি কাব বিন আশরাফকে[২৪২] হত্যার অভিযান

সময়টি ছিল তৃতীয় হিজরির রবিউল আওয়াল মাস। কাব বিন আশরাফের (সে তাইয়ের শাখাগোত্র নাবহান বংশের এক ইহুদি। তার মা ছিল বনু নাজির বংশের) কাছে যখন বদরে কুরাইশের বড় বড় নেতাদের নিহতের খবর পৌঁছল, তখন সে বলল, 'ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই আমার জন্য শ্রেয়।'

সে কালবিলম্ব না করে মক্কায় রওয়ানা হয়ে গেল। কুরাইশের নিহতদের জন্য শোক জানাতে লাগল। মুসলিমদের কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে প্রেমাত্মক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকল। সে কবি ছিল। এরপর মক্কা থেকে মদিনায় আসলো। কিন্তু রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করল না। রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে শত্রুদের খ্যাপাতে থাকল। গালিগালাজ করে মুসলিমদের অনেক কষ্ট দিচ্ছিল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'কে আছ, আমার হয়ে ইবনে আশরাফের পাওনাটা মিটিয়ে দেবে? কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে। সাথে মুসলিমদেরও কষ্ট দিয়েছে।' মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁ বললেন, 'আমি, হে আল্লাহর রাসুল, আমি তাকে হত্যা করব ইনশাআল্লাহ।' রাসুল ﷺ বললেন, 'পারলে তা-ই করো।'

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁ রাসুল ﷺ-কে যে ওয়াদা দিলেন, কয়েক দিন যাবৎ সেটা নিয়ে মনে মনে পরিকল্পনা করতে থাকলেন। এরপর রাসুল ﷺ তাঁকে ডাকলেন। সাথে আরও কয়েকজনকে ডাকলেন। তাঁরা হলেন, বনু আব্দুল আশহালের লোক আবু নায়িলাহ সিলকান বিন সালামা বিন ওয়াফশ—ইনি কাব বিন আশরাফের দুধভাই ছিলেন—আব্বাদ বিন বিশর বিন ওয়াকশ, হারিস বিন আওস বিন মুআজ—এরা দুজন বনু আব্দুল আশহালের লোক—বনু

---

২৪২. তাবারি : ২/৪৮৭-৪৯১। সুনানু আবি দাউদ : ১/২৭৭। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/৫-৯।

হারিসার ভ্রাতৃগোষ্ঠী আবু আবস বিন জাবর।[২৪৩] রাসুল ﷺ তাঁদেরকে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে বিশ্বাসের বিপরীত কথা বলার অনুমতি দিলেন।

তাঁরা কাব বিন আশরাফের কাছে আগে সিলকান বিন সালামা ﷺ-কে পাঠালেন। সিলকান ﷺ তার কাছে গেলেন। রাসুল ﷺ থেকে বিমুখ হওয়ার ব্যাপারে তার সাথে সহমত প্রকাশ করলেন। নিজের আর্থিক দুরবস্থার কথা বলে তার কাছে তিনি এবং তাঁর সাথিরা কিছু খাবার ক্রয় করার কথা আলোচনা করলেন। সে জন্য তার কাছে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র বন্দক রাখার চুক্তি করলেন। কাব বিন আশরাফ সিলকান ﷺ-এর কথায় রাজি হলো।

সিলকান ﷺ সাথিদের কাছে ফিরে এলেন। এরপর সকলে অপারেশন সফলের উদ্দেশ্যে বের হলেন। রাসুল ﷺ এক চন্দ্রালোকিত রাতে বাকিউল গারকাদ[২৪৪] পর্যন্ত তাঁদের এগিয়ে দিলেন। তাঁরা কাবের কাছে আসলেন। কাব বিন আশরাফ দুর্গ থেকে বের হয়ে তাঁদের কাছে আসলো। তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামার সৈনিকগণ তার ঘাড়ে তরবারি বসিয়ে দিল। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ তাঁর কাছে থাকা একটি ছোট ছুরি দিয়ে রাসুলের এ দুশমনকে বিদ্ধ করেছিলেন।

হারিস বিন আওস ﷺ কোনো এক সাথির তরবারি দিয়ে মাথায় অথবা পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন। ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তাল মিলিয়ে চলতে না পারার কারণে সাথিদের থেকে কিছুটা পিছে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথিরা বনু উমাইয়া বিন জাইদের এলাকা হয়ে বনু কুরাইজা, এরপর সেদিক থেকে বুআস,[২৪৫] এরপর হাররাতুল উরাইদে এসে তাঁর অপেক্ষা করতে থাকে। তিনি সেখানে এসে পৌঁছলে তাঁকে নিয়ে তাঁরা রাসুল ﷺ-এর কাছে পৌঁছেন। তখন শেষ রাত, রাসুল ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। তাঁরা এসে রাসুল ﷺ-কে কাব হত্যার খবর জানালেন। এভাবে মুসলিমদের এক চরম দুশমনের সমাপ্তি হয়ে যায়। যে মুসলিমদের কষ্ট দিয়েছিল এবং তাঁদের বিরুদ্ধে শত্রুদের খ্যাপিয়ে তুলেছিল।

---

২৪৩. উয়ুনুল আসার গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে আব্দুর রহমান।

২৪৪. বাকিউল গারকাদ হচ্ছে মদিনাবাসীর কবরস্থান।

২৪৫. বুআস, মদিনার এক প্রান্তে একটি জায়গার নাম। জাহিলি যুগে উক্ত স্থানে আওস ও খাজরাজ গোত্রের মাঝে যুদ্ধ হতো। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ২/২২৩।

২- কুরাতা অভিমুখে তাঁর অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির মুহাররম মাসের ১১ তারিখে রাসুল ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে ৩০ জনের নেতৃত্ব দিয়ে কুরাতা অভিমুখে প্রেরণ করেন। কুরাতা বলে কয়েকটি গোত্রকে বোঝানো হয়। যেমন : কুরত, কারিত, কুরাইত ও আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর। এরা সকলে বকর বিন কিলাবের শাখাগোত্র। এরা দরিয়্যাহ অঞ্চলের এক পার্শ্বে বাকারাত[২৪৬] পাহাড়ি এলাকায় বাস করত। দরিয়্যাহ[২৪৭] আর মদিনার মাঝে সাত দিনের পথের দূরত্ব।

রাসুল ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে কুরাতা অঞ্চলে অতর্কিত হামলার নির্দেশ দেন। ফলে তিনি রাতে পথ চলতেন আর দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। এরপর সেখানে গিয়ে অতর্কিতে হামলা করে বসেন। তাদের একদল লোককে হত্যা করেন। বাকিরা জান নিয়ে ভেগে যায়। তিনি তাদের সব গবাদি পশু তাড়িয়ে নিয়ে মদিনার দিকে পা বাড়ান। কোনো শত্রু তাঁদের পথ আটকানোর সাহস করেনি।

গনিমত নিয়ে তিনি মদিনার পথে রওয়ানা হন। গনিমতের মাল পাঁচ ভাগ করে এক ভাগ রাসুল ﷺ-এর জন্য রেখে বাকিগুলো সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তাঁরা একটি উটের সাথে ১০টি ছাগলের তুলনা করেছিলেন। উট পেয়েছিলেন ১৫০টি আর ছাগল ৩০০০। এ অভিযান সম্পন্ন করতে তাঁদের ১৯ দিন সময় লেগেছিল। মুহাররমের শেষ তারিখের রাতে তাঁরা মদিনায় এসে পৌঁছেন।[২৪৮]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ এই হালকা—অথচ দ্রুত অপারেশনের মাধ্যমে শত্রুর ওপর অতর্কিত হামলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে অতি সহজেই শত্রুর ওপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পেরেছিলেন।

---

২৪৬. দরিয়্যাহ অঞ্চলের এক পাশে কালো উঁচু উঁচু পাহাড়ি এলাকাকে বাকারাত বলে। মুজামুল বুলদান : ২/২৫৬।

২৪৭. দরিয়্যাহ একটি অতি প্রাচীন আবাদি। যা বসরা থেকে মক্কার পথে নাজদে অবস্থিত। মুজামুল বুলদান : ৫/৪৩১-৪৩৪।

২৪৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৭৮, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৩৪-৫৩৫, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৬।

৩- জুল-কাসসাহ অভিমুখে তাঁর অভিযান[২৪৯]

ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আখির মাসে রাসুল ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ؓ-কে ১০ জন সৈনিক দিয়ে জুল-কাসসাহ অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেখানে বাস করত বনু সালাবা ও সালাবা বিন সাদের শাখাগোত্র উওয়াল গোত্র। রবাজার পথে জুল-কাসসাহ ও মদিনার মাঝে ২৪ মাইলের দূরত্ব। মুসলিম বাহিনী রাতে শত্রুর ওপর আক্রমণ করে। কিন্তু শত্রুরা তাঁদের ঘেরাও করে ফেলে। তারা ছিল ১০০ জন। রাতে কিছু সময় পরস্পর তির বিনিময় করে। এরপর তির-বর্শা নিয়ে গোত্রের সকলে মুসলিমদের ওপর হামলে পড়ে এবং সকলকে শহিদ করে।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ؓ আহত হয়ে পড়ে থাকেন। পায়ের গোড়ালিতে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার কারণে নড়াচড়া করতে পারছিলেন না। মুশরিকরা মুসলিমদের কাপড় খুলে নেয়। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ؓ-এর পাশ দিয়ে এক মুসলিম যাচ্ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ ؓ-কে উটে আরোহণ করিয়ে মদিনায় পৌঁছে দেন।

এরপর রাসুল ﷺ ৪০ জনের বাহিনী দিয়ে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ؓ-কে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে কোনো শত্রুর দেখা পান না। কিন্তু শত্রুর গবাদি পশু পেয়ে তা নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।[২৫০]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ؓ প্রাণে রক্ষা পান। মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কারণে শত্রুরা ভেবেছিল অন্যদের মতো তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু আবারও নতুন করে ইসলাম ও মুসলিমদের খিদমত করার জন্য তিনি প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন।

---

২৪৯. জুল-কাসসাহ, রবাজার পথে একটি স্থানের নাম, জুল-কাসসাহ ও মদিনার মাঝে ২৪ মাইল দূর, মুজামুল বুলদান : ৭/১১৪।

২৫০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮৫, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৫১-৫৫২, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৭।

খুলাফায়ে রাশিদিনের সাথে

১- উমর বিন খাত্তাব ﷺ-এর সাথে

ক- উমর ﷺ-এর খিলাফতকালে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ খিলাফতের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। উমর ﷺ-এর কাছে যখন কোনো গভর্নরের ব্যাপারে অভিযোগ আসত, তখন তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করতেন।[২৫১] সে হিসেবে তিনি আধুনিক পরিভাষায় রাষ্ট্রের প্রধান পরিদর্শকের পদে ছিলেন।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ কুফায় একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। যাতে ব্যবহার হয়েছিল হিরাত শহরে অবস্থিত কোনো এক কিসরার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের ইট। সাদ ﷺ-এর বাড়ির নিকটেই বাজার ছিল। যার কারণে বাজারের শোরগোল সাদ ﷺ-এর আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটাত। বাড়ির কাজ সমাপ্ত হলে লোকেরা সাদ ﷺ-এর ব্যাপারে এমন কথা বলতে লাগল, যে কথা তিনি বলেননি। তারা বলল, 'সাদ ﷺ বলেছেন, "আমার কাছে আওয়াজ করা কমিয়ে দাও।"'[২৫২]

সাদ ﷺ-এর সম্পর্কে এ কথা উমর ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই কথাও পৌঁছে যে, লোকেরা তাঁর বাড়ির নাম দিয়েছে সাদের প্রাসাদ। তখন উমর ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে ডেকে কুফায় পাঠালেন। তাঁকে বললেন, 'প্রাসাদের কাছে গিয়ে তাঁর দরজাটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। এরপর তুমি তোমার জায়গায় ফিরে আসবে।'[২৫৩]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ কুফায় চলে গেলেন। কুফায় এসে কিছু লাকড়ি ক্রয় করলেন এবং সাদ ﷺ-এর বাড়িতে এসে বাড়ির দরজা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন।[২৫৪]

---

২৫১. উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩০।
২৫২. তাবারি : ৪/৪৬-৪৭।
২৫৩. তাবারি : ৪/৪৭।
২৫৪. ইবনুল আসির : ২/৫২৯।

সাদ ﷺ-কে খবর জানানো হলো। তখন তিনি বললেন, 'ইনি বার্তাবাহক। তাঁকে এ কাজের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।' কে বাড়ির দরজা জ্বালিয়ে দিল, এটা জানার জন্য তিনি লোক পাঠালেন। খবর নিয়ে দেখলেন, সে লোকটি হলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ। তখন সাদ ﷺ তাঁকে মেহমান হতে আবেদন জানালেন। কিন্তু তিনি আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। সাদ ﷺ কিছু খরচ দিতে চাইলেন। তিনি তাও নিতে অস্বীকার করলেন।

সাদ ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি তাঁকে উমর ﷺ-এর পত্র দিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'আমার কাছে খবর এসেছে, আপনি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। সেটাকে নিজের দুর্গ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তার নাম দেওয়া হয়েছে সাদের প্রাসাদ। আপনার মাঝে ও মানুষের মাঝে দরজা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ওটা আপনার প্রাসাদ নয়; ওটা বরং সর্বনাশের প্রাসাদ। প্রাসাদ ছেড়ে কোষাগারের কাছে কোনো বাড়িতে অবস্থান করুন। সেটি বন্ধ করে দিন। বাড়ির সামনে কোনো দরজা রাখবেন না, যা মানুষকে তার অধিকার গ্রহণ করা থেকে বাধাগ্রস্ত করে। মানুষ যেন ঘরে-বাইরে আপনার সাথে সহজে সাক্ষাৎ করতে পারে।' পত্র পড়ে সাদ ﷺ শপথ করে বললেন, মানুষ যে অভিযোগ করেছে, তিনি সে কথা বলেননি।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ কুফা থেকে মদিনায় রওয়ানা হলেন। মদিনার কাছাকাছি হলে তাঁর পাথেয় শেষ হয়ে যায়। তখন গাছের পাতা ও বাকল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন। মদিনায় পৌঁছে উমর ﷺ-কে সব খুলে বলেন। ঘটনা শুনে উমর ﷺ বললেন, 'সাদ ﷺ-এর কাছ থেকে খরচ গ্রহণ করলেন না কেন?' বললেন, 'আপনি তা চাইলে সেটা তাঁকে লিখে দিতেন অথবা সে ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিয়ে দিতেন।' উমর ﷺ বললেন, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি সে-ই, যার কাছে মালিকের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি না থাকলে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে অথবা বিচক্ষণমূলক কথা বলে।'

তিনি উমর ﷺ-কে সাদ ﷺ-এর শপথের কথাও জানালেন। তখন উমর ﷺ বললেন, 'তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এবং আমার কাছে যা কিছু পৌঁছেছে, তার চেয়ে তিনি বেশি সত্যবাদী।'[২৫৫] এ ঘটনাটি ১৭ হিজরিতে ঘটেছিল।

---

২৫৫. তাবারি : ৪/৪৭, ইবনুল আসির : ২/৫২৯-৫৩০।

খ- বনু আসাদের কিছু লোক সাদ ﷺ-এর দ্বীনদারি, সালাত ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে। এটা তারা উমর ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এ ঘটনা ওই সময়ে ঘটে, যখন ইসলামি বিজয়ধারার নাজুক মুহূর্ত চলছিল। পারস্যের সমগ্র শক্তি নাহাওয়ান্দে[২৫৬] সেনা সমাবেশ করেছে। পারসিক আর মুসলিম উভয় বাহিনীই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে চলেছে। বিশেষত সাদ ﷺ হলেন সে যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। আবার তিনিই প্রাচ্য বিজয়ের প্রধান অধিনায়ক।

উমর ﷺ সে লোকদের বললেন, 'তোমাদের খারাপ অভিযোগের যে প্রমাণ, তা তোমাদের পক্ষ থেকে আছে। সেটা তোমাদের জন্য যে প্রস্তুত করার সে তা প্রস্তুত করে দিয়েছে। আল্লাহর শপথ, এ প্রমাণ আমাকে তোমাদের অভিযোগ নিয়ে বিবেচনা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না; যদিও তোমাদের ওপর তা আপতিত হয়।'[২৫৭] এরপর তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে তদন্তের জন্য প্রেরণ করলেন।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ কুফায় এসে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে তদন্ত শুরু করে দিলেন। সাদ ﷺ-কে নিয়ে কুফার এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদে গেলেন। তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর আখলাক সম্পর্কে লোকদের মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন লোকেরা বলল, 'তাঁর ব্যাপারে আমরা কেবল ভালোই জানি। তাঁর পরিবর্তে আমরা অন্য কারও আশা করি না।'

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ সাদ ﷺ-কে নিয়ে সেই লোকদের কাছে গেলেন, যারা অভিযোগকারীদের সমর্থন করছিল। কিন্তু তাদের কেউ-ই তাঁর ব্যাপারে একটা খারাপ মন্তব্য করার দুঃসাহস করল না।

এরপর তাঁকে নিয়ে বনু আবসের জামে মসজিদে গেলেন। লোকদের সামনে বললেন, 'আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, একজন ব্যক্তিও যদি সত্য জানে, তবে সে যেন তা বলে দেয়।' তখন উসামা বিন কাতাদা দাঁড়িয়ে বলল, 'আল্লাহ

---

২৫৬. হামাজানের পশ্চিম দিকে একটি বিরাট শহরের নাম নাহাওয়ান্দ। হামাজান আর নাহাওয়ান্দের মাঝে তিন দিনের পথের দূরত্ব। মুজামুল বুলদান : ৮/৩২৯-৩৩২।
২৫৭. তাবারি : ৪/১২১, ইবনুল আসির : ৩/৫।

সাক্ষী। যদি আপনি আমাদের শপথ দিয়ে বলেন, তবে শুনুন, সে সমানভাবে বণ্টন করে না। প্রজাদের মাঝে ইনসাফ করে না এবং অভিযানে গিয়ে যুদ্ধ করে না।' তখন সাদ ﵁ বললেন, 'হে আল্লাহ, যদি সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে খ্যাতি ও লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে এ কথা বলে থাকে, তবে তাকে অন্ধ বানিয়ে দিন। তার সন্তানাদির সংখ্যা বাড়িয়ে দিন এবং তাকে দীর্ঘমেয়াদি ফিতনায় ফেলে দিন।' এরপরে সে লোক অন্ধ হয়ে যায়। একে একে ১০ জন কন্যাসন্তান তার ঘরে জমা হয়। স্ত্রীর খবর জানতে চাইলে স্ত্রীর কাছে এসে হাতে স্পর্শ করে দেখতে হতো। হোঁচট খেলে বলত, এটা নেককার সাদের বদদুআ।'[২৫৮]

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﵁ বলেন, 'আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে মুশরিকের রক্ত ঝরিয়েছে। আমার সম্মান দেখাতে গিয়ে রাসুল ﷺ তাঁর বাবা-মা দুজনকে একসাথে উল্লেখ করেছেন। আমার আগে কারও জন্য এভাবে দুজনকে একসাথে উল্লেখ করেননি। আমি নিজেকে ইসলামের এক-পঞ্চমাংশ মনে করতাম। অথচ বনু আসাদ কিনা দাবি করছে, আমি সুন্দর করে সালাত আদায় করি না; শিকারের কারণে আমি সালাত থেকে গাফিল থাকি।'[২৫৯]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁ সাদ ﵁ ও তাঁর বাদী তথা অভিযোগকারীদের নিয়ে উমর ﵁-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে সব খবর বলে দিলেন। উমর ﵁ বললেন, 'হে সাদ, সালাত কীভাবে পড়েন?' সাদ ﵁ বললেন, 'প্রথম দুই রাকআত লম্বা করি আর দ্বিতীয় দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করি।' উমর ﵁ বললেন, 'এভাবেই তোমার প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।' এরপর বললেন, 'যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে, তবে তাদের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট থাকত।'[২৬০]

২১ হিজরিতে উমর ﵁ সাদ ﵁-এর পরিবর্তে আম্মার বিন ইয়াসির ﵁-কে দায়িত্ব দিলেন।[২৬১] তিনি সাদ ﵁-কে কোনো খিয়ানত বা অক্ষমতার কারণে বাতিল করেননি। সে কথা স্বয়ং উমর ﵁-ও বলেছেন।[২৬২] এরপর কুফাবাসী আম্মার বিন ইয়াসির ﵁ সম্পর্কেও অভিযোগ করে বসে, 'তিনি দুর্বল, রাজনীতি

---

২৫৮. তাবারি : ৪/১২১।
২৫৯. তাবারি : ৪/১২১-১২২। দেখুন, আল-মাআরিফ লি ইবনি কুতাইবা : ২৪২।
২৬০. তাবারি : ৪/১২২, ইবনুল আসির : ৩/৬।
২৬১. আল-ইবার : ১/২৫।
২৬২. ফাতহুল বারি শারহুল বুখারি : ৭/৫৫।

সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই।' উমর ﷺ তাঁকেও অপসারণ করেন এবং বলেন, 'কুফাবাসীর ব্যাপারে কে আমার অভিযোগ গ্রহণ করবে? যদি তাদের ওপর শক্তিশালী লোককে নিযুক্ত করি, তখন তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। আর যদি দুর্বল কাউকে দিই, তখন তাঁকে তুচ্ছ মনে করে।'[২৬৩]

গ- উমর ﷺ তাঁর গভর্নরদের কাছে অর্থ গ্রহণের জন্য মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে পাঠাতেন।[২৬৪] তারই ধারাবাহিকতায় তাঁকে মিসরে আমর ইবনুল আস ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করেন। তখন তিনি নির্ধারিত অংশ ভাগ করে উসুল করেন।[২৬৫]

উমর ﷺ তাঁর গভর্নরদের নিযুক্ত করার পর তাদের মালের হিসেব লিখে রাখতেন। পরে এর থেকে যা বেশি হতো, তা বণ্টন করে দিতেন। তিনি আমর ইবনুল আস ﷺ-এর কাছে লিখলেন, 'আপনার দাস-দাসী, আসবাবপত্র ও গবাদি পশু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আপনি মিসরের দায়িত্ব নেওয়ার সময় ছিল না।' আমর ইবনুল আস ﷺ তাঁর কাছে উত্তরে লিখলেন, 'আমাদের ভূমি ব্যবসা ও চাষাবাদ, দুটোর জন্যই উর্বর। যার কারণে প্রয়োজনের চেয়ে আমাদের কিছু সম্পদ অতিরিক্ত থেকে যায়।' এরপর উমর ﷺ পত্র লিখলেন, 'আমি অসাধু গভর্নরদের খবর যথেষ্ট শুনেছি। আমার কাছে আপনার পত্র সত্য গ্রহণে অতিষ্ঠ ব্যক্তির মতো মনে হয়েছে। তাই আপনার প্রতি আমার ধারণা খারাপ হয়েছে। ফলে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে আপনার কাছে পাঠিয়েছি আপনার সম্পদ ভাগ করতে। অতএব তাঁকে তাঁর মতো করে জানতে দিন। আপনার কাছে যা দাবি করে, তা দিয়ে দিন। আপনার প্রতি তাঁর কঠোর আচরণ ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ তিনি বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন।' মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ মিসর গিয়ে তাঁর সম্পদ ভাগ করে দেন।

আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন, 'একটা সময় আমাদের সাথে হানতামার[২৬৬] বেটা এমন আচরণ করত, যখন মন্দ সময় ছিল। আর তখন আস অনেক

---

২৬৩. তারিখু উমর ইবনিল খাত্তাব লি ইবনিল জাওজি : ৮৮ পৃ.।

২৬৪. উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩০।

২৬৫. আল-ইসাবাহ : ৬/৬৪।

২৬৬. হানতামা হচ্ছে, উমর ﷺ-এর মাতার নাম। হানতামা বিনতে হাশিম বিন মুগিরা আল-মাখজুমি।

রেশমি কাপড় পরত।' তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বললেন, 'থামুন, যদি হানতামার বেটা না থাকত, যাকে আপনি অপছন্দ করছেন, তবে আপনার বাড়ির আঙিনা ছাগলে ভরা পেতেন। তার দান আপনাকে আনন্দিত করে; কিন্তু স্বল্পতা আপনাকে কষ্ট দেয়!' আমর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর দোহাই, আমার এসব কথা উমর ﷺ-কে জানাবেন না, কারণ মজলিশের কথাবার্তা সব আমানত।' মুহাম্মাদ ﷺ বললেন, 'উমর ﷺ বেঁচে থাকতে আমাদের এ কথা প্রকাশ করব না।'[২৬৭]

উমর ﷺ যথাযথভাবে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে সেখানে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে প্রেরণ করতেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ ছিলেন খিলাফতের জটিল সমস্যা উদঘাটনে সিদ্ধহস্ত।[২৬৮]

এ পর্যায়ে এসে আমরা কল্পনা করতে পারি, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর নিষ্কলুষতা, পবিত্রতা, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব এবং আত্মবিশ্বাস ও সত্যকে আঁকড়ে থাকার অবস্থান এমন ছিল যে, এর কারণে উমর ﷺ মুসলিমদের বিষয়াদির ব্যাপারে তাঁর ওপরই সবচেয়ে ভরসা পেতেন। গভর্নরদের সমস্যা সমাধানে এবং তাদের বিচ্যুতদের হিসাব কষতে তাঁকেই সীমাহীন বিশ্বাস করতেন। বনু জুহাইনার সদাকা গ্রহণের দায়িত্বও তাঁকে দিয়েছিলেন।[২৬৯] এটা তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা, অনন্য বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও আত্মবিশ্বাসের বড় প্রমাণ। এসব গভীর ইমান, অবিচল আকিদা-বিশ্বাস ও একনিষ্ঠতারই অনিবার্য ফসল।

২- উসমান বিন আফফান ﷺ-এর সাথে

৩৫ হিজরিতে কুখ্যাত আব্দুল্লাহ বিন সাবার চক্রান্তে একদল মানুষ মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু করে। আব্দুল্লাহ বিন সাবা মূলত ছিল ইহুদি। উসমান ﷺ-এর খিলাফতকালে চক্রান্তের সুযোগ নেওয়ার জন্য নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে প্রথমে সে হিজাজে, এরপর বসরা, কুফা ও সিরিয়ায় সফর করে। সিরিয়াবাসী তাকে

২৬৭. বিলাজারি : ৩০৭-৩০৮ পৃ.।
২৬৮. আল-ইসাবাহ : ৬/৬৪।
২৬৯. আল-ইসাবাহ : ৬/৬৩-৬৪, উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩০, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২৭।

সিরিয়া থেকে বের করে দেয়। এরপর সে মিসরে আসে। মিসরে এসে কিছুদিন অবস্থান করে। মিসরের লোকদের সে বলতে লাগল, 'কী আশ্চর্য! কিছু মানুষ ইসা ﷺ-এর প্রত্যাগমনে বিশ্বাস করে; কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রত্যাগমনকে অস্বীকার করে।' এভাবে সে ওখানে প্রত্যাবর্তনবাদ চালু করে। একদল লোক সেটা গ্রহণ করে। এরপর সে তাদের বলে, 'প্রত্যেক নবির একজন প্রতিনিধি থাকে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতিনিধি হলেন আলি। সুতরাং যারা রাসুল ﷺ-এর অসিয়তকে পূরণ করেনি, তারা জুলুম করেছে। তারা আলির ব্যাপারে অসিয়তে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। উসমান অন্যায়ভাবে সেটা গ্রহণ করেছে। অতএব এ ব্যাপারে আপনারা দাঁড়িয়ে যান এবং শাসকদের ওপর চাপ শুরু করুন। সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করুন। এর মাধ্যমে মানুষকে আকর্ষণ করুন।'

সে তার দায়িদের ছড়িয়ে দিল। যারা দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা চায়, তাদের সাথে তারা পত্র-বিনিময় করল। গোপনে তার মতবাদের দিকে ডাকতে লাগল। দেশে দেশে শাসকদের দোষত্রুটি লিখে পত্র-বিনিময় করতে থাকল। প্রত্যেক শহরের লোক অন্য শহরবাসীর কাছে তাদের কর্মপরিকল্পনা জানাতে লাগল। একপর্যায়ে মদিনাকেও টার্গেট বানাল। পুরো খিলাফতে ফাসাদ ছড়িয়ে দিল। ফলে প্রত্যেক শহরবাসী বলত, 'ওরা যে ফিতনায় পড়েছে, সেটা থেকে কেবল আমরা মুক্ত আছি। কেবল মদিনাবাসী ছাড়া, কেননা এ ফিতনা তাদের কাছে শহরের প্রত্যেক দিক থেকে এসেছিল। ফলে তারা বলেছিল, "মানুষ যে ফিতনায় আক্রান্ত হয়েছে, আমরা তার থেকে মুক্ত আছি!"'

মদিনাবাসী উসমান ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, মানুষের কাছ থেকে যে খবর আমাদের কাছে এসেছে, আপনার কাছেও কি সে খবর এসেছে?' উসমান ﷺ বললেন, 'আমার কাছে তো কেবল ভালো খবরই এসেছে। আর তোমরা তো আমারই শরিক, মুমিনদের সাক্ষী। তাই আমাকে পরামর্শ দাও।' তারা বলল, 'আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, শহরে শহরে আপনার কিছু বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে দিন; যাতে তারা সঠিক খবর নিয়ে আসে।'

উসমান ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে কুফায় পাঠালেন। উসামা বিন জাইদ ﷺ-কে পাঠালেন বসরায়। আম্মার বিন ইয়াসির ﷺ-কে মিসরে।

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ-কে সিরিয়ায়। তাঁরা ছাড়া আরও কিছু লোককে বিভক্ত করে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁরা সকলে ফিরে এসে বললেন, 'লোক সকল, আমরা খারাপ কিছু দেখিনি এবং সাধারণ ও বিশেষ লোকেরাও খারাপ কিছু অনুভব করেনি।'[২৭০]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ ছিলেন উসমান ﷺ-এর আস্থাভাজন লোক। পূর্বে যেমন আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ-এরও আস্থাভাজন ছিলেন। বরং রাসুল ﷺ-এরও একজন বিশেষ আস্থাভাজন হিসেবে ছিলেন। এ কারণে উসমান ﷺ তাঁকে সবচেয়ে বিপজ্জনক ইসলামি দুর্গ কুফায় পাঠিয়েছেন; যেন তাঁর কাছ থেকে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন। মতলববাজরা যা প্রচার করেছিল, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ ও অন্য প্রতিনিধিগণ তার কিছুই দেখতে পাননি; বরং তাঁরা পরিস্থিতি শান্তই পেয়েছেন।

কুফা, বসরা ও মিসরের ফিতনাবাজরা হাজির বেশ ধরে তাদের কুমতলব বাস্তবায়নে বের হলো। যখন তারা মদিনার তিন মাইল দূরে ছিল, সেখান থেকে তারা মদিনার বিভিন্ন নিকটবর্তী ক্যাম্পে চলে আসলো এবং মদিনায় ঢুকে পড়ল। তারা মদিনায় প্রবেশের পরের জুমআয় উসমান ﷺ মিম্বারে উঠে খুতবা দিলেন। খুতবায় বললেন, 'লোক সকল, আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর শপথ, মদিনাবাসী জানে, তোমরা (ফিতনাবাজরা) মুহাম্মাদ ﷺ-এর জবানে অভিশপ্ত। অতএব সঠিক কাজের মাধ্যমে ভুলত্রুটি মুছে ফেলো।' তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ উঠে বললেন, 'আমি এ হাদিসের সাক্ষী।'

বিদ্রোহীরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। নির্দোষ লোকদের পাথর মেরে মসজিদ থেকে বের করে দিল। এরপর উসমান ﷺ-কে পাথর মেরে বেহুঁশ করে ফেলল। উসমান ﷺ-কে বাড়িতে নেওয়া হলো।[২৭১]

তখন উসমান ﷺ আলি ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইলেন। আলি ﷺ ফিতনাবাজদের বিরুদ্ধে লোকদের বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন আনসার-মুহাজির মিলে ৩০ জন লোক তার সাথে বের হলো। তারা

---

২৭০. তাবারি : ৪/৩৪০-৩৪১, ইবনুল আসির : ৩/১৫৪-১৫৫।
২৭১. তাবারি : ৪/৩৫২-৩৫৩, ইবনুল আসির : ৩/১৬০-১৬১।

মিসরের লোকদের কাছে গেল। আলি ﵁ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁ তাদের সাথে কথা বললেন। তাদের কথা শুনে তারা মিসরে ফিরে গেল। মিসরের লোকদের প্রধান[২৭২] মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁-কে বলল, 'আমাদের কি কোনো প্রয়োজনের ব্যাপারে নসিহত করবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহকে ভয় করবে। তোমার পক্ষ থেকে কেউ তার ইমামের বিরোধিতা করলে তাকে ফিরিয়ে রাখবে। কারণ, তিনি আমাদের ওয়াদা দিয়েছেন ফিরে যাবেন এবং বের হয়ে যাবেন।' সে বলল, 'ইনশাআল্লাহ, তা করব।'[২৭৩]

মিসরবাসী মিসরে ফিরে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় পথে তারা আবার মদিনায় ফিরে এল। যেমন কুফা আর বসরার লোকেরা ফিরে এসেছে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁ তাদের কাছে গিয়ে ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা একটি সিসার বোতলে রাখা কাগজ বের করে দিল। সে কাগজে উসমান ﵁ তাঁর গভর্নরদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তাদের নেতাকে বেত্রাঘাত করে মাথা মুণ্ডন করে দিতে এবং তাদের কতককে হত্যা করতে।

মিসরের লোকেরা ফিরে এসে সে ব্যাপারে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁-কে জানাল। তারা তাঁকে বলল, 'আমরা আলির সাথে কথা বলেছি। তিনি আমাদের ওয়াদা দিয়েছেন, তাঁর সাথে কথা বলবেন। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও সাদ বিন জাইদ ﵁-এর সাথে কথা বলেছি, তাঁরা বলেছেন, "আমরা তোমাদের বিষয়ে নাক গলাব না।" তারা মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁-কে জোহরের পরে আলি ﵁-এর সাথে উসমান ﵁-এর কাছে উপস্থিত হতে বলল। তিনি তাদের ওয়াদা দিলেন।'

আলি ﵁ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁ উসমান ﵁-এর কাছে গেলেন। তাঁরা মিসরের লোকদের তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। সেখানে তখন মারওয়ান বিন হাকাম উপস্থিত ছিল। সে বলল, 'তাদের সাথে আমাকে কথা বলতে দিন।' উসমান ﵁ বললেন, 'চুপ করো। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। এর সাথে তোমার কীসের সম্পর্ক? আমার কাছ থেকে বের হয়ে যাও।' তখন মারওয়ান বের হয়ে গেল।

---

২৭২. তার নাম আব্দুর রহমান বিন উদাইস আল-বালাওয়ি।
২৭৩. তাবারি : ৪/৩৫৯-৩৬০, ইবনুল আসির : ৩/১৬২-১৬৩।

আলি ﷺ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ মিসরের লোকদের কথা উসমান ﷺ-কে বললেন। তখন উসমান ﷺ শপথ করে বললেন, 'আমি তা লিখিনি, সে ব্যাপারে আমি জানিও না।' তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বললেন, 'সত্য বলেছেন। এটা মারওয়ানের কাজ।'

মিসরের লোকেরা উসমান ﷺ-এর কাছে গেল। তারা তাঁকে সালাম পর্যন্ত দিল না। উসমান ﷺ-কে তারা বলল, 'আমরা মিসর থেকে আপনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম; কিন্তু আলি ﷺ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ আমাদের ফেরত পাঠিয়েছেন। আমাদের সাথে আপনি যে আলোচনা করবেন, সে ব্যাপারে তাঁরা দুজন আমাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই আমরা আমাদের দেশে ফিরে যেতে লাগলাম। কিন্তু পথিমধ্যে আপনার গোলাম ও আপনার চিঠি দেখতে পেলাম। চিঠিতে আপনার সিল আছে। সেখানে আপনি আব্দুল্লাহকে[২৭৪] নির্দেশ দিচ্ছেন, আমাদের বেত্রাঘাত করতে। আমাদের অঙ্গহানি করতে এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমাদের বন্দী করে রাখতে।

উসমান ﷺ হলফ করে বললেন, 'আমি তা লিখিনি। তা লিখতে আদেশ করিনি এবং সে সম্পর্কে জানিও না।' তখন আলি ﷺ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ বললেন, 'উসমান সত্য বলেছেন।' কিন্তু মিসরের লোকদের এমন অবস্থা ছিল যে, উসমান ﷺ খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ালেই তবে তারা নিজেদের অবস্থান থেকে ফিরে যাবে। আর উসমান ﷺ খিলাফত থেকে সরতে না চাইলে তারা তাঁকে হত্যা করবে।[২৭৫]

মিসরের লোকেরা উসমান ﷺ-কে অবরুদ্ধ করে রাখল। তাঁকে হত্যা করে অবরোধের অবসান হলো।[২৭৬]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ ফিতনা অবদমিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। উত্তেজিত বিদ্রোহীদের সামনে সত্য বলার জন্য বীরত্বের সাথে দাঁড়িয়ে গেছেন। তাদের সামনেই সত্যায়ন করেছেন উসমান ﷺ-এর হাদিসকে।

২৭৪. আব্দুল্লাহ বলে তারা মিসরের আমির আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহকে বুঝিয়েছে।
২৭৫. তাবারি : ৪/৩৭২-৩৭৫, ইবনুল আসির : ৩/১৬৮-১৬৯।
২৭৬. তাবারি : ৬/৩৭৫।

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'এই বিদ্রোহীরা অভিশপ্ত।' যার কারণে বিদ্রোহীরা উসমান ﷺ-এর ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে আহত করে। কিন্তু মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ তাদের কোনো পরোয়া করেননি। বরং নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছেন সত্য কথা। উসমান ﷺ-এর কল্যাণ—এমনকি ওই বিদ্রোহীদের কল্যাণ সাধনেও কোনো ত্রুটি করলেন না। কিন্তু ফিতনার প্রচণ্ডতা তাঁর ও অন্য মুসলিমদের চেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। সম্ভবত মুসলিম বিদ্বেষীদের বিষাক্ত হাতই বিদ্রোহীদের দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছিল। ফলে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর মতো সচেতন ও একনিষ্ঠ ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টাও বিফলে গিয়েছিল। মুসলিম মিল্লাতের ক্ষতি সাধনে সেই গোপন হাতগুলোই তাদের লক্ষ্যে সফল হয়েছে। উসমান ﷺ-এর জীবনের সমাপ্তি হয়েছে, শাহাদাত বরণ করেছেন মাজলুম হয়ে। এরপর বিশ্বময় সেই ফিতনার বীজ বপন করতে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্ধকার কালো রাতের ন্যায় ফিতনা আসতে থাকে। থমকে দাঁড়ায় ইসলামের বিজয়ধারা। শত্রুদের ছেড়ে নিজের ওপরই এসে পড়ে মুসলিমদের স্বীয় তরবারি।

৩ - ভয়াবহ ফিতনা থেকে নির্জনতা

রাসুলের শহরে রাসুলের খলিফার হত্যাকাণ্ড মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-সহ অনেক সাহাবিকে প্রকম্পিত করে তোলে। এই ফিতনাকে তাঁরা প্রলয়ংকরী ফিতনা হিসেবে দেখেন। প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, এ ফিতনায় তরবারি বা জবান দিয়ে কোনোভাবেই অংশগ্রহণ না করা এবং তার অগ্নি নির্বাপণে কোনো চেষ্টাই বাদ না রাখা।

ফিতনা থেকে দূরে থাকার কারণে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ ও তাঁর মতো অন্য সাহাবিদেরকে উসমান ﷺ-এর পক্ষের মনে করা আমাদের জন্য অনেক বড় ভুল হবে।[২৭৭] কারণ উসমান ﷺ বা তাঁর খিলাফতের মাধ্যমে তিনি কোনো আর্থিক কিংবা মানবিকভাবে উপকার হাসিল করেছেন, এমন কোনো প্রমাণ তাঁর পাওয়া যায় না। এমনকি দূরে বা কাছে থেকেও তাঁর ওপর এ ব্যাপারে কোনো অপবাদের দাগ পড়তে দেখা যায়নি। আর শরিয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে

---

২৭৭. তাবারি : ৪/৪৩০, ইবনুল আসির : ৩/১৯১।

উসমান ﷺ ছিল মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর জন্য প্রতীকস্বরূপ। সেই সাথে তো অন্যান্য আরও বৈশিষ্ট্য ছিলই, যা শত্রু-মিত্র কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ যখন উসমান ﷺ-এর পক্ষে গোপনে ও প্রকাশ্যে দাঁড়ালেন, তখন মূলত তিনি কেবল ইসলামি আদর্শ ও দ্বীনের বিশুদ্ধ শিক্ষা রক্ষার জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন। মুসলিমদের সারি ছিন্নভিন্নকারী ফিতনাকে রোধ করার জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন। আর পরে সেটাই ঘটেছিল, যার আশঙ্কা করেছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ও তাঁর মতো গভীর ইমান আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহাবিগণ।

এটা নিশ্চিত যে, উসমান ﷺ-এর পক্ষে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর অবস্থানটা বাস্তবিক অর্থেই দায়িত্বশীল অবস্থান ছিল। উসমান ﷺ ছাড়া অন্য কোনো খলিফা জুলুমের শিকার হলেও তাঁর অবস্থানটা এমনই নীতিগত হতো। কারণ সেটা কোনো স্বার্থগত অবস্থান ছিল না যে, অবস্থা আর পরিবেশের সাথে তারও পরিবর্তন হবে।

আলি ﷺ-কে বাইআত দেওয়া থেকে তিনি এ কারণে বিরত ছিলেন না যে, আলি ﷺ-এর সম্মান ও অবস্থান তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল।[২৭৮] কারণ কোনো মুসলিমই আলি ﷺ-এর সম্মান ও অবস্থান সম্পর্কে কোনো রকমের সন্দেহ করতে পারে না। বরং উসমান ﷺ-এর হত্যা এবং ফিতনার প্রজ্বলিত অগ্নিতে পড়ে ব্যথার ভয়াবহতা চরম ধৈর্যশীল ব্যক্তিকেও হয়রান করে দিয়েছিল। যেমন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর মতো অন্যান্য আনসার-মুহাজির সাহাবিগণ পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন।

ফিতনা প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকল। ৩৬ হিজরিতে এসে আলি ﷺ ও তাঁর খিলাফত বিরোধীদের মাঝে জঙ্গে জামাল তথা উষ্ট্রির যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সেদিন ১০ হাজার মুসলিমের প্রাণ গেল।[২৭৯]

এরপরে আলি ﷺ ও মুআবিয়া ﷺ-এর মাঝে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। উভয় দলে ৬০ হাজার মুসলিমের প্রাণ গেল।[২৮০]

---

২৭৮. তাবারি : ৪/৪৩০, ইবনুল আসির : ৩/১৯১।
২৭৯. আল-ইবার : ১/৩৭।
২৮০. আল-ইবার : ১/২৮।

এভাবেই নিজেদের তরবারিতে নিজেদের জীবন ঝরতে লাগল। থমকে দাঁড়াল ইসলামি বিজয়ধারা। রোমানরা তাদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধারের আশা করতে লাগল। আক্রমণকারী পরিণত হলো আক্রমণের শিকারে, বিজয়ীরা হয়ে গেল পরাজিত জাতি।

ফিতনা থেকে দূরে অবস্থান করা ছাড়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর সামনে কোনো উপায় ছিল না। ফলে তিনি আলি ﷺ-এর সঙ্গ দিলেন না ঠিক; কিন্তু তাঁর বিরোধী ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে আরও বড় বড় সাহাবিগণ নির্জনে চলে গেলেন। যেমন : সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, উসামা বিন জাইদ, আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ প্রমুখ সাহাবি।[২৮১] তাঁরা সেসব সাহাবির মধ্যে ছিলেন, যাঁরা উষ্ট্রির যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।[২৮২]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ মদিনা থেকে দূরে রাবাজাহ পল্লীতে গিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করেন।[২৮৩] দুবাইআ বিন হুসাইন সালাবি বলেন, 'একবার আমরা হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, "আমি এমন এক লোককে জানি, যাকে ফিতনা কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।" আমরা বললাম, "তিনি কে?" তিনি বললেন, "মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল-আনসারি।" হুজাইফা ﷺ-এর ইনতিকালের পর আমি কিছু লোকের সাথে বের হলাম। একটি ঝরনার কাছে এসে দেখি, দূরে একটা তাঁবু টানানো; বাতাসে তাঁবুটি দোল খাচ্ছিল। বললাম, "ওটা কার তাঁবু?" লোকেরা বলল, "মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর।" তাঁবুর কাছে এসে দেখি, তিনি অতি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। বললাম, "আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ মুসলিমদের একজন মনে করি। আপনি তো দেখি, আপনার শহর, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন।" তিনি বললেন, "এসব ছেড়েছি অকল্যাণের ভয়ে। মুসলিম অঞ্চলগুলোতে যা ঘটছে, তা থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমার মন কোনো অঞ্চলে যেতে চাচ্ছে না।'[২৮৪]

---

২৮১. উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩১, আল-ইসতিআব : ৩/১৩৭৭।
২৮২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২৭।
২৮৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২৭।
২৮৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৪-৪৪৫।

তিনি বর্ণনা করেন, 'রাসুল ﷺ তাঁকে একটি তরবারি দিয়ে বলেছেন, "এর দ্বারা মুশরিকের সাথে লড়াই করো, যতক্ষণ তাদের সাথে লড়াই করা যায়। যখন আমার উম্মতকে দেখবে, তারা পরস্পর হানাহানি করছে, তখন এ তরবারি নিয়ে (উহুদে) আসবে এবং তাতে আঘাত করে ভেঙে ফেলবে। তারপর তোমার ঘরে বসে থাকবে, যতক্ষণ না তোমার কাছে কোনো অপরাধীর হাত আসে অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে মৃত্যু চলে আসে।"'[২৮৫]

আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ তাঁকে একটি তরবারি দিয়ে বলেন, "হে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা, এই তরবারি দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। অতঃপর যখন মুসলিমদের দুই দলকে পরস্পর যুদ্ধ করতে দেখবে, তখন এই তরবারি দিয়ে পাথরে আঘাত করে ভেঙে ফেলবে। এরপর তোমার হাত ও মুখকে সংযত রাখবে, যতক্ষণ না তোমার কাছে কোনো অপরাধীর হাত অথবা আল্লাহর তরফ থেকে মৃত্যু আসে।" যখন উসমান ؓ নিহত হলেন, তখন তিনি তাঁর বাড়ির আঙিনায় একটি পাথরের সাথে তরবারিটি আঘাত করতে করতে ভেঙে ফেললেন।'[২৮৬]

তিনি বলেন, রাসুল ﷺ তাঁকে ফিতনা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।[২৮৭] তারপর তিনি একটি কাঠের তরবারি বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেটাকে সুন্দর করে বানিয়ে খাপের মধ্যে রেখে বাড়িতে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, 'এটা কেবল আমি দুষ্ট লোককে ভয় দেখানোর জন্য ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।'[২৮৮]

এভাবেই তিনি যে তরবারি দিয়ে জিহাদ করেছিলেন, সে তরবারি ভেঙে বসে ছিলেন। অথচ তখন অনেক মুসলিমের তরবারি শত্রুদের ছেড়ে মুসলিমের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছিল। কিন্তু তাঁর তরবারি ছিল কাঠের, যা কোনো মুসলিমকে হত্যা করে না। সুতরাং যাকে বলা হতো নবিজি ﷺ-এর অশ্বারোহী, তিনি বসে পড়লেন। জিহাদ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারেনি; কিন্তু ফিতনা তাঁকে ক্লান্ত করে ছেড়েছে। তাই সে ফিতনার কারণে তিনি কখনো কোনো মুসলিমের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করেননি।

---

২৮৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৪, আল-ইসাবাহ : ৬/৬৩।
২৮৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৫, আল-ইসাবাহ : ৬/৬৩।
২৮৭. আল-ইসতিআব : ৩/১৩৭৭, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২৭।
২৮৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৫।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর ১০ জন পুত্রসন্তান ও ছয়জন কন্যাসন্তান ছিল।[২৮৯] আব্দুর রহমান—এ নামে তাঁর উপনাম ছিল। উম্মে ইসা ও উম্মুল হারিসা—এদের মা হলেন উম্মে আমর বিনতে সালামা বিন ওয়াকশ। তিনি সালামা বিন সালা-মা ﷺ-এর বোন ছিলেন। আব্দুল্লাহ ও উম্মে আহমাদ—এদের মা হলেন আমরাহ বিনতে মাসউদ বিন আওস, আওস বংশের। সাদ, জাফর ও উম্মে জাইদ—এদের মা হলেন উম্মে ফুতাইলা বিনতে হুসাইন বিন জমজম। উমর—তার মা হলেন জাহরা বিনতে আম্মার বিন মামার। আনাস ও আমরাহ—এদের মা কালব গোত্রের শাখা গোত্র আবতা বংশের মহিলা। কাইস, জাইদ ও মুহাম্মাদ—এদের মা হলেন একজন দাসী। মাহমুদ ও হাফসা—এদের মা হলেন একজন দাসী।[২৯০] মাহমুদের কোনো উত্তরসূরি ছিল না।

তাঁর সন্তানদের মধ্যে পাঁচ ছেলে রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। জাফর, আব্দুল্লাহ, সাদ, আব্দুর রহমান ও উমর। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়িন।[২৯১]

তাঁর ভাই : মাহমুদ বিন মাসলামা। তিনি উহুদ, খন্দক ও খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খাইবার যুদ্ধে মারহাব নামক ইহুদি ওপর থেকে তাঁর মাথার ওপর জাঁতার চাকা ফেলে দেয়। চাকা এসে তাঁর মাথায় পড়ে মাথার মগজ বের হয়ে যায়। এর তিন দিন পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[২৯২]

তাঁর বোন : উম্মে উমাইস বিনতে মাসলামা ﷺ। ইনিই হচ্ছেন রাফি বিন খুদাইজ ﷺ-এর স্ত্রী। তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

---

২৮৯. আল-ইসতিবসার : ৪২২ পৃ., উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩০।
২৯০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৩।
২৯১. আল-ইসাবাহ : ৬/৬৩।
২৯২. আল-ইসতিবসার : ২৪৩ পৃ.।

'যদি কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে।'[২৯৩]

তিনি রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণকারী নারীদের একজন ছিলেন।[২৯৪] যেমনটা মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ؓ-এর স্ত্রী আমরাহ ؓ বাইআত গ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ছিলেন।[২৯৫] তাঁর অপর স্ত্রী উম্মে আমর বিনতে সালামা বিন ওয়াকশ ؓ-ও বাইআত গ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ছিলেন।[২৯৬]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ؓ-এর পুরা বাড়িটি ছিল এমনই ইমান আর তাকওয়ায় ভরা।

তিনি ছিলেন বড় বড় বীর ও নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম।[২৯৭] তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর আস্থাভাজন ব্যক্তি। রাসুল ﷺ-এর পরবর্তী খলিফাদেরও তিনি আস্থাভাজন ছিলেন।

তাঁর বীরত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে কাব বিন আশরাফের হত্যায় অংশগ্রহণকারী তাঁরই সাথি আব্বাদ বিন বিশর ؓ কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

রাসুল ﷺ থেকে তিনি ১৬টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৯৮] ইমাম বুখারি ؒ একক সূত্রে তাঁর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৯৯] তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন একদল সাহাবি ও তাবিয়ি।[৩০০] তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর ফতোয়া দানকারী সাহাবিদের একজন।[৩০১] তাঁকে ফকিহ সাহাবিদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

---

২৯৩. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১২৮।

২৯৪. আল-মুহাব্বার : ৪১১ পৃ.।

২৯৫. আল-মুহাব্বার : ৪১৪, ৪১৫ পৃ.।

২৯৬. আল-মুহাব্বার : ৪১৭ পৃ.।

২৯৭. খুলাসাতু তাহজিবিল কামাল : ৩৫৯ পৃ., আল-ইসতিআব : ৩/১৩৭৭, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২৭, আল-ইসতিবসার : ২৪১ পৃ.।

২৯৮. আসমাউস সাহাবাতির রুওয়াত- মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ : ২৮৩ পৃ., খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ৩৫৯ পৃ.।

২৯৯. খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ৩৫৯ পৃ.।

৩০০. বিস্তারিত দেখুন, আল-ইসাবাহ : ৬/৬৩, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৯২, তাহজিবুত তাহজিব : ৯/৪৫৪-৪৫৫, খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ৩৫৯ পৃ.।

৩০১. আসহাবুল ফুতইয়া মিনাস সাহাবাহ, মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ : ৩২০ পৃ.।

তিনি ছিলেন পিঙ্গল বর্ণের বেশ লম্বা সুঠাম দেহের অধিকারী। মাথায় ছিল টাক। একটু কালো, তবে তাম্র রংটাই ছিল আসল বর্ণ।[৩০২]

মানুষ হিসেবে তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে, ইসলামের সকল উন্নত শিক্ষার জীবন্ত আদর্শের একটি মাটির মানুষ জমিনে হেঁটে চলতেন। হয়তো তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিঃশর্ত আমানতদারিতা, বিরল পবিত্রতা আর মহা তাকওয়ার কথাই ভেসে উঠবে।

প্রাসাদের ফটক পুড়িয়ে ফেলার জন্য কুফায় এসে তিনি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ-এর মেহমান হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সফরের পাথেয় গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ফলে এই দীর্ঘ সফরে গাছের লতাপাতা খেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এসব খেয়ে পরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

যখন প্রাসাদের ফটক পুড়িয়ে ফেলার জন্য কুফার কাঠবিক্রেতার কাছে কাঠ ক্রয় করেছিলেন, তখন কাঠবিক্রেতার ওপর কাঠ বহনের শর্তারোপ করেছিলেন। কাঠ নিয়ে এসে নিঃসংকোচে ফটক জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। উমর ﷺ তাঁকে সদাকার সম্পদ উসুল করার দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন।[৩০৩]

রাসুল ﷺ-এর আবির্ভাবের ২২ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।[৩০৪] অর্থাৎ হিজরতের ৩৫ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কারণ নবুওয়াত পাওয়ার পর রাসুল ﷺ মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেছিলেন।

ইনতিকাল করেন ৪৩ হিজরিতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।[৩০৫]

তাঁর ইনতিকালের এই তারিখকেই আমরা প্রাধান্য দিই। যেহেতু ঐতিহাসিকগণ এ মতের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ মতটি তাঁর বয়সের সময়সীমার কাছাকাছি পৌছায়। একটি দুর্বল মতানুসারে বলা হয়, তিনি ৪৬ হিজরিতে

---

৩০২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৪, উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩১, আল-ইসতিআব : ৩/১৩৭৭, আল-ইসতিআব : ৩/৩৭৭।

৩০৩. আল-ইসতিবসার : ২৪২ পৃ.।

৩০৪. আল-ইসাবাহ : ৬/৬৩।

৩০৫. তাবারি : ৫/১৮১, ইবনুল আসির : ৩/৪২৫, তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/১৯০, তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি : ২/২৪৬, আল-ইবার : ১/৫২।

মদিনায় ইনতিকাল করেন।[৩০৬] মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর জানাজা পড়ান।[৩০৭] আবার বলা হয়, তিনি ৪৭ হিজরিতে ৯৯ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[৩০৮]

এখানে আরেকটি মত পাওয়া যায়। আর তা হলো, তাঁকে সিরিয়ার লোকেরা হত্যা করে। জর্ডানের এক লোক তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে হত্যা করে।[৩০৯] কারণ তিনি মুআবিয়া ﷺ থেকে দূরে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তবে বর্ণনাটি খুবই দুর্বল। কারণ অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ মতটি গ্রহণ করেননি। এবং সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত পোষণ করেছেন।

তিনি মদিনাতেই বাসস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ফিতনার সময়টি ছাড়া তিনি মদিনার বাইরে কোথাও বাস করেননি।[৩১০] মরুভূমির রবাজাহ এলাকায় গিয়ে ফিতনার সময় সেখানেই নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন।

এভাবেই তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি হয়েছিল। তাঁকে দেখে চোখ খুশিতে চকচক করে উঠত। গর্ব আর ভালোবাসায় বুক ফুলে উঠত। ইসলাম ও মুসলিমদের এমন সেবা করেছেন, যার কারণে ইতিহাসের পাতা আজও তাঁর আলোচনায় সুরভিত হয়ে আছে।

কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ ছিলেন বীর সাহাবিদের একজন। যার কারণে তাঁকে 'নবির অশ্বারোহী' বলে খেতাব দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার নিমিত্তে রাসুল ﷺ-এর পতাকাতলে কখনো সৈনিকের বেশে কখনো জেনারেল হয়ে নিজের বীরত্বকে কাজে লাগিয়েছিলেন। কখনো কমান্ডার হতেন অশ্বারোহী বাহিনীর, কখনো প্রধান হতেন রাসুল ﷺ-এর প্রহরীদলের বা মুসলিম বাহিনীর প্রহরীদলের। আবার কখনো রাসুল ﷺ-এর অভিযানের জেনারেল হতেন।

৩০৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪৫।
৩০৭. আল-ইসতিবসার : ৪২২ পৃ.।
৩০৮. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৯২।
৩০৯. আল-ইসাবাহ : ৬/৬৪।
৩১০. উসদুল গাবাহ : ৪/৩৩০, আল-ইসতিআব : ৩/১৩৭৭।

ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমনের ওপর আক্রমণ চালাতেন এককভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে। ত্রাস সৃষ্টি করেছেন ইসলামের দুশমনদের মনে।

একদল ঐতিহাসিকের উক্তিমতে রাসুল ﷺ তাঁকে প্রায় ১৫টি অভিযানের কমান্ডার বানিয়েছিলেন।[৩১১] ঐতিহাসিকগণ তার মধ্য থেকে কেবল তিনটি অভিযানের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার আলোচনা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে সৈনিক ও কমান্ডার হিসেবে তাঁর কর্মতৎপরতার মধ্যে যা প্রকাশ করার মতো, তা হচ্ছে, তিনি রাসুল ﷺ-এর প্রতিটি যুদ্ধে এবং তাঁর পরিচালিত প্রতিটি অভিযানে মূল কার্যকারণ হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি কোনো প্রচলিত সৈনিক বা প্রথাগত কমান্ডার ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন বিশেষ সৈনিক এবং ব্যতিক্রমধর্মী কমান্ডার। দৃঢ়চেতা সৈনিক এবং দৃঢ় বিশ্বাসের ইমাম। আকিদা আর আকিদার অনুসারীদের সেবায় নিয়োজিত রাখতেন স্বীয় আল্লাহ-প্রদত্ত স্বভাব এবং চর্চিত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ শক্তি।

স্বীয় আমির ও কমান্ডারের প্রতি ছিল তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্য। আর এই আনুগত্য এমনই অলঙ্ঘনীয় নীতি, যা সাধারণ সৈনিকের ওপর ভালো সৈনিকের এবং সাধারণ লোকের ওপর একজন সামরিক লোকের বিশেষত্ব অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা হিসেবে কাজে লাগে। এমন আনুগত্যের মতোই তিনি ফিতনা ও ফিতনার প্ররোচক এবং ফিতনার কারণ ও কার্যকারণের সাথে যুদ্ধ করেছেন সর্বস্ব শক্তি ও প্রত্যয়ের সাথে।

মুহূর্তে উপনীত হতে পারতেন সঠিক সিদ্ধান্তে। তাঁর সিদ্ধান্ত হতো শত্রু থেকে অর্জিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে। তাঁর আকাঙ্ক্ষার সিংহভাগ বিষয় ছিল শত্রুর সকল তথ্য হাসিল করা। তিনি ছিলেন অক্লান্ত উদ্যমী, যা কখনো থেমে যেত না। ফলে শত্রুর এমন কোনো তথ্য থেকে কখনো উদাস হতেন না, যা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। যেমন সহায়তা করেছিল এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর দুর্লভ মেধা।

দায়িত্ব বহন করতেন যথাযথভাবে। কখনো দায়িত্ব থেকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন না। এবং অন্যের ঘাড়েও তা চাপিয়ে দিতেন না। সাথি ও স্বীয় সৈনিকদের

---

৩১১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২৭।

মানসিক অবস্থা ও সক্ষমতা সম্পর্কে রাখতেন পূর্ণ ধারণা। যার কারণে প্রত্যেককে তাঁর সক্ষমতা ও মানসিক অবস্থা অনুযায়ী দিতে পারতেন কাজের দায়িত্ব।

বন্ধু, অধীনস্থ সৈনিক, আমির নির্বিশেষে সবার প্রতি যেমন ছিল তাঁর ভালোবাসা ও আস্থা, তেমন ছিল তাঁর প্রতি সবার আস্থা ও গভীর ভালোবাসা।

অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। যার কারণে ন্যায়ের জন্য কোনো রকম রীতি বা সৌজন্য ছাড়াই আমির-উমারা ও নেতৃত্ব পর্যায়ের লোকদের হিসাব কষতে কোনো পরোয়া করতেন না।

তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও মাননীয়। ছিলেন আলিম, বীর ও শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের মধ্যে গণ্য। ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তাঁর ত্যাগ ও কুরবানি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। ইসলামপূর্বেও যেমন আওস গোত্রে এবং স্বীয় পরিবারে সর্বজন শ্রদ্ধেয়, তেমন ইসলামে এসেও হয়েছেন সর্বজন সম্মানিত।

যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞান ছিল তাঁর স্বভাবজাত বিষয়। যা তাঁকে স্বভাবগতভাবেই প্রস্তুত করে তুলেছিল সৈনিক হিসেবে এবং বিশেষ করে কমান্ডার হিসেবে।

লক্ষ্য নির্ধারণ ও সংরক্ষণের নীতি পালন করতেন। অবিরাম অধ্যবসায়ের সাথে উদগ্রীব থাকতেন লক্ষ্য বাস্তবায়নের অপেক্ষায়। এক মুহূর্তের জন্যও কোনো লক্ষ্য আদায়ে নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে বিক্ষিপ্ত করতেন না, যা আসল লক্ষ্য পরিপূর্ণ আদায়ে ত্রুটি সৃষ্টি করে।

আক্রমণাত্মক আক্রমণের নীতি প্রয়োগ করতেন। সৈনিক বা কমান্ডার—যে অবস্থানে থেকেই যুদ্ধ করেছেন, তাঁর প্রতিটি যুদ্ধই ছিল আক্রমণাত্মক। লড়াইয়ের জীবনে কখনো তিনি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে জড়াননি।

অতর্কিত আক্রমণের নীতি ফলো করতেন। সাধারণভাবে এ নীতি যুদ্ধে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক অভিযানে তিনি এই অতর্কিত নীতি অনুসরণ করে শত্রুর ওপর আক্রমণ করেছিলেন। যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

নিরাপত্তার নীতি মেনে চলতেন। রাসুল ﷺ-এর নিরাপত্তা এবং মুসলিম বাহিনীর প্রহরায় অধিকাংশ সময় নিরাপত্তা বিষয়ে প্রধান দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন

করেছেন। ফলে শত্রু ইসলামি শক্তির ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার সুযোগ পায়নি। কারণ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁ ছিলেন পূর্ণ সতর্ক ও সচেতন ব্যক্তি। চতুর ও বিচক্ষণ যোদ্ধা।

এ হচ্ছে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁-এর সৈনিক ও কমান্ডার হিসেবে প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি। রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি রাসুল ﷺ-এর আস্থাভাজন পাত্র হবেন এবং পরবর্তী সময়ে খলিফাদের আস্থার জায়গা হবেন, এতে আশ্চর্যের কিছুই থাকতে পারে না। তিনি যে তাঁর সামরিক দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন, অংশ নেওয়া প্রতিটি যুদ্ধ ও অভিযানে তাঁর কার্যকর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন, এতে আশ্চর্য হলে অবাকই হতে হবে।

ইতিহাসে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁

বীর, নেতা, মান্যবর, বড় ও প্রথম সারির সাহাবি হিসেবেই ইতিহাস তাঁকে স্মরণ করে। অংশ নেওয়া প্রতিটি অভিযান ও যুদ্ধেই তাঁর প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। ছিলেন ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় সদা উদ্যমী ও কর্মতৎপর। তিনি সেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, যারা রাসুল ﷺ-এর জমানায় এবং রাসুল ﷺ-এর নির্দেশে নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব আদায় করেছিলেন।

রাসুল ﷺ-এর জমানায় রাসুল ﷺ-এর দিকনির্দেশনায় ইসলাম ও মুসলিমদেরকে তাদের ঘৃণ্যতর শত্রু থেকে মুক্ত করেছিলেন, কখনো একাকী, কখনো দলগতভাবে। সত্যের পক্ষে অবস্থান নিতে তিনি কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করতেন না। ফলে আমির-উমারাদের হিসেব কষতেন কোনো রকম নমনীয়তা ও সৌজন্যতা ছাড়া।

ফিতনা থেকে বাঁচতে পরিবার-পরিজন ছেড়ে দ্বীন নিয়ে পলায়ন করেছিলেন নির্জন মরুভূমিতে। ফিতনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, যেমন অন্যদের গ্রাস করেছিল।

আল্লাহ তাআলা এই কল্যাণময় মহান সাহাবির প্রতি তাঁর রহমতের অফুরন্ত ধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

জাইদ বিন হারিসা আল-কালবি ﷺ

তাঁর বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

জাইদ বিন হারিসা বিন শারাহিল বিন আব্দুল উজ্জা বিন ইমরুউল কাইস বিন আমির বিন নুমান বিন আমির বিন আবদে উদ্দা বিন আওফ বিন কিনানা বিন উজরাহ বিন জাইদ আল-লাত বিন রুফাইদা বিন সাওর বিন কালব বিন ওয়াবারাহ বিন তাগলিব বিন হুলওয়ান বিন জাফ বিন কুজাআহ বিন মালিক বিন আমর বিন মুররা বিন মালিক বিন হিমইয়ার বিন সাবা বিন ইয়াশজুব বিন ইয়ারুব বিন কাহতান। কখনো বংশধারা উল্লেখ করতে গিয়ে নাম আগে-পরে হয়ে যায়। কখনো আবার কম-বেশি হয়ে যায়।[৩১২]

এটা জানা কথা যে, আরবরা লিখিত ও বর্ণনাক্রম—দুভাবেই গুরুত্বের সাথে বংশধারা সংরক্ষণ করে। আরব উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বংশধারার উৎসের সংখ্যা অনেক। আজও যদি আপনি কোনো আরবের কাছে গিয়ে তার কোনো সন্তানকে বংশধারা জিজ্ঞাসা করেন, তবে সে তৎক্ষণাৎ তার বহু পূর্বপুরুষের নাম নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারবে। অনারবদের কাছে বংশধারা সংরক্ষণের প্রচলন নেই। অতএব আরব বংশধারার শুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতার ধারাবাহিকতায় তাদের সন্দেহ হওয়াটা কোনো অপরিচিত বিষয় নয়।

৩১২. আল-ইসতিআব : ২/৫৪২, উসদুল গাবাহ : ২/২২৪।

তাঁর মাতা : সুদা বিনতে সালাবা বিন আবদে আমির বিন আফলাতা। আফলাতা হচ্ছেন মা'ন বিন তায়ি গোত্রের ব্যক্তি।[৩১৩]

জাহিলি যুগের কথা। জাইদের মা সুদা জাইদকে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে যান। তখন কাইন বিন জাসর গোত্রের একদল অশ্বারোহী সে এলাকায় হামলা করে বসে। তারা বনু মা'ন-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় জাইদ ﷺ-কে লুট করে নিয়ে যায়। তখন জাইদ ﷺ শৈশব পার করে কেবল কৈশোরে পা রেখেছেন। তারা তাঁকে নিয়ে উকাজ বাজারে বিক্রি করতে ওঠায়। হাকিম বিন হিজাম বিন খুওয়াইলিদ তার ফুফু খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের জন্য ৪০০ দিরহামের বিনিময়ে জাইদকে ক্রয় করে নেয়। যখন রাসুল ﷺ-এর সাথে খাদিজা ﷺ-এর বিয়ে হলো, তখন তিনি জাইদকে রাসুল ﷺ-এর কাছে উপহার হিসেবে দান করলেন।[৩১৪]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, জাহিলি যুগে দস্যুদল তাকে ধরে আনে। তখন হাকিম বিন হিজাম হুবাশা বাজারে তাকে ক্রয় করে। হুবাশা মক্কার এক প্রান্তে একটি বাজারের নাম। প্রতি বছর আরবদের জন্য এ বাজারের আয়োজন হতো। হাকিম বিন হিজাম তার ফুফু খাদিজার জন্য জাইদকে ক্রয় করে। অতঃপর খাদিজা ﷺ তাকে রাসুল ﷺ-কে উপহার হিসেবে দান করেন।[৩১৫]

আরেকটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ﷺ মক্কার এক নিম্নভূমিতে দেখলেন, জাইদকে বিক্রয়ের জন্য ডাকা হচ্ছে। রাসুল ﷺ এ কথা খাদিজা ﷺ-কে জানালেন। তখন খাদিজা ﷺ রাসুল ﷺ-কে তাকে ক্রয় করতে বললেন। রাসুল ﷺ খাদিজা ﷺ-এর সম্পদ দিয়ে জাইদকে ক্রয় করেন। এরপর খাদিজা ﷺ তাকে রাসুল ﷺ-কে উপহার দেন।[৩১৬]

আবার এ কথাও বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ জাইদকে সিরিয়ায় ক্রয় করেছিলেন খাদিজা ﷺ-এর জন্য। যখন খাদিজা ﷺ মাইসারাকে সঙ্গে দিয়ে রাসুল ﷺ-কে

---

৩১৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪০, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৬৭, উসদুল গাবাহ : ২/২২৪, আল-ইসতিআব : ২/৫৪২, আল-ইসাবাহ : ৩/২৫।

৩১৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪০-৪১, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৬৭।

৩১৫. আল-ইসতিআব : ২/৫৪৩।

৩১৬. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২০২।

ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। এরপর খাদিজা ﷺ তাকে রাসুল ﷺ-কে উপহার দেন।[৩১৭]

তবে সর্বসম্মত কথা হলো, জাইদ ﷺ ছিলেন স্বাধীন মানুষ। দস্যুদের কবলে পড়ে বিক্রি হতে হয়। ফলে খাদিজা ﷺ-এর দাসে পরিণত হন, এরপর রাসুল ﷺ-এর দাসে। কে তাঁকে ক্রয় করেছে এবং কোথায় ক্রয় করা হয়েছে—আমার কাছে সে আলোচনার কোনো গুরুত্ব রাখে না।

জাইদকে হারিয়ে জাইদের বাবা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবৃত্তি করেছিল :

'জাইদের জন্য কত কাঁদলাম, জানি না তার কী দশা, জীবিত থাকার আশা রাখব নাকি মৃত্যুর কোলে পড়েছে!

আল্লাহর শপথ, জানি না যদি জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, তোমার বিনাশ করেছে কি নরম জমিন না শক্ত পাহাড়!

হায়, আমার কবিতা! যুগের পরেও কি তুমি ফিরে আসবে, তবে তোমার ফেরাই দুনিয়াভরা আমার খুশি হতো!

সূর্য উদয় হতে হতে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অস্ত যাওয়ার সময়ও তার স্মরণ সামনে এনে দেয়।

বাতাস বইলে তার স্মৃতি উসকে দেয়। হায়, কত দীর্ঘ হলো তাকে হারানোর ব্যথা, কত দীর্ঘ হলো সময়!

অচিরেই উটে চরে জমিন চষে বেড়াব, ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হব না; যদিও উট ক্লান্ত হয়।

ঘুরব জীবনভর; অথবা আমার মরণ হলে হবে। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করব; যদিও সবাই আশাহত করে।

তাকে খুঁজতে অসিয়ত করব কাইস আমর দুজনকেই, অসিয়ত করব ইয়াজিদকে তাদের পরে জাবালকে।'

---

৩১৭. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৬৭।

জাবাল হচ্ছে জাইদের আপন ভাই। সে জাইদের বড় ছিল। আর ইয়াজিদ জাইদের বৈপিত্রেয় ভাই। তার পিতা হলো কাব বিন শারাহিল।[৩১৮]

কিছুকাল পরে বনু কিলাব গোত্রের কিছু লোক হজ করতে মক্কায় আসে। তারা জাইদকে দেখে চিনে ফেলে এবং জাইদও তাদের চিনে ফেলেন। তখন জাইদ বলেন, 'আমার পরিবারের লোকদের কাছে আমার এ কবিতা পৌঁছে দেবেন। আমি জানি, তারা আমার কারণে অনেক ব্যথিত।' এরপর বলেন :

'আমার কওমের প্রতি আমি অভিমান পোষণ করি,

দূরে থাকা সত্ত্বেও অনুভতি জেগে ওঠার সময় আমি তাদের মাঝেই বসবাস করি।

যেই আবেগ তোমাদের বেদনায় ভাসাচ্ছে ছুড়ে ফেলো তাকে,

বিরত থেকো উটকে অতি হাঁকানো থেকে।

আল্লাহর প্রশংসায় আমি আছি সুখ-শান্তির নীড়ে,

সম্মানিত মহান মানুষের পরিবারে।'

কালব গোত্রের লোকেরা হজ শেষে বাড়িতে ফিরে গেল। জাইদের পিতাকে তাঁর খবর জানাল। কোথায় আছে এবং কার কাছে আছে, তাও বলে দিল। তখন জাইদের পিতা হারিসা এবং তাঁর চাচা কাব মুক্তিপণের টাকা নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হলো।[৩১৯] তারা মক্কায় এসে রাসুল ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। বলা হলো, তিনি মসজিদে আছেন। তারা রাসুল ﷺ-এর সামনে এসে বলল, 'হে আব্দুল্লাহর পুত্র, হে আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র, হে হাশিমের পৌত্র, হে কওমের সর্দারের পৌত্র, আপনারা হারামের বাসিন্দা, হারামের প্রতিবেশী এবং আল্লাহর ঘরের কাছেই আপনাদের বাস। আপনারা বন্দীদের মুক্ত করেন, কয়েদিদের আহার দান করেন। আমাদের ছেলের জন্য আপনার কাছে এসেছি, সে আপনার কাছে আছে। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, মুক্তিপণ নিয়ে আমাদের

---

৩১৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪১, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৬৭-৪৬৮, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৬।

৩১৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪১-৪২। আনসুল আশরাফ (১/৪৬৮) গ্রন্থে আছে, হারিসা, কাব ও জাবালা বিন হারিসা মুক্তিপণ নিয়ে এসেছিল।

প্রতি দয়া করুন। আমরা আপনাকে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দেবো। রাসুল ﷺ বললেন, 'সে কে?' তারা বলল, 'জাইদ বিন হারিসা।' রাসুল ﷺ বললেন, 'এ ছাড়া আপনাদের অন্য কিছু চাওয়ার আছে?' তারা বলল, 'সেটি কী?' রাসুল ﷺ বললেন, 'তাকে ডাকুন এবং তাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিন। যদি আপনাদের গ্রহণ করে, তবে বিনা মুক্তিপণে সে আপনাদের আর যদি আমাকে গ্রহণ করে, তবে আল্লাহর শপথ, যে আমাকে গ্রহণ করেছে, তাকে ছাড়া আমি কাউকে গ্রহণ করব না।' তারা বলল, 'আপনি আমাদের চাওয়ার চেয়ে বেশি দিয়েছেন, আমাদের প্রতি দয়া করেছেন।' রাসুল ﷺ জাইদকে ডেকে বললেন, 'তুমি এদের চেনো?' জাইদ বলল, 'জি, চিনি।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তারা কারা?' জাইদ ؓ বলল, 'ইনি আমার বাবা আর ইনি আমার চাচা।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আমি কে, চিনেছ তো। আমার আচরণ দেখেছ তো? তোমার ইচ্ছা, চাইলে আমাকেও গ্রহণ করতে পারো আবার তাদেরকেও গ্রহণ করতে পারো।' তখন জাইদ ؓ বলল, 'আমি আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আমার কাছে আমার মা-বাবার মতো।' তখন তারা বলল, 'পোড়া কপাল, হে জাইদ, তুমি কি তোমার পিতামাতা, পরিবার এবং স্বাধীন জীবনের ওপর দাসত্বের জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ?!' জাইদ ؓ বলল, 'হ্যাঁ, এ ব্যক্তির কাছে এমন আচরণ পেয়েছি, তার ওপর আমি অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না।' রাসুল ﷺ এ অবস্থা দেখে জাইদকে নিয়ে কাবা-প্রাঙ্গণে গিয়ে বললেন, 'উপস্থিত লোক সকল, আপনারা সাক্ষী থাকুন, জাইদ আমার পুত্র। আমি তার ওয়ারিস হব এবং সে আমার ওয়ারিস হবে।' এ পরিস্থিতি দেখে তাঁর বাবা ও চাচার মন খুশিতে ভরে গেল। এরপর তারা চলে গেল। এরপর থেকে ইসলাম আসা পর্যন্ত তাকে জাইদ বিন মুহাম্মাদ বলে ডাকা হতো।[৩২০]

এ হাদিসের বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় এ ঘটনা রাসুল ﷺ-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে ঘটেছিল। এবং জাইদকে মুক্ত করার জন্য হারিসা ও কাবের মক্কায় আগমনও হয়েছিল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে।

---

৩২০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪১-৪২, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪/৬৮-৪৬৯, আল-আসাবাহ : ৩/২৫, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৬-৪৫৭।

এখানে যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তা হলো, জাইদ ﷺ তাঁর পিতাকে বললেন, 'আমি এই ব্যক্তির মাঝে এমন জিনিস দেখেছি, যার কারণে তাঁর পরিবর্তে আমি অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারি না।' রাসুল ﷺ-এর মাঝে জাইদ ﷺ কোন জিনিসটা প্রত্যক্ষ করেছিল? উত্তম আখলাক, সদাচার? এটা অবশ্য ঠিক আছে। তবে রাসুল ﷺ-কে গ্রহণ করার জন্য এই গুণই যথেষ্ট নয়। কারণ এ বিবেচনায় কাউকে পিতামাতা ও পরিবার-পরিজনের পরিবর্তে গ্রহণ করা একটু কঠিন। এ গ্রহণটা কেবল আকিদার কারণেই হতে পারে। যে আকিদা-বিশ্বাসই একজন মুমিনকে অকল্পনীয় ত্যাগ ও কুরবানি করতে উদ্বুদ্ধ করে।

জাইদকে মুক্ত করার জন্য হারিসা ও তার ভাইয়ের আগমনের বিষয়টি আমি ইসলামের আবির্ভাবের পরে বলেই অগ্রাধিকার দেবো। এই সময়ের মধ্যে জাইদ ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল ﷺ-এর সাথে একটা গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এই নবুওয়াতের গুণই দেখেছিল জাইদ ﷺ রাসুল ﷺ-এর মাঝে।

হয়তো এর প্রমাণ হিসেবে এ বর্ণনাকে দাঁড় করানো যাবে, যা শুধু একটি উৎসগ্রন্থে এসেছে, 'জাইদের পিতা হারিসা জাইদের সন্ধানে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিম হয়ে নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়েছিলেন।'[৩২১] সুতরাং জাইদের ইসলামই জাইদকে স্বীয় পিতামাতার পরিবর্তে রাসুল ﷺ-কে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর তাঁর পিতা হারিসার ইসলাম তাকে খুশি মনে ফিরে যেতে সাহায্য করেছিল।

জাইদ ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণ

ইমাম জুহরি ﷺ বলেন, 'সর্বপ্রথম জাইদ ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেন।'[৩২২] তিনি এটাও বলেন, 'নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন খাদিজা ﷺ এবং পুরুষদের মধ্যে জাইদ বিন হারিসা ﷺ।'[৩২৩] জুহরি ছাড়া অন্যরা বলেন, 'সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন জাইদ বিন হারিসা।'[৩২৪]

---

৩২১. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২০৩।
৩২২. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭০।
৩২৩. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭১।
৩২৪. ইবনুল আসির : ২/৫৯।

জাইদ বিন হারিসা ও আলি বিন আবু তালিব রাসুল ﷺ-এর কাছে থাকতেন। রাসুল ﷺ দিনের শুরুতে কাবায় গিয়ে দুহার সালাত আদায় করতেন। কুরাইশরা এটাকে অপছন্দ করত না। অন্য কোনো সালাত আদায় করলে তখন আলি ও জাইদ বসে রাসুল ﷺ-কে পাহারাদারি করতেন।[৩২৫]

বলা হয়, জাইদ ؓ ইসলাম গ্রহণ করেছেন আলি ؓ-এর পরে। তাই আলি ؓ-এর পরে সর্বপ্রথম পুরুষ হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করে সালাত পড়েছেন জাইদ বিন হারিসা ؓ।[৩২৬]

আবার বলা হয়, প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন খাদিজা ؓ। খাদিজা ؓ-এর পরে আলি ؓ। আলি ؓ-এর পরে জাইদ ؓ। তারপর আবু বকর ؓ।[৩২৭]

আবার বলা হয়, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন খাদিজা ؓ। এরপর শিশুদের মধ্যে আলি ؓ। এরপর পুরুষদের মধ্যে আবু বকর ؓ। এরপরে জাইদ বিন হারিসা ؓ।[৩২৮]

এসব উক্তির মধ্যে আমি কোনো বৈপরীত্য দেখছি না। কারণ নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন খাদিজা ؓ। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু বকর ؓ। শিশুদের মধ্যে সর্বপ্রথম আলি ؓ এবং দাসদের মধ্যে সর্বপ্রথম জাইদ বিন হারিসা ؓ। ইসলামে এরাই সর্বপ্রথম শুভাগমন করেন।

এই ছোট দলটি সবার আগে ইসলামে প্রবেশ করে। এরপর আস্তে আস্তে মানুষ ইসলামে আসতে থাকে। মক্কায় ইসলামের প্রসার হতে থাকে, চলতে থাকে মানুষের মাঝে ইসলাম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা।[৩২৯] এই দলটির মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীর ব্যাপারে মতানৈক্য একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। তবে সকলের আগে জাইদের ইসলাম গ্রহণ প্রাধান্য দেওয়ার মতটি দুর্বল।[৩৩০]

---

৩২৫. আনসাবুল আশরাফ : ১/১১৩, ইবনুল আসির : ২/৫৯।
৩২৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/২৬৫, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৮।
৩২৭. উসদুল গাবাহ : ২/২২৬।
৩২৮. জাওয়ামিউস সিরাহ : ৪৫ পৃ.।
৩২৯. ইবনুল আসির : ২/৫৯।
৩৩০. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২০২।

মতানৈক্যের কোনো দরকার ছিল না, কেননা প্রত্যেকেই ইসলামে সর্বপ্রথম পদচারণকারী। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর শ্রেণির লোকের মাঝে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। সুতরাং দাসদের মধ্যে জাইদ ﵁ সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী না হলে তাহলে আর কে হতে পারে!

তায়িফ গমন

'শিআবে আবু তালিব' গিরিপথে টানা তিন বছর দুর্বিষহ জীবন পার করতে হয়। শিআবে আবু তালিব থেকে বের হওয়ার পর হিজরতের তিন বছর পূর্বে রাসুল ﷺ-এর চাচা আবু তালিব এবং মুমিনদের মা খাদিজা ﵂ মৃত্যুবরণ করেন। আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন শাওয়াল অথবা জিলকদ মাসে। তখন তার বয়স ৮০ পার হয়েছিল। তার ৩৫ দিন আগে ইনতিকাল করেন খাদিজা ﵂। একটি দুর্বল মতানুসারে দুজনের মৃত্যুর মাঝে ৫৫ দিনের ব্যবধান ছিল। আরেকটি দুর্বল মতানুসারে তিন দিনের ব্যবধান।

এ দুজনের ইনতিকালের পরে রাসুল ﷺ-এর ওপর বিপদের মাত্রা বেড়ে যায়। রাসুল ﷺ বলেন, 'আবু তালিবের মৃত্যু পর্যন্ত কুরাইশরা আমাকে তেমন একটা কষ্ট দিতে পারেনি।' এ কথা তিনি এ কারণে বলেছেন, আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা রাসুল ﷺ-এর ওপর যে পরিমাণে নির্যাতন শুরু করে দেয়, যা আবু তালিবের জীবদ্দশায় করতে পারেনি। একজন তো রাসুল ﷺ-এর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করেছিল। আরেকজন সালাত অবস্থায় রাসুল ﷺ-এর ওপর বকরির নাড়িভুঁড়ি উঠিয়ে দিয়েছিল। ফেরার পথে সে নাড়িভুঁড়ি রাসুল ﷺ বের করে নিয়ে যেতেন আর বলতেন, 'হে আবদে মানাফ গোত্র, প্রতিবেশীর সাথে এটা কেমন আচরণ!' এরপর তা রাস্তায় কোথাও ফেলে দিতেন।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর নির্যাতনের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে রাসুল ﷺ জাইদ ﵁-কে সাথে নিয়ে বনু সাকিফের কাছে সাহায্য তলবের আশায় তায়িফ গমন করেন। বনু সাকিফের তিন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে তায়িফ গেলেন। তারা তিন ভাই, আবদে ইয়ালা, মাসউদ ও হাবিব। এরা তখন ওই বনু সাকিফের নেতা। রাসুল ﷺ তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন। ইসলামের সাহায্যের জন্য তাদের সাথে কথা বললেন। কিন্তু তারা তাঁকে অসম্মানজনকভাবে ফিরিয়ে দেয়।

রাসুল ﷺ তাদের কল্যাণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলেন। তাদের বললেন, 'তোমরা যখন অস্বীকার করলে তখন তা অন্যদের কাছে গোপন রেখো।' তিনি চাইলেন না এ ব্যর্থতার কথা তাঁর কওমের লোকেরা জানুক। কিন্তু তারা রাসুল ﷺ-এর কথা রাখল না। নির্বোধ উচ্ছৃঙ্খল লোকদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। হতভাগারা রাসুল ﷺ-এর ওপর পাথরবৃষ্টি করল। রক্তাক্ত হলো রাসুল ﷺ-এর পবিত্র দেহ। রক্ত জমাট বেঁধে আটকে গেল পায়ের জুতো। রাসুল ﷺ রবিআর ছেলে উতবা ও শাইবার খেজুরবাগানে এসে আশ্রয় নিলেন। হতভাগারা ফিরে গেল। রাসুল ﷺ গাছের ছায়ায় বসে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ, আপনার কাছেই আমার দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা জানাচ্ছি। হে আল্লাহ, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। আপনি দুর্বলদের রব। আপনি আমার রব। আপনি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছেন? গোমড়ামুখো শত্রুর কাছে, নাকি এমন শত্রুর কাছে, যাকে আমার অবস্থার মালিক বানিয়েছেন? যদি আমার ওপর আপনার রাগ না থাকে, তবে আমি কিছু পরোয়া করি না। কিন্তু আপনার নিরাপত্তাই অধিক প্রশস্ত। আমার ওপর আপনার ক্রোধ ও গোস্বা আপতিত হওয়া থেকে আপনার চেহারার নুরের আশ্রয় কামনা করছি। যার দ্বারা সকল আঁধার আলোকিত হয়েছে। এবং দুনিয়া-আখিরাতের সবকিছু ঠিকঠাক আছে।'[৩৩১]

রাসুল ﷺ মক্কায় ফিরে এলেন। সাথে জাইদ رضي الله عنه-ও ফিরে এলেন; যিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন, চোখের পলকের জন্য আলাদা হতেন না। তায়িফ সফরে রাসুল ﷺ-এর সাথে অংশ নিয়েছেন। ইসলামের পথে দাওয়াতে কী অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার শিকার হতে হয়, তা স্বচক্ষে অবলোকন করলেন।

হিজরত

রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরতের অনুমতি দেওয়ার পর জাইদ رضي الله عنه সেখানে হিজরত করলেন। মদিনায় গিয়ে সাদ বিন খাইসামা رضي الله عنه-এর বাড়িতে মেহমান হলেন।[৩৩২]

৩৩১. ইবনুল আসির : ২/৯১-৯২।
৩৩২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪।

একটি দুর্বল মতানুসারে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব ও তাঁর মিত্র আবু মারসাদ কান্নাজ বিন হুসাইন গানাবি এবং জাইদ বিন হারিসা ؓ, এ তিনজন কুবায় কুলসুম বিন হিদমের বাড়িতে মেহমান হন। আরেকটি দুর্বল মতানুসারে তারা সাদ বিন খাইসামার বাড়িতে মেহমান হন।[৩৩৩]

কুবায় বা মদিনায়, যে আনসারির বাড়িতেই তিনি মেহমান হন না কেন, তিনি একটি আশ্রয়স্থল পেয়েছিলেন। যেখান থেকে তিনি নিজের শক্তি-সামর্থ্য ইসলামের সেবায় নিয়োগ করেছিলেন।

মদিনায় রাসুল ﷺ জাইদ ؓ ও উসাইদ বিন হুজাইর ؓ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন।[৩৩৪] একটি দুর্বল মতানুসারে জাইদ ؓ ও জাফর বিন আবু তালিবের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন।[৩৩৫] আরেকটি দুর্বল মতানুসারে, রাসুল ﷺ জাইদ ؓ ও হামজা ؓ-এর মাঝে আবার জাইদ ؓ ও হুজাইর বিন উসাইদ ؓ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন।[৩৩৬]

সম্ভবত রাসুল ﷺ জাইদ ؓ ও হামজা ؓ-এর মাঝে হিজরতের পূর্বে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন।[৩৩৭] উহুদের যুদ্ধের সূচনাকালে হামজা ؓ তাঁর কাছেই জীবনের শেষ অসিয়ত করেছিলেন।[৩৩৮] আর হিজরতের পরে মদিনায় যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করা হয়েছিল, তা ছিল জাইদ ؓ ও হুজাইর বিন উসাইদ ؓ-এর মাঝে।

আর জাইদ ؓ ও জাফর ؓ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, জাফর ؓ হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁর সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসেন খাইবারের যুদ্ধের সময়।[৩৩৯] আর

---

৩৩৩. জাওয়ামিউস সিরাহ : ৮৯ পৃ.। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪।
৩৩৪. আল-মুহাব্বার : ৭১ পৃ.।
৩৩৫. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২০২ পৃ.।
৩৩৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪, আল-ইসাবাহ : ৩/২৬, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৭, উসদুল গাবাহ : ২/২২৬।
৩৩৭. আদ-দুরার ফি ইখতিসারিল মাগাজি ওয়াস সিয়ার : ১০০ পৃ.।
৩৩৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১২৪, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৬৮, আল-ইসাবাহ : ১/৩৭।
৩৩৯. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৪৮।

খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে।[৩৪০] সুতরাং রাসুল ﷺ হিজরতের ওই শেষ বছরে এসে জাইদ ؓ ও জাফর ؓ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করবেন—এটা একটা সংশয়পূর্ণ বিষয়। যেহেতু হিজরতের পরপরই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপনের কাজ চলেছিল।

এভাবেই নতুন বাড়ি মুসলিমদের নিরাপদ ঘাঁটি মদিনাতে তাঁর আশ্রয়স্থল তৈরি হয়। পেয়ে যান মেরুদণ্ড শক্তিশালী করার ভাই এবং সুখে-দুঃখে সাহায্য-সহযোগিতার সমাজ।

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে

রাসুল ﷺ তাঁর হিজরতের ১৯ মাসে অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরির রমাদানের ১২ তারিখে মদিনা থেকে বদর অভিমুখে রওয়ানা হন।

সেদিন মুসলিমদের আরোহণের জন্য ৭০টি উট ছিল। একেকটি উটে পালাক্রমে দুই থেকে তিনজন অথবা চারজনও আরোহণ করেছেন। রাসুল ﷺ, আলি ؓ ও জাইদ ؓ-এর জন্য একটি উট ছিল।[৩৪১] আরেক বর্ণনায় আছে, রাসুল ﷺ, আলি ؓ ও মারসাদ বিন আবু মারসাদ ؓ একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করেছেন। আর হামজা ؓ, জাইদ ؓ, আবু কাবশা ؓ ও রাসুল ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম আনাসাহ ؓ একটি উটে আরোহণ করেন।[৩৪২] দ্বিতীয় বর্ণনাটিই নির্ভরযোগ্য। যেহেতু অধিকাংশ ঐতিহাসিক এর ওপর একমত পোষণ করেছেন।

তিনি বদরে রাসুল ﷺ-এর তিরন্দাজ বাহিনীর মধ্যে ছিলেন।[৩৪৩] এ ঐতিহাসিক যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ে এই তিরন্দাজ বাহিনীর বিরাট ভূমিকা ছিল।

---

৩৪০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩৭৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ (২/১০৬) গ্রন্থে আছে, খাইবারের যুদ্ধ সপ্তম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

৩৪১. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৮৯।

৩৪২. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১০৮ পৃ.।

৩৪৩. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩২৩। দেখুন, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২০২, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৫।

এ যুদ্ধে তিনি হানজালা বিন আবু সুফিয়ান বিন সখরকে হত্যা করেন। সে কুরাইশের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিল।[৩৪৪]

তাঁকে রাসুল ﷺ বদরের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে মদিনার নিম্নভূমিতে পাঠিয়েছিলেন।[৩৪৫] মদিনার উঁচু এলাকায় পাঠিয়েছিলেন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-কে। উসামা বিন জাইদ ﷺ বলেন, 'আমাদের কাছে বদরের বিজয়ের সংবাদ ওই সময় আসে, যখন আমরা মাত্র রাসুল ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়া ﷺ-কে কবরে দাফন করে ফারিগ হচ্ছিলাম। রাসুল ﷺ আমাকে উসমান ﷺ-এর সাথে মদিনায় রেখে গিয়েছিলেন। জাইদ বিন হারিসা ﷺ আসার খবর শুনে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাঁকে উদ্দেশ্য করে মানুষ ইদগাহ ময়দানে ভিড় জমিয়েছে। তিনি লোকদের বলছিলেন, "উতবা বিন রবিআ নিহত হয়েছে। শাইবা বিন রবিআ নিহত হয়েছে। আবু জাহেল বিন হিশাম নিহত হয়েছে। জামআহ বিন আসওয়াদ নিহত হয়েছে। আবুল বুখতারি আস বিন হিশাম নিহত হয়েছে। উমাইয়া বিন খালাফ নিহত হয়েছে। হাজ্জাজের দুই ছেলে নুবাইয়া ও মুনাব্বিহ নিহত হয়েছে।" আমি বললাম, "বাবা, এটা কি সত্য খবর?" বললেন, "হ্যাঁ, বেটা, হ্যাঁ!"'[৩৪৬]

অথচ এক মুনাফিক উসামা ﷺ-কে বলেছিল, 'তোমাদের সাথিসহ সকলে নিহত হয়েছে।' আরেক মুনাফিক আবু লুবাবা ﷺ-কে বলেছিল, 'তোমাদের সাথিরা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এর পরে আর কখনো সংঘবদ্ধ হতে পারবে না। মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। এই যে তাঁর উটনী। এই যে জাইদ, ভয়ে তাঁর মুখ থেকে কথা বের হচ্ছে না।' উসামা ﷺ বলেন, 'তখন আমি আমার বাবার কাছে আসলাম। বাবা মুনাফিকদের কথা প্রত্যাখ্যান করলেন।'[৩৪৭]

জাইদ ﷺ মদিনাবাসীর ভয় দূর করতে পেরেছিলেন। এবং মুনাফিকদের অপপ্রচার দূর করে মদিনায় স্বস্তি ও প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

---

৩৪৪. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৪৭ পৃ.।
৩৪৫. আল-মুহাব্বার : ২৭৮ পৃ., তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২০২, উসদুল গাবাহ : ২/২২৬।
৩৪৬. সিরাতে ইবনি হিশাম : ২/২৮৪-২৮৫।
৩৪৭. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৯৪। দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১১৪।

বদরের চূড়ান্ত লড়াইয়ে জাইদ ﵁-এর অবস্থান নিশ্চয় প্রধান ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছিল।

কারাদাহ অভিযানের কমান্ডার[৩৪৮]

এটি প্রথম অভিযান, যে অভিযানে জাইদ ﵁ সর্বপ্রথম কমান্ডার হয়েছিলেন। হিজরতের ২৭ মাসের মাথায় অর্থাৎ তৃতীয় হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়।[৩৪৯]

কুরাইশরা সিরিয়ার পথে চলতে রাসুল ﷺ ও তাঁর সাথিদের ভয় করছিল। তারা ছিল বণিক সম্প্রদায়। ব্যবসার ওপর নির্ভর করত তাদের রুজি-রুটি। তাই তো সফওয়ান বিন উমাইয়া বলেছে, 'মুহাম্মাদ আর তাঁর সাথিরা তো আমাদের ব্যবসার চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। বুঝতে পারছি না, তাঁর সাথিদের সাথে কী করব! তারা উপকূলীয় রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে না। উপকূলীয় লোকেরা তাঁদের সাথে সন্ধি করেছে। তাদের সাধারণ লোকেরা সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছে। বুঝতে পারছি না, কোন পথে চলব! যদি ব্যবসা না করে বসে থাকি, তাহলে মূলধন খেয়ে শেষ করব।[৩৫০] আমাদের এ দেশে থেকে আমাদের কোনো খরচের উপায় নেই। এখানে আমরা ব্যবসার ওপর নির্ভর করে বসবাস করি। গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় আর শীতকালে হাবশায়।' তখন তাকে আওয়াদ বিন মুত্তালিব বলল, 'তাহলে উপকূলীয় রাস্তা ছেড়ে ইরাকের পথ ধরো।'

সফওয়ান ইরাকের পথ সম্পর্কে জানত না। তাই গাইড হিসেবে ফুরাত বিন হাইয়ান ইজলকে ভাড়া নিল। ফুরাত তাকে বলল, 'আমি তোমাকে ইরাকের পথে নিয়ে যাব। সে পথে মুহাম্মাদের কোনো সাথি চলেনি। এটা হলো নাজদ ও ফায়াফি অঞ্চল।' সফওয়ান বলল, 'এটাই তো আমার দরকার। ফায়াফির রাস্তায় তো আমরা শীতকালে যাচ্ছি। তখন আমাদের সামান্য পানি হলে চলবে।'

---

৩৪৮. নাজদের একটি এলাকার নাম কারাদাহ। যা জাতে ইরকের প্রান্তে রাবাজাহ এবং গামারার মাঝে অবস্থিত। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৩৬, মুজামুল বুলদান : ৭/৫০।

৩৪৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৯৭। তাবাকাতু ইবনি সাদ (২/৩৬) গ্রন্থে এসেছে, হিজরতের ২৮ মাসের মাথায়।

৩৫০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৯৭।

সফওয়ান সফরের প্রস্তুতি নিল। আবু জামআহ তার সাথে ৩০০ মিসকাল স্বর্ণ ও কয়েকটি রুপার পিণ্ড দিয়ে দিল। কুরাইশের কিছু লোক তার সাথে অনেক আসবাবপত্র দিল। কুরাইশের আরও কিছু লোক নিয়ে তার সাথে আব্দুল্লাহ বিন আবু রবিআহ ও হুওয়াইতিব বিন আব্দুল উজ্জাও সফরসঙ্গী হলো। সফওয়ান অনেক মাল নিয়ে বের হলো। যেমন : কয়েকটি রুপার পিণ্ড, ৩০ হাজার দিরহাম ওজনের রুপার আসবাবপত্র। তারা 'জাতে ইরক'-এর পথ ধরে আগাল।

এই সময়ে নুআইম বিন মাসউদ আশজায়ি মদিনায় আসলো। সে তখন তার ধর্মের ওপর ছিল। সে বনু নাজির গোত্রের কিনানা বিন আবুল হুকাইকের বাড়িতে মেহমান হলো। সে মদ পান করল। তার সাথে সালিত বিন নুমান বিন আসলামাও মদ পান করল। সে সময় মদ নিষিদ্ধ করা হয়নি। সালিত তখন বনু নাজিরে এসে মদ পান করে যেত। নুআইম সেই আসরে সফওয়ানের ব্যবসায় রওয়ানা হওয়ার কথা বলে দেয় এবং কাফেলায় কী পরিমাণ মাল আছে, তাও সে বলে দিল। কালবিলম্ব না করে সালিত ﷺ সেখান থেকে সোজা রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে খবর জানাল। রাসুল ﷺ তখন ১০০ আরোহী দিয়ে জাইদ বিন হারিসা ﷺ-কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা কুরাইশ কাফেলার সামনে গিয়ে আক্রমণ করল। কুরাইশের লোকেরা পলায়ন করল। একজন বা দুজন বন্দী হলো।

কুরাইশের ব্যবসার মালামাল নিয়ে জাইদ ﷺ মদিনায় উপস্থিত হলেন। এরপর সম্পদগুলোকে পাঁচ ভাগ করলেন। তখনকার সময়ে পাঁচ ভাগের এক ভাগের মূল্য ছিল বিশ হাজার দিরহাম সমান। বাকি চার ভাগ অভিযানের সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করা হলো।

অভিযানে ফুরাত বিন হাইয়ান বন্দী হয়েছিল। তাকে রাসুল ﷺ-এর সামনে আনা হলে সে ইসলাম গ্রহণ করে। রাদিয়াল্লাহু আনহু।[৩৫১]

রাসুল ﷺ এভাবে অভিযানের পর অভিযান পরিচালনা করে কুরাইশের অর্থনীতিকে সংকটপূর্ণ করে তুলেছিলেন। একে একে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিলেন সিরিয়াগামী মক্কার সকল পথে।

---

৩৫১. ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৯৭-১৯৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৩৬, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৪২৯-৪৩০।

জামুমে অবস্থিত সুলাইমের দিকে জাইদ ﷺ-এর অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আখির মাসে রাসুল ﷺ জামুম অঞ্চলের সুলাইম গোত্রের উদ্দেশ্যে জাইদ ﷺ-কে প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে আমরা জানতে পারিনি। জাইদ ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে জামুম অঞ্চলের বাম পাশের উপকণ্ঠ বাতনে নাখলায় অবতরণ করেন। বাতনে নাখলা মদিনা থেকে বসরার পথে ৪৮ মাইল দূরে। তাঁরা সেখানে মুজাইনা গোত্রের হালিমা নামক এক মহিলাকে পাকড়াও করেন। সে মুসলিম বাহিনীকে বনু সুলাইম গোত্রের এক মহল্লা দেখিয়ে দেয়। মুসলিম বাহিনী সে গোত্রের উট, ছাগল ও বন্দী হস্তগত করে। বন্দীদের মধ্যে হালিমার স্বামীও ছিল। জাইদ ﷺ অভিযানে প্রাপ্য গনিমতের মাল নিয়ে মদিনায় আসার পর রাসুল ﷺ তাঁকে মুজাইনার হালিমা ও তার স্বামীকে উপহার দেন। এ কারণে বিলাল বিন হারিস একটি কবিতায় বলে :

'কী কপাল তোমার! নেতা কষ্ট করল না, দুর্বল হলো না হালিমা, অবশেষে দুজনেরই সফর হলো একসাথে।'

এ অভিযানের লক্ষ্য ছিল ইসলামি দুর্গের নিরাপত্তা জোরদার করা। মদিনার আশেপাশের কবিলাগুলোর ওপর মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের অর্থনৈতিক সংকট চরম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া।

ঈস অভিযানের কমান্ডার

ঈস ও মদিনার মাঝে চারদিনের দূরত্ব। আবার ঈস ও জিলমারওয়ার মাঝে একদিনের দূরত্ব। ষষ্ঠ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে রাসুল ﷺ জাইদ ﷺ-কে ঈস অভিমুখে প্রেরণ করেন। রাসুল ﷺ জানতে পারেন কুরাইশের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরে আসছে। তখন ৭০ জন আরোহী দিয়ে জাইদ ﷺ-কে কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করতে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী সম্পদসহ কুরাইশ কাফেলাকে আটক করে। সেদিন তাঁরা সফওয়ান বিন উমাইয়ার অনেক রুপা হস্তগত করেছিলেন এবং কাফেলার অনেক লোককে বন্দী করেছিলেন। তাদের মধ্যে আবুল আস বিন রবিও ছিল।[৩৫২]

---

৩৫২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮৭। দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৫৩-৫৫৫।

জাইদ ﷺ তাদের নিয়ে মদিনায় পৌছেন। আবুল আস রাসুল ﷺ-এর কন্যা জাইনাব ﷺ-এর আশ্রয় কামনা করে। জাইনাব ﷺ তাকে আশ্রয় প্রদান করেন। রাসুল ﷺ ফজরের সালাত আদায়কালে জাইনাব ﷺ মানুষের মাঝে ঘোষণা দেন যে, 'আমি আবুল আসকে আশ্রয় দিলাম।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি কিছু জানতাম না। ঠিক আছে তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম।' আবুল আস থেকে যে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তা তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

যে কুরাইশদের জীবন-মরণ নির্ভর করত ব্যবসার ওপর, সে কুরাইশের ব্যাবসায়িক রোড বন্ধ করে এভাবেই তাদের অর্থনীতির টুঁটি চেপে ধরেছিলেন রাসুল ﷺ।

তারাফ অভিযানের কমান্ডার

ষষ্ঠ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে রাসুল ﷺ জাইদ ﷺ-কে তারাফ অভিমুখে প্রেরণ করেন। মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে বাকারার মধ্যপথে নুখাইল এলাকার আগে মিরাজ এলাকার কাছে একটি পনির উৎসের নাম তারাফ।

১৫ জনের একটি সারিয়্যা নিয়ে জাইদ ﷺ বনু সালাবার উদ্দেশ্যে রওয়ান হন। অতঃপর হামলা করে ২০টি উট ও কিছু ছাগল কব্জা করেন। বেদুইনরা পালিয়ে যায়। চার দিন পরে সকালবেলায় গনিমত নিয়ে তাঁরা মদিনায় পৌছেন।[৩৫৩]

এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের দুর্গ মদিনার নিরাপত্তাকে জোরদার করা এবং আশেপাশের কবিলাগুলোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কারণ তাদের ওপর হামলা না করলে তারা হামলা করে বসবে। এটা তাদের স্বভাবগত নীতি।

---

৩৫৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮৭, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৫৫।

হিসমা অভিযানের কমান্ডার[৩৫৪]

ষষ্ঠ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে রাসুল ﷺ জাইদ ﵁-কে হিসমা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এটি ওয়াদিল কুরার পেছনের এলাকা।

এ অভিযানের কারণ, দিহইয়াহ বিন খলিফা কালবি ﵁ (যিনি একজন বড় মাপের সাহাবি) রোমের বাদশা কাইসারের কাছ থেকে মদিনায় ফিরছিলেন। রোমের বাদশাহ তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করে। পথিমধ্যে হিসমা এলাকায় হুনাইদ বিন আরিদ ও তার ছেলে আরিদ বিন হুনাইদের সাথে দেখা হয়। তারা দিহইয়াহ কালবি ﵁-এর একটা পুরাতন কাপড় ছাড়া সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। বনু দুবাইবের কিছু লোক এ কথা শুনে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় এবং সামানাপত্র উদ্ধার করে দিহইয়াহ কালবি ﵁-এর কাছে ফিরিয়ে দেয়।

দিহইয়াহ কালবি ﵁ ফিরে এসে রাসুল ﷺ-এর কাছে সব খবর বলে দেন। তখন রাসুল ﷺ ৫০০ যোদ্ধা দিয়ে জাইদ ﵁-কে সেদিকে প্রেরণ করেন। সাথে দিহইয়াহ কালবি ﵁-কেও পাঠালেন।

জাইদ ﵁ বাহিনী নিয়ে রাতে চলতেন আর দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। তাঁর সাথে উজরা গোত্রের একজন গাইড ছিল। লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে তাঁরা সকাল সকাল শত্রুর ওপর হামলা করে বসেন। এলোপাতাড়ি আক্রমণ করে শত্রুদের সব তছনছ করে দেন। এরপর তাদের চারণভূমিতে আক্রমণ করে এক হাজার উট, পাঁচ হাজার ছাগল কব্জা করেন এবং ১০০ জন নারী-শিশুকে বন্দী করেন।

অপরদিকে জাইদ বিন রিফাআ জুজামি তার কওমের কিছু লোক নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে রওয়ানা হয়। রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে সেই পত্র হস্তান্তর করে, যে পত্র রাসুল ﷺ তিন দিন আগে তাকে এবং তার কওমকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন। তারা রাসুল ﷺ-এর সামনে ইসলাম কবুল করেন। এরপর বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের জন্য হালালকে হারাম করবেন না এবং হারামকে হালাল করবেন না।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তবে তোমাদের নিহতদের ব্যাপারে

---

৩৫৪. হিসমা হচ্ছে, সিরিয়ার গ্রামাঞ্চল। হিসমা ও ওয়াদিল কুরার মাঝে দুই দিনের পথের দূরত্ব। ওয়াদিল কুরা ও মদিনার মাঝে ছয় দিনের পথের দূরত্ব। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/২৭৬।

আমি কী করতে পারি?' তখন আবু ইয়াজিদ বিন আমর বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের জীবিতদের ছেড়ে দিন। নিহতদের কোনো মূল্য দিতে হবে না।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'আবু ইয়াজিদ সত্য বলেছে।'

রাসুল ﷺ আলি ﷺ-কে জাইদ ﷺ-এর কাছে এ বার্তা দিয়ে প্রেরণ করলেন, 'লোকদের সম্পদ ও বন্দীদের ছেড়ে দাও।' আলি ﷺ পথিমধ্যে জাইদ ﷺ-এর সুসংবাদদাতা রাফি বিন মাকিস জুহানির দেখা পেলেন। তার সাথে শত্রুদের উটের পাল ছিল। আলি ﷺ সেগুলো মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ফাহলাতাইনে জাইদ ﷺ-এর দেখা পেলেন এবং তাঁকে রাসুল ﷺ-এর বার্তা জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি যা কিছু কব্জা করেছিলেন, সবকিছু তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।[৩৫৫]

অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, বনু জুজামকে শায়েস্তা করা, যারা দিহইয়াহ কালবি ﷺ-এর ওপর জুলুম করেছিল। অথচ তারা জানত, তিনি মুসলিম। আর রাসুল ﷺ তো এমন লোক নন, যিনি কোনো মুসলিমের ওপর জুলুম সহ্য করবেন। কারণ একজন মুসলিমের ওপর জুলুম করা মানে সমস্ত মুসলিমের ওপর জুলুমের শামিল।

ওয়াদিল কুরা অভিযানের কমান্ডার

ষষ্ঠ হিজরির রজব মাসে ফাজারা গোত্রকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে রাসুল ﷺ জাইদ ﷺ-কে ওয়াদিল কুরা এলাকায় প্রেরণ করেন।[৩৫৬] কিন্তু এ অভিযানের সাথিগণ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়। জাইদ ﷺ নিহতদের মাঝে পড়ে থাকেন। মদিনায় ফিরে এসে তিনি নিজের ওপর আবশ্যক করে নেন যে, পুনরায় বনু ফাজারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া স্ত্রী-সহবাস করবেন না।[৩৫৭]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, জাইদ ﷺ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে কয়েকজন সাহাবিও ছিলেন। যখন ওয়াদিল কুরার কাছাকাছি পৌঁছলেন,

---

৩৫৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮৮, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৫৫-৫৬০।
৩৫৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮৯।
৩৫৭. উয়ুনুল আসার : ২/১০৮।

তখন বনু ফাজারার কিছু লোক তাদের ওপর হামলা করে বসে এবং কাফেলার সকলকে রক্তাক্ত করে। তারা ধারণা করে সকলে নিহত হয়েছে। কাফেলার সব সামানাপত্র লুট করে নেয়। জাইদ ﷺ কিছুক্ষণ পর সুস্থতা অনুভব করলে মদিনায় ফিরে আসেন।[৩৫৮] এই বর্ণনাটি যুক্তি ও সঠিক ঘটনাপ্রবাহের অধিক নিকটবর্তী।

সম্ভবত মুসলিমরা কুরাইশের সিরিয়াগামী ব্যাবসায়িক পথ পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাঁরা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে এই রোড ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ ক্ষেত্রে ফল লাভ করতে পারেননি। কারণ তখন তাঁদের সামনে স্পষ্ট হয়েছিল যে, এই রোড পরিপূর্ণ ব্যবহারের উপযুক্ত হয়নি।

ওয়াদিল কুরায় উম্মে কিরফার উদ্দেশ্যে অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির ৭ রমাদানে রাসুল ﷺ ওয়াদিল কুরার উম্মে কিরফার উদ্দেশ্যে জাইদ ﷺ-কে প্রেরণ করেন। উম্মে কিরফা ফাজারার বনু বদর গোত্রের মহিলা ছিল।

মুসলিম বাহিনী মদিনা থেকে বের হয়ে রাতে পথ চলত আর দিনে লুকিয়ে থাকত। তাঁদের সাথে একজন গাইডও ছিল। ফাজারার বনু বদরকে মুসলিমদের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল। কারণ সকাল হলে তারা একজন প্রহরী নিযুক্ত করত। সে পথের সম্মুখে এক পাহাড়ে উঠে নজরদারি করত। সেখান থেকে একদিনের পথের দূরত্ব পর্যন্ত দেখা যেত। সে তার গোত্রকে বলে, 'সমস্যা নেই, তোমরা কাজে বেরিয়ে যাও। রাতে তোমরা সতর্ক হয়ে থেকো!'

জাইদ ﷺ ও তাঁর সাথিরা যখন একদিনের পথের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁদের গাইড পথ ভুল করে বসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁরা ভুল পথে চলতে থাকেন। এরপর ভুল বুঝতে পেরে সে রাতেই গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হন এবং সকালবেলা শত্রুর কাছে উপস্থিত হন। জাইদ ﷺ তাঁর বাহিনীকে আক্রমণ

৩৫৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৬৪, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯০।

করতে এবং পরস্পর বিক্ষিপ্ত হতে নিষেধ করলেন। বললেন, 'আমি তাকবির বললে তোমরাও তাকবির বলবে।' এরপর তিনি বনু ফাজারার ঘরবাড়ি ঘেরাও করলেন। তিনি তাকবির দেওয়ার সাথে সাথে সকল সৈন্য একযোগে তাকবির ধ্বনি দিয়ে উঠল। মাসলামা বিন আকওয়া ﷺ সারি থেকে বের হয়ে এক শত্রু সেনাকে খুঁজে হত্যা করল। মালিক বিন হুজাইফা বিন বদরের কন্যাকে বন্দী করল। তাকে সে তাদের এক ঘরে পেয়েছিল। সে ছিল উম্মে কিরফার মেয়ে। উম্মে কিরফার নাম ছিল ফাতিমা বিনতে রবিআ বিন বদর। এরপরে তারা উম্মে কিরফাকেও পাকড়াও করল। কাইস বিন মুহাসসির তাকে হত্যা করল। মাসআদা বিন হাকামার দুই ছেলে নুমান ও উবাইদুল্লাহকে হত্যা করা হলো।[৩৫৯]

আরবের লোকেরা বলত, 'যদি উম্মে কিরফার চেয়ে বেশি সম্মানিত হতাম!'[৩৬০] কারণ উম্মে কিরফার ঘরের সামনে ৫০ জন যোদ্ধা অবস্থান করত। তারা সকলে উম্মে কিরফার মাহরাম পুরুষ ছিল।[৩৬১]

জাইদ ﷺ অপারেশন শেষ করে মধ্যরাতে মদিনায় ফেরেন। মদিনায় এসে রাসুল ﷺ-এর দরজায় কড়া নাড়ার সাথে সাথে রাসুল ﷺ দ্রুত বের হয়ে আসেন এবং জাইদ ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে চুমু খান। এরপর জাইদ ﷺ তাঁকে বিজয় ও গনিমত লাভের সংবাদ জানালেন।

উম্মে কিরফার মেয়েকে মাসলামা বিন আকওয়া ﷺ রাসুল ﷺ-কে হাদিয়া দিলেন। রাসুল ﷺ তাঁর মামা হাজন বিন আবু ওয়াহাবকে উপহার দেন। সে তাঁর ঘরে একজন মেয়ে-সন্তান জন্ম দেয়। এ ছাড়া তাঁর কোনো সন্তান ছিল না।[৩৬২]

এভাবেই জাইদ ﷺ ফাজারা গোত্র থেকে মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন এবং ফিরিয়ে এনেছেন সেই অঞ্চলে মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। বনু ফাজারাকে এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা তারা কখনো ভুলতে পারবে না। অনুরূপ শিক্ষা নিয়েছিল অন্যান্য কবিলাগুলোও।

---

৩৫৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯০-৯১।
৩৬০. উয়ুনুল আসার : ২/১০৮।
৩৬১. উয়ুনুল আসার : ২/১১০।
৩৬২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯০-৯১, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৬৪-৫৬৫। দেখুন, উয়ুনুল আসার : ২/১০৭-১০৮।

মুতা অভিযানের কমান্ডার

অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে রাসুল ﷺ জাইদ ؓ-কে কমান্ডার বানিয়ে মুতা অভিমুখে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এ অভিযানের কারণ, রাসুল ﷺ হারিস বিন উমাইর আল-আজদি ؓ-কে পত্র দিয়ে বসরার বাদশার কাছে প্রেরণ করেন। তিনি যখন মুতা নামক জায়গায় পৌছলেন, তখন শুরাহবিল বিন আমর গাসসানি তাঁকে আটক করে হত্যা করে। এ ছাড়া রাসুল ﷺ-এর আর কোনো পত্রবাহককে হত্যা করা হয়নি। ঘটনাটি রাসুল ﷺ-কে কঠিনভাবে নাড়া দিয়েছিল। সাহাবিদের দ্রুত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। সাথে সাথে তিন হাজার সৈনিক জুরফ নামক জায়গায় সেনাছাউনি গাড়েন। রাসুল ﷺ বললেন, 'এ বাহিনীর কমান্ডার জাইদ বিন হারিসা। সে নিহত হলে কমান্ডার হবে জাফর বিন আবু তালিব। সে নিহত হলে কমান্ডার হবে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা। যদি সেও নিহত হয়, তবে মুসলিমরা তাদের মধ্য থেকে একজন আমির বানিয়ে নেবে।'

রাসুল ﷺ তাঁদের একটি সাদা ঝান্ডা প্রস্তুত করে জাইদ বিন হারিসা ؓ-এর হাতে দিলেন। তাঁদের নির্দেশ দিলেন, তাঁরা হারিস বিন উমাইর ؓ-এর নিহতের স্থানে গিয়ে সেখানকার লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বান করবে। আহ্বানে সাড়া দিলে ভালো, অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেবে। রাসুল ﷺ মুসলিম বাহিনীর সাথে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত গেলেন। সেখান গিয়ে তাঁদের বিদায় জানালেন। মুসলিম বাহিনী চলা শুরু করলে মুসলিমরা বলতে লাগল, 'আল্লাহ তোমাদের থেকে অকল্যাণ দূরে রাখুন। নিরাপদে গনিমতসহ আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনুন।' তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ আবৃত্তি করে উঠলেন :

> 'কিন্তু আমি তো রহমানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, প্রার্থনা করি প্রাণসংহারক বিরাট আঘাতের।'

মুসলিম বাহিনী মদিনা থেকে বের হলে শত্রুদের খবর হয়ে যায়। তারা মোকাবিলার জন্য এক লাখেরও বেশি সৈন্য প্রস্তুত করে। তাদের নেতৃত্ব দেয় স্বয়ং শুরাহবিল বিন আমর। এবং সামনে অগ্রগামী বাহিনীও প্রেরণ করে।

মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার মুআন এলাকায় অবতরণ করে জানতে পারল যে, হিরাক্লিয়াস বালকা অঞ্চলের মাআব এলাকায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে অবস্থান নিয়েছে। সেসব সৈন্য বাহরা, ওয়ায়িল, বকর, লাখম ও জুজাম গোত্র থেকে সংগ্রহ করেছে।

মুসলিমগণ সেখানে দুদিন অবস্থান করে বিষয়টি নিয়ে ভাবল। বলল, 'অবস্থা জানিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে চিঠি লিখি।' তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ তাঁদের সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দিলেন। ফলে মুসলিম বাহিনী মুতায় গিয়ে পৌঁছল।

সেখানে শত্রুরাও এসে পৌঁছল। শত্রুরা এত পরিমাণ সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র ও সামানাপত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল, যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারও সাধ্যে ছিল না। তারপরও মুসলিম বাহিনী ও শত্রু বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। সেদিন আমিরগণ পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেন। জাইদ বিন হারিসা ؓ ঝান্ডা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। মুসলিমরাও তাঁর সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিল। জাইদ ؓ যুদ্ধ করতে করতে একসময় বর্শার আঘাতে শাহাদাত বরণ করলেন। এরপর জাফর বিন আবু তালিব ؓ ঝান্ডা তুলে নিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার পায়ের কব্জি কেটে দিলেন তিনি। ইসলামে এই প্রথম এ ঘোড়ার পায়ের কব্জি কেটে দেওয়া হয়। তিনিও যুদ্ধ করতে করতে একসময় শহিদ হয়ে গেলেন। এক রোম সৈন্য তাঁকে আঘাত করে দুই টুকরো করেছিল। তাঁর অর্ধেক দেহের মধ্যে ৩৩টিরও বেশি আঘাত পাওয়া যায়। তাঁর সারা শরীরে বর্শা আর তরবারির মোট ৭২টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তারপর ঝান্ডা তুলে নেয় আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ। তিনিও লড়াই করতে করতে একসময় শাহাদাত বরণ করেন।

এরপর লোকেরা খালিদ বিন ওয়ালিদ ؓ-কে আমির নির্ধারণ করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে বের করে নিয়ে আসেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে সেনা বাহিনীকে বের করে নিয়ে আসা যুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর জন্য একটি অনন্য কর্ম হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

মদিনাবাসী যখন মুতার বাহিনীর আগমনের খবর জানতে পারল, তখন তারা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জুরফে আসলো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ওপর তারা

মাটি নিক্ষেপ করে বলতে লাগল, 'হে পলাতকেরা, তোমরা আল্লাহর রাস্তা থেকে পলায়ন করেছ?' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তাঁরা পলায়ন করেনি; বরং শীঘ্রই তাঁরা আঘাত হানবে ইনশাআল্লাহ।'[৩৬৩]

এভাবেই জাইদ ﷺ ইসলামের পতাকা সমুন্নত রেখে সামনে ধাবমান অবস্থায় আল্লাহর রাহে স্বীয় প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু ইসলামের পতাকায় ধূলি স্পর্শ করতে দেননি। রঞ্জিত হতে দেননি শাহাদাতের রক্তে; বরং তৎক্ষণাৎ তা উঁচু করে ধরেছেন নতুন কমান্ডারের জন্য।

ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন

জাইদ বিন হারিসা ﷺ অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে মুতার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন।[৩৬৪] রাসুল ﷺ জাইদ ﷺ-এর চেয়ে ১০ বছরের বড় ছিলেন।[৩৬৫] সে হিসেবে তিনি ৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু রাসুল ﷺ-এর জন্ম ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে। এর অর্থ হচ্ছে, জাইদ ﷺ জীবনায়ু লাভ করেছিলেন সৌরবর্ষ হিসেবে ৪৮ বছর আর চন্দ্রবর্ষ হিসেবে প্রায় ৫০ বছর।[৩৬৬]

এখানে আরেকটি মত আছে, তিনি ৫৫ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।[৩৬৭] তবে প্রথম বর্ণনাটিই অগ্রগণ্য। কারণ অধিকাংশ ঐতিহাসিক প্রথম মতের ওপর নির্ভর করেছেন।

তিনি বেঁটে এবং উজ্জ্বল বাদামি ফরসা ছিলেন। তাঁর নাক সামান্য চ্যাপটা ছিল।[৩৬৮] আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি লাল ফরসা ছিলেন।[৩৬৯] তবে প্রথম

---

৩৬৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৮-১৩০। দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৫৫-৭৬৯।
৩৬৪. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৭।
৩৬৫. আল-ইসতিআব : ২/৫৪৩, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৭, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭০।
৩৬৬. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭৩।
৩৬৭. আল-ইসাবাহ : ৩/২৬, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৬১।
৩৬৮. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭০, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৭, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪।
৩৬৯. উসদুল গাবাহ : ২/২২৭।

বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ। কারণ অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক এ বর্ণনার ওপর নির্ভর করেছেন।

জাফর ﷺ ও জাইদ ﷺ-এর নিহত হওয়ার খবর শুনে রাসুল ﷺ কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, 'ও আমার ভাই, ও আমার আপনজন, ও আমার প্রিয়জন।' রাসুল ﷺ জাইদ ﷺ-এর শাহাদাত লাভের সাক্ষ্য দান করেন।

জাইদ ﷺ-এর শাহাদাতের খবর শুনে রাসুল ﷺ তাঁর পরিবারের কাছে আসলেন, তখন জাইদ ﷺ-এর কন্যা জাইনাব রাসুল ﷺ-এর সামনে এসে কাঁদতে শুরু করলেন। এটা দেখে রাসুল ﷺ-ও কাঁদতে লাগলেন। এবং অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। তখন সাদ বিন উবাদা ﷺ বললেন, 'এটা কী, হে আল্লাহর রাসুল! রাসুল ﷺ বললেন, 'প্রিয়তমের প্রতি প্রিয়তমের ভালোবাসা।'[৩৭০] এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ জাইদ ﷺ তো রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসার মানুষ ছিলেন।[৩৭১]

শাহাদাতের পর রাসুল ﷺ তাঁদের জন্য দুআ করেন। 'হে আল্লাহ, জাইদকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, জাইদকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, জাইদকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, জাফরকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহাকে ক্ষমা করে দিন।'[৩৭২]

হাসসান বিন সাবিত ﷺ জাইদ ﷺ-এর শোকগাথা রচনা করেন।

রাসুল ﷺ-এর সাথে জাইদ ﷺ-এর ছিল গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। তাই তো তিনি স্বীয় পিতামাতার ওপর রাসুল ﷺ-কে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আর রাসুল ﷺ-ও তাঁকে নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন। আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বলেন, 'এরপর থেকে আমরা তাঁকে জাইদ বিন মুহাম্মাদ বলে ডাকতাম। যখন (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ) "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো।"[৩৭৩] এ আয়াত নাজিল হলো, তখন থেকে তাঁকে জাইদ বিন হারিসা নামে ডাকা হয়।'[৩৭৪]

---

৩৭০. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৫৩।
৩৭১. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৪।
৩৭২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৬।
৩৭৩. সুরা-আহজাব, ৩৩ : ৫।
৩৭৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৩, উসদুল গাবাহ : ২/২২৬, আল-ইসাবাহ : ৩/২৫।

আগে পালকপুত্রদের প্রতিপালনকারী পিতার নামের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো। মিকদাদ বিন আমর رضي الله عنه-কে ডাকা হতো মিকদাদ বিন আসওয়াদ নামে। কারণ আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুস তাকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছিল।[৩৭৫]

জাইদ رضي الله عنه-কে বলা হতো 'প্রিয় জাইদ।' কেননা তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর প্রিয় এবং প্রিয় উসামার পিতা।[৩৭৬] যে উসামাকে উমর رضي الله عنه নিজের পুত্র আব্দুল্লাহর চেয়ে বেশি উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর উমর رضي الله عنه তাঁর ছেলের কাছে সেটার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'যেহেতু সে রাসুল ﷺ-এর কাছে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল এবং তাঁর বাবাও রাসুল ﷺ-এর কাছে তোমার বাবার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল।'[৩৭৭]

রাসুল ﷺ বলেন, 'হে জাইদ, তুমি আমার মাওলা (আজাদকৃত গোলাম)। তুমি আমার থেকে এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।' এবং জাইদকে এ কথাও বলেন, 'তুমি আমাদের ভাই। তুমি আমাদের বন্ধু।' তিনি আরও বলেন, 'তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার থেকে। তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।'[৩৭৮]

মুমিনদের মা আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'রাসুল ﷺ জাইদ رضي الله عنه-কে যে যুদ্ধেই পাঠিয়েছেন, সে যুদ্ধেই তাঁকে আমির বানিয়েছেন। আর যুদ্ধে না গেলে তিনি রাসুল ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত হতেন।'[৩৭৯]

রাসুল ﷺ যখন নিজে যুদ্ধে না যেতেন, তখন তাঁর তরবারিখানা আলি رضي الله عنه অথবা জাইদ رضي الله عنه-কে দিয়ে দিতেন।[৩৮০] এটা জাইদ رضي الله عنه-এর প্রতি রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসা ও মূল্যায়নের চূড়ান্ত প্রকাশ। এ ভালোবাসা ও মূল্যায়ন কেবল এমন ব্যক্তিত্বের জন্যই হতে পারে, যে ব্যক্তিত্বের আছে অনুপম বৈশিষ্ট্য, গভীর বিশ্বাস ও অনন্য ইখলাস।

---

৩৭৫. আল-ইসতিআব : ২/৪৫৪।

৩৭৬. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৬৯, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২০২।

৩৭৭. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৬১।

৩৭৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৪, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭০।

৩৭৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৬।

৩৮০. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৯।

তাঁর সাথে রাসুল ﷺ নিজের ফুফাতো বোন জাইনাব বিনতে জাহশকে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং জাইদ ﷺ-এর পরে নিজে তাঁকে বিয়ে করে নিয়েছিলেন।[৩৮১] ফলে মুনাফিক ও মুশরিকরা বলেছিল, 'মুহাম্মাদ ছেলের স্ত্রীদের বিয়ে করা হারাম বলে; অথচ সে নিজে তাঁর ছেলের স্ত্রীকে বিয়ে করেছে।' তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।'[৩৮২]

এবং এ আয়াতও নাজিল হয় :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে।'[৩৮৩]

তখন থেকে তাঁকে জাইদ বিন হারিসা বলে ডাকা হয়। এবং প্রত্যেক পালকপুত্রকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকা আরম্ভ হয়।[৩৮৪]

আম্মাজান আয়িশা ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ যদি কোনো ওহি গোপন রাখতেন, তবে এ আয়াতটি রাখতেন—

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ

৩৮১. উসদুল গাবাহ : ২/২২৬।
৩৮২. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৪০।
৩৮৩. সুরা-আহজাব, ৩৩ : ৫।
৩৮৪. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৬৯।

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

"আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, "তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও। এবং আল্লাহকে ভয় করো।" আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন; অথচ আল্লাহকেই বেশি ভয় করা উচিত। অতঃপর জাইদ যখন তার স্ত্রীর (জাইনাবের) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম; যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।'"[৩৮৫]

রাসুল ﷺ যখন জাইনাব ؓ-কে বিয়ে করলেন, তখন কাফিররা বলতে লাগল, 'সে তো পুত্রবধূকে বিয়ে করল।'[৩৮৬] আরবের লোকেরা কোনো ছেলেকে পোষ্যপুত্র বানালে উত্তরাধিকার এবং বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাকে নিজের ঔরসজাত ছেলের স্থান দিত। আর রাসুল ﷺ-এর একটি আদর্শ ও নীতি ছিল, আল্লাহ তাআলা কোনো জাহিলি প্রথা রহিত করলে সেটাকে তিনি তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত করে দেখাতেন। যাতে এ ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণীয় হন। জাইদ ؓ যখন জাইনাব ؓ-কে বিয়ে করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা জাহিলি প্রথাকে রহিত করার নির্দেশ দিলেন। তাই জাইদ ؓ-কে স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন আর রাসুল ﷺ-কে তাঁর সে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে বললেন। যাতে পালকপুত্রের ক্ষেত্রে জাহিলি প্রথাটি বাতিল হয়ে যায়। এই কারণটি আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন :

---

৩৮৫. সুরা আর-আহজাব, ৩৩ : ৩৭।
৩৮৬. উসদুল গাবাহ : ২/২২৬।

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ

'যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা না থাকে।'[৩৮৭_৩৮৮]

রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, 'আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমিও অনুগ্রহ করেছি।' অর্থাৎ জাইদ বিন হারিসা ﷺ। আল্লাহ তাঁকে ইসলামে হিদায়াত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন আর রাসুল ﷺ অনুগ্রহ করেছেন আজাদ করে।[৩৮৯]

আরবে আরেকটি জাহিলি প্রথা ছিল, আরবরা আজাদপ্রাপ্ত দাসের সাথে স্বাধীন নারী বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে বিয়ে দিতে নাক ছিটকাত। এই জাহিলি প্রথাকে দূর করার জন্য রাসুল ﷺ তাঁর ফুফাতো বোন জাইনাবকে জাইদ ﷺ-এর সাথে বিয়ে দেন। জাইদ ﷺ-এর সাথে বিয়ে হওয়া জাইনাব ﷺ-এর জন্য অনেক কষ্টের ব্যাপার ছিল। জাইনাব ﷺ বলেন, 'কুরাইশের অনেক লোক আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তখন আমি আমার বোন হামনাকে রাসুল ﷺ-এর কাছে পরামর্শ চেয়ে পাঠালাম। রাসুল ﷺ বললেন, "তাঁকে বাদ দিয়ে সে কোথায় পড়ে আছে, যে তাকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহ শিক্ষা দেবে?" হামনা বলল, "সে কে, হে আল্লাহর রাসুল!" রাসুল ﷺ বললেন, "জাইদ।" এটা শুনে হামনা অনেক রেগে গেলেন। এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনার ফুফাতো বোনকে কি একজন দাসের সাথে বিয়ে দেবেন!"' এরপর হামনা এসে জাইনাবকে খবর শোনাল। জাইনাব তাঁর বোনের চেয়েও বেশি ক্রোধান্বিত হলো। এবং তার চেয়েও কঠিন কথা বলল। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

---

৩৮৭. সুরা আর-আহজাব, ৩৩ : ৩৭।
৩৮৮. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৮-৪৫৯।
৩৮৯. আল-ইসতিআব : ২/৪৫৬।

> 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে ফায়সালা চূড়ান্ত করলে কোনো ইমানদার পুরুষ এবং ইমানদার নারীর জন্য তাদের বিষয়ে ইচ্ছাধিকারের ক্ষমতা রাখে না।'[৩৯০]

তখন জাইনাব ﵂ রাসুল ﷺ-এর কাছে এ বলে বার্তা পাঠালেন যে, 'আপনি যার সাথে ইচ্ছা আমাকে বিয়ে দিন। তাই জাইদের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন।'[৩৯১]

স্বাধীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে আজাদপ্রাপ্ত দাসের সাথে বিয়েকে ঘৃণা করার প্রথা এবং পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে নিষিদ্ধের জাহিলি প্রথাকে রাসুল ﷺ নিজ কর্মের মাধ্যমে উঠিয়ে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, যদি রাসুল ﷺ এ জাহিলি প্রথাকে নিজের কর্মের মাধ্যমে উঠিয়ে না দিতেন, তবে অন্যের ওপর তা প্রয়োগ করা হয়তো কঠিন হয়ে যেত। এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে যায় তাকওয়া এবং দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা। বংশমর্যাদা বা অন্য কোনো অবস্থান নয়।

জাইনাব বিনতে জাহশ ﵂-এর ঘটনায় রাসুল ﷺ যে সাহসিকতা এবং ত্যাগের মানবিক গুণ প্রদর্শন করেছেন, তা বস্তুগত যেকোনো সাহসিকতা ও ত্যাগের তুলনায় কোনোভাবেই কম হবে না। ইসলামের সবচেয়ে কঠিন বিধান নিজের ওপর আগে প্রয়োগ করেছেন। এ কারণেই তো তিনি আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ এবং আদর্শবান ব্যক্তিত্ব। এর মাধ্যমে জাহিলি যুগের পুরাতন অন্ধ প্রথার বিলোপ হয়েছে।

জাইনাব ﵂-এর সাথে জাইদ ﵁-এর বিয়ের আলোচনা নিয়ে যেহেতু আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি; তাই উচিত হবে তাঁর অন্য নারীদের সাথে বিয়ের আলোচনাকেও সামনে আনা।

রাসুল ﷺ তাঁর সাথে নিজের আজাদকৃত দাসী উম্মে আইমানের বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর গর্ভে জন্ম নেয় রাসুলের প্রিয় উসামা বিন জাইদ ﵁।[৩৯২] উম্মে আইমান ﵂ ছিলেন রাসুল ﷺ-এর খাদিমা এবং আজাদকৃত দাসী। তার নাম ছিল

---

৩৯০. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩৬।

৩৯১. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৮।

৩৯২. উসদুল গাবাহ : ২/২২৬, আল-ইসতিআব : ২/৫৪৬, আল-ইসাবাহ : ৩/২৫।

বারাকাহ। জাহিলি যুগে উবাইদ বিন আমর বিন বিলালের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তখন তার একটি সন্তান হয়, নাম আইমান বিন উবাইদ। এ কারণে তাকে উম্মে আইমান নামে ডাকা হয়। আইমান হুনাইনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। উবাইদ উম্মে আইমানকে রেখে মৃত্যুবরণ করে। এরপরে তিনি বিধবা হয়ে থাকেন। তারপর রাসুল ﷺ তাঁকে জাইদ -এর সাথে বিয়ে দেন।[৩৯৩]

জাইদ উকবা বিন মুয়িতের মেয়ে উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন।[৩৯৪] উম্মে কুলসুম, তাঁর মা আরওয়া বিনতে কুরাইজ এবং তাঁর নানি—যিনি আব্দুল মুত্তালিবের মেয়ে—উম্মে হাকিম বাইদা, এই তিনজন হিজরত করে রাসুল ﷺ-এর কাছে আসেন। তখন জুবাইর বিন আওয়াম, জাইদ বিন হারিসা, আব্দুর রহমান বিন আওফ ও আমর বিন আস উম্মে কুলসুমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উম্মে কুলসুম তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই উসমান বিন আফফান -এর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চান। তিনি তাঁকে রাসুল ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করতে বলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে জাইদ বিন হারিসা -এর সাথে বিয়ে বসতে বলেন। পরামর্শমতে জাইদ বিন হারিসা -এর সাথে বিয়ে বসেন এবং জাইদ ও রুকাইয়া নামে দুজন সন্তান জন্ম দেন। জাইদ ছোট থাকতে ইনতিকাল করে। আর রুকাইয়া উসমান -এর প্রতিপালনে থেকে ইনতিকাল করে। একসময় জাইদ উম্মে কুলসুমকে তালাক দেন। তখন তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করেন আব্দুর রহমান বিন আওফ , তারপর জুবাইর , তারপর আমর বিন আস ।[৩৯৫]

জাইদ জুবাইর -এর বোন হিন্দা -কে বিয়ে করেন।[৩৯৬] তার পূর্বে আবু লাহাবের মেয়ে দুররাহকে বিয়ে করেছিলেন; কিন্তু তাকে তালাক দিয়ে দেন।[৩৯৭]

অগ্রবর্তিতা হিসেবে জাইদ -এর স্ত্রীদের ধারাবাহিকতা হচ্ছে, রাসুল ﷺ-এর আজাদকৃত দাসী ও সেবিকা উম্মে আইমান, তারপর জায়নাব বিনতে জাহশ।

---

৩৯৩. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭১।
৩৯৪. আল-মুহাব্বার : ৪৪৬ পৃ., জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১১১ পৃ.।
৩৯৫. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭১। দেখুন, আল-মুহাব্বার : ৪৪৬ পৃ.।
৩৯৬. আল-ইসাবাহ : ৩/২৫।
৩৯৭. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭১।

তাঁকে তালাক দেওয়ার পর রাসুল ﷺ উকবার মেয়ে উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করান। উম্মে কুলসুমকে তালাক দেওয়ার পর আবু লাহাবের মেয়ে দুররাহকে বিয়ে করান। তাঁকে তালাক দেওয়ার পর আওয়ামের মেয়ে অর্থাৎ জুবাইর ﷺ-এর বোন হিন্দাকে বিয়ে করান। এভাবেই রাসুল ﷺ জাইদ ﷺ-এর সাথে তাঁর নিকটাত্মীয় ও সম্ভ্রান্ত নারীদের বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি রাসুল ﷺ-এর প্রিয়, বিশ্বস্ত এবং আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। যাতে বিয়ের ক্ষেত্রে জাহিলি পুরাতন অন্ধ প্রথার বিলুপ্তি হয়। কিন্তু আজ কিছু মুসলিম সেই জাহিলি অন্ধ প্রথার দিকে ফিরে এসেছে। ফলে সে জাহিলি প্রথা আবার নতুন করে জীবন পেয়েছে।

রাসুল ﷺ জাইদ ﷺ-কে দুবার নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। প্রথমবার বুআত যুদ্ধের সময়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে।[৩৯৮] দ্বিতীয়বার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন বনু মুসতালিক তথা মুরাইসি-এর যুদ্ধের সময়। এটি সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরির শাবান মাসে।[৩৯৯] দুবার স্থলাভিষিক্ত হওয়া প্রমাণ করে, পরিচালনা কাজে তাঁর দক্ষতার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর আস্থা ছিল।

রাসুল ﷺ তাঁকে তাঁর আজাদকৃত গোলাম আবু রাফি'র সাথে মক্কায় পাঠান। তাঁরা মক্কা থেকে রাসুল ﷺ-এর স্ত্রী সাওদাহ বিনতে জামআহ ﷺ এবং তাঁর দুই কন্যা ফাতিমা ও উম্মে কুলসুমকে মদিনায় নিয়ে আসেন। তখন মসজিদে নববির নির্মাণ কাজ চলছিল।[৪০০] রাসুল ﷺ তাঁকে এক আনসারি সাহাবির সাথে আরেকবার মক্কায় পাঠিয়েছিলেন তাঁর কন্যা জাইনাব ﷺ-কে মদিনায় নিয়ে আসার জন্য। তিনি তাঁদের বলেন, 'তোমরা বাতনে ইয়াজুজে থাকবে। অতঃপর জাইনাব তোমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তাঁকে সাথে নিয়ে মদিনায় ফিরে আসবে।' ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের এক মাস পরে বা তার কাছাকাছি সময়ে তারা মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন এবং তাঁকে তাঁরা জায়গামতো পেয়ে

---

৩৯৮. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৮৭।
৩৯৯. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৪১।
৪০০. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪১৪।

মদিনায় আসেন।[৪০১] এটা তাঁর বিচক্ষণতা, উন্নত শিষ্টাচার ও আমানতদারিতার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর বিরাট আস্থার প্রমাণ।

মহান আল্লাহ তাঁর পাক কালামে রাসুল ﷺ-এর কোনো সাহাবি অথবা কোনো নবির সাথির নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু জাইদ ؓ-এর নাম উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

'অতঃপর জাইদ যখন তার স্ত্রীর (জাইনাবের) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করালাম।'[৪০২]

তিনি রাসুল ﷺ থেকে চারটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৪০৩] আরেক বর্ণনামতে শুধু দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৪০৪]

রাসুল ﷺ-এর প্রিয় এবং প্রিয়দের পিতা জাইদ ؓ চন্দ্রবর্ষ হিসেবে ৫০ বছর জীবন অতিবাহিত করে তাঁর মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। বুঝ হওয়ার পর থেকে তিনি তাঁর প্রিয় এবং অভিভাবক রাসুল ﷺ-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন। তাই তাঁর ওপর সকল দায়িত্ব উত্তম, সুন্দর ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। ফলে রাসুল ﷺ-এর মূল্যায়ন, ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন। লাভ করেছেন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের—মুখলিস ও সত্যনিষ্ঠ মুসলিমদের মূল্যায়ন, ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি। মুখলিস ও সত্যনিষ্ঠ মুসলিমদের উত্তম আদর্শ হয়ে ছিলেন। সে আদর্শ হয়ে এখনো আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

রাসুল ﷺ-এর জীবনে এবং তাঁর পরিবারের মাঝে জাইদ ؓ তাঁর স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। অনুরূপ দায়ি ও মুজাহিদ হিসেবে দ্বীনে হানিফের খিদমতেও তিনি রেখে গেছেন অনন্য অবদান। তিনি সুখে-দুঃখে ও যুদ্ধ ছাড়াও সব সময় রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

---

৪০১. বিস্তারিত দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৯৭-২৯৯, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৯৭-৩৯৮, ইবনুল আসির : ২/১৩৪।

৪০২. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩৭।

৪০৩. আসমাউস সাহাবাতির রুওয়াত : ২৯১ পৃ.।

৪০৪. উসদুল গাবাহ : ২/২২৭, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২০২।

কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

বিদায় হজ থেকে ফিরে রাসুল ﷺ জিলহজের বাকি দিনগুলো এবং ১১ হিজরির মুহাররম ও সফর মাস মদিনায় অবস্থান করেন। এরপর একটি বড় সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। যার মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﷺ-এর মতো মহান মহান সাহাবিগণও ছিলেন। এ বাহিনীর নেতৃত্বের ভার দেন উসামা বিন জাইদ ﷺ-এর ওপর। লোকেরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারগণ উসামা ﷺ-এর সাথে বের হলেন।[৪০৫] রাসুল ﷺ উসামা ﷺ-কে ফিলিস্তিনের দারুম এলাকায় হামলার নির্দেশ দেন।

রাসুল ﷺ-এর অসুস্থতার কারণে বাহিনীর যাত্রা করা বিলম্ব হলো। রাসুল ﷺ মাথা শক্ত করে বাঁধা অবস্থায় মসজিদে এলেন এবং মিম্বারে বসে বললেন, 'লোকসকল, উসামার বাহিনীর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করুন। আমার জীবনের শপথ, তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে কিছু বললে এর আগে তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও বলতে হবে। সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য, যদি তাঁর পিতা নেতৃত্বের যোগ্য হয়ে থাকে।'[৪০৬] ইমাম বুখারির বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তার নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন উসামা বিন জাইদ ﷺ-এর ওপর। তখন কিছু লোক তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে মন্তব্য করে বসে। তাই রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে মন্তব্য করছ! তোমরা তো পূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও মন্তব্য করেছিলে। আল্লাহর শপথ, অবশ্যই সে নেতৃত্বের যোগ্য। অথচ সে আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিল। তাঁর পরে এখন আমার কাছে এ বেশি প্রিয়।'[৪০৭] রাসুল ﷺ-এর এ উক্তি জাইদ ﷺ ও তাঁর ছেলে উসামা ﷺ-এর নেতৃত্বের যোগ্যতার জোর সমর্থন। যে কারও সমর্থনের চেয়ে রাসুলের সমর্থন অবশ্যই মূল্যবান। কারণ রাসুল ﷺ-এর সমর্থনের কাছে কারও সমর্থনের তুলনা হয় না।

---

৪০৫. সিরাতে ইবনি হিশাম : ৪/৩১৯, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৯০।
৪০৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৬৮।
৪০৭. ফাতহুল বারি শারহুল বুখারি : ৭/৬৯, আল-ইসাবাহ : ৩/২৬, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৬০।

রাসুল ﷺ-এর যিনি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং অন্যের চেয়ে রাসুল ﷺ-কে বেশি জানেন, সেই আম্মাজান আয়িশা ﷺ বলেছেন, 'রাসুল ﷺ জাইদ ﷺ-কে যে বাহিনীতেই প্রেরণ করেছেন, সেই বাহিনীর নেতৃত্ব তাঁকেই দিয়েছেন।[৪০৮] আর যদি যুদ্ধে না যেতেন, তবে তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন।[৪০৯]

জাইদ ﷺ-এর নেতৃত্বের যোগ্যতার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর এমন মূল্যায়ন এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাস নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ পর্যায়ের। জাইদ ﷺ তাঁর নেতৃত্বমূলক বৈশিষ্ট্যের কারণে এমন মূল্যায়নের উপযুক্ত হয়েছিলেন। কারণ রাসুল ﷺ কেবল তার প্রতিই পূর্ণ আত্মবিশ্বাস রাখতেন, যে তার উপযুক্ত হতেন। তিনি সাহাবিদের এমন দৃঢ় ও অবিচল ইমানি শক্তি ও উত্তম আদর্শে গড়ে তুলতেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা সকলের জন্য আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়। তিনি যোগ্যতা অনুসারে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতেন; যেন উম্মাহকে আদর্শ ও যোগ্যতায় তাদের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তিবর্গ পরিচালনা করে, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উম্মাহ যাদের মডেল হিসেবে সামনে রাখবে।

সুতরাং জাইদ ﷺ-এর নেতৃত্বের কোন বৈশিষ্ট্যটি কমান্ডাররা শিখতে পারবে?

তিনি সাহাবিদের মাঝে হাতে গোনা তিরন্দাজদের একজন ছিলেন।[৪১০] অর্থাৎ তিনি ছিলেন লক্ষ্যভেদী তিরন্দাজদের একজন। যেমনটা আমরা আধুনিক সমর পরিভাষায় বলে থাকি। এই যোগ্যতাকে তিনি ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে প্রদর্শন করেছিলেন। কুরাইশের একজন নেতাকে হত্যা করেছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেককে হত্যা করেছিলেন, ইতিহাস যাদের কথা বিস্মৃত হয়ে গেছে। বদর ছাড়াও রাসুল ﷺ-এর সাথে অংশ নেওয়া খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবার ও অন্যান্য যুদ্ধসমূহে এ যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েছেন। এ যোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন রাসুল ﷺ-এর নির্দেশে তাঁর পরিচালিত নয়টি অভিযানেও।[৪১১] যার উল্লেখ এ আলোচনায় এসেছে।

---

৪০৮. নাসায়ি, ফাতহুল বারি শারহুল বুখারি : ৭/৬৯।
৪০৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৬, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৬১।
৪১০. তাহজিবুল আসমা ওয়া লুগাত : ১/২০২, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৫/৪৫৯, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৫।
৪১১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৫, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৪৫৯ পৃ.।

তিনি ছিলেন দক্ষ অশ্বারোহীদের একজন। অন্য আর ১০ জন আরবের মতোই তিনি সাধ্যের মধ্যে থেকে অশ্বচালনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ফলে অশ্বচালনায় অতি কুশলী এবং উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন।

জাইদ ﵁-এর পরিচালিত অভিযানসমূহ থেকে যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমাদের সামনে আসে, তা হচ্ছে, তাঁর আক্রমণগুলো শত্রুর ওপর চূড়ান্ত মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলেছিল। আর সেসব অভিযানের মাধ্যমে রাসুল ﷺ কার্যত মুসলিমদের শক্তির প্রতিষ্ঠা চাচ্ছিলেন। যাতে মুসলিমদের আক্রমণের তোড়ে ওই শত্রুরা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে তিনি প্রচলিত যুদ্ধনীতি—'আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ কার্যকরী মাধ্যম' নীতি প্রয়োগ করতেন।

অভিযানসমূহে জাইদ ﵁-এর নিয়ম ছিল প্রথম ধাপেই শত্রুর মনোবল-মানসিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া। যার ভিত্তি হলো ঝটিকা যুদ্ধ এবং অতর্কিত হামলা। আর এ ধরনের কাজের জন্য চাই এমন নির্ভীক ও দুঃসাহসী কমান্ডার, যার থাকবে আল্লাহ-প্রদত্ত বীরত্ব, ঝুঁকির পরোয়া করে না এমন অবিচল বিশ্বাস, পরিণামদর্শী উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এবং ভয়ভীতি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্যের সীমাহীন ধৈর্য।

রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে অংশ নেওয়া যুদ্ধে এবং নিজের পরিচালিত অভিযানে আমরা তাঁর বীরত্ব অনুমান করতে পেরেছি। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা আমরা সে সময়ও দেখতে পেয়েছি, যখন রাসুল ﷺ তাঁকে তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় হিজরত করতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর তিনি তাঁদের নিয়ে মদিনায় পৌঁছেছিলেন ঘাতক ও বিদ্বেষী শত্রুবেষ্টিত পথ দিয়েই।

জাইদ ﵁ বেড়ে উঠেছিলেন রাসুল ﷺ-এর ঘরে। তাই ইমান আনার ক্ষেত্রে তিনিই সর্বপ্রথম ছিলেন অথবা যিনি সর্বপ্রথম ইমান এনেছিলেন, তিনিও তাঁর সাথে ইমান এনেছিলেন। প্রস্তুত হয়েছিলেন আল্লাহর পথে সব ধরনের ত্যাগ ও কুরবানির জন্য।

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার আলামত প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর কৈশোর বয়সে। নিজের মা-বাবা ও আপনজনের ওপর রাসুল ﷺ-কে প্রাধান্য দেওয়া কেবল

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিমত্তারই বহিঃপ্রকাশ। শান্তিকালীন এবং যুদ্ধাবস্থায় অনেক জটিলতার ব্যাপারে রাসুল ﷺ তাঁর সাথে বহুবার পরামর্শ করেছেন।

তাঁর তারুণ্য ও যৌবন সম্পর্কে এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট যে, তিনি ৫০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন—যখন শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের উচ্চ শিখরে অবস্থান করছিলেন।

এসব নেতৃত্বমূলক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তাঁর অধিক সাদৃশ্য ছিলেন তাঁরই পুত্র উসামা বিন জাইদ ﵁। যিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর একান্ত প্রিয় মানুষ। এই উসামা ﵁-এর মাধ্যমে ইসলাম অল্পবয়সি বালককে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করার বিষয়টি মেনে না নেওয়ার প্রথাকে মিটিয়ে দিয়েছে। দূর করে দিয়েছে গোত্র ও বংশের ভিত্তিতে সম্মান ও মর্যাদার অযথা নীতি। কারণ ইসলামে সম্মান ও মর্যাদা বিবেচিত হয় তাকওয়া ও নেক আমলের ভিত্তিতে। এবং উপযুক্ত কাজে যথাযোগ্য যোগ্যতার আলোকে।

নেতৃত্বমূলক বৈশিষ্ট্য ও গভীর ইমানই জাইদ ﵁-কে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে।

উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত দানে জাইদ ﵁-এর ছিল অনন্য যোগ্যতা। তাঁর প্রতিটি অভিযানই এমন ছিল যে, যেখানে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। মুতার যুদ্ধে যখন তিনি দেখতে পেলেন, শত্রুরা যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে হাজির হয়েছে, তার মোকাবিলা করার সাধ্য মুসলিম বাহিনীর নেই। তখন শক্তির এই বিরাট ব্যবধানের যুদ্ধে জড়াতে একটু সময় নিতে চাইলেন এবং নতুন অবস্থান গ্রহণের জন্য রাসুল ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জিহাদে আসা কিছু উৎসাহী মুজাহিদ—যাঁদের মূলে ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁—তাঁরা শত্রুর মোকাবিলা করার ইচ্ছা করলেন, এতে ফলাফল যা-ই আসুক না কেন। ফলে জাইদ ﵁ এক আবেগঘন বক্তব্য দান করলেন। সম্ভবত পরিস্থিতি অতি দ্রুতই পরিবর্তন হয়েছিল। যার কারণে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এ যুদ্ধ বাহ্যিকভাবে অনেক বেদনাদায়ক হলেও ফলাফলের দিক থেকে তা বিজয়ই হয়েছিল। রোমানরা উত্তরাঞ্চলীয়

মুসলিমদের সংস্পর্শে এসে কার্যত বুঝতে পেরেছিল যে, ইসলামের মাধ্যমে আরবরা ভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। তাই তাদের যুদ্ধ অতীতের কোনো যুদ্ধের মতো হবে না; বরং পরবর্তী যুদ্ধগুলো হবে নিয়মতান্ত্রিক রক্তক্ষয়ী ও ধারাবাহিক এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলে।

জাইদ ﷺ ছিলেন অবিচল দৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী। অভিযানে অনেক কষ্ট এবং পরিস্থিতিকে অতি সহজেই আয়ত্তে আনতে পারতেন। ফলে ইচ্ছাশক্তির আশীবাদে তিনি উত্তরণ হতে পারতেন আকস্মিক কোনো সমস্যা ও জটিল বিষয়ে।

তিনি সেসব মহান কমান্ডারদের একজন ছিলেন, যারা উত্তমরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করতেন এবং তা আদায়ও করতেন যথাযথভাবে। দায়িত্ব থেকে পাশ কাটিয়ে যেতেন না এবং অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না।

তাঁর মনোবল এমনই সুদৃঢ় ছিল যে, বিজয় তাঁকে কোনো রকম বাড়াবাড়িতে নিয়ে যেত না। আবার পরাজয়ও মনোবল ভেঙে পড়ার খাদে ফেলে দিত না। কারণ বাড়াবাড়ি ও ভেঙে পড়া—দুটোই কমান্ডার ও সৈনিকের বিপদ ডেকে আনে।

ব্যক্তি যতক্ষণ নিজের স্বার্থের জন্য কাজ না করে একমাত্র উম্মাহর কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে, ততক্ষণ তার মনোবল অবিচল ও সুদৃঢ় থাকবে।

সৈনিকদের যোগ্যতা ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। কারণ বেড়ে উঠেছেন তাঁদের মাঝেই এবং কাজও করেছেন তাঁদের সাথে। যুদ্ধ ও শান্তিকালীন সময় দীর্ঘকাল তাঁদের মাঝে বাস করেছেন। সেই সাথে বাস করেছেন রাসুল ﷺ-এর সাথে, তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের সাথে এবং তাঁর পূতপবিত্র পরিবার-পরিজনের সাথে। তাই প্রত্যেক সৈনিককে তাঁর যোগ্যতা ও উপযুক্ততা অনুসারে কাজ দিতেন।

সৈনিকদের প্রতি নিঃশর্ত আস্থা রাখতেন, সৈনিকরাও তাঁর প্রতি নিঃশর্ত আস্থা রাখত। কমান্ডার আর সৈনিকের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য তাঁদের আস্থাই হচ্ছে মৌলিক নীতি। পারস্পরিক আস্থা ছাড়া কোনো সহযোগিতার চিন্তা করা যায় না।

সৈনিকদের ভালোবাসতেন আপন ভাইয়ের মতো। সৈনিকরাও তাঁকে ভালোবাসত একনিষ্ঠভাবে। আর পারস্পরিক ভালোবাসাই হলো মজবুত সহযোগিতার জীবনী শক্তি। যা বিজয়ের পথকে মসৃণ করে।

জাইদ ﷺ এমন প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে সেসব অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যে অভিযানের সৈনিক ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক, উমর বিন খাত্তাব, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﷺ-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবিবর্গ। মদিনায় তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। যা তাঁর প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকেই প্রমাণ করে।

তাঁর ছিল এক অনন্য দেহ অবয়ব। যা তাঁকে দ্রুতই সুদূর পথ পাড়ি দিতে সাহায্য করত। এবং কোনো ক্লান্তি, বিষন্নতা ও অবসন্নতা ছাড়াই যুদ্ধ এবং সফরের কষ্ট সহ্য করতে সহায়ক হতো।

রাসুল ﷺ এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় ছিল তাঁর কার্যকর ও সম্মানজনক অবস্থান।

নিজেকে তিনি তাঁর সৈনিকদের সমান মনে করতেন। নিজে সুখে থেকে তাঁদের কষ্টে ফেলতেন না। বরং নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বস্তির ক্ষেত্রে তাঁদেরকেই প্রাধান্য দিতেন। এবং বিপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের ফেলে নিজেকেই আগে পেশ করতেন।

সাথিদের সাথে পরামর্শ করতেন। বিশেষভাবে তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞজনদের সাথে। তাঁদের মতামত নিয়ে সঠিক ও উপযুক্ত স্থানে রাখতেন।

যুদ্ধের নীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে তিনি টার্গেট নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতেন। টার্গেটে পৌছতে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম নিয়ে চিন্তা করতেন। এরপর টার্গেটে পৌছতে উপযুক্ত পয়েন্ট নির্ধারণ করতেন।

জাইদ ﷺ-এর সকল অভিযানই ছিল আক্রমণাত্মক। যার মূল কৌশল ছিল অতর্কিত হামলা। মুতা অভিযান ছাড়া তাঁর সবকটি অভিযানই ছিল অতর্কিত। এ কারণে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বহুসংখ্যক শত্রু বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করতে পেরেছিলেন। শত্রুর ভূমি থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন মুসলিমদের নিরাপদ ও প্রধান ঘাঁটি মদিনা থেকে বহু দূরে গিয়েও।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে তার বাহিনীকে প্রস্তুত করতেন। তিনি সে সেনাদের মনোবলকেও চাঙা রাখতেন। তাঁর অভিযানের মূল্যায়ন এভাবেই করা যাবে যে, তাঁর প্রধান টার্গেট থাকত প্রথম ধাপেই মনোবল ধ্বংস করে দেওয়া। যার কথা আমরা আগেও বলেছি।

নিরাপত্তার নীতি মেনে চলতেন। ফলে কোনো যুদ্ধেই শত্রুরা জাইদ ﵁-এর বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি মুতার যুদ্ধে শত্রুপক্ষের তুলনাহীন অস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত থাকা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা করতে পারেনি। কিন্তু এ যুদ্ধে তিনি নিজে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাই ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর সে আশা পূরণ হয়েছিল।

আনুগত্যের ক্ষেত্রে জাইদ ﵁-এর অভিযানগুলো ছিল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। বর্তমানে আমরা যার নাম দিয়ে থাকি 'সুদৃঢ় শৃঙ্খল'। সেই সাথে অভিযানগুলোতে তাঁর বৈশিষ্ট্য হতো নির্ভীক ও দুঃসাহসী বীর এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্যে পরম সহিষ্ণু। আর এই মানবিক গুণগুলোই সর্বকালে এবং সব জায়গায় প্রতিটি উন্নত সৈনিকের গুণ হিসেবে প্রয়োগ হয়ে আসছে।

স্বয়ং জাইদ ﵁ ছিলেন মানবিক গুণের অধিকারী সৈনিক। প্রত্যেক অভিযানে তিনি সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ছিলেন উত্তম আদর্শবান ব্যক্তিত্ব। তাই জাইদ ﵁ বাস্তবিকই ছিলেন একজন বিশিষ্ট কমান্ডার।

ইতিহাসে জাইদ ﵁

জাহিলি যুগে দস্যুদের দ্বারা ছিনতাইয়ের শিকার হন। এরপর ভাগ্য তাঁকে আপনজন থেকে দূরে ঠেলে দেয়; যাতে নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেই নবির আশ্রয়ে প্রতিপালন হতে পারেন।

তাঁর বাবা, চাচা ও ভাইগণ তাঁকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আপনজনদের দূরে ঠেলে দিয়ে রাসুল ﷺ-কেই আপন করে নিয়েছিলেন। এরপর তাঁর ঠিকানা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথেই যুক্ত হয়ে যায়।

তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছেন অথবা সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারীর সাথে তিনিও কবুল করেছেন। সে হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বসম্মতক্রমে গোলামদের মাঝে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

বনু সাকিফকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য তায়িফ গমনে তিনি রাসুল ﷺ-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। এই কষ্টসাধ্য সফরে রাসুল ﷺ-এর অবর্ণনীয় কষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন স্বচক্ষে।

তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। সাথে নিয়ে যান রাসুল সহধর্মিণী ও কন্যাকে।

রাসুল ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন বদর, উহুদ, খন্দকসহ অনেক যুদ্ধে। এবং সেসব যুদ্ধে ঢেলে দেন নিজের সর্বোচ্চ শক্তি।

রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহ থেকে নয়টি অভিযানের নেতৃত্ব দান করেন। সে হিসেবে তিনি রাসুল ﷺ-এর সারিয়্যাগুলোর সবচেয়ে বেশি অভিযানের কমান্ডার পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

সকল নবি-রাসুলের মধ্যে আল্লাহর পাক কালাম কুরআনে কারিমে একমাত্র তাঁরই নাম উল্লেখ হয়েছে।

তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর প্রিয় ব্যক্তি এবং রাসুল ﷺ-এর প্রিয় ব্যক্তি উসামা ؓ-এর পিতা।

তিনি তাঁর জিহাদি জীবনের সফর শেষ করেছেন শাহাদাতের সুধা পান করে। ফলে স্বীয় জীবনকে আকিদা-বিশ্বাসের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু জীবনের জন্য নিজের আকিদাকে বিসর্জন দেননি।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের প্রিয় এই মহান সাহাবির প্রতি রহমতের করুণাধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

ফিদায়ি কমান্ডার
আব্দুল্লাহ বিন উনাইস আল-জুহানি ﷺ

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

আব্দুল্লাহ বিন উনাইস বিন আসআদ বিন হারাম বিন হাবিব বিন মালিক বিন গানম বিন কাব বিন তাইম বিন নুফাসা বিন ইয়াস বিন ইয়ারবু বিন বারক বিন ওয়াবারা।[৪১২] ইনি কালব বিন ওয়াবারার ভ্রাতৃগোষ্ঠী। বারক বিন ওয়াবারা গিয়ে মিলিত হয় জুহাইনা গোত্রে।[৪১৩]

আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ ছিলেন খাজরাজের শাখাগোত্র বনু সালিমার মিত্র।[৪১৪] এবং বিশেষভাবে বনু সালিমার শাখাগোত্র সাওয়াদেরও মিত্র।[৪১৫] বনু সাওয়াদের লোকদেরকেই সম্বন্ধ করা হয় এভাবে—সাওয়াদ বিন গানম বিন কাব বিন সালিমা বিন সাদ। ইনি এসেছেন খাজরাজ গোত্র থেকে।

তিনি আকাবার বাইআতে শরিক ছিলেন।[৪১৬] তাঁর ইসলাম গ্রহণ কল্যাণকর হয়। তিনি ওই তিনজনের একজন, যারা বনু সালিমা গোত্রের মূর্তি ভেঙেছিলেন।[৪১৭]

---

৪১২. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৪৫২ পৃ., আল-ইসতিআব : ৩/৮৭০, আল-ইসাবাহ : ৪/৩৭,
৪১৩. আল-ইসতিআব : ১৩/৮৭০, উসদুল গাবাহ : ৩/১২০, আল-ইসাবাহ : ৪/৩৭।
৪১৪. আল-ইসাবাহ : ৪/৩৭, উসুদল গাবাহ : ৩/১১৯, আল-ইসতিবসার : ১৩৬ পৃ.।
৪১৫. আল-ইসতিআব : ৩/৮৭০।
৪১৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৭১, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৮৩ পৃ.।
৪১৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩৪৭।

ইসলাম ও নবির দুশমন আবু রাফিকে হত্যা করার লক্ষ্যে প্রেরিত বনু খাজরাজের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট দলের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁরা খাইবারে গিয়ে নবির দুশমনকে হত্যা করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﵁-ই তাকে হত্যার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

ইউসাইর বিন রিজামকে হত্যার উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কমান্ড অভিযানের তিনিও একজন সদস্য ছিলেন। সে সময় ইউসাইর রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বনু গাতাফান গোত্রকে জমায়েত করছিল। আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﵁-ই তাকে হত্যার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।[৪১৮]

আর সাল্লাম বিন আবুল হুকাইক তথা আবু রাফি এবং ইউসাইর, দুজনই ছিল খাইবারের ইহুদি। এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বড় শত্রু।

হুজালি অভিমুখে তাঁর অভিযান

চতুর্থ হিজরির মুহাররমের ছয় তারিখ সোমবার আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﵁ মদিনা থেকে বের হন।[৪১৯] এবং রাসুল ﷺ তাঁকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা সম্পন্ন করে ১৮ দিন পর মদিনায় ফিরে আসেন। রাসুল ﷺ তাঁকে একাই খালিদ বিন সুফিয়ান বিন নুবাইহ হুজালিকে হত্যার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। যে উরানাহ[৪২০] এলাকায় রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেনা সমাবেশ করছিল। আব্দুল্লাহ ﵁ খালিদকে হত্যা করে তার মাথা নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে হাজির হন।

আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, 'রাসুল ﷺ আমাকে ডেকে বললেন, "আমি জানতে পারলাম, খালিদ বিন সুফিয়ান বিন নুবাইহ হুজালি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য জোগাড় করছে। এখন সে নাখলায়[৪২১] অথবা উরানায় আছে।

৪১৮. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৯৮ পৃ., ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৯১, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৯২-২৯৩।

৪১৯. ইমাম ওয়াকিদিরি মাগাজি : ১/৩, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫০।

৪২০. আরাফার ময়দানের পাহাড়ের কাছে একটি জায়গার নাম উরানাহ। মুজামুল বুলদান : ৬/১৫৯।

৪২১. নাখলাহ, মক্কার নিকটবর্তী হিজাজের একটি জায়গার নাম। মুজামুল বুলদান : ৮/২৭৫।

সেখানে গিয়ে তুমি তাকে হত্যা করবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, তার অবকাঠামো আমাকে বলুন; যাতে তাকে চিনতে পারি।" রাসুল ﷺ বললেন, "তাকে দেখলে তোমার শয়তানের কথা মনে পড়বে। তোমার ও তার মাঝে আলামত হলো, তুমি যখন তাকে দেখবে, তখন দেখতে পাবে, সে ভয়ে প্রকম্পিত।"

আমি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বের হলাম। তার কাছে পৌঁছলাম, তখন সে কিছু মহিলার মাঝে অবস্থান করছিল। তারা তার জন্য অবস্থানের একটি স্থান খুঁজছিল। তখন আসরের সময় ছিল। রাসুল ﷺ যেমনটি বলেছেন, আমি তাকে ওই অবস্থায় দেখতে পেলাম। তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার ভয় হচ্ছিল কোনো কারণে আমার সালাত ছুটে যায় কি না। আমি হাঁটতে হাঁটতে মাথায় ইশারা করে সালাত আদায় করে নিলাম। তার কাছে গিয়ে পৌঁছলে সে জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি?" বললাম, "আরবের লোক। আপনার ব্যাপারে শুনলাম, আপনি নাকি এই লোকের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করছেন?" সে বলল, "হ্যাঁ, আমি সে কাজেই আছি।"

এরপর তার সাথে কিছুদূর হাঁটলাম। এবং সুযোগ পাওয়ামাত্রই হামলা করে তাকে হত্যা করলাম। এরপর সেখান থেকে বের হয়ে চলতে থাকি। তখন তার নারীরা তার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে পৌঁছলে রাসুল ﷺ আমাকে দেখে বললেন, "চেহারা সফল হয়েছে।" আমি বললাম, "তাকে হত্যা করেছি হে আল্লাহর রাসুল!"[৪২২] আমি তার কর্তিত মাথা রাসুল ﷺ-এর সামনে রেখে দিলাম। এবং ঘটনার বিবরণ শুনালাম।'[৪২৩]

এভাবেই আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﵁ তাঁর অনন্য বীরত্ব ও বিরল দুঃসাহসিকতার মাধ্যমে সক্ষম হয়েছিলেন হুজালির ফিতনাকে নির্মূল করতে—যখন সে ওই ফিতনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এভাবেই আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﵁ ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে হুজালির চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।

---

৪২২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫০-৫১, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৯৩-২৯৪, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৩১-৫৩৩।
৪২৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৩৩।

হুজালি মুসলিমদের রাতের শিকারে পরিণত করার আগেই আব্দুল্লাহ ﷺ তাকে সকালেই শিকারে পরিণত করেছেন। যে কিনা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করছিল এবং তাঁদের জানমালের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করে চলেছিল।

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

তিনি আকাবার বাইআতে উপস্থিত ছিলেন।[৪২৪] এক বর্ণনামতে বদর, উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন।[৪২৫] আরেক বর্ণনামতে তিনি উহুদ ও তার পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন।[৪২৬] দ্বিতীয় বর্ণনাটিই সঠিক। কারণ একদল সাহাবি বদর যুদ্ধের সময় পিছিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ-ও ছিলেন।[৪২৭] কারণ তাঁরা ধারণা করতে পারেনি যে, অতি সত্বর তাঁদের যুদ্ধে জড়াতে হবে। ফলে তাঁরা বদরে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তুরবান[৪২৮] নামক স্থানে রাসুল ﷺ-এর সাথে আব্দুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি সুস্থ-নিরাপদে আছেন এবং বিজয় লাভ করেছেন, এ জন্য আল্লাহর প্রশংসা আদায় করছি। আপনি যেদিন বের হয়েছেন, সে রাতে আমার জ্বর ছিল। গতকাল পর্যন্ত জ্বরাক্রান্ত ছিলাম। এরপর আপনার উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দান করুন।'[৪২৯]

আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ছিলেন মুহাজির, পরে হয়েছেন আনসার।[৪৩০] তিনি বিশিষ্ট সাহাবিদের মধ্যে গণ্য হতেন।[৪৩১] সেসব সাহাবির একজন ছিলেন, যারা উভয় কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পরে সিরিয়া বিজয়াভিযানে শরিক হন। মিসরের পথে প্রবেশ

---

৪২৪. আল-ইসাবাহ : ৪/৩৮।
৪২৫. উসদুল গাবাহ : ৩/১২০।
৪২৬. আল-ইসতিআব : ৩/৮৭০, আনসাবুল আশরাফ : ১/২৫৯।
৪২৭. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৮৮।
৪২৮. মদিনা থেকে তুরবান বদরের পথে একদিনের রাস্তার দূরত্ব।
৪২৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১১৭।
৪৩০. আল-ইসতিআব : ৩/৮৭০, উসদুল গাবাহ : ৩/১২০, জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৪৫২।
৪৩১. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৪৫২ পৃ.।

করে আফ্রিকা পর্যন্ত পৌছে যান।[৪৩২] তিনি অর্জন করেছিলেন রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য এবং রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদ করার মর্যাদা। এবং পেয়েছিলেন ইসলামি বড় বড় বিজয়াভিযানের জিহাদে শরিক হওয়ার মর্যাদা। তাঁর উপনাম ছিল আবু ইয়াহইয়া।

তিনি রাসুল ﷺ থেকে ২৪টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৪৩৩] ফতোয়া দানকারী সাহাবিদের একজন ছিলেন।[৪৩৪] তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর সন্তানগণ। আতিয়্যা, আমর, দামরাহ ও আব্দুল্লাহ। এবং তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন সাহাবি জাবির বিন আব্দুল্লাহ ও বিসর বিন সাদ ﷺ। এই আব্দুল্লাহ বিন উনাইসই রাসুল ﷺ-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন :

إِنِّي شَاسِعُ الدَّارِ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُ لَهَا،

'আমার বাড়ি অনেক দূরে, আমাকে এক রাতের কথা বলে দিন, তাহলে সে রাত জেগে আমি ইবাদত-বন্দেগি করব।'

فَقَالَ لَهُ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم: انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ

তখন নবিজি ﷺ বললেন, 'রমাদানের ২৩তম রাত জেগে ইবাদত করবে।'[৪৩৫]

তিনি রাসুল ﷺ থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন, রাসুল ﷺ বলেন :

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَيَمِينُ الْغَمُوسِ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا كَانَتْ وَكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

---

৪৩২. আল-ইসাবাহ : ৪/৩৯।
৪৩৩. আসমাউস সাহাবাতির রুওয়াত- মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ : ২৮২ পৃ.।
৪৩৪. আসহাবুল ফুতইয়া মিনাস সাহাবাহ- মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ : ৩২০ পৃ.।
৪৩৫. মুয়াত্তা মালিক : ৮৮৬, উসদুল গাবাহ : ১/৬২০। বিস্তারিত দেখুন, তাহজিবুত তাহজিব : ৫/১৫০।

'সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা শপথ করা। ওই সত্তার শপথ—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে কেউ শপথ করবে—যদিও মাছির পাখার সমান শপথ হোক না কেন—তারই কলবে দাগ পড়ে যাবে। ওই দাগ নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে।'[৪৩৬]

কিসাস সম্পর্কে একটি হাদিস নেওয়ার জন্য জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ এক মাসের পথ সফর করে আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ-এর কাছে গাজায় গিয়েছিলেন।[৪৩৭]

তাঁর জন্মসন সম্পর্কে আমরা জানতে পারিনি। তিনি মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতকালে ৫৪ হিজরিতে সিরিয়ায় ইনতিকাল করেন।[৪৩৮]

তাঁর নেতৃত্বের যেসব বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে ভেসে উঠছে, তা হলো আল্লাহ-প্রদত্ত বীরত্ব ও বিরল দুঃসাহসিকতা। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষকে আমার ভয় লাগে না।'[৪৩৯] এ ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে, তিনি মক্কার সন্নিকটে গিয়ে সাথি-সঙ্গী ও সৈন্যসামন্ত থাকা সত্ত্বেও হুজালিকে হত্যা করেছিলেন; অথচ তখন তাঁর সাথে শুধু তরবারি ছাড়া আর কেউই ছিল না।

অনুরূপ তিনি হুজালি ছাড়া ইসলাম ও নবির অন্যান্য দুশমনদেরও হত্যা করেছেন। দলের সদস্যদের থেকে তাঁর হাতেই সম্পন্ন হয়েছিল সেই দুশমনদের হত্যার কাজ। অভিযানের সদস্যরা বীরত্ব ও সাহসিকতায় বাছাইকৃত হয়ে থাকে। সেহেতু আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ ছিলেন আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বাছাইকৃতদের সেরা এবং সবচেয়ে দুঃসাহসী, তেজি ও নির্ভীক বীর।

আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ প্রকৃতপক্ষে একজন বীর কমান্ডার ছিলেন।

---

৪৩৬. আল-মুজামুল কাবির : ৩৫০, উসদুল গাবাহ : ৩/১২০।
৪৩৭. আল-ইসাবাহ : ৪/৩৮, আল-ইসতিআব : ৩/৮৭০, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২৬০।
৪৩৮. আল-ইসাবাহ : ৪/৩৮, আল-ইসতিআব : ৩/৮৭০, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২৬১, তাহজিবুত তাহজিব ৫/১৫০, আল-ইসতিবসার : ১৬৮ পৃ.।
৪৩৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৩২।

ইতিহাসে আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﵁

তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিমদের একজন ছিলেন। একই সাথে ছিলেন মুহাজির ও আনসার।

ইসলাম ও মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি দুশমনকে হত্যা করেন এই আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﵁।

তিনি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদ করেন। জিহাদ করেন ইসলামি বড় বড় বিজয়াভিযানের কমান্ডারদের পতাকাতলে।

তিনি ছিলেন বীরদের বীর এবং সত্যনিষ্ঠ আত্মোৎসর্গী মুজাহিদদের সেরা।

তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস এবং ফতোয়া দানকারী সাহাবিদের একজন।

আল্লাহ তাআলা এই মহান আত্মোৎসর্গী বীর সাহাবির প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর আল-আওসি আল-আনসারি ﵁

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর বিন নুমান বিন উমাইয়া বিন ইমরুউল কাইস বিন সালাবা বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস। ইমরুউল কাইসের উপাধি ছিল বুরাক। তিনি এ নামেই পরিচিত ছিলেন।[৪৪০]

তাঁর বাবার বংশ হলো বনু সালাবা বিন আমর বিন আওফ[৪৪১] এবং মায়ের বংশ হলো বনু আব্দুল্লাহ বিন গাতাফান।[৪৪২] মায়ের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়নি। খাওয়াত বিন জুবাইর তাঁর আপন ভাই।[৪৪৩] তাঁদের চাচা হারিস বিন নুমান বিন উমাইয়া বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৪৪৪]

---

৪৪০. আল-ইসতিবসার : ৩২২, আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৭, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩০, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৫।

৪৪১. উসদুল গাবাহ : ৩/১৩০।

৪৪২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৫।

৪৪৩. আল-ইসতিআব : ৩/৪৭৫।

৪৪৪. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৩৩৬ পৃ.।

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ؓ-এর উপনাম আবু মুনজির।[৪৪৫] সূচনাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আওস ও খাজরাজ গোত্রের মুসলিমদের সাথে আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে উপস্থিত ছিলেন।[৪৪৬]

রাসুল ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। সে হিসেবে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ও হুসাইন বিন হারিস ؓ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।[৪৪৭]

সুহাইল বিন হুনাইফ ؓ-সহ তিনি মদিনার মুশরিকদের মূর্তি ভাঙতেন এবং সেগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিমদের কাছে নিয়ে আসতেন।[৪৪৮] ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তাঁর অত্যন্ত একনিষ্ঠতার কারণে তিনি এটা করতেন।

জিহাদ

১- ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ؓ ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৪৪৯] সেদিন আবুল আস বিন রবি-কে বন্দী করেছিলেন।[৪৫০] যিনি রাসুল ﷺ-এর কন্যা জাইনাবের স্বামী ছিলেন।

মক্কার লোকেরা যখন তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে পাঠাল, তখন রাসুল ﷺ-এর কন্যা জাইনাব ؓ-ও আবুল আসেরও মুক্তিপণ পাঠিয়েছিলেন। মুক্তিপণের মধ্যে তিনি তাঁর হার পাঠিয়েছিলেন, যা মূলত খাদিজা ؓ-এর ছিল। বলা হতো, হারটি মূলত বিভিন্ন রঙের ছাপযুক্ত আকিক ছিল। খাদিজা ؓ যখন জাইনাব ؓ-কে আবুল আসের হাতে তুলে দেন, তখন হারটি তাঁকে

---

৪৪৫. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৪১।

৪৪৬. ইবনি হিশাম : ২/২৬৫, আনসাবুল আশরাফ : ১/২২৪১, আদ-দুরার : ৭৬ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ১২৮।

৪৪৭. আদ-দুরার : ৯৯ পৃ.।

৪৪৮. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৬৫।

৪৪৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৫, আল-ইসতিবসার : ৩২৩ পৃ., উসদুল গাবাহ : ৩/১৩০, আল-মুহাব্বার : ২৭৯, আল-ইসতিআব : ৩/৮৭৭, আল-ইসাবাহ : ৪/৪৬।

৪৫০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৩১, আর-ইসতিবসার : ৩২৩ পৃ.।

উপহার দিয়েছিলেন। হারটি দেখে রাসুল ﷺ অশ্রুসিক্ত হলেন। তাঁর মনে খাদিজা ﷺ-এর স্মৃতি ভেসে উঠল। ফলে জাইনাবের প্রতি তাঁর মায়া হলো। সাহাবিদের বললেন, 'তোমরা চাইলে তাঁর বন্দীকে মুক্ত করে দাও এবং তাঁর হার তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও।' সাহাবায়ে কিরাম বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল!' তাই আবুল আসকে ছেড়ে দিলেন এবং সাথে জাইনাব ﷺ-এর হারটিও ফিরিয়ে দিলেন। রাসুল ﷺ আবুল আসকে শর্ত দিলেন, জাইনাবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেবে। আবুল আস প্রতিশ্রুতি দিল। আবুল আসের মুক্তির জন্য তার ভাই আমর বিন রবি এসেছিল। আবুল আস ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ-এর বন্দী।[৪৫১] তিনি রাসুল ﷺ-এর সম্মানার্থে আবুল আসকে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দেন।

২- উহুদ যুদ্ধে

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৪৫২] রাসুল ﷺ তাঁকে তিরন্দাজ বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব দেন। এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০ জন। জাবালে আইনাইন পাহাড়কে তাঁদের অবস্থানস্থল নির্ধারণ করেন। এরপর তিনি মদিনাকে সামনে রেখে উহুদ পাহাড়কে পেছনে ফেলে অবস্থান গ্রহণ করেন।[৪৫৩]

তিরন্দাজ বাহিনীকে রাসুল ﷺ কড়া নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা তোমাদের এই স্থানে অটল থেকে আমাদের পেছনের দিকটা প্রহরা দেবে। যদি আমাদের গনিমত সংগ্রহ করতে দেখো, তবে স্থান ছেড়ে গনিমত সংগ্রহে শরিক হয়ো না। আর যদি দেখো, আমাদের হত্যা করা হচ্ছে, তবে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসো না।'[৪৫৪]

যুদ্ধ শুরু হলে তিরন্দাজ বাহিনী মুশরিকদের প্রতি তিরবৃষ্টি করতে লাগলেন। এমন কোনো তির ছিল না, যা কোনো মুশরিক সৈন্য বা ঘোড়ার ওপর গিয়ে

---

৪৫১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৩০-১৩১।

৪৫২. আল-ইসাবাহ : ৪/৮৬, উসদুল গাবাহ : ৩/১৩০, আল-ইসতিআব : ৩/৪৭৭, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৫।

৪৫৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২২০।

৪৫৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৫।

পড়ত না।[৪৫৫] রাসুল ﷺ তিরন্দাজ বাহিনীকে মুসলিম বাহিনীর পেছনে বিন্যস্ত করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﵁-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তির-বর্শার মাধ্যমে মুশরিকদের ঠেকিয়ে রাখতে; যাতে পেছন দিক থেকে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা করতে না পারে।[৪৫৬]

মুশরিক বাহিনীর ডান বাহুতে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং বাম বাহুতে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল ইকরিমা বিন আবু জাহেল।[৪৫৭] খালিদ ও ইকরিমা কেউ মুসলিমদের ব্যাপারে কোনো সুবিধাই করতে পারছিল না। কারণ তিরন্দাজ বাহিনী একদিক থেকে মুসলিম বাহিনীকে যেমন পরিপূর্ণ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন, আরেক দিক থেকে তিরবৃষ্টির মাধ্যমে মুশরিকদের পাখির মতো শিকার করছিলেন।

মুশরিক বাহিনীতে লাশের পর লাশ পড়তে থাকল। মুশরিক বাহিনীতে আসা নারীরা যখন তাদের সৈনিকদের ভয়াবহ অবস্থা দেখতে পেল, তখন তারা নিজ অবস্থান ছেড়ে পালাতে লাগল। মুশরিকরা পলায়ন করতে লাগল। উতবার মেয়ে হিন্দাও তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দিগ্‌বিদিক হারিয়ে পালাতে লাগল। মুসলিমগণ চাইলেই তাদের ধরতে পারত।[৪৫৮] সেদিন মুসলিমগণ অটল-অবিচল থেকে মরণপণ লড়াই করেছিলেন।[৪৫৯] ফলে কুরাইশদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।[৪৬০]

মুসলিমগণ তাদের পিছু ধাওয়া করে। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও সামানাপত্র ফেলে জান নিয়ে পলায়ন করছিল। মুসলিম বাহিনী সেগুলো গনিমত হিসেবে সংগ্রহ করছিল।[৪৬১]

---

৪৫৫. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩১৭।
৪৫৬. আদ-দুরার : ১৫৫ পৃ.।
৪৫৭. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৫৯ পৃ.। দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/১১।
৪৫৮. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩১৭-৩১৮, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩৪।
৪৫৯. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৬০ পৃ.।
৪৬০. আদ-দুরার : ১৫৬ পৃ.।
৪৬১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৪১।

মুশরিক বাহিনী পরাজিত হয়ে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যাচ্ছিল আর মুসলিম বাহিনী তাদের ধাওয়া করে গনিমত সংগ্রহ করছিল। এ অবস্থা দেখে তিরন্দাজ বাহিনীর একে অপরকে বলল, 'তোমাদের এখানে অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ দুশমনকে পরাস্ত করেছেন। অতএব তোমাদের ভাইদের সাথে গনিমত সংগ্রহে লেগে পড়ো।' আবার কেউ কেউ বলল, 'তোমরা কি জানো না, রাসুল ﷺ তোমাদের বলেছেন, আমাদের পেছনের দিক থেকে আমাদের রক্ষা করবে? অতএব আপন জায়গায় অটল থাকো।' অন্যরা বলল, 'আল্লাহর রাসুল এটা উদ্দেশ্য নেননি। আল্লাহ তো দুশমনকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং তাদের পরাস্ত করেছেন।'

তাঁদের আমির আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ সেদিন সাদা কাপড় দিয়ে নিদর্শনযুক্ত ছিলেন। তখন তিনি সৈনিকদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। আল্লাহর হামদ ও সানার পর সৈনিকদের আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। রাসুল ﷺ-এর নির্দেশের অমান্য করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর কথা মানতে পারলেন না। অবস্থান ছেড়ে গনিমত সংগ্রহে চলে গেলেন। ফলে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ-এর সাথে শুধু ১০ জন সাহাবি অটল থাকলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভাইগণ, আপনাদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করুন। আপনাদের আমিরের আনুগত্য করুন।' কিন্তু না, তাঁরা তাঁর কথা মানতে পারলেন না। মুশরিক বাহিনীর পিছু নিয়ে গনিমত সংগ্রহে লেগে গেলেন। আর পাহাড়ের অবস্থানস্থলকে খালি করে দিলেন।[৪৬২]

যখন অল্পসংখ্যক তিরন্দাজ ছাড়া বাকিরা চলে গেল, তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ পাহাড়ের সে স্থান খালি এবং স্বল্পসংখ্যক লোক দেখে অশ্ববাহিনী নিয়ে ফিরে আসে। ইকরিমা বিন আবু জাহেলও তার অশ্ববাহিনী নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদের অনুসরণ করে। এই অল্পসংখ্যক তিরন্দাজ প্রাণপণ তাদের মোকাবিলা করে। এবং তাদের অনেককে হত্যা করে।

৪৬২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৩০, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৫-৪৭৬।

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﵁-এর তির শেষ হয়ে আসে। এরপর তিনি বর্শা দিয়ে আঘাত করতে থাকেন। বর্শা ভেঙে গেলে তরবারি নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তরবারির মুখ ভেঙে যায়, এরপর তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৪৬৩] তিনি পড়ে গেলে মুশরিকরা তাঁকে বিবস্ত্র করে ফেলে। খুব ঘৃণ্যভাবে তাঁর লাশ বিকৃতি করে। তাঁর পেটে বর্শা ঢুকিয়ে কোমর ভেদ করে তলপেট পর্যন্ত চিরে দেয়। ফলে তাঁর নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসে। তাঁকে হত্যা করেছিল ইকরিমা বিন আবু জাহেল।[৪৬৪]

তাঁর ভাই খাওয়াত ﵁ তাঁকে তুলে নিয়ে এসে দাফন করেন।[৪৬৫]

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﵁ তাঁর সৈনিকদের উপদেশ দিতে এবং নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করতে কোনো রকম ত্রুটি করেননি। ইসলাম ও মুসলিম বাহিনীকে রক্ষার্থে এমনই বীরদর্পে লড়াই করেছিলেন, যা ভেবে বিস্ময় হতে হয়।

তিরন্দাজ বাহিনীর আদেশ অমান্যের ফলেই উহুদের দিন মুসলিমদের ওপর বিপর্যয় নেমে এসেছিল।[৪৬৬]

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﵁ উহুদ প্রান্তরে শাহাদাতের সুধা পান করে এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন যে, তাঁর না ছিল কোনো টাকা-পয়সা, ভিটে-মাটি বা কোনো সন্তানাদি।[৪৬৭] কিন্তু তিনি তাঁর আকিদার ব্যবসায় লাভবান হয়েছেন। আকিদার যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তাঁর শানে এবং তাঁর সাথে যে তিরন্দাজরা অবিচল ছিলেন, তাঁদের শানে অবতীর্ণ হয় আল্লাহর এ বাণী :

---

৪৬৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৩২, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৬, আল-ইসতিবসার : ৩২৩ পৃ.।

৪৬৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩০১-৩০২, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৩০, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৭৮।

৪৬৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৮৪, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৬।

৪৬৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/২৪-২৫, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৬০, আদ-দুরার : ১৫৬, ইবনুল আসির : ২/ ১৫৩-১৫৪।

৪৬৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৬।

وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ

'আবার তোমাদের কেউ কেউ আখিরাত আশা করে।'[৪৬৮_৪৬৯]

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

রাসুল ﷺ থেকে তাঁর কোনো বর্ণনা নেই।[৪৭০] কিন্তু মদিনাবাসীর মধ্যে যারা তাঁর ঘটনা বলেছেন, তাদের সেই হাদিসে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ-এর আলোচনা এসেছে। যেমন সহিহ বুখারিতে[৪৭১] বারা বিন আজিব ﷺ বর্ণিত হাদিসে এসেছে, 'মুশরিকরা যখন পরাজিত হলো, তখন তিরন্দাজ বাহিনীর সৈনিকেরা গনিমত সংগ্রহের জন্য চলে গেলেন। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ তাঁদের নিষেধ করলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁকে রেখে চলে গেলেন।'[৪৭২]

স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, রাসুল ﷺ থেকে তাঁর কোনো বর্ণনা নেই। যেহেতু আগে আগে শাহাদাত বরণ করেছেন, সেহেতু রাসুল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনার যথেষ্ট সময় পাননি। সম্ভবত যে অল্প সময় তিনি রাসুল ﷺ-এর সংশ্রবে ছিলেন, সে সময়টুকুও তাঁর জিহাদে অতিবাহিত হয়েছে।

তবে মর্যাদার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের দায়িত্ব আদায়ে সবশেষে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মসন উল্লেখ করেননি। তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে (৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি শাহাদাত বরণ করেন—যেহেতু উহুদ যুদ্ধ এই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল।[৪৭৩]

---

৪৬৮. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫২।
৪৬৯. দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩২৪।
৪৭০. আল-ইসতিআব।
৪৭১. আল-ইসাবাহ : ৪/৮৬।
৪৭২. আল-ইসাবাহ : ৪/৮৬।
৪৭৩. আল-ইবার : ৪/৫।

তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ বের করতে না পারলেও অন্তত সঠিকের কাছাকাছি একটা তারিখ বের করা সম্ভব। যেমন তিনি তাঁর ভাই খাওয়াতের চেয়ে বড় ছিলেন।[৪৭৪] খাওয়াত ﷺ ৪০ হিজরিতে (৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে) মদিনায় ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।[৪৭৫] অর্থাৎ তিনি হিজরতের ৩৪ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরি সন শুরু হয়েছিল ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে, যা একটি পরিচিত বিষয়। চন্দ্রবর্ষ হিসেবে খাওয়াত ﷺ হিজরতের ৩৪ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন—যেহেতু আরবরা চন্দ্রবর্ষ হিসেবে বয়সের হিসাব করত। আর সৌরবর্ষ হিসেবে ৩৩ বছর পূর্বে। তাহলে খাওয়াত ﷺ জন্মগ্রহণ করেন ৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দে।

আব্দুল্লাহ ﷺ যখন খাওয়াত ﷺ থেকে বয়সে বড়। আর খাওয়াত ﷺ ছিলেন তাঁর আপন ভাই। সে হিসেবে তিনি খাওয়াত ﷺ-এর চেয়ে কমপক্ষে দুই বছরের বড় হবেন।

তাহলে আব্দুল্লাহ ﷺ ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদাত বরণ করেন। এ হিসেবে তিনি জীবনায়ু লাভ করেন সৌরবর্ষ হিসেবে প্রায় ৩৭ বছর এবং চন্দ্রবর্ষ হিসেবে ৩৮ বছর। এ হিসাবটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে বের করা হয়েছে।

তিনি ছিলেন পাক্কা ইমানদার, দৃঢ় বিশ্বাসী, সত্যিকারের মুত্তাকি, অত্যন্ত পরহেজগার, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মুখলিস, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের একনিষ্ঠ প্রেমিক এবং সম্ভ্রান্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। অর্থাৎ আসল আরব এবং প্রকৃত মুমিনের সকল গুণাবলি তাঁর মাঝে সমন্বয় হয়েছিল।

তাঁর নেতৃত্বমূলক বৈশিষ্ট্য, যা তাঁকে সবচেয়ে বিপজ্জনক যুদ্ধের তিরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্বের যোগ্য প্রমাণিত করেছিল। যার ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং তাঁর সৈনিকদের ত্যাগ-তিতিক্ষার ওপর নির্ভর করত মুসলিম বাহিনীর জয়-পরাজয়। যেমনটা যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহে তার কার্যত ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁর সেসব নেতৃত্বমূলক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তিনটি পয়েন্টে বের করা যায়। প্রথমত,

---

৪৭৪. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৪১।
৪৭৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭৭-৪৭৮, আনসাবুল আশরাফ : ১/২৪১।

তিরন্দাজিতে অনন্য দক্ষতা; দ্বিতীয়ত, বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা; তৃতীয়ত, অনুপম আনুগত্য ও কঠোর শৃঙ্খলা।

তিরন্দাজ বাহিনীর সদস্যগণ মুসলিমদের মাঝে তিরন্দাজিতে নামেধামে দক্ষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বর্তমান আধুনিক সামরিক পরিভাষায় যাদের আমরা বলে থাকি 'স্নাইপার'।

দক্ষ তিরন্দাজদের ওপর রাসুল ﷺ-এর ভরসা একটু বেশিই থাকত, বিশেষত এই যুদ্ধে। কারণ তখন মুসলিম বাহিনীর কাছে তেমন একটা ঘোড়া ছিল না। বিপরীতে মুশরিকদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘোড়া থাকত। যার কারণে মুসলিমগণ নিপুণ তিরন্দাজির মাধ্যমে ঘোড়ার অভাব পূরণ করার চেষ্টা করতেন। তাই এই যুদ্ধে তিরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আবশ্যিকভাবেই আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ-এর দক্ষ তিরন্দাজ হতে হবে; যাতে তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের আদর্শ হতে পারেন এবং সক্ষম হন নিজের অনন্য যোগ্যতা বলে তাঁদের নেতৃত্ব দিতে।

কিন্তু তিরন্দাজিতে তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে যত কথাই বলি, তা কমই বলা হবে। কারণ বীরত্ব ও দুঃসাহসিতায় অবশ্যই তাঁকে হতে হবে অনন্য; যাতে এ ক্ষেত্রে তাঁর সৈনিকদের আদর্শ হতে পারেন।

সম্ভবত তাঁর বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, মাত্র ১০ জন তিরন্দাজ নিয়ে পাহাড়ের ন্যায় অবিচল ছিলেন। যাঁদের আক্রমণ করতে এসেছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরিমা বিন আবু জাহেলের নেতৃত্বে ২০০ অশ্বারোহী। সেখানে যুদ্ধটি ছিল ১০ জন পায়দল তিরন্দাজ এবং ২০০ অশ্বারোহীর মাঝে। সত্যিই সেটি এক অসম লড়াই। কারণ সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তারা এই গুটিকয়েকজন থেকে বেশি ছিল। ফলে যুদ্ধের চিরাচরিত ফলাফলের বিচারে ১০ জন মুসলিম শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি অবিচল ছিলেন পাহাড়ের ন্যায়, যুদ্ধ করেছেন বীরদর্পে এবং নিজের আকিদা রক্ষার জন্য ছিন্নভিন্ন হয়েছেন। তাই যুদ্ধ ও অবিচলতায় মর্যাদার প্রশ্নে বেশ লাভবান হয়েছেন। এর বিনিময়ে হরিয়েছেন নিজের প্রাণ। অথচ এই বীরত্ব, দুঃসাহসিকতা আর অবিচলতার সামনে এটাকে কোনো ক্ষতি হিসেবেই গণ্য করা যায় না।

তাঁর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও কঠোর শৃঙ্খলা। এ ক্ষেত্রে তিনি যেকোনো উন্নত সৈনিক বা কমান্ডারের উত্তম আদর্শ হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

এসব হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ-এর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। আর এটা তাঁর গভীর ইমান ও খাঁটি আকিদার অনিবার্য ফল।

ইতিহাসে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ

তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আনসারি সাহাবিদের একজন ছিলেন। আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে রাসুল ﷺ-এর কাছে বাইআত হন। এবং এই বাইআত রক্ষায় ওয়াদা পালনে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন।

উহুদে তিরন্দাজ বাহিনীতে তাঁর অনন্য নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে প্রথমে মুসলিম বাহিনী বিজয়মাল্য গলায় পরেছিল, তাঁদেরই মতানৈক্যের ফলে সেই মুসলিমদের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

তিরন্দাজ সৈনিকদের মতানৈক্যের পর তিনি নিজ দায়িত্বে পাহাড়ের ন্যায় অটল-অবিচল ছিলেন। যার কারণে তির শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং তারপরে সাধ্যের শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়াই করেছেন শত্রুর বিরুদ্ধে। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন।

নেতার নিরঙ্কুশ আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁর এমন দৃষ্টান্ত আছে, যা সর্বকালে, সব জায়গায় প্রত্যেক সৈনিকের জন্য অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য, যতক্ষণ তার নেতা বা কমান্ডার আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের ভেতরে থাকে। আর তিরন্দাজ বাহিনীর একাংশের মতানৈক্যের উদাহরণকে আমরা যুদ্ধকালীন এবং শান্তিকালীন উভয় ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলব।

আল্লাহ তাআলা এই মহান বীর সাহাবির প্রতি তাঁর রহমতের করুণাধারা অবিরাম জারি রাখুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ আল-মাখজুমি ﵁

তাঁর বংশধারা ও শুরুজীবন

আব্দুল্লাহ আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ বিন হিলাল বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন মাখজুম বিন ইয়াকাজা বিন মুররা বিন কাব বিন লুয়াই আল-কুরাশি।[৪৭৬]

তাঁর মা বাররাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম।[৪৭৭] আবু সালামা ﵁ একদিক থেকে নবিজি ﷺ-এর ফুফাতো ভাই[৪৭৮] আরেক দিক থেকে দুধভাই। আবু লাহাবের আজাতকৃত দাসী সুওয়াইবা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিবকে দুধ পান করায়, তারপর রাসুল ﷺ-কে এবং তারপর আবু সালামাকে। রাসুল ﷺ-কে সর্বপ্রথম দুধ পান করায় সুওয়াইবা।

হয়তো তিনি রাসুল ﷺ-এর এক বছরের কিছু ছোট হবেন। তাঁর জন্মসন লিখিত নেই। কিন্তু তাঁর জন্মসন বের করা সম্ভব। কারণ সুওয়াইবা তাঁকে রাসুল ﷺ-এর পরে দুধ পান করিয়েছে। আর রাসুল ﷺ যেহেতু হস্তীবাহিনীর বছর (৫৭১ খ্রি.)

---

৪৭৬. নাসবু কুরাইশ : ৩৩৭ পৃ., জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৪১-১৪৩ পৃ., আনসাবুল আশরাফ : ১/২৫৭, আল-ইসতিআব : ৩/৯৩৯।
৪৭৭. নাসবু কুরাইশ : ৩৩৭ পৃ., আল-মুহাব্বার : ১৭৩ পৃ.।
৪৭৮. উসদুল গাবাহ : ৫/২১৮।

জন্মগ্রহণ করেন, সে হিসেবে তিনি এই বছরে অথবা (৫৭২) খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করবেন। অর্থাৎ তিনি রাসুল ﷺ-এর এক বছরের ছোট হবেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ؓ-এর পরে এবং আরকাম বিন আবু আরকামের আগে।[৪৭৯]

আরকাম বিন আবু আরকামের গৃহে[৪৮০] নবিজি ﷺ ও প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীগণ প্রবেশের পূর্বে এবং ১০ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ১১তম ইসলাম গ্রহণকারী।[৪৮১]

রাসুল ﷺ যখন সাহাবিদেরকে নির্যাতনের শিকার হতে দেখলেন, তখন তাঁদের বললেন :

'যদি তোমরা হাবশায় চলে যাও, তাহলে ভালো হবে! কারণ সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছে, যার কাছে কেউ নির্যাতিত হয় না। হাবশা সত্যের ভূমি, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তির একটা পথ করে দেন।'

তখন মুসলিমগণ হাবশার দিকে হিজরত করলেন। ফিতনার আশঙ্কায় দ্বীনের হিফাজতের জন্য তারা আল্লাহর পথে পলায়ন করলেন। এটা ছিল ইসলামের প্রথম হিজরত।[৪৮২] হাবশায় এই প্রথম মুহাজিরদের দলে ছিলেন আবু সালামা ؓ এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে উমাইয়া বিন মুগিরা বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন মাখজুম ؓ।[৪৮৩]

হাবশার মুহাজিরগণ সংবাদ পেলেন মক্কার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সংবাদ পেয়ে তাঁরা মক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হয়ে জানতে

---

৪৭৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/২৬৯। দেখুন, জাওয়ামিউল সিরাত : ৪৬ পৃ.।
৪৮০. আনসাবুল আশরাফ : ১/১৭২।
৪৮১. আল-ইসতিআব : ৩/৯৩৯।
৪৮২. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৩।
৪৮৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৪ এবং ১/৩৪৯।

পারলেন, সংবাদটি মিথ্যা ছিল।[৪৮৪] এদের মধ্যে আবু সালামা ও তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাও ছিলেন।[৪৮৫] এদের সংখ্যা ছিল ৩৩ জন।[৪৮৬]

আবু সালামা ﷺ তাঁর মামা আবু তালিবের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন বনু মাখজুমের কিছু লোক আবু তালিবের কাছে এসে বলল, 'হে আবু তালিব, এটা কেমন কথা? তুমি তোমার ভাতিজার ব্যাপারে আমাদের বাধা দিয়ে রেখেছ। কিন্তু আমাদের লোকের সাথে তোমার কীসের সম্পর্ক, তুমি তার ব্যাপারেও আমাদের বাধা দিয়ে রাখছ?' তখন আবু তালিব বলল, 'সে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে আমার বোনের ছেলে। যদি বোনের ছেলের ব্যাপারে তোমাদের বাধা দিতে না পারি, তবে ভাইয়ের ছেলের ব্যাপারেও তোমাদের বাধা দিতে পারব না।' তখন আবু লাহাব বলে উঠল, 'হে কুরাইশের লোকেরা, তোমরা এই লোকটাকে অনেক ছাড় দিয়ে ফেলেছ। তোমরা একের পর এক তার গোত্রের লোককে তার আশ্রয়ে দিয়েই যাচ্ছ। আল্লাহর শপথ, হয়তো তোমরা তাকে বিরত রাখবে, অন্যথায় আমরাও সেটাই করব, যেটা সে করছে। যাতে তার ইচ্ছা পূরণ হয়।' কুরাইশের লোকেরা বলল, 'হে আবু উতবা, আমরা বরং তোমার অপছন্দ থেকে বিরত থাকব।' রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে আবু লাহাব তাদের বন্ধু এবং সাহায্যকারী ছিল। ফলে তারা তার বন্ধুত্বকে বাকি রাখল।[৪৮৭] আবু সালামা ﷺ হাবশায় প্রথম হিজরতকারী মুসলিমদের একজন ছিলেন।[৪৮৮] তিনি হাবশায় দুবার হিজরত করেন। সঙ্গে ছিল স্ত্রী উম্মে সালামা ﷺ। যার নাম হিন্দা। হিন্দা ﷺ হাবশায় দুজন সন্তান জন্মদান করেন—জাইনাব বিনতে আবু সালামা[৪৮৯] ও উমর বিন আবু সালামা।[৪৯০]

কুরাইশরা তাদের গোত্রের মুসলিমদের ওপর বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। তাঁদের বন্দী করে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে লাগল। ক্রমে ক্রমে নির্যাতন চরম মাত্রায়

৪৮৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৮৮।
৪৮৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৯০।
৪৮৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৯১। দেখুন, আদ-দুরার : ৬১ পৃ.।
৪৮৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৯৩।
৪৮৮. আল-ইসতিআব : ৩/৯৪০।
৪৮৯. আনসাবুল আশরাফ : ১/২০৭।
৪৯০. উসদুল গাবাহ : ৩/১৯৬, আনসাবুল আশরাফে (১/৩৩৭) 'হিন্দা'-এর পরিবর্তে 'রমলাহ' এসেছে।

পৌঁছে গেল। আবু সালামা ﷺ আবু তালিবের আশ্রয়ে থাকেন। আবু তালিব তাকে নিরাপত্তা দিলেন।[৪৯১] তাঁকে পরিপূর্ণভাবে দেখাশোনা এবং সাহায্য-সহযোগিতা করলেন।

মুফাসসিরদের মতে আবু সালামা ﷺ ও উসমান বিন মাজউন ﷺ সম্পর্কে এ আয়াতদ্বয় নাজিল হয়েছে—

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর রাহে হিজরত করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দান করব। আর আখিরাতের প্রতিদান তো সর্বাধিক বড়। যদি তারা জানত, যারা দৃঢ়পদ থেকেছে এবং তাদের রবের ওপরই ভরসা করেছে।'[৪৯২]

আবু সালামা ﷺ স্বীয় দ্বীনের সেবায় তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। নির্যাতন আর অসহায়ত্বের ওপর অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ইসলাম ছিল একনিষ্ঠ। ফলে তিনি এই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য হয়েছেন।

মদিনায় হিজরত

যখন মদিনার ৭০ জন ব্যক্তি আকাবায় রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত দিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ব্যাপারটি কুরাইশদের অস্থির করে তুলল। তারা দেখতে পেল, আল্লাহর রাসুলের একটি দুর্গ এবং হিজরতের স্থান তৈরি হচ্ছে।

তখন তারা মুসলিমদের আরও সংকটে ফেলল এবং নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। মুসলিমদের শুনতে হলো বিভিন্ন রকম অবমাননাকর কথা ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। মুসলিমগণ এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর কাছে

---

৪৯১. উসদুল গাবাহ : ৩/১৯৬।
৪৯২. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৪১-৪২।

অভিযোগ করল। রাসুল ﷺ-এর কাছে হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'আমাকে এখনো হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়নি।' একদিন রাসুল ﷺ সাহাবিদের সামনে প্রফুল্ল চেহারা নিয়ে বের হলেন। তাঁদের বললেন, 'তোমাদের হিজরতের ভূমি হচ্ছে ইয়াসরিব। যে হিজরতের ইচ্ছা করেছে, সে যেন হিজরত করে। কারণ ইয়াসরিব নিকটবর্তী অঞ্চল এবং তোমাদের পরিচিত জায়গা। এটা তোমাদের সিরিয়া যাওয়ার পথ।' তখন সাহাবায়ে কিরাম চুপিচুপি হিজরতের প্রস্তুতি নিয়ে গোপনে মদিনায় যেতে লাগলেন। বলা হয়, তাঁদের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ হিজরতকারীর মাঝে সময় লেগেছিল এক বছরের কিছু বেশি। তাঁরা বাহন ও কিছু মালসামানা নিয়ে একের পর এক যেতে থাকলেন। হাবশায় অবস্থানরত মুসলিমদের কাছে এই হিজরতের খবর পৌঁছে গেল। তাই তাঁদের মধ্যে যাঁরা হিজরতের জন্য মক্কায় পৌঁছার, তাঁরা মক্কায় পৌঁছে গেল।[৪৯৩] হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমনকারীর মাঝে ছিল আবু সালামা ﷺ। তিনি দেরি না করে মদিনায় হিজরত করলেন। তিনি মুসআব বিন উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ-এর পরে তৃতীয় নাম্বার মুহাজির হন। মুসআব বিন উমাইর ﷺ সর্বপ্রথম হিজরত করেছিলেন। তারপরে হিজরত করেন ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ﷺ-এর আগে আবু সালামা ﷺ হিজরত করেছেন। তবে প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী।[৪৯৪]

মুহাজির হিসেবে সর্বপ্রথম আবু সালামা ﷺ মদিনায় গমন করেন।[৪৯৫] অবশ্য উভয় বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ মুসআব বিন উমাইর ﷺ-কে রাসুল ﷺ মদিনায় শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এটা হিজরতের অনুমতি পাওয়ার আগের ঘটনা। যখন রাসুল ﷺ-কে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হলো, তখন আবু সালামা ﷺ মুহাজির হিসেবে প্রথম মদিনায় গমন করেন।[৪৯৬] অর্থাৎ তাঁর হিজরত মুসআব ﷺ-এর পরে হয়।

---

৪৯৩. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৫৭।
৪৯৪. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৫৯।
৪৯৫. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৫৯, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/২৩৯, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৮৬, উসদুল গাবাহ : ৩/১৯৬।
৪৯৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৭৭, আদ-দুরার : ৮ পৃ.১।

মুহাররমের ১০ দিন গত হওয়ার পর আবু সালামা ﷺ মদিনায় পৌছেন। আর রাসুল ﷺ মদিনায় পৌছেন রবিউল আওয়ালের ১২ দিন গত হওয়ার পর। সুতরাং সর্বপ্রথম যিনি হিজরত করে বনু আমর বিন আওফের বাড়িতে মেহমান হয়েছিলেন, তার হিজরত আর রাসুল ﷺ-এর হিজরতের মাঝে মাত্র দুই মাসের ব্যবধান।[৪৯৭]

অপর এক বর্ণনামতে, আবু সালামা ﷺ বাইআতে আকাবার এক বছর আগে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি হাবশা থেকে মক্কায় রাসুল ﷺ-এর কাছে চলে এসেছিলেন। যখন কুরাইশরা তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু করে দিল এবং তিনি মদিনার আনসারদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারলেন, তখন মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।[৪৯৮]

আবু সালামা ﷺ কুবায়[৪৯৯] মুবাশশির বিন আব্দুল মুনজির[৫০০] ﷺ-এর বাড়িতে মেহমান হন। ইনি আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস[৫০১] গোত্রের লোক।

আবু সালামা ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা ﷺ ছিলেন মুহাজির হিসেবে মদিনায় প্রথম আগমনকারিণী নারী। তাঁর স্বামী আবু সালামা ﷺ যখন হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর জন্যও উট প্রস্তুত করলেন। এবং তাঁকে উটে আরোহণ করালেন। সে সময় তাঁর কোলে ছিল শিশু সালামা ﷺ। আবু সালামাকে এ অবস্থায় বনু মুগিরার কিছু লোক দেখে ফেলল। তারা বলল, 'তুমি নিজের ব্যাপারে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করেছ। কিন্তু তোমার সঙ্গীর ব্যাপারে কীসের অধিকার রাখো? আল্লাহর শপথ, আমরা তাকে নিয়ে তোমাকে দেশে দেশে ঘুরতে দেবো না।' এরপর তারা তাঁর হাত থেকে উটের লাগাম খুলে নিল। এবং উম্মে সালামাকে তাদের কাছে রেখে দিল। তখন বনু আব্দুল আসাদের লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, 'আল্লাহর শপথ, যখন তোমরা তাঁকে তাঁর

---

৪৯৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/২৪০।

৪৯৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৭৭, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৮৬।

৪৯৯. কুবা মূলত একটি কূপের নাম। তার নামে গ্রামটি পরিচিত। এটি আনসারদের মাঝে বনু আমর বিন আওফের আবাসস্থল। এটি মদিনা থেকে দুই মাইল দূরে মক্কা যাওয়ার বামের রাস্তায় অবস্থিত। এখানেই মসজিদুত তাকওয়া অবস্থিত। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৭/২০-২২।

৫০০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/২৪০।

৫০১. আল-ইসতিবসার : ২৭৬-২৭৮ পৃ.।

স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছ, তখন আমরা তোমাদের কাছে তাঁর ছেলেকে রাখব না।' তারা উম্মে সালামাকে নিয়ে পরস্পর টানাহ্যাঁচড়া করতে লাগল। এই টানাহ্যাঁচড়ার কারণে সালামার একটি হাত বাহু থেকে খুলে যায়। মৃত্যু পর্যন্ত তা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এরপর তারা তাকে নিয়ে গেল। উম্মে সালামা ﷺ তার গোত্র বনু মুগিরায় থাকাকালে প্রতিদিন সাফা পাহাড়ে উঠে বসতেন আর বলতেন :

> 'হে শকুনের পাল, মুক্ত আকাশে ডানা ঝাপটাও আর বনু আব্দুল আসাদের ওপর হামলে পড়ো।
>
> তারপর হিলাল ও তার গোত্রের ওপর হামলে পড়ে ঠোঁটের ধারে শান দাও।'

এরপর উম্মে সালামা ﷺ তাদের ওপর বদদুআ দিয়ে বলতেন, 'তাদের গোশত যেন শকুনে খায়।' তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি প্রতিদিন সকালে বের হতাম আর প্রশস্ত প্রান্তরে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতাম। একদিন বনু মুগিরা গোত্রের এক লোক আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমাকে দেখল। আমার অবস্থা দেখে তার মনে দয়ার উদ্রেক হলো। সে আমার ব্যাপারে বনু মুগিরার সাথে কথা বলল। সে বলল, "তোমরা এই বেচারিকে তার স্বামী ও ছেলে থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ, এর দরুন তার এ কষ্ট কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?" তখন তারা আমাকে বলল, "তুমি চাইলে তোমার স্বামীর কাছে চলে যেতে পারো।" বনু আব্দুল আসাদ আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিল। আমি আমার উটনী প্রস্তুত করলাম। ছেলেকে কোলে নিয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে মদিনা অভিমুখে বের হলাম। এ সফরে আমার সাথে আল্লাহর কোনো বান্দা ছিল না। মনে মনে বললাম, পথে যার সাথেই দেখা হয়, খুশিমনে তার সাথেই আমার স্বামী পর্যন্ত পৌঁছব। এরপর যখন আমি তানয়িম[৫০২] নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন বনু আব্দুদ দার গোত্রের ভ্রাতৃগোষ্ঠীর উসমান বিন তালহা বিন

---

৫০২. তানয়িম মক্কার হিল এরিয়ার একটি জায়গার নাম। এটা মক্কা থেকে দুই ফারসাখ দূরে সারাফ এলাকার দিকে। অন্য বর্ণনায়, চার ফারসাখ দূরে অবস্থিত। এ নামে নামকরণের কারণ হলো, এ জায়গার ডানপাশে নাঈম নামে একটি পাহাড় আর বামপাশে না-য়িম নামে একটি পাহাড় আছে। আর উপত্যকাকে বলা হয়, নায়িমান। হজের সময় মক্কার অধিবাসীরা এখান থেকে ইহরাম বাঁধে। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ২/৪১৬-৪১৭।

আবু তালহার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, "হে আবু উমাইয়ার মেয়ে কোথায় যাচ্ছ?" বললাম, "মদিনায় আমার স্বামীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি।" তিনি বললেন, "তোমার সাথে কেউ নেই?" বললাম, "আমার এই ছেলে আর আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই।" তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ, তোমাকে এভাবে একাকী যেতে দেওয়া ঠিক হবে না।" তখন তিনি আমার উটের রশি ধরে টানতে লাগলেন। আল্লাহর শপথ, আমি আরবে তার চেয়ে উদার মনের লোক দেখিনি। যখন কোনো মনজিলে পৌঁছতেন, তখন উটকে বসিয়ে দিয়ে পেছনে সরে যেতেন। আমি নেমে পড়লে তখন তিনি উটকে টেনে পেছনে নিয়ে যেতেন। তারপর সামানা নামিয়ে রেখে উটকে গাছের সাথে বাঁধতেন। এরপর তিনি দূরে কোনো গাছের ছায়ায় গিয়ে শুয়ে পড়তেন। যাত্রার সময় হলে উটকে প্রস্তুত করে আমার দিকে এগিয়ে দিতেন এবং আমার থেকে দূরে সরে যেতেন। বলতেন, "আরোহণ করো।" যখন আমি আরোহণ করে উটের ওপর ভালোভাবে বসতাম, তখন তিনি এসে উটের লাগাম ধরে টানতেন। মদিনায় পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই করে গেলেন। যখন বনু আমর বিন আওফের এলাকা কুবা দেখতে পেলেন, তখন আমার উদ্দেশে বললেন, "তোমার স্বামী এই এলাকায় আছে। আল্লাহর নামে এখানে প্রবেশ করো।" এরপর তিনি ফিরে মক্কায় চলে গেলেন। আল্লাহর শপথ, আমি এমন কোনো মুসলিম পরিবারকে জানি না, যে পরিবার আবু সালামার পরিবারের মতো বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। উসমান বিন তালহার[৫০৩] মতো কোনো আত্মমর্যাদাবান লোককে কখনো দেখিনি। যখন উসমান বিন তালহা মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত উম্মে সালামা ﵂-এর সঙ্গী হয়েছিলেন, তখন তিনি কাফির ছিলেন।[৫০৪]

যারা রাসুল ﷺ-এর আগে এবং আবু সালামা ﵁-এর পরে মদিনায় হিজরত করে কুবায় আবু সালামার কাছে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তারা সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে সালাত আদায় করছিলেন। সে সময় বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা হতো। সে মসজিদের কিবলা বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরানো ছিল। রাসুল ﷺ এসে তাদের নিয়ে সেখানে

---

৫০৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৭৭-৭৮, আনসাবুল আশরাফ : ১/২৫৮-২৫৯।
৫০৪. জাওয়ামিউস সিরাত : ৮৬ পৃ.।

সালাত আদায় করেন। মুহাজিরদের সালাতে ইমামতি করতেন আবু হুজাইফা ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম সালিম ﷺ। মদিনাতেও তিনি ইমামতি করতেন। কারণ তাঁদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি কুরআন জানতেন। তাঁদের মাঝে উমর ﷺ-ও ছিলেন। এ অবস্থা রাসুল ﷺ মদিনায় আগমনের আগ পর্যন্ত ছিল।[৫০৫]

রাসুল ﷺ মদিনায় মসজিদ নির্মাণের পর মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দেন। অপর বর্ণনায় আছে, একদিকে মসজিদ নির্মাণের কাজ চলছিল, আরেক দিকে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও অধিকারের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করা হচ্ছিল। তাই তাঁরা এর ভিত্তিতে একে অপরের ওয়ারিসি সম্পদ লাভ করত। এই বিধান এ আয়াত নাজিল হওয়া পর্যন্ত বাকি ছিল।

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

'আর যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধানমতে তারা পরস্পর বেশি হকদার।'[৫০৬]

রাসুল ﷺ আবু সালামা ﷺ ও সাদ বিন খাইসামা ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দেন।[৫০৭]

দ্বিতীয় হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে রাসুল ﷺ গাজওয়ায়ে জুল-উশাইরার[৫০৮] উদ্দেশ্যে বের হন। তখন মদিনায় আবু সালামা ﷺ-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান।[৫০৯]

---

৫০৫. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৬৪।

৫০৬. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৭৫।

৫০৭. আদ-দুরার : ৯৬-৯৭ পৃ., আনসাবুল আশরাফ : ১/২৭০, আল-মুহাব্বার : ৭৩ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭০।

৫০৮. জুল-উশাইরা মক্কা-মদিনার মাঝে একটি ঝরনার পাশের স্থানের নাম। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৬/১৮১।

৫০৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯, আনসাবুল আশরাফ : ১/২৮৭, আদ-দুরার : ১০৬, জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৪৩।

আবু সালামা ﷺ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫১০] উহুদ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি আহত হন। আবু উসামা আল-জুশামি নামের এক কাফির তাঁর বাহুতে লম্বা বল্লম দিয়ে আঘাত করেছিল। এরপর তিনি এক মাস পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকেন। মনে করা হয়েছিল তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। অথচ ভেতরে ভেতরে ঘা বেড়ে গিয়েছিল, তিনি তা বুঝতে পারেননি। ফলে ক্ষতের ওপরের খোসা পড়ে গিয়ে আবারও আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন।[৫১১]

এভাবেই আবু সালামা ﷺ আল্লাহর সাথে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছিলেন। সয়েছিলেন হিজরতের বেদনাতুর যন্ত্রণা। তিনি সর্বদা সমানভাবে রাসুল ﷺ-কে সাহায্য করে গেছেন—যুদ্ধকালীন সময়ে কখনো সৈনিকের কাতারে থেকে আবার কখনো কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করে এবং শান্তিকালীন সময়ে পরিচালনার কাজে।

কাতান[৫১২] অভিমুখে অভিযান

আবু সালামা ﷺ উহুদে অংশগ্রহণ করেন। কুবা থেকে স্থানান্তর হয়ে তিনি মদিনার উপকণ্ঠে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি যেহেতু উহুদ যুদ্ধে বাহুতে আঘাতপ্রাপ্ত ছিলেন, তাই নিজ আবাসস্থলে ফিরে আসেন। সাথে ছিল তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা ﷺ।

তিনি সংবাদ পেলেন, রাসুল ﷺ হামরাউল আসাদের[৫১৩] দিকে অভিযান প্রেরণ করেছেন। তাই গাধায় আরোহণ করে রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বের হলেন।

---

৫১০. নাসবু কুরাইশ : ৩৩৭ পৃ.।

৫১১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/২৪।

৫১২. কাতান : ফাইদ অঞ্চলের একটি পাহাড়। সেখানে বনু আসাদ বিন খুজাইমা গোত্রের একটি পানির উৎস আছে। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫০, মুজামুল বুলদান : ৭/১২৫-১২৭।

৫১৩. হামরাউল আসাদ : মদিনা থেকে আট মাইল দূরে। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/৩৩৭।

তিনি 'আসবাহ'[৫১৪] নামক স্থান থেকে আকিকে অবতরণ করলে রাসুল ﷺ-এর দেখা পান। হামরাউল আসাদ পর্যন্ত রাসুল ﷺ-এর সাথে চলেন।

রাসুল ﷺ মদিনায় ফিরে আসলে তিনি মুসলিম বাহিনীর সাথে রওয়ানা হন। এরপর 'আসবাহ' থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন। যেখানে তিনি এক মাস অবস্থান করে ক্ষতের শুশ্রূষা করেছিলেন।

যখন হিজরতের ৩৫তম মাসের মাথায় মুহাররমের চাঁদ উদিত হলো। অর্থাৎ হিজরি চতুর্থ বর্ষ শুরু হলো। তখন রাসুল ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি এই অভিযানে বের হও। আমি তোমাকে এ বাহিনীর আমির নিযুক্ত করলাম।' তাঁর হাতে একটি ঝান্ডা দিয়ে বললেন, 'অবিরাম চলতে থাকো এবং বনু আসাদের ভূমিতে গিয়ে যাত্রাবিরতি করবে। তোমার ওপর তাদের আক্রমণের আগেই তুমি তাদের ওপর হামলা করে বসবে।' তাঁকে তাকওয়া অবলম্বন ও সাথিদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হওয়ার উপদেশ দিলেন। সে বাহিনীতে তাঁর সাথে ১৫০ জন যোদ্ধা বের হন। তাঁদের মাঝে ছিল আবু সাবরাহ বিন আবু রুহম।[৫১৫] তিনি আবু সালামা ﷺ-এর মা-শরিক ভাই। আরকাম বিন আবু আরকাম, আবু উবাদাহ ইবনুল জাররাহ,[৫১৬] সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস[৫১৭] প্রমুখ সাহাবিগণ ﷺ।[৫১৮]

এ অভিযানের প্রধান কারণ, তায়ি গোত্রের ওয়ালিদ বিন জুহাইরের ভাতিজি 'জাইনাব' সাহাবি তুলাইব বিন উমাইর আল-কুরাশি ﷺ-এর বিবাহ বন্ধনে ছিল। ওয়ালিদ তার ভাতিজিকে দেখার জন্য মদিনায় আসলো এবং জামাতার ঘরে মেহমান হলো, যিনি রাসুল ﷺ-এর একজন সাহাবি। ওয়ালিদ তার জামাতাকে সংবাদ দিল যে, খুয়াইলিদের দুই ছেলে তুলাইহা ও সালামাকে

---

৫১৪. আসবাহ : মসজিদে কুবার পশ্চিমে বনু জাহজাবির আবাসস্থল। দেখুন, ওয়াফাউল ওয়াফা : ২/৩৪৬।

৫১৫. তাঁর বিস্তারিত জীবনী জানতে পড়ুন আমাদের বই, 'কাদাতু ফাতহি বিলাদি ফারিস' (১৫৫-১৬০ পৃ.)।

৫১৬. বিস্তারিত জীবনী জানতে পড়ুন আমাদের বই, 'কাদাতু ফাতহি বিলাদিশ শাম ওয়া মিসর' (৫৪-৮১)।

৫১৭. বিস্তারিত জীবনী জানতে পড়ুন আমাদের বই, 'কাদাতু ফাতহিল ইরাক ওয়াল জাজিরাহ' (২৪৮-২৯৬ পৃ.)।

৫১৮. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি (১/৩৪১)।

এ অবস্থায় ছেড়ে এসেছে যে, তারা তাদের গোত্র এবং আরও কিছু লোক সংগ্রহ করে রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। তারা মদিনার নিকটবর্তী এলাকাগুলো টার্গেট করে বের হয়েছে। তারা বলাবলি করছে, 'আমরা মুহাম্মাদের দোরগোড়া পর্যন্ত যাব। তার আশেপাশে হামলা করব। কারণ তাদের একটি চারণভূমি আছে, যেখানে মদিনার লোকেরা তাদের পশু চরায়। আমরা অশ্ব চালিয়ে যাব। আমাদের অশ্বগুলোকে আমরা পূর্ণরূপে শক্তিশালী করেছি। আমরা বাছাইকৃত অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের নিয়ে বের হচ্ছি। কিছু লুণ্ঠন করতে পারলে পাকড়াও হতে হবে না। আর যদি তাদের বাহিনীর সাথে মুলাকাত হয়ে যায়, তবে তার জন্য প্রস্তুতি তো নিয়েই বের হয়েছি। আমাদের সাথে ঘোড়া আছে আর তাদের কোনো ঘোড়া নেই। আমাদের আছে ঘোড়ার মতোই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আর তারা দুঃখপীড়িত বিপদগ্রস্ত। অতি সম্প্রতিকালে কুরাইশরা তাদের ওপর চড়াও হয়েছিল। তারা পরিস্থিতির সামাল দিতে পারবে না। কোনো বাহিনীও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না।'

তাদের মাঝ থেকে এক লোক দাঁড়িয়ে বলল—যাকে কাইস বিন হারিস বিন উমাইর বলা হয়—'হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় এটা কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। তাদের মোকাবিলায় আমাদের কোনো তৃতীয় শক্তি নেই। আর তারা কোনো ডাকাত দলের লুণ্ঠিত সম্পদও নয়। আমাদের বসতি ইয়াসরিব থেকে অনেক দূরে। কুরাইশের মতো আমাদের তেমন বাহিনীও নেই। কুরাইশ তো অনেক সময় ধরে আরবদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছে। আবার তাদের কাঙ্ক্ষিত তৃতীয় শক্তিও আছে। তারপর তারা উঠে আরোহণ করে, ঘোড়া চালিয়ে, অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তিন হাজার যোদ্ধার বিশাল সেনাবহর নিয়ে অভিযানে বের হয়েছিল। আর তোমাদের শক্তি শুধু ৩০০ যোদ্ধা, যদি তা পূর্ণ হয়। তোমাদের অঞ্চল থেকে বের হয়ে নিজেদের জান নিয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছ। আমি তোমাদের বিপদের ব্যাপারে শঙ্কামুক্ত নই।'

এই লোকের বাস্তবধর্মী কথা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যাপারে বনু আসাদকে দ্বিধায় ফেলে দিল। তারা তাদের সীমানার ভেতরে থেকে এসব জল্পনা-কল্পনা করে যাচ্ছিল।

রাসুল ﷺ-এর সাহাবি তুলাইব বিন উমাইর رضي الله عنه ওয়ালিদকে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে গেলেন। তিনি রাসুল ﷺ-কে বনু আসাদ গোত্রের সংবাদ জানিয়ে দিলেন।

এরপর রাসুল ﷺ-এর নির্দেশে আবু সালামা ﷺ তাঁর সাথিদের নিয়ে বের হলেন। সাথে ওয়ালিদ আত-তায়িও গাইড হিসেবে বের হলো। তাঁরা দ্রুত চলতে লাগলেন। ওয়ালিদ পরিচিত পথ ছেড়ে মুসলিম বাহিনীকে ভিন্ন পথে নিয়ে চলল। রাত-দিন অনবরত পথ চললেন। ফলে কোনো সংবাদ পৌছার আগেই তাঁরা পৌছে গেলেন। বনু আসাদের একটি পানির উৎস কাতান এলাকার সন্নিকটে পৌছে গেলেন। সেখানেই শত্রুবাহিনী অবস্থান করছিল। মুসলিম বাহিনী একটি চারণভূমি পেল। চারণভূমিটি ঘেরাও করে তাদের তিনজন রাখালকে বন্দী করল। আর বাকিরা পালিয়ে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর ব্যাপারে তাদের সতর্ক করল। তারা মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে বলল। ফলে শত্রু বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

আবু সালামা ﷺ পানির উৎসের কাছে গিয়ে দেখলেন, বনু আসাদ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। তখন তিনি সৈন্য বিন্যস্ত করে গবাদি পশুর সন্ধানে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিলেন। সৈন্যদের তিন ইউনিটে ভাগ করলেন। এক ইউনিটকে নিজের কাছে রাখলেন। আর দুই ইউনিটকে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের উপদেশ দিলেন, আক্রমণাত্মক হামলা থেকে পিছপা হবে না, নিরাপদ থাকলে রাতে তাঁর কাছেই এসে রাত্রি যাপন করবে। তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করলেন। প্রত্যেক গ্রুপে একজন করে কমান্ডার নিযুক্ত করলেন।

অভিযান শেষে উভয় ইউনিট উট-ছাগল নিয়ে নিরাপদে তাঁর কাছে ফিরে আসে। অভিযানকালে কোনো শত্রুর সাথে তাদের মুলাকাত হয়নি।

আবু সালামা ﷺ এসব কিছু নিয়ে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সাথে তায়ি গোত্রের লোকটিও ফিরে এল। একরাত চলার পর আবু সালামা ﷺ বললেন, 'তোমাদের গনিমত বণ্টন করো।' প্রথমে গনিমতের মধ্য থেকে রাসুল ﷺ-এর জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হিসেবে একটি গোলাম বের করা হলো। তারপর এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্য রাখা হলো। বাকি সম্পদ বাহিনীর সদস্যদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হলো। এরপর গনিমতের উট-ছাগল হাঁকিয়ে মদিনায় ফিরে এল।[৫১৯]

৫১৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৪০-৩৪৩ পৃ.। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫০, উয়ুনুল আসার : ২/৩৮-৪৯।

অপর এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে, প্রমাণ হিসেবে তায়ি গোত্রের লোকটি আবু সালামা ﷺ-এর সাথে ফিরে আসে। সে একজন 'খিররিত'[৫২০] বা দক্ষ গাইড ছিল। সে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ভিন্ন পথে চলে কাতানে পৌঁছায়। যাতে শত্রুর কাছে মুসলিম বাহিনীর খবর গোপন রাখা যায়। মুসলিম বাহিনী শত্রুর কাছে এসেই একটি ছোট উটের পালে আক্রমণ করে। তারা দেখল, উটের রাখালদের মাধ্যমে শত্রুরা তাদের খবর পেয়ে গেছে এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। এরপর লড়াই বাধে এবং উভয়পক্ষের সৈন্য আহত হয়। তারপর শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।[৫২১]

তৃতীয় এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে, আবু সালামা ﷺ-এর বাহিনী রাতে পথ চলত আর দিনে আত্মগোপন করে থাকত। এভাবে চলতে চলতে একসময় তারা কাতান এলাকায় পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে দেখল, শত্রুরা অভিযানের জন্য সৈন্য সমাবেশ করেছে। কালবিলম্ব না করে ভোরের অস্পষ্ট আলোতেই শত্রুদের ঘেরাও করে ফেলে। কিন্তু হামলা হওয়ার আগেই বনু আসাদ সতর্ক হয় এবং অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে যায়। সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ শত্রু বাহিনীর এক লোকের ওপর হামলা করে বসেন। তার পায়ে আঘাত করে শরীর থেকে পা আলাদা করে ফেলেন। এরপর তাকে হত্যা করেন। এক বেদুইন মাসউদ বিন উরওয়াকে বর্শা মেরে হত্যা করে। মুসলিমরা আশঙ্কা করল যে, শত্রুরা তাদের সাথির কাপড় ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই তারা তাকে নিজেদের এরিয়ায় নিয়ে আসে।

এবার সাদ ﷺ চিৎকার দিয়ে বললেন, 'অপেক্ষা কীসের।' তখন আবু সালামা ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে হামলা করেন। মুশরিকরা আত্মরক্ষার জন্য দৌড় দিলে মুসলিমরা তাদের পিছু ধাওয়া করল। এরপর শত্রুরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

---

৫২০. আরবিতে খিররিত এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে গোপন ও সংকীর্ণ পথে সাফল্যের সাথে পথপ্রদর্শন করে। বলা হয়, সে সুঁইয়ের ছিদ্রে সুতা ঢোকানোর মতো করে পথপ্রদর্শন করে। আন-নিহায়া : ১/২৮৬।

৫২১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৪৪।

আবু সালামা ﷺ আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকলেন এবং সৈন্যদের নিবৃত্ত করলেন। সহজলভ্য গনিমত জমা করে মদিনা অভিমুখে ফিরে চললেন। কাতান পানির উৎস থেকে তাঁরা এক রাত পরিমাণ পথ চলে দেখতে পেলেন, তাঁরা পথ ভুল করেছে। সেখানে বনু আসাদের কিছু গবাদি পশু পেলেন। সেই গবাদি পশুগুলোকে তার রাখালসহ হাঁকিয়ে মদিনায় নিয়ে গেলেন। তাঁদের গনিমতের ভাগে সাতটি করে উট পড়েছিল।[৫২২]

তবে স্পষ্ট বিষয় হলো, প্রথম বর্ণনাটিই সঠিক। কারণ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণ এই বর্ণনার ওপর একমত পোষণ করেছেন। এটা বিবেক ও যুক্তিনির্ভরও বটে। কারণ আবু সালামা ﷺ বনু আসাদের মুশরিকদের ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেছিলেন। ফলে তারা গবাদি পশু পেছনে ফেলে জান নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর মুসলিমরা সেগুলো গনিমত হিসেবে লাভ করেন।

এই অভিযানের দ্বারা রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল, বনু আসাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের জোটবদ্ধতা ও সৈন্য সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। যাতে মদিনায় এসে মুসলিমদের ওপর হামলা করতে না পারে। আর স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণই অধিক কার্যকর। আবু সালামা ﷺ রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছেন। এরপর গনিমত সহকারে নিরাপদে মদিনায় ফিরে এসেছেন।

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন

আবু সালামা ﷺ-এর সন্তান : সালামা, উমর, দুররাহ ও জাইনাব। এদের মা হলেন, উম্মে সালামা ﷺ। যিনি পরবর্তী সময়ে রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আবু সালামার পুত্র উমর রাসুল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। আবু সালামা ﷺ-এর ইনতিকালের পরে রাসুল ﷺ তাঁর জিম্মাদারি নিয়েছিলেন। রাসুল ﷺ আবু সালামার পুত্র সালামার কাছে হামজাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ-এর কন্যাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। আবু সালামা ﷺ-এর কন্যা জাইনাব ﷺ জামআহ বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদ বিন আব্দুল

৫২২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৪৫।

উজ্জা এর পুত্র আব্দুল্লাহর বিবাহ বন্ধনে ছিল। তাঁর গর্ভে সন্তান জন্ম লাভ করে। আবু সালামা ﵇-এর দুই পুত্র—সালামা ও দুররাহ এর কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর অপর দুই সন্তান—উমর ও জাইনাবের সন্তান ছিল।[৫২৩]

আবু সালামা ﵇-এর পিতা আব্দুল আসাদের সন্তানাদি : আবু সালামা, সুফিয়ান বিন আব্দুল আসাদ, আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ। আসওয়াদ বদরে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। তাকে হামজা ﵇ হত্যা করেন। আসওয়াদ শপথ করেছিল যে, অবশ্যই সে রাসুল ﷺ-এর পানির হাওজ ভাঙবে। সে যুদ্ধ করতে করতে একসময় হাওজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হামজা ﵇ তাকে হাওজ ভাঙা অবস্থায় ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন। তার রক্তে মাটি ভিজে গিয়েছিল। আব্দুল আসাদের পুত্র সুফিয়ান ও আসওয়াদের মা হলো কিনদাহ।[৫২৪]

আবু সালামা ﵇ ও তাঁর ভাই আবু সাবরাহ বদরে রাসুল ﷺ-এর পক্ষে লড়াই করেন। আবু সালামার মা-শরিক ভাই আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ মুশরিকদের পক্ষে লড়াই করে। আবু সালামার কন্যা জাইনাবের মামা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাসুল ﷺ-এর দলে যুদ্ধ করেন আর জাইনাবের আরেক মামা মাসউদ বিন উমাইয়া বিন মুগিরা মুশরিকদের দলে যুদ্ধ করে।[৫২৫]

আবু সালামা ﵇ সেসব বদরি সাহাবিদের মধ্যে ছিলেন, যাঁরা রাসুল ﷺ-এর ফুফু সাফিয়া ﵇-এর সাথে দেখা করতেন। কারণ তিনি তাঁর মাহরাম ছিলেন। যেহেতু আবু সালামার মা সাফিয়া ﵇-এর বোন ছিল।[৫২৬]

আবু সালামা ﵇ রাসুল ﷺ থেকে বিপদের সময় 'ইসতিরজা' এর হাদিস বর্ণনা করেন।[৫২৭] তিনি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, 'কোনো মুসলিম যখন বিপদে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) পাঠ করে এবং বলে (اللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي، فَأْجُرْنِي فِيهَا، وَعَوِّضْنِي مِنْهَا) "হে

---

৫২৩. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৩৭-৩৩৮, সিরাতু ইবনি হিশামে (৪/৫২২) দুররাহ-এর নাম রুকাইয়া বলা হয়েছে।

৫২৪. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৩৭।

৫২৫. আল-মুহাব্বার : ৪০৩ পৃ.।

৫২৬. আল-মুহাব্বার : ১৭২-১৭৩ পৃ.।

৫২৭. তাহজিবুত তাহজিব : ৫/২৮৭।

আল্লাহ, আমি আপনার নিকট বিপদে সাওয়াব প্রত্যাশা করি, আপনি আমাকে এর পুরস্কার দান করুন এবং আমাকে এর বিনিময় দান করুন” তখন আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন এবং এর চেয়েও উত্তম বিনিময় দান করেন।'...[৫২৮]

তাঁর থেকে উম্মে সালামা ﵂ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৫২৯] তিনি ফতোয়া প্রদানকারী সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৫৩০] ইমান, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার এ বাণী অবতীর্ণ হয়—

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ

'অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, “নাও, তোমরাও আমার আমলনামা পড়ো।”'[৫৩১]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ কর্তৃক বর্ণিত হদিসে এসেছে,

'সর্বপ্রথম যাকে ডান হতে আমলনামা দেওয়া হবে, তিনি হলেন, আবু সালামা ﵁ বিন আব্দুল আসাদ। আর সর্বপ্রথম যাকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, সে হলো, তাঁর ভাই সুফিয়ান বিন আব্দুল আসাদ।'[৫৩২]

আবু সালামা ﵁ উহুদে আহত হয়েছিলেন। কাতান অভিযানে দশের অধিক দিন অতিবাহিত করে মদিনায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর ক্ষতের অবনতি হয়ে খুব মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে চতুর্থ হিজরির জুমাদাল উখরার ১৩ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ইনতিকাল করেন (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে)। বনি উমাইয়া বিন জাইদের উপত্যকায় উসাইরা কূপে তাঁকে শেষ গোসল দেওয়া হয়। জাহিলি যুগে এ কূপের নাম ছিল বায়ির। রাসুল ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন উসাইরা। আবু সালামা ﵁-কে বনু উমাইয়া বিন

---

৫২৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৫৯৮, আল-ইসাবাহ : ৪/৯৫।
৫২৯. তাহজিবুত তাহজিব : ৫/২৮৭।
৫৩০. আসহাবুল ফুতইয়া- মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ : ৩২২।
৫৩১. সুরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ১৯। উসদুল গাবাহ : ৩/১৯৬।
৫৩২. দেখুন, আল-আহাদিসুল মুখতারাহ : ৪৯, আল-ইসাবাহ : ৪/৯৫।

জাইদ এলাকা থেকে মদিনায় আনা হয়। এবং সেখানে তাঁর দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়।[৫৩৩]

আবু সালামা ﷺ-এর অসুস্থতার খবর শুনে রাসুল ﷺ তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু একদিকে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন, আরেক দিকে তাঁর প্রাণ বের হয়ে যায়। রাসুল ﷺ-এর দর্শনের আশায় যে চক্ষুদ্বয় তখনও প্রতীক্ষায় ছিল, সে চোখে রাসুল ﷺ স্বীয় হাত বুলিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন।

আবু সালামা ﷺ-এর মৃত্যুতে নারীরা নিজেদের ওপর অভিশাপ দিচ্ছিল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'থামো, নিজেদের বদদুআ দিয়ো না। কল্যাণের দুআ করো। কারণ মৃত ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা হাজির হয়।' অথবা বলেছেন, 'মাইয়িতের পরিবারের কাছে ফেরেশতা হাজির হয়। তারা তাদের দুআয় আমিন আমিন বলেন।' এরপর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, তাঁর কবর প্রশস্ত করে দিন। আলোকিত করে দিন। তাঁর আলো বাড়িয়ে দিন। তাঁকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ, তাঁকে হিদায়াতপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তাঁর রেখে যাওয়া আপনজনদের আপনি অভিভাবক হয়ে যান। হে রব্বুল আলামিন, তাঁকেও ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকেও ক্ষমা করুন।'[৫৩৪]

উহুদে যে আহত হয়েছিলেন, অবশেষে সে জখম নিয়েই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৫৩৫] এবার চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করলেন সে জখমের যন্ত্রণা থেকে। ইসলাম ও মুসলিমদের খিদমতে নিজের জান ও পরিবারকে পরিশ্রান্ত করে অবশেষে পাড়ি জমালেন পরপারে। উম্মে সালামা ﷺ সত্যিই বলেছেন, 'আমার জানা নেই, ইসলামের জন্য আবু সালামার পরিবারের মতো আর কার পরিবার এমন দুঃখ-কষ্ট সয়েছে?'[৫৩৬]

রাসুল ﷺ সাহাবিদের বাড়ির জায়গা নির্ধারণ করে দিতেন। তিনি আবু সালামা ﷺ-এর বাড়ির জায়গা বনু আব্দুল আজিজ জাহরিয়্যিনের বাড়ির কাছে নির্ধারণ

---

৫৩৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/২৪১, আনসাবুল আশরাফ : ৪২৯ পৃ.।
৫৩৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/২৪১-২৪২।
৫৩৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৪৪।
৫৩৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৭৮, আনসাবুল আশরাফ : ১/২৫৯।

করে দিয়েছিলেন। পরে তিনি সে জায়গা বিক্রি করে মদিনার বনু কাব গোত্রে চলে যান। হয়তো তিনি তারপরে উমাইয়া বিন জাইদ উপত্যকা এলাকায় উসাইরাহ কূপের কাছে বাস করতে থাকেন। যেখানে একেবারে রিক্তহস্ত অবস্থায় জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি উত্তরসূরিদের জন্য মিরাস হিসেবে কোনো ঘর বা টাকাপয়সা রেখে যাননি। অবশ্য তার চেয়েও অনেক বড় মিরাস রেখে গেছেন ইসলাম ও মুসলিমদের খিদমতে। তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব অন্যের জন্য অনায়াসেই উত্তম আদর্শ হতে পারে।

অস্বাভাবিক দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ, কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় সময়-উপযোগী বিস্ময়কর পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। তিনি রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহের মধ্য থেকে একটি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এরপরই তিনি মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর বাহিনীর সৈনিক ছিল ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর সেনানীগণ। তাঁর বাহিনীর মাঝে ছিল রাসুল ﷺ-এর তিরোধানের পর ইসলামি বিজয়ধারার মহান জেনারেলবর্গ। এটাই তাঁর নেতৃত্বের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

আবু সালামা ﵁ রাসুল ﷺ-এর একজন বিশিষ্ট জেনারেলই ছিলেন না; বরং তিনি পরিচালনা কাজে সেসব বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন, যারা রাসুল ﷺ-এর অবর্তমানে মদিনায় রাসুলের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ইতিহাসে আবু সালামা ﵁

আবু সালামা ﵁ ইতিহাসে সেসব মহান ব্যক্তির মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছেন, যারা সর্বপ্রথম গলায় ইসলামের রশি ধারণ করে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করেছেন। হাবশায় প্রথম হিজরতকারী এবং মদিনায়ও প্রথম হিজরতকারী হিসেবে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়।

আল্লাহর জন্য ধৈর্যসহকারে তিনি সহ্য করেছেন কুরাইশ কাফিরদের সকল নির্যাতন। দ্বীনে হানিফের জন্য আল্লাহর খাতিরে তাঁর পরিবারকে যত দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা অন্য কোনো পরিবারকে হতে হয়নি।

তিনি ছিলেন একজন চৌকশ জেনারেল, যোগ্য পরিচালক, একজন মহান ব্যক্তি। ইসলামের প্রাসাদের অন্যতম প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর।

আল্লাহ তাআলা এই মহান বীর শহিদ সাহাবির কবরে রহমতের শিশিরধারা বর্ষণ করুন। নুরের আলোতে আলোকিত করুন তাঁর কবর নামক জান্নাতের বাগিচা।

শহিদ কমান্ডার

মুনজির বিন আমর আস-সায়িদি আল-খাজরাজি আল-আনসারি ﷺ

বংশপরিচিতি ও শুরুজীবন

মুনজির বিন আমর বিন খুনাইস বিন লাওজান বিন আব্দে উদ্দা বিন জাইদ বিন সালাবাহ বিন খাজরাজ বিন সায়িদাহ।

তাঁর মাতা হিন্দা বিনতে মুনজির বিন জামুহ বিন জাইদ বিন হারাম বিন কাব বিন গানম বিন কাব বিন সালিমা[৫৩৭]। সালিমা বনু খাজরাজের অন্তর্ভুক্ত[৫৩৮] আবার বনু হারাম আল-খাজরাজি আল-আনসারিরও অন্তর্ভুক্ত। হিন্দা ﷺ রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণকারী নারীদের একজন ছিলেন।[৫৩৯]

ইসলামের পূর্বে মুনজির ﷺ-এর কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। জাহিলি যুগে তাঁর কোনো অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর নাম ইসলামি যুগে এসে চমকিয়েছে। বাইআতে আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে ৭৩ জন আনসারি

---

৫৩৭. জামহারাতু আনসাবুল আরব : ৩৬৬ পৃ.। এতে আছে ইবনে তুরাইফ বিন খাজরাজ। আল-ইসতিবসার : ১০১ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৫৫, উসদুল গাবাহ : ৪/৪১৮, আল-ইসাবাহ : ৬/১৪০।

৫৩৮. আল-ইসতিবসারে বনু সালিমার বংশধারা দেখুন।

৫৩৯. আল-মুহাব্বার : ৪২৬ পৃ.।

সাহাবির সঙ্গে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৫৪০] এ বাইআতে রাসুল ﷺ যে ১২ জনকে নেতা নির্বাচন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।

কুরাইশরা আকাবার দ্বিতীয় বাইআতের খবর পেয়ে বাইআতকারীদের তালাশে বেরিয়ে পড়ে। তারা আজাখির নামক জায়গায় সাদ বিন উবাদাহ ﷺ ও মুনজির বিন আমর ﷺ-কে আটক করতে সক্ষম হয় আর তাঁরা দুজনই রাসুল ﷺ-এর নির্বাচিত নেতা ছিলেন। অবশ্য মুনজির ﷺ তাদের থেকে ছুটতে সক্ষম হন। কিন্তু তারা সাদ বিন উবাদাহ ﷺ-কে ধরে রাখে। তাঁকে প্রশ্ন করে, 'তুমি কি মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন তারা তাঁকে আটকে রেখে পাহারাদারি করতে থাকে। মুনজির ﷺ-ও ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছিলেন। যার কারণে দিরার বিন খাত্তাব আল-ফিহরি বলেছিল :

'সাদের অনুসরণ করে জোরপূর্বক তাকে পাকড়াও করেছি, মুনজিরের অনুসরণ করলে যথেষ্ট হয়ে যেত।

যদি তাকে ধরতে পারতাম এখানে তার জখম থেকে রক্ত ঝরত, সে লাঞ্ছিত হতো এবং তার রক্ত বৃথা যেত।'

রাসুল ﷺ-এর কবি হাসসান বিন সাবিত ﷺ তার জবাবে বলেছিলেন[৫৪১] :

'তুমি সাদের নাগাল পেতে না এবং মুনজিরেরও না, যখন আমাদের বাহনগুলো তোমাদের পিছু ধাওয়া করত।

যদি আবু ওয়াহাব না হতো, তবে যাত্রার শুরুতেই তোমার আশায় গুড়ে বালি পড়ত।

তুমি কি কাতান কাপড় পরে গর্ব করছ; অথচ আনবাত লোকেরা সৈনিকের ইউনিফর্ম পরত,

অতএব ওই ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে স্বপ্নে দেখে সে কাইসার অথবা কিসরার প্রাসাদে আছে।

---

৫৪০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৪৯।

৫৪১. বিস্তারিত জানতে দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৫৮-৬০, আনসাবুল আশরাফ : ১/২৫৪-২৫৫, আদ-দুরার : ৭৫ এবং ৭৮ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ৭২ পৃ.।

সন্তানহারা নারীর মতো হয়ো না, যে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে সন্তানের শোক থেকে দূরে আছে।

ওই ছাগলের মতো হয়ো না, যে নিজের ক্ষুর দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ছুরির সন্ধান দিয়েছিল ঘাতককে।

আবার ওই প্রতারকের মতো হয়ো না, যে প্রতারণা করতে গিয়ে তিরের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

কারণ, আমরা এবং আমাদের ঘাতক হচ্ছি খাইবারবাসীর বণ্টিত খেজুরের মতো।'

আকাবায় বাইআত দানকারী মুসলিমগণ মদিনায় এসে প্রকাশ্যে ইসলাম পালন করতে থাকে।[৫৪২]

রাসুল ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন, তখন মদিনাবাসী রাসুল ﷺ-কে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। প্রত্যেকেই রাসুল ﷺ-কে নিজ বাড়িতে মেহমান হওয়ার আশা ব্যক্ত করছিল। প্রত্যেক আনসারি গোত্রই এ বিরাট সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মুনজির ﷺ-ও তাঁদের একজন ছিলেন, যাঁরা রাসুল ﷺ-কে মেহমান বানানোর আকাঙ্ক্ষা পেশ করেছিলেন। বনু খাজরাজের সায়িদা গোত্র অতিক্রমকালে বনু সায়িদার অন্যান্যদের মতো সাদ বিন উবাদাহ ﷺ এবং মুনজির বিন আমর ﷺ-ও রাসুল ﷺ-কে তাঁদের বাসায় মেহমান হওয়ার আবেদন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের বাসায় মেহমান হোন। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র, শক্তি ও জনবল আছে।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার উটনীর রাস্তা ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর তরফ থেকে আদেশপ্রাপ্ত।'[৫৪৩]

রাসুল ﷺ তুলাইব বিন উমাইর বিন ওয়াহাব ও মুনজির বিন আমর ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।[৫৪৪] অপর এক বর্ণনায় আছে, আবু জার গিফারি

---

৫৪২. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৫৯-৬১।
৫৪৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১১২, আদ-দুরার : ৯৩ পৃ.।
৫৪৪. আল-মুহাব্বার : ৭২ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৫৫, উসদুল গাবাহ : ৪/৪১৬।

ও মুনজির বিন আমর ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।[৫৪৫] তবে প্রথম বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ। কারণ রাসুল ﷺ সাহাবিদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন বদরে কুবরার আগে। সে সময় আবু জার ﷺ মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকেও উপস্থিত ছিলেন না। তিনি এসব যুদ্ধের পরে রাসুল ﷺ-এর কাছে আগমন করেন।[৫৪৬]

তাওহিদ ও শিরকের লড়াই এবং মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে চূড়ান্ত সংঘাত শুরু হয় বদর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। সেই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুনজির ﷺ।[৫৪৭]

তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর বাম অংশের কমান্ডিং করেছিলেন।[৫৪৮]

এভাবেই মুনজির ﷺ জিহাদের ময়দানে কখনো সৈনিকের কাতারে আবার কখনো কমান্ডিং করে ইসলামের প্রসার ও তার রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খাজরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সেসব ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন, যাঁরা মুসলিমদের খিদমতে নিজেদের নেতৃত্বকে সৈনিক, কমান্ডার ও দায়ি হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

বিরে মাউনার[৫৪৯] অভিযান

উহুদ যুদ্ধের পরে তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো এবং জিলকদ, জিলহজ ও চতুর্থ হিজরির মুহাররম মাস পর্যন্ত রাসুল ﷺ মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। তারপর উহুদ যুদ্ধের চার মাসের মাথায় চতুর্থ হিজরির প্রথম দিকে বিরে মাউনার উদ্দেশ্যে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন।

---

৫৪৫. আদ-দুরার : ৯৯ পৃ., সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১২৫, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৯৬ পৃ.।

৫৪৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৫৫, উসদুল গাবাহ : ৪/৪১৯, আল-ইসতিবসার : ১০১ পৃ., উয়ুনুল আসার : ১/২০১।

৫৪৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৬৮, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩৪৪, আদ-দুরার : ১৩১ পৃ.।

৫৪৮. আল-ইসতিবসার : ১০১ পৃ.।

৫৪৯. বিরে মাউনা তথা মাউনার কূপ—বনু সালিম ও বনু আমির গোত্রের মধ্যবর্তী বনু সালিমের পানির উৎস।

এ যুদ্ধের কারণ, বনু কিলাব গোত্রের আবু বারা আল-কিলাবি, যার নাম মূলত আমির বিন মালিক বিন জাফর বিন কিলাব বিন রবিয়াহ বিন সাসাআহ। সে রাসুল ﷺ-এর কাছে আগমন করে। রাসুল ﷺ তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে দাওয়াত কবুলও করল না, আবার প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যানও করল না। বরং সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, যদি আপনার কিছু সাথিকে নাজদ অধিবাসীর কাছে পাঠাতেন, তাঁরা তাদেরকে আপনার দ্বীনের দিকে আহ্বান করবে, তাহলে আমি আশাবাদী যে, তারা অবশ্যই আপনার দ্বীন কবুল করবে।' রাসুল ﷺ তখন বললেন, 'আমার সাথিদের ব্যাপারে নাজদবাসীকে আমার ভয় হয়।' তখন আবু বারা বলল, 'আমি তাদের জিম্মাদারি নিলাম।'

রাসুল ﷺ মুনজির বিন আমর ؓ-কে আমির বানিয়ে নাজদ অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'মৃত্যুপাগল ঘোড়া'। এ উপাধি তাঁর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। অন্যদের বেলায় বলা হতো, 'তার মৃত্যু দ্রুত এসে গেছে।' এ বাহিনীতে ছিল ৪০ জন মুসলিম। অপর একটি দুর্বল বর্ণনামতে, ৭০ জন মুসলিম। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, হারিস বিন সিম্মাহ, উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম বিন মিলহান—অর্থাৎ আনাস বিন মালিক ؓ-এর মামা—উরওয়া বিন আসমা বিন সালত আস-সুলামি, নাফি বিন বুদাইল বিন ওয়ারাকা আল-খুজায়ি, আবু বকর ؓ-এর আজাদকৃত গোলাম আমির বিন ফুহাইরা প্রমুখ সাহাবিগণ ؓ।

এ বাহিনী বিরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছে হারাম বিন মিলহান ؓ-কে রাসুল ﷺ-এর পত্র দিয়ে আমির বিন তুফাইলের নিকট প্রেরণ করে। যখন হারাম ؓ তুফাইলের কাছে পত্র নিয়ে আসলো, তুফাইল পত্রের প্রতি কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে হারাম ؓ-এর ওপর আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে। এরপর সে বাকি সাহাবিদের সাথে যুদ্ধের জন্য বনু আমিরকে উত্তেজিত করে। কিন্তু তারা তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, কারণ আবু বারা তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এরপর সে বনু সুলাইমের কাছে সাহায্য চায়। তখন বনু সুলাইমের শাখাগোত্র উসাইয়্যা, রিল ও জাকওয়ান তার ডাকে সাড়া দেয়। তারা মুসলিমদের ঘেরাও করে ফেলে। মুসলিমরাও তাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যান এবং যুদ্ধ করে সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তাঁদের মাঝে শুধু কাব বিন জাইদ ؓ বেঁচে যান। তিনি আহত

হয়ে নিহতদের মাঝে পড়ে ছিলেন। নিহতদের সাথে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি খন্দকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

বাহিনীর পশু চরানোর দায়িত্বে ছিলেন আমর বিন উমাইয়া জামরি ও মুনজির বিন মুহাম্মাদ বিন উকবাহ ﷺ। তাঁরা দূর থেকে দেখতে পান, মুসলিম বাহিনীর ওপর পাখি ওড়াউড়ি করছে। তাঁরা একটু সামনে অগ্রসর হয়ে দেখতে পান, মুসলিম বাহিনীর লাশের ওপর পাখি উড়ছে। তখন মুনজির বিন মুহাম্মাদ আমর বিন উমাইয়াকে বলল, 'তুমি কী মনে করো?' আমর বলল, 'আমার মত হচ্ছে, আমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটা জানাই।' তখন মুনজির ﷺ বলল, 'যেখানে মুনজির বিন আমর নিহত হয়েছে, সেখানে আমি জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পছন্দ করি না।" তারা শত্রুর সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন। মুনজির ﷺ শহিদ হলেন আর আমর বিন উমাইয়া বন্দী হলেন। আমর বিন উমাইয়া ﷺ যখন শত্রুদের বললেন, তিনি মুজার গোত্রের লোক, তখন আমির বিন তুফাইল তাকে দাস বানিয়ে নেয়। এবং তার মায়ের পক্ষ থেকে তাকে আজাদ করে দেয়। এ ঘটনা সফর মাসের ২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সংঘটিত হয়।

আমর বিন উমাইয়া ﷺ ফেরার পথে কনাত এলাকার উপকণ্ঠে কারকারা নামক স্থানে এসে বিশ্রাম নেন। সেখানে বনু আমির গোত্রের দুজন লোক এসে তাঁর সঙ্গে বিশ্রাম নেয়। রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া ছিল। কিন্তু আমর ﷺ সে ব্যাপারে কিছু জানতেন না। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলেন যে, তারা বনু আমির গোত্রের লোক। আমর বিন উমাইয়া ﷺ সুযোগ খুঁজলেন। তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন তিনি তাদের দুজনকে হত্যা করেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সাথিদের পক্ষ থেকে বনু আমিরের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আমর বিন উমাইয়া ﷺ মদিনায় এসে রাসুল ﷺ-কে সব খুলে বললেন। রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি এমন দুজনকে হত্যা করেছ, যারা আমার নিরাপত্তায় ছিল। আমি তাদের রক্তমূল্য আদায় করব। আবু বারার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি তার প্রস্তাবের ব্যাপারে সন্দেহ আর ভয়ের মধ্যে ছিলাম।'

এ মর্মান্তিক ঘটনায় রাসুল ﷺ যতটা ব্যথিত হয়েছিলেন, অন্য কোনো ঘটনায় এতটা ব্যথিত হননি। আমির বিন তুফাইলের এহেন কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পেরে আবু বারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু বার্ধক্যজনিত কারণে সে অত্যন্ত দুর্বল

ছিল। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ হিসেবে তার ছেলেকে আমির বিন তুফাইলকে হত্যার নির্দেশ দেয়।

আবু বারার ছেলে রবিআ আমির বিন তুফাইলের হত্যার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়। তাঁকে উটে আরোহী অবস্থায় পেয়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করে; কিন্তু সে আঘাত ব্যর্থ হয়। সে মানুষকে ডাকাডাকি শুরু করে দেয় এবং বলতে থাকে, 'তুমি আমার ক্ষতি করতে পারবে না, তুমি আমার ক্ষতি করতে পারবে না।' কিন্তু আবু বারার ছেলে রবিআ ততক্ষণে তার ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে সক্ষম হয়। আর বলে দেয়, এর মাধ্যমে আবু বারার দায়িত্ব পরিপূর্ণ হলো। তখন আমির বলল, 'আমার চাচাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।'[৫৫০]

এ বাহিনীর অধিকাংশরাই যুবক-তরুণ ছিলেন। তাঁদের কারি বলে ডাকা হতো। তাঁদের নিয়ম ছিল, সন্ধ্যা হলে তাঁরা মদিনার এক জায়গায় একত্রিত হয়ে পরস্পর পাঠদান ও দ্বীনি আলোচনা করতেন। সালাত ও অন্যান্য ইবাদত করে রাত্রি অতিবাহিত করতেন। সকাল হলে সুপেয় পানি ও লাকড়ি সংগ্রহ করে রাসুল ﷺ-এর ঘরে পৌঁছে দিতেন। তাঁদের পরিবারের লোকেরা মনে করত, তাঁরা মসজিদে অবস্থান করেন আর মসজিদের লোকেরা মনে করত, তারা তাদের বাড়িতে অবস্থান করেন। রাসুল ﷺ তাঁদের এ অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু বিরে মাউনায় পৌঁছে তাঁরা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং সকলে শাহাদাত বরণ করেন।[৫৫১] তাঁরা উম্মাহর এমন আলিম ছিলেন, যারা নিজেদের ইলম ও আমলের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। দাওয়াহ ইলাল্লাহ, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং কল্যাণকর কাজে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এই মহান ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ছিলেন মুনজির বিন আমর رضي الله عنه।

এ অভিযানে মুনজির বিন আমর رضي الله عنه-এর সকল সাথি শাহাদাত বরণ করেন। মুশরিকরা মুনজির رضي الله عنه-কে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছিল; কিন্তু মুনজির رضي الله عنه

---

৫৫০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৪৬-৩৫৩, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/১৮৪-১৯১, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫১-৫৪, আত-তাবারি : ২/৫৪৫-৫৪৯, ইবনে আসির : ২/১৭১-১৭৩, ইবনে কাসির : ৪/৭১-৭৪, আদ-দুরার : ১৭০-১৭৩, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৭৮-১৮০, সহিহুল বুখারি : ৫/১০৩, জাদুল মাআদ : ২/২৭২, আল-মাওয়াহিব : ১/১৩৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৫।

৫৫১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৪৮।

তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং লড়াই করে সদলবলে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এ কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে 'মৃত্যুপাগল' বলে অভিহিত করেছিলেন। এরপর থেকে তাঁকে 'মৃত্যুপাগল' উপাধিতে স্মরণ করা হয়।

বিরে মাউনার যুদ্ধটি ছিল সেই যুদ্ধসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যে যুদ্ধের মুজাহিদগণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যই ছিল শাহাদাত বরণ করা। তাই তো জাব্বার বিন সুলমা নামক মুশরিক যখন আবু বকর ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম আমির বিন ফুহাইরা ﷺ-কে আঘাত করেছিল, তখন তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি সফলকাম হয়েছি।' ফলে তখনই সে হত্যাকারী ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিল। কারণ, সে দেখতে পেয়েছিল, এমন উৎফুল্ল চিত্তে জীবন দান করা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সম্ভব হতে পারে। এমন সৎ ও মহান মুজাহিদদের নেতৃত্বে ছিলেন মুনজির বিন আমর ﷺ।

কমান্ডার এবং ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন

বিরে মাউনার শহিদদের জন্য রাসুল ﷺ যেমন ব্যথিত হয়েছিলেন, তেমন মুসলিমরাও ব্যথিত হয়েছিল।

মুনজির ﷺ তাঁর সম্প্রদায়ের একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর সম্মান নির্দেশের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসুল ﷺ তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন। কারণ তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সবচেয়ে তাকওয়াবান এবং নেতা পর্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন।

অবশ্য তাঁর পরিবারে তিনি একাই তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন না; বরং তাঁর বোন মানদুস বিনতে আমরও তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন। তাঁর আরেক বোন সালমা বিনতে আমর রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত নিয়েছিলেন।[৫৫২] তাঁর মা-ও বাইআত গ্রহণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৫৫৩] সুতরাং তিনি তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত এক পরিবারের সদস্য ছিলেন—যে পরিবারে সূচনাতেই ইসলামের প্রসার হয়েছিল। আর এ পরিবারে মুনজির ﷺ-এর কৃতিত্ব সবার কাছে স্পষ্ট।

৫৫২. আল-মুহাব্বির : ৪২২-৪২৩ পৃ.।
৫৫৩. আল-মুহাব্বির : ৪২৬ পৃ.।

এই মুনজির ﷺ-এর সম্পর্কেই রাসুল ﷺ বলেছেন, 'সে মৃত্যুপানে ছুটন্ত ঘোড়া।' অর্থাৎ তিনি জেনেশুনেই মৃত্যুর দিকে দৌড় দিয়েছেন।[৫৫৪] মুনজির ﷺ জাহিলি যুগেই একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।[৫৫৫] যখন অল্পসংখ্যক মানুষই লিখতে পারত। সুতরাং তিনি মুসলিমদের অগ্রগামী আলিম ছিলেন। অথচ সে সময় আরবে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল।[৫৫৬]

চতুর্থ হিজরির প্রথম দিকে শাহাদাত বরণ করেন।[৫৫৭] (৬২৫ খ্রি.) শাহাদাত বরণের সময় কোনো বংশধর রেখে যাননি।[৫৫৮] রাসুল ﷺ থেকে তিনি শুধু একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৫৫৯] তাঁর জন্মসন সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারিনি। খুব সম্ভব তিনি যৌবনের শুরুতেই শাহাদাত বরণ করেছেন।

মুনজির ﷺ-এর নেতৃত্বের মাঝে একজন আদর্শিক নেতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। এ কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে শুরুতেই দায়ি ইলাল্লাহ হিসেবে প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। সে বিবেচনায় তিনি একজন প্রতিনিধি হিসেবে জীবনযাপন করেছেন এবং প্রতিনিধি হিসেবেই শাহাদাত বরণ করেন। শ্রম, ত্যাগ ও কুরবানির ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বাহিনীর উপমা হয়ে ছিলেন।

বাহিনীর সদস্যদের সাথে তাঁর সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়তো এক মুজাহিদের এ উক্তিটিই দেওয়া যাবে। যে বলেছিল, 'এমন স্থান থেকে কীভাবে জীবন নিয়ে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, যেখানে মুনজির বিন আমর শাহাদাত বরণ করেছে।' যেহেতু তিনিই তাঁদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী, আল্লাহভীরু, ধৈর্যশীল ও দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি মৃত্যুপানে ছুটে গিয়েছিলেন। মৃত্যু তাঁকে পাকড়াও করেনি; বরং শাহাদাতের নেশায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আনন্দে তিনিই মৃত্যুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যার কারণে জীবন চলে গেছে; কিন্তু তাঁর হাত থেকে তরবারি পড়েনি।

---

৫৫৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৫৫।
৫৫৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৫৫, উসদুল গাবাহ : ৪/৪১৮।
৫৫৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৫৫।
৫৫৭. উসদুল গাবাহ : ৪/৪১৯, আল-মুহাব্বির : ১১৮ পৃ.।
৫৫৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৫৫।
৫৫৯. আল-ইসাবাহ : ৬/১৪০।

মুনজির বিন আমর ﷺ ছিলেন সেসব বরকমতময় ইটের মধ্যে একটি, যার ওপর নির্মিত হয়েছে ইসলামে সুরম্য প্রাসাদ।

ইতিহাসে মুনজির ﷺ

মুনজির ﷺ সেই আনসারি সাহাবিদের একজন ছিলেন, যাঁরা বনি খাজরাজের মধ্য হতে সর্বপ্রথম ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেছিলেন। মদিনায় দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য রাসুল ﷺ তাঁকে প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। বিশেষভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনি খাজরাজের শাখা গোত্র বনি সায়িদার জন্য তিনি দায়ি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রাসুল ﷺ-এর হিজরতের পূর্বে আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে তিনি রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত দিয়েছিলেন। এ হিসেবে তিনি সেই মহান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শামিল হন, যাঁরা রাসুল ﷺ ও অন্যান্য মুসলিমদের জন্য মদিনাকে হিজরতের ভূমি হিসেবে প্রস্তুত করেছিলেন।

তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার মর্যাদা লাভে ধন্য হন। রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে একজন সৈনিক হয়ে বদরে অংশগ্রহণ করেন। এবং একজন অধীনস্ত সেনা কমান্ডার হিসেবে উহুদ যুদ্ধে যোগদান করেন। বিরে মাউনা অভিযানে তিনি সেই পবিত্র আত্মার অধিকারী তরুণ আলিমদের সেনাপতি ছিলেন, যারা আল্লাহর রাহে হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

বিরে মাউনায় মুশরিকরা তাঁর জন্য জীবন লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। কিন্তু তিনি ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পেছনে ছুড়ে ফেলে আল্লাহর প্রতিদানের আশায় চিরস্থায়ী জীবন শাহাদাতকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

ইতিহাসে মুনজির ﷺ একজন আলিম, ফকিহ, বদরি, শহিদ, কমান্ডার ও 'মৃত্যুপাগল ঘোড়া' হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ মহান সাহাবির প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের বারিধারা বর্ষিত হোক।

শহিদ কমান্ডার

মারসাদ বিন আবু মারসাদ আল-গানাবি ﵁

জীবন ও বংশপরিচিতি

মারসাদ বিন আবু মারসাদ কান্নাজ বিন হিসন বিন ইয়ারবু’ বিন তারিফ বিন খারাশাহ বিন উবাইদা বিন সাদ বিন আওফ বিন কাব বিন মালিক বিন জাল্লান বিন গানম বিন আমর। এরপর পরের সিঁড়ি হলো, গনি বিন আসুর বিন সাদ[৫৬০] বিন কাইস বিন আইলান বিন মুজার।[৫৬১]

তাঁর পিতা আবু মারসাদ গানাবি রাসুল ﷺ-এর চাচা হামজা ﵁-এর সমবয়সি ও হালিফ ছিলেন। তিনি অধিক ঘন চুলবিশিষ্ট বেশ লম্বা গড়নের ছিলেন।[৫৬২] তিনি প্রথম হিজরতকারীদের একজন ছিলেন।[৫৬৩] বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। ১২ হিজরিতে ৬২

৫৬০. জামাহারাতু আনসাবিল আরব : ২৪৭ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ-এ (৩/৪৭) বংশের ধারা এভাবে এসেছে, খারশাহ বিন উবাইদ এবং কাব বিন মালিক বিন জাল্লান এবং গানম বিন ইয়াহইয়া বিন ইয়াসুর।

৫৬১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭, জামাহারাতু আনসাবিল আরব : ২৪৪ পৃ.।

৫৬২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭।

৫৬৩. জামাহারাতু আনসাবিল আরব : ২৪৭ পৃ.।

বছর বয়সে আবু বকর সিদ্দিক ﷺ-এর খিলাফতকালে মদিনা মুনাওয়ারায় ইনতিকাল করেন।[৫৬৪]

আবু মারসাদ আল-গানাবি ও মারসাদ ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে কুবায় বনি আমর বিন আওফের ভ্রাতৃগোষ্ঠী কুলসুম বিন হিদমের বাড়িতে মেহমান হন।[৫৬৫] অপর এক বর্ণনামতে বলা হয়, তাঁরা সাদ বিন খাইসামার বাড়িতে মেহমান হন।[৫৬৬]

রাসুল ﷺ উবাদাহ বিন সামিত ﷺ-এর সাথে আবু মারসাদকে এবং উবাদাহ ﷺ-এর ভাই আওস ﷺ-এর সাথে মারসাদ ﷺ-কে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক জুড়ে দেন। উবাদাহ ও আওস ﷺ খাজরাজ গোত্রের ছিলেন।[৫৬৭]

মারসাদ ﷺ ও তাঁর পিতা আবু মারসাদ ﷺ সেই অভিযানে শরিক ছিলেন, যে অভিযান হামজা ﷺ-এর নেতৃত্বে প্রথম হিজরির রমাদানে পরিচালিত হয়েছিল। অবশ্য সে অভিযানে তাঁরা কোনো শত্রুর দেখা পাননি।[৫৬৮]

বদর যুদ্ধে যাওয়ার কালে সাহাবিদের কাছে মাত্র ৭০টি উট ছিল। সেদিন একেকটি উটে পালাক্রমে তিনজন করে সফর করতে হয়েছিল। সে হিসেবে রাসুল ﷺ, আলি ﷺ ও মারসাদ বিন আবু মারসাদ ﷺ একটি উটে পালাক্রমে সফর করছিলেন।[৫৬৯] যখন রাসুল ﷺ-এর হাঁটার পালা আসত, তখন আলি ﷺ ও মারসাদ ﷺ বলতেন, 'আপনি বসে থাকুন, আমরা হেঁটে চলি।' কিন্তু রাসুল ﷺ বলতেন, 'তোমরা আমার চেয়ে শক্তিশালী নও, আবার আমি প্রতিদান থেকে অমুখাপেক্ষী নই।'[৫৭০]

---

৫৬৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৭, আল-ইসতিআব : ৪/১৭৫৫, উসদুল গাবাহ : ৫/২৯৪।

৫৬৫. কুবা সম্পর্কে আলোচনা গত হয়ে গেছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৭/২০-২২।

৫৬৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৯০, আদ-দুরার : ৮৪।

৫৬৭. আল-ইসতিবসার : ১৮৮ পৃ.।

৫৬৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৯।

৫৬৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৫১, আদ-দুরার : ১১১ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ১০৮ পৃ., ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৪।

৫৭০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/২১, উয়ুনুল আসার : ১/২৪৬-২৪৭।

সেদিন রাসুলের বাহিনীতে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। মারসাদ বিন আবু মারসাদ ﷺ-এর একটি এবং মিকদাদ বিন আমর আল-বাহরানি ﷺ-এর একটি। বলা হয়, জুবাইর বিন আওয়াম ﷺ-এরও একটি ঘোড়া ছিল। তবে মিকদাদ ﷺ-এর ঘোড়া থাকার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত পাওয়া যায় না। রাসুল ﷺ বদর যুদ্ধে লব্ধ গনিমত থেকে ঘোড়ার জন্য এক অংশ দিয়েছিলেন এবং ঘোড়সওয়ারকে এক অংশ দিয়েছিলেন। আবার এই মতও আছে যে, ঘোড়ার জন্য দুটি অংশ এবং ঘোড়সওয়ারের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছিলেন।[৫৭১]

বদর যুদ্ধে মারসাদ ﷺ অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন। সেদিন তিনি মন-দিল উজাড় করে মুসলিমদের সাহায্য করেছিলেন। আবু সাওর নামক মুশরিককে তিনি বন্দী করেন। পরে জুবাইর বিন মুতইম মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে।[৫৭২]

তিনি উহুদ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।[৫৭৩] এভাবেই মারসাদ ﷺ সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং লাভ করেন রাসুল ﷺ-এর কমান্ডের অধীনে থেকে জিহাদ করার এক অতুলনীয় মর্যাদা।

রাজিহের অভিযান[৫৭৪]

উহুদ যুদ্ধের পর তৃতীয় হিজরির সফর মাসের মাঝামাঝি সময়ে (তবে সঠিক কথা হলো, চতুর্থ হিজরির শুরুতে) আদাল ও কারাহ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসুল ﷺ-এর কাছে আগমন করে। আদাল ও কারাহ গোত্রদ্বয় বনি আসাদ বিন খুজাইমার ভ্রাতৃগোষ্ঠী হাওন বিন খুজাইমা বিন মুদরিকার শাখা গোত্র। তারা রাসুল ﷺ-এর কাছে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে তাদের মাঝে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু সাহাবি পাঠানোর আবেদন করে। ফলে রাসুল ﷺ ছয়জন সাহাবিকে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন।[৫৭৫]

---

৫৭১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১০২-১০৩।
৫৭২. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩০২।
৫৭৩. আল-ইসতিআব : ৩/১৩৮৩, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৮।
৫৭৪. আসফান ও মক্কার মধ্যে অবস্থিত হুজাইল গোত্রের এক পানির উৎসের নাম রাজিহ। যা তায়িফ ও মক্কার মাঝামাঝি হাদআহ এলাকার নিকটে অবস্থিত।
৫৭৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/১৬০, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৭৬ পৃ.।

এক বর্ণনামতে দশজন[৫৭৬] আরেক বর্ণনামতে সাতজন।[৫৭৭] তবে সঠিক কথা হলো তিনি দশজন পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মাঝে সাতজনের নাম হাদিস ও ইতিহাসের কিতাব থেকে জানা যায়। বাকি তিনজনের নাম জানা যায়নি। দশজনের মধ্যে ছিলেন, মারসাদ বিন আবু মারসাদ আল-গানাবি, খালিদ বিন বুকাইর আল-লাইসি, আসিম বিন সাবিত বিন আকলাহ, খুবাইব বিন আদি, জাইদ বিন দাসিন্নাহ, আব্দুল্লাহ বিন তারিক এবং তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই মুআত্তিব বিন উবাইদ ﷺ। রাসুল ﷺ তাঁদের মাঝে মারসাদ ﷺ-কে আমির নিযুক্ত করেন। আরেকটি দুর্বল মতানুসারে তাঁদের আমির ছিলেন আসিম বিন সাবিত বিন আবু আকলাহ ﷺ।

বনি আদাল ও কারাহ-এর প্রতিনিধি দলের সাথে সাহাবিদের ক্ষুদ্র দলটি বেরিয়ে পড়ল। তাঁরা যখন হিজাজের হাদআহ[৫৭৮] এলাকায় পৌঁছল, তখন ছদ্মবেশী প্রতিনিধিরা তাঁদের সাথে প্রতারণা করে বসল। তারা সাহাবিদের বিরুদ্ধে হুজাইল গোত্রের সাহায্য চাইল। হুজাইলের লোকেরা তৎক্ষণাৎ তরবারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে সাহাবিদের ঘিরে ধরল। সাহাবিরাও তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারা সাহাবিদের নিরাপত্তা দিয়ে বলল, 'আমরা তোমাদের হত্যা করতে চাই না। আমরা কেবল মক্কাবাসীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে তোমাদের গ্রহণ করতে চাই।'

তখন মারসাদ, খালিদ বিন বুকাইর, মুআত্তিব বিন উবাইদ ও আসিম বিন সাবিত ﷺ তাদের নিরাপত্তা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমরা কখনো কোনো মুশরিকের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করব না।' এরপর তাঁরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।

আসিম ﷺ-এর উপনাম ছিল আবু সুলাইমান। তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শত্রুর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন—

> 'আমার কীসের সমস্যা, আমার আছে কঠিন বর্শা—আছে অকল্পনীয় শক্ত তন্তুর ধনুক,

---

৫৭৬. সহিহুল বুখারি : ৫/১০৩, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫৫।

৫৭৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৫৫।

৫৭৮. হাদআহ উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি এলাকার নাম। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/৪৪৮।

যার বক্ষ থেকে বিদ্যুৎবেগে তির নিক্ষিপ্ত হয়—মৃত্যুই সত্য সঠিক,
জীবন ধোঁয়াশা।

আমার রব যা নির্ধারণ করেছেন, তা আসবেই—ঘুরেফিরে মানুষ
সেদিকেই ছুটে চলে।

যদি আমি লড়াই না করি, তবে ধ্বংসই আমার অনিবার্য।'

তিনি শত্রুদের তির নিক্ষেপ করতে থাকেন, একপর্যায়ে তির শেষ হয়ে যায়। এরপর তাদেরকে তিনি বর্শা দ্বারা আঘাত করতে থাকেন, একপর্যায়ে সে বর্শাও তার ভেঙে যায়। এরপর তাদের সাথে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং দুজনকে আহত এবং একজনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে তারপর শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

আসিম ﵁ শাহাদাত বরণের পর হুজাইলের লোকেরা তাঁর মাথা কেটে সাদ বিন শহিদের মেয়ে সুলাফার কাছে বিক্রি করতে চাইল। এর কারণ ছিল, উহুদ যুদ্ধে আসিম ﵁ সুলাফার দুই ছেলেকে হত্যা করেছিলেন। তখন সুলাফা মান্নত করেছিল, আসিমের মাথা পেলে তাঁর মাথার খুলি দিয়ে সে মদ পান করবে। কিন্তু শত্রুরা যখন আসিম ﵁-এর মাথা কাটার ইচ্ছা করল, তখন কোথা থেকে একদল ভিমরুল এসে আসিম ﵁-এর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াল। বাধ্য হয়ে তারা বলল, 'রাত হলে যখন ভিমরুল চলে যাবে, তখন আমরা আমাদের কাজ সম্পন্ন করব।' কিন্তু রাতে পানির এক অজ্ঞাত স্রোত এসে আসিম ﵁-এর লাশকে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ফলে কাফিররা আর তাঁর লাশ খুঁজে পেল না। তিনি আল্লাহর কাছে মান্নত করেছিলেন, যেন তাকে কোনো মুশরিক স্পর্শ না করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ মান্নত পুরো করেছিলেন। তাঁর প্রতি রহমত বর্ষিত হোক।

কিন্তু জাইদ বিন দাসিন্নাহ, খুবাইব বিন আদি ও আব্দুল্লাহ বিন তারিক ﵃ কাফিরদের কথা বিশ্বাস করে নেন। কাফিররা তাঁদের বন্দী করে। তাঁদের নিয়ে কাফিররা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। মাররুজ জাহরান স্থানে পৌঁছলে আব্দুল্লাহ বিন তারিক ﵁ হাতের বাঁধন খুলে তরবারি তুলে নেয়। কাফিররা তাঁর

কাছ থেকে সরে যায়। তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। একপর্যায়ে তিনি পাথরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

তারা খুবাইব বিন আদি ও জাইদ বিন দাসিন্নাহ ﷺ-কে মক্কায় কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। পিতা-হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য খুবাইব ﷺ-কে ক্রয় করে হুজাইর বিন আবু ইহাব। আর সফওয়ান বিন উমাইয়া তার পিতা উমাইয়া বিন খালাফের হত্যার প্রতিশোধ নিতে ক্রয় করে জাইদ বিন দাসিন্নাকে। সফওয়ান বিন উমাইয়া তার গোলাম নাসতাসকে সঙ্গে নিয়ে জাইদ বিন দাসিন্নাকে হত্যা করার জন্য হেরেম এলাকার বাইরে তানয়িম[৫৭৯] নামক স্থানে নিয়ে যায়।

তাঁর হত্যার উপলক্ষ্যে একদল কুরাইশ জমা হয়। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিল। জাইদ ﷺ-কে হত্যার জন্য হাজির করা হলে আবু সুফিয়ান তাঁকে বলে, 'হে জাইদ, তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তুমি কি চাও, এ মুহূর্তে তোমার পরিবর্তে এ স্থানে মুহাম্মাদ (ﷺ) হোক। আর তুমি তোমার পরিবারে ফিরে যাও?' তখন জাইদ ﷺ বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি এতটুকুও চাই না যে, মুহাম্মাদ ﷺ এখন যে স্থানে আছেন, সেখানে তাঁর শরীরে কোনো কাঁটা বিদ্ধ হোক আর আমি আমার পরিবারে নিরাপদে বসে থাকি।' আবু সুফিয়ান ﷺ পরবর্তী সময়ে বলেন, 'আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথিদের মতো অন্য কাউকে দেখিনি তাদের সর্দারকে এভাবে ভালোবাসতে।' এরপর নাসতাস তাঁকে শহিদ করে দেয়।

খুবাইব বিন আদি ﷺ সম্পর্কে হুজাইর বিন আবু ইহাবের চাচাতো বোন মাবিয়াহ বলে,[৫৮০] 'খুবাইব যখন জানতে পারল, তার হত্যার সময় অতি সন্নিকটে, তখন সে আমাকে বলল, "আমাকে একটি খুর দিন, মৃত্যুর আগে নিজেকে পাকসাফ করে নিই।" আমি লজ্জার কারণে একটি ছোট বালকের হাতে খুর দিয়ে বললাম, "ওই ঘরে যে লোকটি আছে, তাকে এটি দিয়ে আসো।" কিন্তু দেখতে পেলাম, বালকটি খুবাইবের হাতের কাছে চলে গেছে। আমি ভাবনায়

---

৫৭৯. মক্কা থেকে ছয় মাইল দূরে মক্কা ও সারফ এলাকার মাঝখানে অবস্থিত একটি জায়গার নাম তানয়িম।

৫৮০. সিরাতু ইবনি হিশামে (৩/১৬৫) তার নাম 'মারিয়া' উল্লেখ করা হয়েছে।

পড়ে গেলাম। আমি এ কী করলাম! লোকটি তো তার ক্ষতি করে ফেলবে। সে তো এখন এই বালককে হত্যা করে নিজের জানের বদলা নিয়ে নেবে। খুবাইব বালকটির হাত থেকে খুর নিয়ে বলল, "তোমার জীবনের কসম, তোমার মা যে তোমাকে আমার কাছে খুর দিয়ে পাঠিয়েছে, সেটা আমার প্রতি তার আত্মবিশ্বাসের কারণে।"' এরপর সে বালককে তার মায়ের কাছে দিয়ে দেয়। বালকটি ছিল ওই মাবিয়্যারই আদরের সন্তান।

এরপর কাফিররা খুবাইব ﷺ-কে শূলে চড়ানোর জন্য তানয়িমে নিয়ে যায়। খুবাইব ﷺ তাদের বললেন, 'তোমরা পারলে আমাকে দুই রাকআত সালাত আদায় করার সুযোগ দাও।' তারা বলল, 'আচ্ছা, আদায় করো।' খুবাইব ﷺ ধীরস্থিরতার সাথে উত্তমভাবে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে কাফিরদের সম্বোধন করে বললেন, 'যদি তোমরা এ ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুভয়ে সালাতকে দীর্ঘায়ত করছি, তবে আমি আমার সালাতকে আরও দীর্ঘায়ত করতাম।' তো খুবাইব ﷺ-ই সর্বপ্রথম মুসলিমদের জন্য শহিদ হওয়ার আগ মুহূর্তে দুই রাকআত সালাত আদায়ের সুন্নাত চালু করেন।

তারা খুবাইব ﷺ-কে ফাঁসির কাষ্ঠে উঠিয়ে বাঁধল, তখন তিনি বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহ, আমরা মানুষের কাছে আপনার নবির পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি, অতএব আপনিও তাঁর কাছে প্রত্যুষেই আমাদের এ অবস্থার কথা জানিয়ে দিন।' এরপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, এ কাফিরদের এক এক করে গুনে রাখুন। তাদের বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা করুন। তাদের একজনকেও রেহাই দেবেন না।' এরপর তারা তাঁকে শহিদ করে দেয়।[৫৮১]

এভাবেই মারসাদ ﷺ আল্লাহর সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন। শাহাদাতের পথে হেঁটে চলেছিলেন এক অসম লড়াইয়ে। যে যুদ্ধে কাফিররা তাঁর ওপর এবং তাঁর সাথিদের ওপর প্রথমে জোটবদ্ধ হয়ে তারপর বিচ্ছিন্নভাবে হামলে পড়েছিল। তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের নেশায় সম্মুখপানে এগিয়ে গিয়েছিলেন। চুল পরিমাণও পিছপা হননি। স্বীয় আকিদা রক্ষার্থে

---

৫৮১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/১৬০, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫৫-৫৬। সহিহুল বুখারি : ৪/৬৭ এবং ৫/১০৩। তাবারি : ২/৫৩৮-৫৪২, ইবনুল আসির : ২/১৬৭-১৬৮, ইবনে কাসির : ৪/৬২-৬৯।

জীবনের কোনো পরোয়া করেননি। তাঁর আকিদায় সামান্য ত্রুটি আপতিত হবে—এই ভয়ে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতে সামান্য ত্রুটি করেননি। কত লাভজনক ছিল তাঁর সেই ব্যবসা!

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

যথাসাধ্য মদিনায় মুসলিমদের হিজরত ঠেকাতে মুশরিকরা কুরাইশ ও অন্য গোত্রের মুসলিমদের বন্দী করে রাখছিল।

মক্কায় এই বাধাপ্রাপ্ত মুসলিমদের তারা বন্দী বলে সম্বোধন করত। মারসাদ ﵁ সেই দুঃসাহসী পালোয়ান ও বীর বাহাদুরদের একজন ছিলেন, যারা এই বন্দী মুসলিমদের মক্কা থেকে মদিনায় নেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলিম বন্দীদের উদ্ধারের জন্য সাহাবিগণ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনাই তাঁদের কাঁধে এই বিশাল দায়িত্ব অর্পণ করেছিল।

মক্কায় এনাক নামক এক বেশ্যা মহিলা ছিল। জাহিলি যুগে মারসাদ ﵁-এর সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। মারসাদ ﵁ মক্কার এক বন্দীকে মুক্ত করার ওয়াদা দিয়েছিলেন। সেই ওয়াদার ভিত্তিতে এক চাঁদনি রাতে তিনি মক্কায় বন্দীঘেরা এক প্রাচীরের কাছাকাছি চলে যান। কিন্তু ওই সময় এনাক এসে মারসাদ ﵁-এর ছায়ামূর্তি দেখতে পায়। সে কাছাকাছি আসতেই মারসাদ ﵁-কে চিনে ফেলে। তাই বলে উঠে, 'মারসাদ নাকি?' মারসাদ ﵁ বললেন, 'হ্যাঁ, মারসাদ।' মহিলা বলল, 'শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। আসো, এ রাতটি আমার কাছে কাটিয়ে দাও।' মারসাদ ﵁ বললেন, 'এনাক, আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারকে হারাম করেছেন।' তখন সে মহিলা চিৎকার দিয়ে ডাকতে লাগল, 'হে মক্কাবাসী, এই লোক তোমাদের কয়েদিদের চুরি করে নিয়ে যায়।' সাথে সাথে আট ব্যক্তি মারসাদ ﵁-এর পিছু ধাওয়া করে। মারসাদ ﵁ খানদামাহ পাহাড়ের পথ ধরে পাহাড়ের এক গুহায় লুকিয়ে পড়েন। আর সেই আট ব্যক্তি গুহার মুখ পর্যন্ত চলে আসে। কিন্তু তারা মারসাদ ﵁-এর কোনো হদিস খুঁজে পায় না। তাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। কিছুক্ষণ পর মারসাদ ﵁ আবারও ফিরে যান এবং বন্দীকে কাঁধে করে মক্কার আজাখির জায়গায় নিয়ে যান। এবারের বন্দী অনেক ভারী

ছিল। আজাখির স্থানে এসে বন্দীর বাঁধন খুলে দেন। এরপর মদিনায় নিয়ে যান।

মারসাদ ﷺ মদিনায় এসে রাসুল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এনাককে বিয়ে করতে পারি?' রাসুল ﷺ কোনো জবাব দিলেন না। এরপর এ আয়াত নাজিল হয় :

> الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
>
> 'ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে। এবং ব্যভিচারিণী নারীকে কেবল ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে। আর এদেরকে মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।'[৫৮২]

রাসুল ﷺ এ আয়াত পড়ে মারসাদ ﷺ-কে শোনালেন এবং বললেন, 'তাকে বিয়ে করো না।'

এরপর থেকে মারসাদ ﷺ এনাককে চির দিনের জন্য ভুলে যান। সত্যিকারেই তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ মুমিন ছিলেন।

মারসাদ ﷺ-এর সূত্রে রাসুল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন :

> إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ، فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ
>
> 'যদি তোমরা পছন্দ করো যে, তোমাদের সালাত কবুল করা হোক, তবে তোমাদের ইমামতি যেন তোমাদের উত্তম লোকেরা করে। কারণ তাঁরা তোমাদের ও তোমাদের রবের মধ্যকার প্রতিনিধি।'[৫৮৩]

---

৫৮২. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩।

৫৮৩. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ৭৭৭; হাদিসটি জয়িফ।

হাদিসটি ইয়াহইয়া বিন ইয়ালা আল-আসলামি বর্ণনা করেছেন।[৫৮৪]

আমর বিন শুআইব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে মারসাদ ﷺ-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৫৮৫]

মারসাদ ﷺ যে অভিযানে শাহাদাত বরণ করেন, সে অভিযানটি ছিল চতুর্থ হিজরির সফর মাসে।[৫৮৬] পক্ষান্তরে তাঁর পিতা আবু মারসাদ আল-গানাবি ১২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। সে হিসেবে চতুর্থ হিজরিতে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তাই আবশ্যিকভাবে বলতে হয়, মারসাদ ﷺ যৌবনের সূচনাতেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

আমরা তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা কতটুকুই বা দিতে পারব। তিনি ছিলেন আদর্শে দায়ি, দাওয়াত ও জিহাদের কমান্ডার, কষ্ট সহিষ্ণু মজবুত দেহের অধিকারী এবং সুশৃঙ্খল ও আনুগত্যের গুণে গুণান্বিত মহান ব্যক্তি। দুঃসাহসী নওজোয়ান, ময়দানের নির্ভীক লড়াকু সৈনিক। স্বীয় আকিদা-বিশ্বাসের তরে অকাতরে জীবনোৎসর্গী ব্যক্তি।

ইতিহাসে মারসাদ ﷺ

অনেক মুসলিমকেই তিনি মুক্ত করেছিলেন, যারা মক্কায় বন্দিত্বের জীবনযাপন করছিলেন। তিনি সেসব মহান দায়িদের একজন ছিলেন, যাঁরা দ্বীন ইসলামের দাওয়াত প্রচার এবং তার রক্ষণাবেক্ষণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি স্বীয় আকিদা-বিশ্বাসের কারণে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন; কিন্তু জীবনের জন্য আকিদা-বিশ্বাসকে বিসর্জন দেননি।

তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি তাঁর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এ মহান বীর মুজাহিদ শহিদ কমান্ডারের প্রতি আল্লাহর অজস্র রহমত বর্ষিত হোক।

---

৫৮৪. আল-ইসতিআব : ৩/১৩৮৪, উসদুল গাবাহ : ৪/৩১৫।

৫৮৫. তাহজিবুত তাহজিব : ১০/৮২।

৫৮৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৮, উসদুল গাবাহ : ৪/৩৪৪, আল-ইসাবাহ : ৬/৭৮, আল-ইসতিআব : ৩/১৩৮৩।

শহিদ কমান্ডার

উক্কাশা বিন মিহসান আল-আসাদি ﷺ

প্রথম জীবন ও বংশপরিচিতি

উক্কাশা বিন মিহসান বিন হুরসান বিন কাইস বিন মুররাহ বিন কাবির বিন গানম বিন দুদান বিন আসাদ বিন খুজাইমা আল-আসাদি। তাঁর উপনাম আবু মিহসান। বনি উমাইয়ার শাখা গোত্র বনি আবদে শামশের মিত্র।[৫৮৭] তিনি তাঁর গোত্রের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।[৫৮৮] এবং প্রথম ইসলাম কবুলকারীদের একজন ছিলেন।[৫৮৯]

তাঁর সম্প্রদায় বনি গানমের সাথে তিনিও মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় নতুন করে আত্মনিয়োগ করার জন্য অন্যদের মতো তিনিও স্থায়ীভাবে মদিনায় থেকে যান। রাসুল ﷺ তাঁকে মুজাজ্জার বিন জিয়াদ আল-বালাবির সাথে ভ্রাতৃত্ব জুড়িয়ে দেন।[৫৯০]

---

৫৮৭. উসদুল গাবাহ : ৪/২, আল-ইসাবাহ : ৪/২৫৬, আল-ইসাবায় বংশধারা এভাবে আছে, ইবনে মুররাহ বিন বুকাইর। আল-ইসতিআব : ৩/১০৮০, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২।
৫৮৮. উসদুল গাবাহ : ৪/২-৩।
৫৮৯. আল-ইসাবাহ : ৪/২৬৫।
৫৯০. আদ-দুরার : ১০০ পৃ.।

তিনি আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আল-আসাদি ﷺ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানের একজন সৈনিক ছিলেন।[৫৯১] এই অভিযানেই ইসলামে সর্বপ্রথম গনিমত লাভ হয় এবং সর্বপ্রথম বন্দী হিসেবে বন্দী হয় দুজন মুশরিক। এবং এই অভিযানে সর্বপ্রথম এক মুশরিক নিহত হয়।[৫৯২]

উক্কাশা ﷺ ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁর সব শক্তি উজাড় করে জিহাদ করেছিলেন। সেদিন তাঁর হাতে একটি তরবারি ভেঙে গিয়েছিল। তখন রাসুল ﷺ তাঁকে আরেকটি নতুন তরবারি দেন। তিনি সে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান, একপর্যায়ে মুসলিমদের বিজয় অর্জন হয়। পরবর্তী সময়ে সকল যুদ্ধেই তিনি সেই তরবারি ব্যবহার করেছিলেন।[৫৯৩] বদরের দিন তিনি কুরাইশের শাখাগোত্র মালিক বিন হিসলের মিত্র মুআবিয়া নামক এক মুশরিককে হত্যা করেছিলেন।[৫৯৪]

তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫৯৫] এ যুদ্ধে রাসুল ﷺ নিজেও যুদ্ধ করেন। তির নিক্ষেপ করতে করতে তূণীরের সব তির শেষ করেছিলেন। তাঁর ধনুকের এক মাথা ভেঙে গিয়েছিল। উক্কাশা ﷺ ধনুকে রশি বাঁধার জন্য ধনুকটি নিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, ধনুকের রশি তো যথেষ্ট হচ্ছে না।' রাসুল ﷺ বললেন, 'টান করে বেঁধে দাও।' উক্কাশা ﷺ তা-ই করলেন। এরপর ধনুকটি তির নিক্ষেপের উপযুক্ত করে রাসুল ﷺ-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন।[৫৯৬]

তিনি রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫৯৭] তিনি বনু কুরাইজার যুদ্ধে অশ্বারোহীর দলে ছিলেন।[৫৯৮] জি-কারাদ যুদ্ধেও তিনি

---

৫৯১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৩৯, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৯, আদ-দুরার : ১০৭ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ১০৪ পৃ.।

৫৯২. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৩৮, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৩, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১০, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১০৪।

৫৯৩. উসদুল গাবাহ : ৪/৩, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৭৭-১৭৮, আদ-দুরার : ১১৪ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ১১৩ পৃ., আনসাবুল আশরাফ : ১/৩০৮।

৫৯৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৫২, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩০১।

৫৯৫. উসদুল গাবাহ : ৩/৪, আল-ইসতিআব : ৩/১০৮০।

৫৯৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৪২।

৫৯৭. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩৩৮, উসদুল গাবাহ : ৪/৩, আল-ইসতিআব : ৩/১০৮০।

৫৯৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৯৮।

অশ্বারোহী হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৫৯৯] সেই যুদ্ধে আওসার বিন আমর বিন আওসার নামক এক মুশরিককে হত্যা করেন।[৬০০] আরেকটি দুর্বল মত অনুসারে বনু ফুজারার আওসার ও আমর বিন আওসার নামের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন।[৬০১] তিনি তাদের একজন ছিলেন, যারা উয়াইনা বিন হিসন ও তার সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য রাসুল ﷺ-এর ডাকে সবার আগে সাড়া দিয়েছিলেন। উয়াইনা ও তার লোকেরা রাসুল ﷺ-এর গর্ভবতী উটনীকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। উক্কাশা ﷺ উটনীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন।[৬০২]

উক্কাশা ﷺ যুদ্ধ এবং শান্তিকালীন উভয় সময়ে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। এবং ছোট-বড় সকল যুদ্ধেই ত্যাগ স্বীকার করেন। এ কারণেই তো রাসুল ﷺ সুসংবাদ দান করেছিলেন, 'তিনি তাঁদের মধ্যে গণ্য, যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৬০৩]

এভাবেই উক্কাশা ﷺ সাহাবির মর্যাদার সাথে সাথে রাসুল ﷺ-এর কমান্ডে থেকে জিহাদ করার মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

গামরের অভিযান

রাসুল ﷺ উক্কাশা ﷺ-কে ৪০ জনের একটি বাহিনী দিয়ে গামরের দিকে প্রেরণ করেন। (গামরে মারজুক, মদিনার পথে ফায়িদ[৬০৪] থেকে দুই রাতের দূরত্বে অবস্থিত বনি আসাদের একটি পানির উৎস)। তাঁদের মাঝে ছিলেন, সাবিত বিন আকরাম, শুজা বিন ওয়াহাব, ইয়াজিদ বিন রুকাইশ ﷺ। উক্কাশা ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে দ্রুত যাত্রা করেন।

---

৫৯৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৪১।
৬০০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮০।
৬০১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৪৬ এবং ২/৫৪৯।
৬০২. আদ-দুরার : ১৯৮-১৯৯।
৬০৩. উসদুল গাবাহ : ৪/৩।
৬০৪. ফায়িদ, কুফা থেকে মক্কার পথে অবস্থিত একটি ছোট শহর। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৬/৪০৮।

শত্রুরা তাঁর ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়। ফলে বাড়ি-ঘর ছেড়ে উঁচু এলাকায় অবস্থান নেয়।

উক্কাশা ﷺ বনি আসাদের পানির উৎসের কাছে পৌঁছে দেখেন ঘর-বাড়ি সব খালি। তিনি খবরাখবর নেওয়ার জন্য পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করেন। শুজা বিন ওয়াহাব ﷺ ফিরে এসে সংবাদ দিলেন, তিনি নিকটেই শত্রুদের পশুর আলামত দেখতে পেয়েছেন। এরপর তাঁরা বনু আসাদের এক গুপ্তচরের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। সে রাতে আত্মগোপন করে থেকে মুসলিম বাহিনীর আওয়াজ শুনে তাঁদের গতিবিধি লক্ষ করছিল। কিন্তু সকালের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়লে মুসলিমরা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় আটক করে।

তাকে বনু আসাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। সে বলল, 'তারা তাদের গবাদি পশুসহ এখন এ অঞ্চলের উঁচু এলাকায় অবস্থান করছে।' মুসলিমরা তাকে নিরাপত্তা দিলে সে তার চাচা গোত্রের গবাদি পশুর সন্ধান দিল। মুসলিমরা হামলা করে তা ছিনিয়ে নিল এবং এক ব্যক্তি মারফত সেগুলো মদিনায় পঠিয়ে দিল। এরপর তাঁরা নিরাপদে রাসুল ﷺ-এর কাছে ফিরে আসে।

এ অভিযান ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে পরিচালিত হয়েছিল।[৬০৫]

উক্কাশা ﷺ এ অভিযানে তাঁর নেতৃত্বের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে অতি সুচারুরূপে পালন করেছিলেন। কারণ কোনো রকম জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই তিনি তাঁর বাহিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছিলেন। বেদুইনদের থেকে বিরাট সংখ্যক উট গনিমত লাভ করেছিলেন। শত্রুদের মনোবলে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিলেন। যার কারণে শত্রুরা মোকাবিলার চিন্তা বাদ দিয়ে জান নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। ওই অঞ্চলের বাকি আরব বেদুইনদের মাঝে তিনি এমন ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, যার কারণে তারা মুসলিমদের ভয় করতে থাকে।

---

৬০৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৫০-৫৫১, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮৪-৮৫), আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৬-৩৭৭।

জিনাব অভিমুখে অভিযান[৬০৬]

নবম হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে রাসুল ﷺ উক্কাশা -এর নেতৃত্বে জিনাব অভিমুখে বনু কুজাআহর শাখাগোত্র[৬০৭] বনু উজরাহ এবং বনু বালিয়্যাকে লক্ষ্য করে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন।[৬০৮]

এ অভিযানের লক্ষ্য এবং তার বাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারিনি। তার ফলাফল সম্পর্কেও আমরা তেমন কিছু জানতে পারিনি। সম্ভবত ওই অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এ অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল। কারণ নবম হিজরিতে ওই অঞ্চলগুলোতে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সে অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ইসলামে প্রবেশ করেছিল। কয়েক বছর আগেই তারা পাক্কা ইমানদার বনে গিয়েছিলেন। অল্প সংখ্যক কিছু ছিটমহল তখন শিরকের অন্ধকারে ডুবে ছিল। তাই ওই ছিটমহলগুলোকে শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সেখানে ইসলামের আলো ছড়ানোর প্রচেষ্টাগুলোর একটি অংশ ছিল এ অভিযান।

শাহাদাত বরণ

রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর ১১ হিজরিতে যখন আরবে ইরতিদাদের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ল, তখন কুরাইশ ও সাকিফ গোত্র ছাড়া আরবের ছোট-বড় সকল গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়। তুলাইহা বিন খুয়াইলিদ আল-আসাদির ফিতনাটি চরম আকার ধারণ করে। তায়ি ও আসাদ গোত্রের লোকেরা তুলাইহার পাশে জমা হলো। এ পরিস্থিতিতে আবু বকর ১১টি সৈন্য বাহিনী বিন্যাস করলেন। তার মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ -এর নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে তুলাইহার মোকাবিলায় পাঠালেন।

---

৬০৬. খাইবার, সিলাহ ও ওয়াদিল কুরার পার্শ্ববর্তী জায়গার নাম জিনাব। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/১৪০-১৪১।

৬০৭. দেখুন, জামহারাতু আনসাবিল আরব : ২৪৪ পৃ.।

৬০৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬৪।

তার আগে আদি বিন হাতিম তায়িকে তায়ি গোত্রের কাছে পাঠান। তার পরেই খালিদ ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনি খালিদ ﷺ-কে প্রথমে তায়ি গোত্রের ওপর হামলা করার নির্দেশ দেন।

আদি ﷺ তায়ি গোত্রে এসে তাদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের ভীতি-প্রদর্শন করেন। তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, 'আপনি খালিদের বাহিনীর সামনে গিয়ে আমাদের থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করুন, তাহলে আমাদের যারা তুলাইহার কাছে চলে গেছে, আমরা তাদের বের করে আনব; যাতে তাদের নিহত হতে না হয়।'

আদি ﷺ খালিদ ﷺ-এর সামনে গিয়ে এ সংবাদ দিলে খালিদ ﷺ নিবৃত্ত হলেন। আর তায়ি গোত্রের লোকেরা তুলাইহার কাছে অবস্থানরত তাদের লোকদের কাছে বার্তা পাঠালে তারা গোত্রের লোকদের সাথে মিলিত হয়। এরপর তায়ি গোত্র খালিদ ﷺ-এর কাছে তাওবা করে ফিরে আসে।

খালিদ ﷺ জালিদাহ[৬০৯] গোত্র অভিমুখে রওয়ানা হলে আদি ﷺ তাদের ব্যাপারে খালিদ ﷺ-এর কাছে সুযোগ চাইলেন। এরপর তিনি জালিদাহ গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করে নেয়। তাদের ইসলামে ফিরে আসার সংবাদ নিয়ে আদি ﷺ খালিদ ﷺ-এর কাছে আসেন। জালিদাহ গোত্রের এক হাজার অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। সে সময়ে আদি ﷺ তায়ি অঞ্চলের জন্য একজন ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ উক্কাশা ও সাবিত বিন আকরাম আনসারি ﷺ-কে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁদের সাথে তুলাইহার ভাই হিবালের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁরা তাকে হত্যা করে। এ খবর তুলাইহার কাছে পৌঁছলে তুলাইহা ও তার ভাই সালাম তাদের বাহিনী থেকে বের হয়ে আসে। তুলাইহা উক্কাশা ﷺ-কে আর তার ভাই সালামা সাবিত ﷺ-কে শহিদ করে।[৬১০]

---

৬০৯. জালিদাহ তায়ি গোত্রের একটি শাখাগোত্র। বিস্তারিত জানতে দেখুন, জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৪৭১ পৃ.।

৬১০. ইবনুল আসির : ২/৩৪৬-৩৪৭।

তুলাইহা ও সালামা মূলত উক্কাশা ও সাবিত ﷺ-কে একাকী পেয়েছিল। তারা সকলেই ঘোড়ায় আরোহী অবস্থায় ছিলেন। উক্কাশা ﷺ-এর ঘোড়ার নাম ছিল রাজ্জাম (গর্জনকারী সিংহ) আর সাবিত ﷺ-এর ঘোড়ার নাম মুহাব্বার (সজ্জিত)। সালামা সাবিত ﷺ-কে অতর্কিতভাবে হত্যা করে বসে। তখন তুলাইহা সালামাকে বলে আমাকে শত্রুর ওপর সাহায্য করো, কারণ সে নির্ঘাত আমাকে হত্যা করে ফেলবে। তখন তারা উভয়ে একযোগে হামলা করে উক্কাশা ﷺ-কে হত্যা করে। এরপর তারা বাহিনীতে ফিরে ঘটনার বিবরণ দেয়। তখন উয়াইনা বিন হিসন আনন্দিত হয়ে বলে, 'এটা আমাদের বিজয়ের আলামত।' তখন উয়াইনা তাদের সাথে ছিল।

এরপর সেখানে খালিদ ﷺ-এর ২০০ ঘোড়সওয়ারের অগ্রবাহিনী জাইদ বিন খাত্তাব ﷺ-এর নেতৃত্বে পৌঁছে যায়। তাঁরা উক্কাশা ও সাবিত ﷺ-কে এভাবে নিহত পড়ে থাকতে দেখে অনেক ব্যথিত হন।

খালিদ ﷺ তাঁর সেনাবহর নিয়ে সে স্থানে পৌঁছে সাবিত ﷺ ও উক্কাশা ﷺ-এর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে খুবই মর্মাহত হলেন। মুসলিমরাও অনেক ব্যথিত হলো। খালিদ ﷺ দুটি কবর খননের নির্দেশ দিলেন। এরপর উভয় শহিদকে রক্তমাখা শরীরে তাঁদের পরনের কাপড় দিয়ে সেখানেই দাফন করা হয়। উক্কাশা ﷺ-এর শরীরে জখমের পরিমাণ একটু বেশি ছিল।[৬১১] এতে মুসলিমরা অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন।[৬১২]

উক্কাশা ও সাবিত ﷺ-এর রক্ত বৃথা যায়নি। মুসলিমগণ বুজাখার যুদ্ধে তুলাইহার ওপর বিজয় লাভ করে। মুসলিম বীরেরা তার দলের এবং তাদের জানমালের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছিল।

তুলাইহা নিজের একটি উন্নত ঘোড়া এবং তার স্ত্রীর জন্য একটি সওয়ারি প্রস্তুত করে রেখেছিল। যখন তার দলবলের ওপর বিপদ নেমে আসলো, তখন সে তার স্ত্রী নিয়ে পলায়ন করল এবং সিরিয়া গিয়ে বনু কালব গোত্রে আশ্রয় নিল।

৬১১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯২-৯৩।
৬১২. ইবনুল আসির : ২/৩৪৭, উসদুল গাবাহ : ৪/৩, আল-ইসতিআব : ৩/১০৮০, আল-ইসাবাহ : ৪/২৫৬, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩৩৮।

পরে বনু আসাদ ও বনু গাতাফানের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে সে ইসলাম গ্রহণ করে। এবং আবু বকর ؓ-এর ইনতিকাল পর্যন্ত সে বনু কালবে অবস্থান করে।

আবু বকর ؓ-এর খিলাফতকালে সে উমরাহর উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। মদিনার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে আবু বকর ؓ-কে বলা হলো, এই যে তুলাইহা যায়। তখন আবু বকর ؓ বলেছিলেন, 'তার ব্যাপারে আমি কী করতে পারি, যেহেতু সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।' উমর ؓ খলিফা হলে সে উমর ؓ-এর কাছে বাইআত হতে আসে। তখন উমর ؓ তাকে বলেছিল, 'তুমি কি উক্কাশা ও সাবিত ؓ-কে হত্যা করেছ? আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে কখনো পছন্দ করব না।' তুলাইহা বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, সে ব্যক্তিদ্বয়ের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন। তাঁদের হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করেননি।' তখন উমর তার বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর তুলাইহা তার সম্প্রদায়ে ফিরে এসে জিহাদের উদ্দেশ্যে ইরাকে চলে যায়।[৬১৩]

উক্কাশা ؓ-এর শাহাদাত ১১ হিজরিতে হয়েছিল।[৬১৪]

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন

উক্কাশা ؓ সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী[৬১৫] এবং নেতৃত্ব দানকারী সাহাবিদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।[৬১৬] তাঁর আলোচনা ইবনে আব্বাস ؓ বর্ণিত বুখারি-মুসলিমের সেই হাদিসে এসেছে, যে হাদিসে ৭০ হাজার ব্যক্তির বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের কথা উল্লেখ আছে। সেখানে এসেছে, 'উক্কাশা ؓ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কাছে দুআ করুন; যেন আমিও ওই দলে থাকি।" রাসুল ﷺ বললেন, "তুমিও তাদের একজন।" এটা দেখে আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমিও তাদের দলে থাকি।" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "এ দুআয় উক্কাশা তোমার থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে।"' এ

---

৬১৩. ইবনুল আসির : ২/৩৪৮।
৬১৪. আল-ইবার : ১/১৩, তারিখু খলিফা ইবনু খইয়াত : ১/৬৭।
৬১৫. আল-ইসাবাহ : ৪/২৫৬।
৬১৬. উসদুল গাবাহ : ৪/২-৩।

কথা দিয়ে মানুষ উপমা দিত। কেউ কোনো বিষয়ে অগ্রগামী হলে বলা হতো, 'উক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়েছে।'[৬১৭]

তাঁর সূত্রে সাহাবি আবু হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ হাদিস বর্ণনা করেছেন। রাসুল ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

«يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: فَدَعَا لَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»

"'আমার উম্মতের ৭০ হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তখন উক্কাশা বিন মিহসান বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, দুআ করুন; আল্লাহ যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন।" রাসুল ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। তখন আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, দুআ করুন; আল্লাহ যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন।" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "উক্কাশা এ ব্যাপারে তোমার থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে।'"[৬১৮]

হাদিসটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর সূত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন :

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ بِالْمَوْسِمِ، فَرَاثَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي، قَالَ: فَأَرَيْتُهُمْ، فَأَعْجَبَتْنِي كَثْرَتُهُمْ وَهَيْئَتُهُمْ قَدْ مَلَئُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ،- قَالَ حَسَنٌ: - فَقَالَ: أَرَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَؤُلَاءِ، - قَالَ عَفَّانُ، وَحَسَنٌ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ - سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » فَقَامَ عُكَّاشَةُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهُ، ثُمَّ

---

৬১৭. আল-ইসাবাহ : ৪/২৫৬।
৬১৮. মুসনাদু ইবনিল জাদ : ১১৪৫, আল-ইসতিআব : ৩/১০৮১।

قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»

'নিদর্শনসহ পূর্বেকার জাতিসমূহকে আমার সামনে পেশ করা হলো। আমার উম্মত আমার সামনে আসতে বিলম্ব করল। এরপর তাদের দেখতে পেলাম। তবে তাদের আধিক্য আমাকে আনন্দিত করল। তাদের আধিক্য পাহাড়-উপত্যকা ভরে দিয়েছে। তখন আল্লাহ বললেন, "হে মুহাম্মাদ, আপনি খুশি তো?" আমি বললাম, "আমি খুশি হে আমার রব!" তিনি বললেন, "এদের সাথে তোমার জন্য আরও ৭০ হাজার দেওয়া হলো। যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হলো, যারা ঝাড়ফুঁক করায় না। লোহা পুড়ে দাগ দেয় না। কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তাদের রবের প্রতি ভরসা রাখে।" তখন উক্কাশা দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর নবি, দুআ করুন; আল্লাহ যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন।" রাসুল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন। এরপর অপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর নবি, দুআ করুন; আল্লাহ যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন।" রাসুল ﷺ বললেন, "এ ব্যাপারে উক্কাশা তোমার থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে।"'[৬১৯]

জনৈক আহলে ইলম বলেন, 'পরের ওই লোকটি মুনাফিক ছিল।' এ উক্তির মাঝে সমস্যা আছে। কারণ রাসুল ﷺ বিপরীত কথার মাধ্যমে সে লোকের জবাব দিয়েছেন। আর রাসুল ﷺ-এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হলে সামর্থ্যে থাকলে তিনি তা দিয়ে দিতেন।[৬২০]

রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের সময় উক্কাশা رضي الله عنه-এর বয়স ৪৪ বছর হয়েছিল। তার এক বছর পরে[৬২১] ১২ হিজরিতে আবু বকর رضي الله عنه-এর খিলাফতকালে বুজাখার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৬২২]

---

৬১৯. মুসনাদু আহমাদ : ৪৩৩৯।
৬২০. আল-ইসতিআব : ৩/১০৮১।
৬২১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯২, আল-ইসতিআব : ৩/১০৮০।
৬২২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯২।

তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, উক্কাশা ﵁ বুজাখার যুদ্ধেই শহিদ হন; কিন্তু বুজাখার যুদ্ধ ১২ হিজরিতে নয়; বরং ১১ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। যেটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং তিনি রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের বছরই শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু তাঁর শাহাদাত রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের কয়েক মাস পরে হয়। সে হিসেবে শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪৫ বছর।

উক্কাশা ﵁ একজন সুদর্শন পুরুষ ছিলেন।[৬২৩] রাসুল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করেছেন, আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতে দাখিল করেন এবং তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল করে দেন। তাঁর হাঁটাচলা অনেকটা উট ও ঘোড়ার হাঁটাচলার মতো ছিল।[৬২৪]

আমরা তাঁর পরিবারের মধ্যে যাদের চিনি, তারা হলেন, তাঁর ভাই আবু সিনান বিন মিহসান। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকে অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চম হিজরিতে বনু কুরাইজা অবরোধকালে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁকে সেখানে দাফন করা হয়। বর্তমানে তা মাকবারায়ে বনু কুরাইজা নামে পরিচিত। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স ৪০ বছর হয়েছিল। তিনি উক্কাশা ﵁-এর চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলেন।[৬২৫]

আমাদের পরিচিত তাঁর পরিবারের আরেক জন হলেন, তাঁর ভাতিজা সিনান বিন আবু সিনান। সিনান ও তাঁর পিতার বয়সের মাঝে ২০ বছরের ব্যবধান ছিল। সিনান ﵁ বদর, উহুদ, খন্দক ও হুদাইবিয়ায় শরিক ছিলেন। হুদাইবিয়ার দিন গাছের নিচে তিনিই সর্বপ্রথম রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত হন। সিনান ﵁ ১৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।[৬২৬]

তাঁর পরিবারের আরেক জন হলেন, তাঁর বোন উম্মে কাইস বিনতে মিহসান। তিনি আকাবায় রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত দানকারিণী নারীদের একজন।[৬২৭]

---

৬২৩. উসদুল গাবাহ : ৪/৩, আল-ইসতিআব : ৩/১০৮০, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯২, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩৩৮।
৬২৪. আল-মুহাব্বার : ৮১ পৃ.।
৬২৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯৩।
৬২৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯৪।
৬২৭. আল-মুহাব্বার : ৪০৮ পৃ.।

তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি ছিলেন তেজোদীপ্ত বীর। নবিজি ﷺ-এর নেতৃত্বে অংশ নেওয়া সকল যুদ্ধে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর তেজোদীপ্ততা ও বীরত্বের কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে একটি তরবারি উপহার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সাহায্যের আর্তনাদে সাড়া দিতে তিনি তুফান বেগে ছুটে যেতেন এবং নির্ভীক চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়তেন যুদ্ধের অগ্নিগর্ভে।

তিনি রাসুল ﷺ-এর একজন অন্যতম ঘোড়সওয়ার ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর খালিদ বিন ওয়ালিদ -এরও ঘোড়সওয়ার ছিলেন। তিনি শুধু সম্মুখ বাহিনীর সৈনিকই ছিলেন না; বরং অগ্রগামী বাহিনীর জন্য বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক হয়ে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতেন। আবার শত্রু যাতে মুসলিম বাহিনীর কোনো খবরাখবর নিতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যেকোনো মুসলিম সৈনিকের আগে তিনিই শত্রুর মোকাবিলায় এগিয়ে যেতেন। এসবই তাঁর বীরত্ব, তেজোদীপ্ততা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাক্ষ্য বহন করে। কারণ তথ্য উদ্ধারের জন্য ব্যক্তির যেমন থাকতে হয় উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও প্রচণ্ড প্রতিরোধ ক্ষমতা, তেমন থাকতে হয় সুতীক্ষ্ণ মেধা।

তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের খিদমতে কাজ করে গেছেন। আকিদা-বিশ্বাসের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলীন করেছেন। ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেছেন নিজের অমূল্য জীবন।

ইতিহাসে উক্কাশা

তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। সাহাবিদের মাঝে ছিলেন একজন সম্মানিত নেতা, ঘোড়সওয়ার ও সাহসী বীর।

রাসুল ﷺ-এর দুটি অভিযানে কমান্ডের দায়িত্ব পালন করেন। এবং ইসলামের তরে জীবন দানকারী ছিলেন। এ মহান বীর ও ঘোড়সওয়ারের প্রতি আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত নাজিল হোক। আমিন।

নবির হাওয়ারি ও সারিয়্যা কমান্ডার
আব্দুর রহমান বিন আওফ আজ-জুহরি ﵁

প্রথম জীবন ও বংশপরিচিতি

আব্দুর রহমান বিন আওফ বিন আবদে আওফ বিন আব্দুল হারিস বিন জুহরা[৬২৮] বিন কিলাব বিন মুররা[৬২৯] বিন কাব বিন লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালিক বিন নাজর বিন কিনানাহ[৬৩০] বিন কুরাশি আজ-জুহরি।

তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মাদ। ইসলামপূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদে আমর। দুর্বল বর্ণনামতে, আবদে কাবা। পরে রাসুল ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন আব্দুর রহমান।[৬৩১]

তাঁর মাতা শিফা বিনতে আওফ বিন আবদু বিন হারিস বিন জুহরা[৬৩২] বিন কিলাব বিন মুররা। তাঁর পিতা আওফকে গুমাইসা এলাকায় বনু জুজাইমা হত্যা করে।[৬৩৩]

---

৬২৮. নাসবু কুরাইশ : ২৬৫ পৃ., জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৩০-১৩১ পৃ.।
৬২৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৪, আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৭৬।
৬৩০. আল-মাআরিফ : ২৩৫ পৃ.।
৬৩১. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১২, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০০।
৬৩২. আল-ইসতিআব : ২/৮৪৪।
৬৩৩. আল-মাআরিফ : ২৫৩ পৃ.।

তাঁর বংশধারা কিলাব বিন মুররা পর্যন্ত এসে রাসুল ﷺ-এর বংশধারার সাথে মিলে যায়। তাঁকে জুহরা বিন কিলাবের সাথে সম্বন্ধ করা হয়। সে হিসেবে তাঁকে বলা হয় কুরাশি জুহরি।[৬৩৪] তিনি রাসুল ﷺ-এর মামাগোষ্ঠীর লোক। কারণ বনু জুহরা রাসুল ﷺ-এর মামাগোষ্ঠী।[৬৩৫] রাসুল ﷺ-এর মাতা আমিনা বিনতে ওয়াহাব বনু জুহরা বংশের মহিলা।[৬৩৬]

তিনি হস্তীবাহিনী ঘটনার ১০ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৩৭] হস্তীবাহিনীর ঘটনা ঘটে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে,[৬৩৮] যে বছর রাসুল ﷺ জন্মগ্রহণ করেন।[৬৩৯] অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন আওফ رضي الله عنه ৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ইসলামের সূচনাকালেই আবু বকর رضي الله عنه-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৪০] রাসুল ﷺ তখনও আরকাম বিন আবু আরকামের বাড়িতে তাঁর দাওয়াহর কাজ শুরু করেননি।[৬৪১] তিনি ওই আটজনের একজন ছিলেন, যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলামে প্রবেশ করেন। এবং ওই পাঁচজনের একজন ছিলেন, যারা আবু বকর رضي الله عنه-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৬৪২] তাঁরা হলেন, উসমান বিন আফফান, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رضي الله عنهم।[৬৪৩]

আবু বকর رضي الله عنه তাঁর সম্প্রদায়ে একজন সহজ, বন্ধুপ্রতিম ও পছন্দের মানুষ ছিলেন। কুরাইশের সবচেয়ে কাছের হওয়ার কারণে কুরাইশের ভালো-মন্দ সম্পর্কে তিনি ভালো ধারণা রাখতেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমা, সদাচার ও ব্যবসার কারণে কুরাইশের লোকেরা অনেক কারণেই তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করত। এ সুবাদে তিনি যার

---

৬৩৪. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৭৬।
৬৩৫. আল-মাআরিফ : ১৬৬ পৃ.।
৬৩৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/১৬৯।
৬৩৭. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৩, আল-ইসতিআব : ২/৮২২।
৬৩৮. দেখুন, আমাদের রচিত বই, ওয়ামদাতুন মিন নুরিল মুস্তফা : ১৫।
৬৩৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/১৭১।
৬৪০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১২৪।
৬৪১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৪।
৬৪২. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৩।
৬৪৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/২৬৮।

ব্যাপারে আশ্বস্ত হতেন, তাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেন। ফলে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে এ পাঁচ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৪৪] পরবর্তী সময়ে তারা ইসলামে বিরাট অবদান রেখেছিলেন। তিনি ওই পাঁচ ব্যক্তিকে রাসুল ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলে তাঁরা রাসুল ﷺ-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে সালাত আদায় করেন।[৬৪৫]

রাসুল ﷺ যখন দেখলেন তাঁর সাহাবিগণ প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আবার এ নির্যাতন বন্ধের কোনো ব্যবস্থাও করতে পারছিলেন না, তখন তাঁদের বললেন, 'যদি তোমরা হাবশায় চলে যেতে! কারণ সেখানে একজন বাদশাহ আছে। তার কাছে কেউ নির্যাতিত হয় না। হাবশা সত্যের ভূমি। যাতে এ বিপদ থেকে আল্লাহ তোমাদের বাঁচার একটা পথ বের করে দেন।' তখন মুসলিমগণ স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য হাবশায় চলে যায়। বনু জুহরার মধ্যে সর্বপ্রথম হাবশায় হিজরত করেন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ।[৬৪৬] তিনি ওই ১০ ব্যক্তির একজন ছিলেন, যাঁরা সবার আগে হিজরত করে হাবশায় পৌঁছেছিলেন।[৬৪৭]

হাবশায় হিজরতকারী মুসলিমদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ সংবাদ শুনে তাঁরা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি এসে জানতে পারলেন, সংবাদটি ভুয়া ছিল। তখন তাঁদের কেউ গোপনে বা কারও আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে। হাবশা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-ও ছিলেন।[৬৪৮]

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ মক্কা থেকে হাবশায় দুবার হিজরত করেন।[৬৪৯] মিসওয়ার বিন মাখরামা ﷺ বলেন, 'একবার আমি উসমান ﷺ ও আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর সাথে হাঁটছিলাম। আব্দুর রহমান ﷺ আমার সামনে ছিল।

---

৬৪৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/২৬৮, আদ-দুরার : ৪১ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ৪৬ পৃ., তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০৪।
৬৪৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/২৬৮।
৬৪৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৩-৩৪৪, আদ-দুরার : ৫১ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ৫৬ পৃ.।
৬৪৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৫।
৬৪৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৮৮-৩৮৯, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৬৫ পৃ.।
৬৪৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৫, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০১।

তাঁর গায়ে ছিল একটি নকশি কালো চাদর। উসমান رضي الله عنه আমাকে ডেকে বললেন, "হে মিসওয়ার!" বললাম, "জি, হে আমিরুল মুমিনিন!" তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি মনে করবে, সে প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরতের ক্ষেত্রে তোমার মামার চেয়ে উত্তম, তবে সে মিথ্যা বলবে।"[৬৫০] তিনি প্রথম হিজরত বলে হাবশার হিজরত এবং দ্বিতীয় হিজরত বলে মদিনার হিজরত বোঝাতে চেয়েছেন।

মদিনায় হিজরতের পূর্বে রাসুল ﷺ মুহাজির সাহাবিদের মাঝে সহমর্মিতা ও অধিকারের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিয়েছিলেন। সে হিসেবে উসমান رضي الله عنه ও আব্দুর রহমান বিন আওফ رضي الله عنه-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দিয়েছিলেন।[৬৫১] উসমান رضي الله عنه বললেন, 'আমার দুটি বাগানের যেকোনো একটি তুমি নিয়ে নাও।' আব্দুর রহমান বিন আওফ رضي الله عنه বললেন, 'আল্লাহ তোমার বাগানে বরকত দান করুন। আমি এ জন্য ইসলাম গ্রহণ করিনি। আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন।' তখন উসমান رضي الله عنه তাঁকে বাজার দেখিয়ে দিলে তিনি সুরকি ও কাঁচা চামড়ার ব্যবসা করা শুরু করেন। এরপর কিছু সম্পদ জমা হলে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৬৫২]

হিজরতের ভূমি প্রস্তুত হলে রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। তিনি সাহাবিদের বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য কিছু ভাই এবং একটি স্থান নির্ধারণ করেছেন। যেখানে তোমরা নিরাপদে থাকবে।' তখন সাহাবায়ে কিরাম একে একে হিজরত করতে থাকলেন। আর রাসুল ﷺ আল্লাহ তাআলার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলেন।[৬৫৩]

সেই প্রেক্ষিতে আব্দুর রহমান বিন আওফ رضي الله عنه মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে কিছু মুহাজিরদের সাথে খাজরাজ গোত্রের সাদ বিন রবি رضي الله عنه-এর কাছে মেহমান হন।[৬৫৪]

---

৬৫০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৫।

৬৫১. আল-মুহাব্বার : ৭১ পৃ.। তাবাকাতু ইবনি সাদে (৩/১২৬) এভাবে এসেছে, রাসুল ﷺ আব্দুর রহমান رضي الله عنه ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দিয়েছিলেন। তবে ওপরে আমরা যে মতটি উল্লেখ করেছি, সেটিই অধিক বিশুদ্ধ। দেখুন, আদ-দুরার : ১০০ পৃ., আনসাবুল আশরাফ : ১/৭০।

৬৫২. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৫, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১১৩।

৬৫৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৭৬।

৬৫৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৯১, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৮৯ পৃ., আদ-দুরার : ৮৪ পৃ.।

রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরত করে মসজিদে নববি নির্মাণের পর মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দেন। অপর এক দুর্বল বর্ণনামতে, একদিকে মসজিদে নববির নির্মাণের কাজ চলছিল, অপরদিকে মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব তৈরি করা হচ্ছিল। এর মাধ্যমে তাঁরা একে অপরের উত্তরাধিকার লাভ করত। আত্মীয়তার ভিত্তিতে নয়। এই আয়াত নাজিল হওয়া পর্যন্ত নিয়মটি বাকি ছিল।

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

'বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধানমতে তারা পরস্পর বেশি হকদার।'[৬৫৫]

এ আয়াত ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের বিধান রহিত করে দেয়। কিন্তু উত্তরাধিকার বাদে সহমর্মিতা ও অন্যান্য অধিকার সর্বদা বহাল থাকে। রাসুল ﷺ হারিস বিন খাজরাজের ভ্রাতৃগোষ্ঠী সাদ বিন রবি ﷺ-এর সাথে আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দেন।[৬৫৬]

এটা স্পষ্ট বিষয় যে, রাসুল ﷺ মক্কায় মুহাজিরদের মাঝে হিজরতের পূর্বে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দিয়েছিলেন। আর মদিনায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে হিজরতের পরে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দিয়েছিলেন। সে হিসেবে মক্কায় আব্দুর রহমান ও উসমান ﷺ-এর মাঝে এবং মদিনায় আব্দুর রহমান ও সাদ ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং মক্কায় ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দেওয়া এবং মদিনায় ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দেওয়ার মাঝে কোনো বৈপরীত্য থাকল না। যেমনটা কিছু ঐতিহাসিক ও ইতিহাস রচয়িতা ধারণা করে থাকেন। বিষয়টি স্পষ্ট, তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই।

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ হাবশা ও মদিনা উভয় স্থানে হিজরতের ক্ষেত্রে অগ্রগামীদের মধ্যে ছিলেন।[৬৫৭]

---

৬৫৫. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৭৫।
৬৫৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১২৫, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৯৬ পৃ., আদ-দুরার : ৯৭ পৃ.।
৬৫৭. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৩।

রাসুল ﷺ যখন আব্দুর রহমান ও সাদ ‎ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দিলেন, তখন সাদ ‎ﷺ বললেন, 'আমার ভাই, মদিনায় আমি একজন সম্পদশালী লোক। আমার অর্ধেক সম্পদ আপনি নিয়ে নিন। আমার দুজন স্ত্রী আছে। দেখুন, দুজনের মধ্যে কোন জনকে আপনার পছন্দ হয়, আমি তাকে আপনার জন্য তালাক দিয়ে দিই।' তখন আব্দুর রহমান ‎ﷺ বললেন, 'আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিবারে বরকত দান করুন। আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন।' তিনি তাঁকে বাজার দেখিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ক্রয়-বিক্রয় করে লাভবান হলেন। কিছু পনির ও ছাতু নিয়ে আসলেন। তারপর কিছুদিন আপন অবস্থায় থাকলেন। এরপর একদিন জাফরান মাখা একটি চাদর গায়ে রাসুল ﷺ-এর দরবারে হাজির হলেন। রাসুল ﷺ তাঁর গায়ে খুশবুজাতীয় রং দেখে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এক নারীকে বিবাহ করেছি।' রাসুল বললেন, 'তাকে কী পরিমাণ মোহর দিয়েছ?' তিনি বললেন, 'একটি খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণ।' রাসুল ﷺ বললেন, 'একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলিমা করো।' আব্দুর রহমান ‎ﷺ বলেন, 'তখন আমার নিজেকে মনে হলো, হায়, আমি পাথর খুঁড়ে হলেও যদি একটি স্বর্ণ বা রুপার সন্ধান পেয়ে যেতাম!'[৬৫৮]

রাসুল ﷺ মদিনায় বাড়িঘরের রেখা টেনে দিয়েছিলেন। বনু জুহরার জন্য মসজিদের পেছনে এক প্রান্তে সীমানা দিয়েছিলেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ ‎ﷺ-এর একটি খেজুরবাগান ছিল। খেজুর গাছগুলো অনেক ছোট ছিল।[৬৫৯]

তিনি আরেক আনসারি মহিলাকে তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করেছিলেন।[৬৬০]

এভাবেই তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অঙ্গনে জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পরিবার-পরিজন নিয়ে মুহাজির অবস্থায় এক নিরাপদ ভূমিতে লাভজনক ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

---

৬৫৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৬, উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৪, আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮৪।
৬৫৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৬।
৬৬০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৬।

এক. বদর রণাঙ্গন

দ্বিতীয় হিজরির ১২ রমাদান শনিবার মুসলিম বাহিনী মদিনা থেকে বদর অভিমুখে রওয়ানা হয়।[৬৬১] বাহন হিসেবে মুসলিম বাহিনীতে উট ছিল সর্বমোট ৭০টি। যার একেকটি উটে পালাক্রমে দুজন থেকে নিয়ে চারজন পর্যন্ত আরোহণ করতে হয়েছে। আবু বকর, উমর ও আব্দুর রহমান ﷺ—এ তিনজন পালাক্রমে একটি উটে আরোহণ করেছিলেন।[৬৬২]

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ রাতে আমাদেরকে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ করে সৈন্য বিন্যাস করলেন। সকালবেলা আমরা প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে গেলাম।[৬৬৩] আমি কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় আমার দুই পাশে দুজন আনসারি বালককে দেখতে পেলাম। তারা একেবারেই অল্পবয়সি ছিল। তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম, যদি এদের পরিবর্তে আমার পাশে শক্তিমান কেউ থাকত। এরেই মধ্যে তাঁদের একজন আমাকে গুঁতা দিয়ে বলছে, "চাচা, আবু জাহেলকে চেনেন?" বললাম, "হ্যাঁ, কিন্তু তাকে দিয়ে তুমি কী করবে?" সে বলল, "শুনেছি সে নাকি রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দিত। আল্লাহর কসম, তাকে পেলে হয়তো তাকে শেষ করব, নয়তো আমি শেষ হব।" তাঁর কথা শেষ হতেই অপরজন গুঁতা মেরে প্রথমজনের মতো করে বলল। একটু পরেই দেখতে পেলাম, আবু জাহেল মানুষের ভিড়ে ঘোরাফেরা করছে। বললাম, "ওই লোকটাকে যে দেখছ, সে-ই তোমাদের শিকার।" দেখিয়ে দেওয়ামাত্রই তরবারি হাতে নিয়ে তাঁরা বাজপাখির মতো আবু জাহেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উভয়ে তরবারির আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। এরপর তাঁরা রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে খবর দিল। রাসুল ﷺ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের দুজনের কে তাকে হত্যা করেছ?" তাঁরা প্রত্যেকই বলল, "আমি

---

৬৬১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২।

৬৬২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১২৪, আদ-দুরার : ১১১, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১০৮ পৃ., ইবনুল আসির : ২/১১৮।

৬৬৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৮৮।

হত্যা করেছি।" রাসুল ﷺ বললেন, "তোমরা কি তরবারি থেকে রক্ত মুছে ফেলেছ?" তাঁরা বলল, "না।" রাসুল ﷺ তাঁদের তরবারি দেখে বললেন, "তোমরা দুজনই তাকে হত্যা করেছ।"'[৬৬৪] তাঁরা দুজনই ছিলেন আফরার ছেলে। আওফ বিন হারিস আল-খাজরাজি আল-আনসারি[৬৬৫] এবং মুআওয়িজ বিন হারিস আল-খাজরাজি আল-আনসারি।[৬৬৬]

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ উমাইয়া বিন খালাফের হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'উমাইয়া বিন খালাফ মক্কায় আমার বন্ধু ছিল। ওই সময় আমার নাম ছিল আবদে আমর। ইসলাম গ্রহণের সময় আমার নাম রাখা হয় আব্দুর রহমান। মক্কায় অবস্থানকালে একবার উমাইয়া বিন খালাফ আমাকে বলল, "হে আবদে আমর, তুমি কি তোমার বাবা-মায়ের রাখা নাম অপছন্দ করলে?" বললাম, "হ্যাঁ।" সে বলল, "আমি তো রহমানকে চিনি না। তাহলে তোমাকে ডাকতে পারি এমন একটি নাম ঠিক করো। কারণ তুমি তো তোমার আগের নামে ডাকলে সাড়া দেবে না। আর আমিও যা চিনি না, সে নামে তোমাকে ডাকতে পারব না।" এই কারণে সে আমাকে আবদে আমর বলে ডাকলে আমি সাড়া দিতাম না। আমি বললাম, "হে আবু আলি, তুমিই একটা নাম ঠিক করো।" তখন সে বলল, "আজ থেকে তোমাকে আমি আব্দুল ইলাহ বলে ডাকব।" এরপর থেকে সে আমাকে এভাবেই সম্বোধন করত।

যাহোক, বদরের দিন যুদ্ধশেষে আমি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে তখন তার ছেলে আলির হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কিছু যুদ্ধলব্ধ বর্ম বহন করছিলাম। সে আমাকে দেখে বলল, "হে আবদে আমর!" আমি কিছু বললাম না। সে আবার ডাকল, "হে আব্দুল ইলাহ!" তখন আমি বললাম, "জি, বলো।" সে বলল, "আমার ব্যাপারে কি কোনো আগ্রহ নেই। আমি তো তোমার এই বর্মগুলো থেকে অনেক উত্তম।" আমি বর্মগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে তার হাত ও তার ছেলের হাত ধরলাম। সে বলতে লাগল, "আমি আজকের দিনের মতো

---

৬৬৪. আল-ইসতিবসার : ১৫৬ পৃ.।

৬৬৫. তার বিস্তারিত জীবন জানতে দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৭/৪৯২, আল-ইসাবাহ : ৫/৪২, উসদুল গাবাহ : ৪/১৫৫, আল-ইসতিআব : ৩/১২২৫।

৬৬৬. তার বিস্তারিত জীবনী জানতে দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৭/৪৯২, আল-ইসাবাহ : ৫/৪২, উসদুল গাবাহ : ৪/৪০২, আল-ইসতিআব : ৪/১৪৪২।

বিপদ আর কখনো দেখিনি। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন পড়ে না?[৬৬৭] আচ্ছা আব্দুল ইলাহ, বুকে বিশেষ কাপড় বাঁধা লোকটি কে?" বললাম, "মুত্তালিবপুত্র হামজা ﷺ।" সে বলল, "সে-ই আমাদের আজকে বেশি সর্বনাশ করেছে।" আমি পিতা-পুত্রকে টেনে নিয়ে যাব, এমন মুহূর্তে বিলাল উমাইয়াকে দেখে ফেলে। উমাইয়া মক্কায় বিলাল ﷺ-কে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য নির্মম শাস্তি দিত। বিলাল ﷺ-কে ভরদুপুরে উত্তপ্ত বালুর ওপর চিত করে শুইয়ে বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত। আর বলত, "হয়তো মুহাম্মাদের ধর্ম ছাড়বে, না হয় এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।" তখন বিলাল ﷺ শুধু বলতেন, "আহাদ, আহাদ।" তাই বিলাল ﷺ উমাইয়াকে দেখে বলল, "উমাইয়া বিন খালাফ হচ্ছে কুফরের সর্দার। সে বেঁচে গেলে আমার রক্ষা নেই।" আমি বললাম, "হে বিলাল, আমার কয়েদির ব্যাপারে তুমি এমন কথা বলছ?" কিন্তু বিলাল ﷺ বলল, "সে বেঁচে গেলে আমার রক্ষা নেই।" এরপর সে চিৎকার দিয়ে ডাকতে লাগল, "হে আনসারি যুবকেরা, এই যে কুফরের সর্দার উমাইয়া বিন খালাফ। সে বাঁচলে আমার রক্ষা নেই।" তখন আনসারি তরুণ-যুবকরা আমাদের ঘিরে ধরল। তাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিল। আমি তাকে রক্ষা করছিলাম। একপর্যায়ে এক লোক তার ছেলেকে তরবারি দ্বারা আঘাত করলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার দিচ্ছিল, এমন চিৎকার আমি কখনো শুনিনি। বাধ্য হয়ে বললাম, "তুমি নিজেকে বাঁচাও। আজ তোমার রক্ষা নেই। আমি তোমার কিছুই করতে পারছি না।" এরপর তাঁরা দুজনকে তরবারির আঘাতে শেষ করে ফেলল।'

পরবর্তী সময়ে আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বলতেন। 'আল্লাহ বিলালের প্রতি রহম করুন। সেদিন আমার আম-ছালার মতো বর্মও গেছে, কয়েদিও গেছে।'[৬৬৮]

তিনি অবশ্য সেদিন সায়িব বিন আবু হুবাইশকে বন্দী করেছিলেন।[৬৬৯] এবং উমাইয়া গোত্রের সায়িব বিন আবু রিফাআহকে হত্যা করেছিলেন।[৬৭০]

---

৬৬৭. এটা বলে সে প্রচুর দুগ্ধবিশিষ্ট উটের বিনিময়ে তার মুক্তির কথা বলেছে। দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৭২।

৬৬৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৭১, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৮২-৮৩, ইবনুল আসির : ২/১২৭।

৬৬৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৭৯, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩০২।

৬৭০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৫০, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩০০।

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ সক্রিয় বদরি সাহাবিদের একজন ছিলেন।[৬৭১] তিনি হত্যাও করেছেন বন্দীও করেছেন। আবার গনিমতও জমা করেছেন। এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপ সত্যিই তাঁর সক্ষমতা ও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে।

দুই. উহুদ রণাঙ্গন

তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৬৭২]

একপর্যায়ে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ যখন কাফিরদের পক্ষে চলে গেল এবং মুসলিমরা ময়দান ছেড়ে বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করছিল, তখন রাসুল ﷺ ১৪ জন সাহাবির একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে ময়দানে অটল-অবিচল ছিলেন। তাঁরাও রাসুল ﷺ-এর সাথে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৪ জনের সাতজন ছিলেন মুহাজির আর সাতজন ছিলেন আনসার। আব্দুর রহমান ﷺ ছিলেন এই সাত মুহাজিরদের একজন।[৬৭৩] তাঁর শরীরে সেদিন প্রায় ২১টি আঘাত লেগেছিল। তাঁর সামনের দুটি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল।[৬৭৪] এক পায়ে এমন জখম হয়েছিল, যার কারণে মৃত্যু পর্যন্ত খুড়িয়ে হেঁটেছিলেন। তিনি আসিদ বিন আবু তালহাকে হত্যা করেছিলেন।[৬৭৫] আসিদ আব্দুদ দার গোত্রের লোক ছিল। সেদিন কুরাইশের শাখাগোত্র আব্দুদ দার গোত্রের ১০ ব্যক্তি নিহত হয়েছিল।[৬৭৬] একটি দুর্বল মত অনুসারে, তিনি কিলাব বিন আবু তালহাকেও হত্যা করেছিলেন।[৬৭৭]

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ উহুদ যুদ্ধের অন্যতম বীর ছিলেন। সেদিন তিনি নিজের জীবন বাজি রেখে রাসুল ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন। বিভীষিকাময় যুদ্ধের সময় তিনি পাহাড়ের ন্যায় অবিচল থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। বীরত্ব

---

৬৭১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩২৭, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৫৫, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১১৭ পৃ., আদ-দুরার : ১২৩ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৮।
৬৭২. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৫৬ পৃ., আদ-দুরার : ১৫৩ পৃ.।
৬৭৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৪০, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩১৮।
৬৭৪. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০১।
৬৭৫. আল-মাআরিফ : ১৬১ পৃ.।
৬৭৬. আল-মাআরিফ : ১৬০-১৬১ পৃ., আদ-দুরার : ১৬৫ পৃ.।
৬৭৭. আদ-দুরার : ১৬৫ পৃ.।

ও সাহসিকতার সাথে জীবনের বিনিময়ে রাসুল ﷺ-এর হিফাজত নিশ্চিত করেছিলেন।

তিন. অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্র

ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে যুদ্ধের যে বাইআত সংঘটিত হয়েছিল, সে বাইআতে আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে সকল ধনী সাহাবিদের একজন ছিলেন, যাঁরা কুরবানির জন্য বাইতুল্লাহয় পশু পাঠিয়েছিলেন।[৬৭৮]

সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে খাইবার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁।[৬৭৯] অন্যান্য সাহাবির সাথে আব্দুর রহমান ﵁-এর জন্য গনিমত হিসেবে খাইবারের একটি অংশ নির্ধারিত হয়।[৬৮০] খাইবারের চাষাবাদ থেকে আসা ফসলাদি মুসলিমদের মাঝে বণ্টনের সুবিধার্থে ১০০ করে গ্রুপ বানানো হয়েছিল। প্রতি গ্রুপে একজন করে আমির নির্ধারণ করা হয়েছিল, যিনি তাদের গনিমত ভাগ করে দিতে পারবে। আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁-ও একটি গ্রুপের আমির ছিলেন।[৬৮১]

অষ্টম হিজরির রমাদান মাসে তিনি মক্কা-বিজয়ের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। রাসুল ﷺ-এর সবুজ বাহিনী যখন মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছল আর রাসুল ﷺ তাঁর কসওয়ায় আরোহণ করে আবু বকর ﵁ ও উসাইদ বিন হুজাইর ﵁-এর সাথে কথা বলতে বলতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন আব্বাস ﵁ আবু সুফিয়ান বিন হারবকে বললেন, 'এই যে আল্লাহর রাসুল তাঁর বাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছেন। তাঁর বাহিনীতে আনসার-মুহাজির সবাই উপস্থিত আছেন। আনসারদের প্রত্যেক শাখাগোত্রের জন্য আলাদা ঝান্ডা আছে। তাঁরা আপদ-মস্তক লৌহ বর্মাবৃত।' অপর একটি দুর্বল মত অনুসারে মুসলিম বাহিনীতে

---

৬৭৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৭২-৫৭৩।
৬৭৯. আদ-দুরার : ২০৯ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ২১১ পৃ.।
৬৮০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৮৯, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪০৪, আদ-দুরার : ২১৭ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ২১৪ পৃ.।
৬৮১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৮৯।

এক হাজার বর্ম পরিহিত যোদ্ধা ছিল। রাসুল ﷺ তাঁর ঝান্ডা সাদ বিন উবাদাহ ﷺ-এর হাতে দিয়েছিলেন। তিনি বাহিনীর সামনে সামনে হাঁটছিলেন। আবু সুফিয়ানকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'হে আবু সুফিয়ান, আজ যুদ্ধের দিন। আজ তোমাদের সবকিছু বৈধ করা হবে। আজ কুরাইশকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন।' তখন আবু সুফিয়ান রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আপনার সম্প্রদায়কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। সাদ ও তাঁর সাথিরা তো দাবি করছে, আজ নাকি যুদ্ধের দিন। আজ নাকি আমাদের সবকিছুকে তারা বৈধ বানাবে। আল্লাহ নাকি আজ কুরাইশকে লাঞ্ছিত করবেন? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি আপনার সম্প্রদায়ের মাঝে সবচেয়ে সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ, সবচেয়ে দয়ালু এবং আপনি বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন।' তখন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ ও উসমান বিন আফফান ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কুরাইশের ব্যাপারে সাদকে নিরাপদ মনে করছি না।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'আজ হচ্ছে দয়া প্রদর্শনের দিন। আজকে আল্লাহ কুরাইশকে সম্মানিত করবেন।' রাসুল ﷺ সাদ ﷺ-কে বাদ দিয়ে তাঁর ছেলে কাইস বিন সাদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন।[৬৮২]

মক্কা-বিজয়ের পর রাসুল ﷺ খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-কে বনি জাজিমার কাছে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।[৬৮৩] বনু জাজিমার লোকেরা খালিদ ﷺ-এর বাহিনী দেখে অস্ত্র ধারণ করে। তখন খালিদ ﷺ তাদের বলল, 'অস্ত্র রাখো, কারণ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে।'[৬৮৪]

আরও কিছু যুদ্ধ

ক. আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ রাসুল ﷺ-এর সাথে প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[৬৮৫] চতুর্থ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে বনু নাজির

৬৮২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৮২১-৮২২।
৬৮৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৫৩।
৬৮৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৫৩, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৪৭।
৬৮৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৮।

গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেন।[৬৮৬] এ যুদ্ধে রাসুল ﷺ তাঁকে সুয়ালাহ প্রদান করেন। একে মালে সুলাইম বলা হয়।[৬৮৭]

খ. পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ[৬৮৮] এবং শাবান মাসে বনু মুসতালিক বা মুরাইসি এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুরাইসি এর যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহীর দলে ছিলেন।[৬৮৯]

গ. পঞ্চম হিজরির জিলকদ মাসে তিনি বনু কুরাইজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেও তিনি অশ্বারোহীর দলে ছিলেন। রাসুল ﷺ সেদিন ঘোড়ার জন্য দুটি অংশ আর ঘোড়ার মালিকের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছিলেন।[৬৯০] বনু কুরাইজা যখন বন্দী হলো, তখন রাসুল ﷺ তাদের একটি অংশকে উসমান ؓ ও আব্দুর রহমান বিন আওফ ؓ-এর নিকট বিক্রি করেন।[৬৯১]

ঘ. এমনিভাবে তিনি ষষ্ঠ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে[৬৯২] 'জি-কারাদ' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৬৯৩] এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এ রকম ছিল, মদিনার উত্তর প্রান্তে আব্দুর রহমান বিন আওফ ؓ-এর কিছু উট চরে বেড়াত। সাথে সাথে রাসুল ﷺ-এর গর্ববতী ও দুগ্ধদানকারী উটপাল মাঠে চরে বেড়াত। উয়াইনা বিন হিসন ৪০ জন অশ্বারোহী নিয়ে মদিনার চারণভূমিতে আক্রমণ করে বসে। কিন্তু তারা আব্দুর রহমান ؓ-এর উটকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে ভুলে রাসুল ﷺ-এর উটকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। খবর শুনে মুসলিমগণ তাদের ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে মুশরিকরা উট ছেড়ে পলায়ন করে।

ঙ. দুমাতুল জানদাল অভিমুখে অভিযান[৬৯৪]

---

৬৮৬. আদ-দুরার : ১৭৪ পৃ.।
৬৮৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৭৯।
৬৮৮. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০১, আদ-দুরার : ১৭৯ পৃ.।
৬৮৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৪০৪-৪০৫।
৬৯০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৯৬-৪৯৮।
৬৯১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫১৩।
৬৯২. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩২৩।
৬৯৩. গাতাফান অঞ্চলের কাছাকাছি মদিনার দিকে একটি পানির উৎসের নাম 'জি-কারাদ'। বলা হয়, মদিনা থেকে এটি এক দিনের পথ দূরত্বে অবস্থিত।
৬৯৪. মদিনা ও দামেশকের মাঝে অবস্থিত দামেশক থেকে সাত মাঞ্জিল দূরে মদিনা ও দামেশকের মাঝে অবস্থিত অঞ্চলের নাম দুমাতুল জানদাল। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৪/১০৬-১০৯।

ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে রাসুল ﷺ আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-কে ডেকে সামনে বসালেন। এবং নিজ হাতে তাঁর মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিলেন। এরপর বললেন, 'আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে যাও। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, বাড়াবাড়ি করো না, কারও সাথে প্রতারণা করো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না।'

রাসুল ﷺ তাঁকে দুমাতুল জানদাল অভিমুখে বনু কালবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে বনু কালব গোত্রের প্রধান আসবাগ বিন আমর আল-কালবি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে তাঁর কওমের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। আর যারা পূর্বের ধর্মে বাকি থাকে, তারা জিজিয়া দেওয়ার শর্তে বাকি থাকে। আসবাগ খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিল।

রাসুল ﷺ আব্দুর রহমান ﷺ-কে বলেছিলেন, 'যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া দেয়, তবে তাদের প্রধানের কন্যাকে বিবাহ করবে।' তাই আব্দুর রহমান ﷺ আসবাগের কন্যা তুমারাজকে বিবাহ করে মদিনায় নিয়ে এসেছিলেন। তুমারাজ হলেন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর ছেলে আবু সালামা ﷺ-এর মাতা।[৬৯৫]

এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে আদমরা জানতে পারিনি। কিন্তু এ অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বান করা। আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ সে দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করেছেন।

পক্ষান্তরে খালিদ ﷺ বনু জাজিমার লোকদেরকে অস্ত্রসজ্জিত পেয়েছিলেন। তাই তিনি তাদের বলেছিলেন, 'তোমাদের ব্যাপার কী?' তারা বলল, 'আমরা মুসলিম। আমরা সালাত আদায় করেছি, মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্যায়ন করেছি, আমাদের মহল্লায় মসজিদ বানিয়েছি এবং আমরা আজান দিয়ে সালাত আদায় করছি।' খালিদ ﷺ বললেন, 'তাহলে হাতে অস্ত্র কেন?' তারা বলল, 'আরবের কিছু কবিলার সাথে আমাদের শত্রুতা আছে। আমরা ভয় করেছিলাম আপনারা হয়তো সেই কবিলার লোক।' খালিদ ﷺ বললেন, 'এখন তাহলে অস্ত্র ফেলে দাও।' তারা অস্ত্র ফেলে দিল। এরপর খালিদ ﷺ তাদেরকে বন্দী

৬৯৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮৯, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩২৭।

করে সাথিদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। ভোর রাতে খালিদ ﵁ সাথিদের ডেকে বললেন, 'যার কাছে কয়েদি আছে, সে যেন তরবারির মাধ্যমে তার কয়েদির ঝামেলা মিটিয়ে দেয়।' এ নির্দেশ শুনে বনু সুলাইমের সৈনিকরা তাদের কয়েদিদের হত্যা করে। কিন্তু মুহাজির ও আনসারগণ তা থেকে নিবৃত্ত থাকেন। রাসুল ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, খালিদ যা করেছে, তা থেকে আমি আপনার কাছে দায়মুক্তির ঘোষণা দিচ্ছি।'

এরপর রাসুল ﷺ আলি ﵁-কে প্রেরণ করে সম্পদের ক্ষতিপূরণ এবং নিহতের ফিদইয়া আদায় করেন।

চ. অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আব্দুর রহমান ﵁। এবং তিনি তায়িফ অবরোধেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি হুনাইনের যুদ্ধে বনু হাওয়াজিনের একজন নারীকে বন্দী করেছিলেন।[৬৯৬] পরে যখন রাসুল ﷺ হাওয়াজিন গোত্রের বন্দীদের ফিরিয়ে দিতে বললেন, তখন আব্দুর রহমান ﵁ তাঁর বন্দীকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেন।[৬৯৭]

ছ. নবম হিজরির রজব মাসে সংঘটিত হয় তাবুক যুদ্ধ।[৬৯৮] রাসুল ﷺ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মাল দিয়েও সাহায্য করার উৎসাহ দেন। মুসলিমরা ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। সকলে মন-দিল উজাড় করে যুদ্ধের জন্য সম্পদ দান করেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাথে সাথে ২০০ উকিয়া দান করেন। যার মূল্য প্রায় চার হাজার দিরহামের সমান।[৬৯৯]

তাবুক যাওয়ার পথে রাসুল ﷺ আব্দুর রহমান ﵁-এর পেছনে ফজরের এক রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন।[৭০০]

মুগিরা বিন শুবা ﵁ বলেন, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। শেষ রাতে তিনি আমার সওয়ারির ঘাড়ে আঘাত করলেন। আমি ধারণা করলাম,

---

৬৯৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৪৩।
৬৯৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৫২।
৬৯৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬৫।
৬৯৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২১০।
৭০০. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৪, আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া :৭/১৬৪।

হয়তো রাসুল ﷺ-এর হাজতের প্রয়োজন পড়েছে। তাই আমি তাঁর সঙ্গ দিলাম। আমরা সফরসঙ্গীদের থেকে একটু দূরে নির্জন স্থানে গেলাম। রাসুল ﷺ তাঁর সওয়ারি থেকে নেমে আরেকটু অগ্রসর হয়ে আমার থেকে আড়াল হলেন। আমি বেশ সময় ধরে অপেক্ষা করলাম। এরপর তিনি আসলেন। আমাকে বললেন, "মুগিরা, তোমার ইসতিনজার প্রয়োজন আছে?" বললাম, "না, আমার প্রয়োজন নেই।" বললেন, "তোমার কাছে কি পানি আছে?" বললাম, "জি।" আমি আমার অপর সওয়ারির সাথে বাঁধা হাওদার কাছে গেলাম। হাওদা এনে তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর হাতদুটো উত্তমরূপে ধৌত করলেন। তিনি তাঁর হাত মাটিতে ঘষে ধৌত করলেন কি না সঠিক বলতে পারছি না। এরপর চেহারা ধৌত করলেন। তিনি জামার হাতা থেকে হাত বের করতে গেলেন; কিন্তু জামার হাতা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে ভেতর দিয়ে হাত বের করলেন। তারপর হাত ধৌত করলেন। এরপর কপালের অগ্রভাগ এবং পাগড়ির ওপর মাসেহ করলেন। এবং মোজার ওপর মাসেহ করলেন। এরপর আমরা সওয়ারিতে করে আমাদের লোকদের কাছে ফিরে এলাম। তারা ততক্ষণে আব্দুর রহমান বিন আওফ ؓ-এর ইমামতিতে সালাত শুরু করে দিয়েছে এবং এক রাকআত পড়ে ফেলেছে। আমি তাকে রাসুল ﷺ-এর কথা বলতে যাব, অমনি রাসুল ﷺ আমাকে নিষেধ করলেন। আমরা তাঁর পেছনে বাকি এক রাকআত আদায় করলাম এবং বাকি এক রাকআত নিয়ম অনুসারে শেষ করলাম।'

এ ঘটনা তাবুকে ঘটেছিল। মুগিরা ؓ রাসুল ﷺ-এর অজুর পানি বহন করতেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ ؓ-এর পেছনে সালাত আদায় করার পর রাসুল ﷺ বললেন, 'কোনো নবিই মৃত্যুবরণ করেনি, যতক্ষণ না তাঁর উম্মতের একজন সৎ ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করেছেন।'[৭০১]

৭০১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৮-১২৯, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/১০১২।

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁ আল্লাহর রাস্তায় অধিক পরিমাণে দান-সদাকা করতেন।[৭০২] রাসুল ﷺ-এর সময়ে তিনি একবার চার হাজার দিরহাম মূল্যের পরিমাণ সম্পদ দান করেছেন। একবার ৪০ হাজার দিরহাম দান করেন। আরেকবার ৪০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। তারপর জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে ৫০০ ঘোড়া দান করেন। আরেকবার ৫০০ উট দান করেন। তাঁর এ সকল সম্পদ ব্যবসা থেকে আসত, ব্যবসা থেকে তাঁর প্রচুর পরিমাণে লাভ হতো।[৭০৩]

যখন তিনি চার হাজার দিরহাম রাসুল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন, তখন বললেন, 'আমার কাছে মোট আট হাজার দিরহাম আছে, চার হাজার পরিবার-পরিজনের জন্য রেখে দিয়েছি আর চার হাজার আমার মহান রবকে ঋণ দিলাম।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি যা নিজের জন্য রেখে দিয়েছ, আল্লাহ তার মাঝেও বরকত দান করুন এবং যা আল্লাহকে দিয়েছ, তাতেও বরকত দান করুন।'[৭০৪] এরপর উসমান ﵁ ও আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁-এর শানে এ আয়াতখানা নাজিল হয়,

> الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর দানের কথা বলে বেড়ায় না এবং কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে প্রতিদান। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।'[৭০৫]

এটা হলো আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁-এর সম্পদ দ্বারা জিহাদের প্রকাশ্য পরিমাণ। যেটা রাসুল ﷺ-এর যুগে সবার জানা ছিল। নিঃসন্দেহে এটা পরিমাণ

---

৭০২. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৪, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০১।

৭০৩. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৬, আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০১।

৭০৪. আর রিয়াদুন রাদরাহ : ২/৩৭৯।

৭০৫. সুরা আল-বাকারা, ২: ২৬২।

হিসেবে অনেক বড় পরিমাণ। বিশেষত ওই যুগে। তাঁর এ প্রকাশ্য সম্পদের জিহাদের সাথে অপ্রকাশ্য সম্পদের জিহাদ অবশ্যই থাকবে। যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ জানমাল দুটো দিয়েই তাঁর জিহাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

উম্মাহর বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা

দুই শাইখের সাথে

নবিজি ﷺ মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার পর আব্দুর রহমান ﷺ রাসুল ﷺ-এর দুই খলিফা আবু বকর ও উমর ﷺ-এর একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁদের কাছে উম্মাহর একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

যখন আবু বকর ﷺ-এর মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এল, আব্দুর রহমান ﷺ-কে ডেকে বললেন, 'আমাকে উমরের সম্পর্কে কিছু বলো।' তিনি বললেন, 'তিনি আমার দেখা সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। অবশ্য তাঁর মাঝে কঠোরতা আছে।' আবু বকর ﷺ বললেন, 'আমাকে তিনি নম্র দেখে এমন কঠোরতা করেছেন। কাঁধে দায়িত্ব চলে আসলে কঠোরতা ছেড়ে দেবেন। ইতিপূর্বে তাঁকে আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। আমি কোনো লোকের প্রতি কঠোরতা করলে সে লোকের প্রতি তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করতেন। আবার কারও প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করলে তার প্রতি আমাকে তিনি কঠোর করে তুলতেন।'

এরপর তিনি উসমান ﷺ-কে ডাকলেন। তাঁকে বললেন, 'আমাকে উমর সম্পর্কে কিছু বলুন।' উসমান ﷺ বললেন, 'তাঁর প্রকাশ্য অবস্থা থেকে অপ্রকাশ্য অবস্থা অনেক উত্তম। আমাদের মাঝে তাঁর মতো কেউ নেই।' আবু বকর ﷺ বললেন, 'আপনাদের দুজনকে যা বললাম, তা অন্যের কাছে বলাবলি করবেন না। উমরের কথা বাদ দিলে আমি উসমান ﷺ-কে পাশ কাটিয়ে যেতাম না। তোমাদের কোনো বিষয়ে দায়িত্ব না নেওয়াই তাঁর জন্য কল্যাণকর হতো। আর

আমার একান্ত প্রত্যাশা যে, তোমাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করি এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সঙ্গে মিলিত হই।'[৭০৬]

খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করার মতো এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আব্দুর রহমান ﷺ-এর সাথে আবু বকর ﷺ-এর পরামর্শ করা সত্যিই তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থারই প্রমাণ বহন করে।

উমর ﷺ-এর খিলাফতকালে আব্দুর রহমান ﷺ উমর ﷺ-এর সাথে হজ করতে যান। মিনা প্রান্তরে তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'উমর ইনতিকাল করলে আমি অমুক ব্যক্তিকে খিলাফতের বাইআত দেবো।' এটা শুনে উমর ﷺ বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় অবশ্যই আমি মানুষের মাঝে ভাষণ দেবো। লোকদের সতর্ক করব, এই লোকগুলো মানুষের খিলাফতের অধিকার হরণ করতে চাচ্ছে।' তখন আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, সময়টা হচ্ছে হজের। এ সময় গ্রাম্য ও সাধারণ লোকের সমাগমই বেশি। আপনার মজলিশে তাদের উপস্থিতিই বেশি হবে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনি এমন কোনো কথা বলবেন, সেটা তারা যথাযথ বুঝতে না পেরে ব্যাপারটি ওলটপালট করে দেবে। তাই একটু ধৈর্য ধরুন। মদিনায় গিয়ে রাসুল ﷺ-এর বিশেষ সাহাবিদের ডেকে যা বলার তাঁদের কাছে বলুন। তাঁরা সেটা যথাযথ বুঝে সংরক্ষণ করতে পারবেন।' উমর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, মদিনায় গিয়ে আমি সর্বপ্রথম এই মজলিশের আয়োজন করব।' এভাবেই উমর ﷺ আব্দুর রহমান ﷺ-এর মতামতকে মেনে নিয়েছিলেন।

একবার ইরাকে ফরাসিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশাল যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। মুসান্না বিন হারিসা ﷺ এ সংবাদ দিয়ে উমর ﷺ-এর কাছে বার্তা পাঠালেন। তখন উমর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি অনারব শাসকদের অবশ্যই শায়েস্তা করব।' এরপর তিনি নেতা, বক্তা, কবি, বুদ্ধিমান ও যেকোনো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকদের একত্রিত করতে লাগলেন। তাদেরকে মানুষের কাছে পাঠালেন।

সকলে তাঁর কাছে জমায়েত হলে তিনি সকলকে নিয়ে মদিনা থেকে বের হলেন এবং সিরার নামক স্থানে এসে সৈন্য বিন্যস্ত করলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর

---

৭০৬. ইবনুল আসির : ২/৪২৫।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি কি সামনে অগ্রসর হবেন, না সেখানেই অবস্থান করবেন। লোকেরা তাঁকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে উসমান ﷺ ও আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁরা কিছু বলতে না পারলে আব্বাস ﷺ-কে ধরতেন।

যাহোক, উসমান ﷺ উমর ﷺ-কে তাঁর এ আয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন উমর ﷺ লোকদের একত্রিত করে আসল খবর বলে দিলেন। তিনি তাদের কাছে ইরাকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মতামত চাইলেন। তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠল, 'চলুন, চলুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি।' উমর ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে, আপনারা প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমিও আপনাদের সাথে যাব। তবে যদি এর চেয়ে উত্তম কোনো মতামত আসে, তখন ভিন্ন কথা।' এরপর তিনি রাসুল ﷺ-এর বড় বড় সাহাবিদের একত্রিত করলেন। আলি ﷺ-এর কাছে বার্তা পাঠালেন, তখন তিনি মদিনায় উমর ﷺ-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। তালহা ﷺ-এর কাছে খবর পাঠালেন, তিনি তখন সম্মুখ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি ফিরে এলেন। এরপর জুবাইর ﷺ ও আব্দুর রহমান ﷺ-এর নিকট খবর পাঠালেন। তাঁরা ডান ও বাম পার্শ্বের বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরাও উপস্থিত হলেন। এরপর উমর ﷺ তাঁদের সাথে পরামর্শসভায় বসলেন। তাঁরা সকলে একমত হলেন যে, এ বাহিনী রাসুল ﷺ-এর কোনো সাহাবির নেতৃত্বে প্রেরণ করা হোক। তাঁর হাতে যদি বিজয় আসে তো আসলো, অন্যথায় তাঁর পরিবর্তে আরেক জনকে পাঠানো হবে। এভাবেই শত্রুর পতন ঘটবে।

উমর ﷺ লোকদের আবারও একত্রিত করে বললেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল আপনাদের সাথে যাওয়ার; কিন্তু আপনাদের অভিমতদাতাগণ আমাকে ফিরিয়ে রাখলেন। আমারও মত হচ্ছে, আমি মদিনায় অবস্থান করে আমার পরিবর্তে আরেক জনকে প্রেরণ করি। তাই আপনারা কোনো একজনের কথা বলুন।'

লোকেরা এ ব্যাপারে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ-এর নাম বলল। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাদিসিয়ার চূড়ান্ত লড়াইয়ে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সাহাবি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ।[৭০৭]

---

৭০৭. ইবনুল আসির : ২/৪৫০-৪৫১।

১৫ হিজরিতে উমর ﷺ যখন সৈন্যদের নাম নথিভুক্তকরণ ও ভাতা নির্ধারণের ইচ্ছা করলেন, তখন আলি ﷺ ও আব্দুর রহমান ﷺ তাঁকে বললেন, 'ভাতার বিষয়টি আগে আপনাকে দিয়ে শুরু করুন।' তিনি বললেন, 'না; বরং আমি রাসুল ﷺ-এর চাচা আব্বাস ﷺ-কে দিয়ে শুরু করব।' এরপর যাঁরা রাসুল ﷺ-এর যত কাছের হবে, সে সিরিয়াল ঠিক রাখব।' ফলে তিনি প্রথমে আব্বাস ﷺ-এর ভাতা নির্ধারণ করলেন। এরপর বদরি সাহাবিদের জন্য পাঁচ হাজার করে নির্ধারণ করলেন। তারপর বদরের পর থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত সাহাবিদের জন্য চার হাজার করে। হুদাইবিয়ার পর থেকে আবু বকর ﷺ-এর সাথে ইরতিদাদের ফিতনা নির্মূলকারীদের জন্য তিন হাজার করে। এ স্তরের মধ্যে মক্কা-বিজয় এবং আবু বকর ﷺ-এর সাথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী এবং কাদিসিয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা শরিক ছিলেন, তাঁরা এ স্তরে গণ্য হলেন। এদের প্রত্যেকের জন্য তিন হাজার করে নির্ধারণ করা হলো। এরপর দুই হাজার করে নির্ধারণ করা হলো, কাদিসিয়ায় অংশগ্রহণকারী এবং শামের মুজাহিদদের জন্য। তাঁদের মধ্যে গোলযোগপূর্ণ এলাকার মুজাহিদদের জন্য আড়াই হাজার করে নির্ধারণ করা হলো।[৭০৮]

১৮ হিজরিতে উমর ﷺ শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি যখন সারগ[৭০৯] এলাকায় পৌঁছলেন, তখন নেতৃস্থানীয় আমির-উমারাগণ দেখা করতে আসলেন। তাঁদের মাঝে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﷺ ছিলেন। তাঁরা তাঁকে শামের মহামারির সংবাদ দিলেন। উমর ﷺ জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিল মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ। তিনি মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের ডেকে এ বিষয়ে তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা বিরোধপূর্ণ মতামত দান করলেন। কেউ বললেন, 'আপনি তো আল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন; তাই আপনার পথে বাধা হতে পারবে না।' আবার কেউ বললেন, 'এটা এক মহামারি। এর থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।' তিনি তাঁদের বিদায় দিয়ে মক্কা-বিজয়ে অংশগ্রহণকারী কুরাইশ মুহাজিরদের ডাকলেন। তাঁরা সকলে ফিরে যাওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন। তখন উমর ﷺ লোকদের

---

৭০৮. ইবনুল আসির : ২/৫০২-৫০৩।

৭০৯. শামের শেষ এবং হিজাজের শুরু অর্থাৎ মুগিসা ও তাবুকের মাঝামাঝি এলাকার নাম সারগ। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৫/৭০-৭১।

মাঝে ঘোষণা দিলেন, 'আমি আগামীকাল সকালে মদিনায় ফিরে যাচ্ছি।' এটা শুনে আবু উবাইদা ﷺ বললেন, 'আপনি কি আল্লাহর ভাগ্যলিপি থেকে পলায়ন করছেন?' উমর ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আল্লাহর এক ভাগ্যলিপি থেকে পলায়ন করে আরেক ভাগ্যলিপির দিকে যাচ্ছি। আচ্ছা বলুন তো, আপনার যদি একটি উট থাকে। আপনি সেটাকে নিয়ে দুটি চারণভূমিবিশিষ্ট এক উপত্যকায় অবতরণ করলেন। যার একটি সবুজ-শ্যামল আরেকটি শুষ্ক মরুভূমি। তবে আপনি সবুজ-শ্যামল চারণভূমিতে উটটি চরালে কি আল্লাহর ভাগ্যলিপি অনুসারে চরাবেন না? আবার ঘাসমুক্ত শুষ্ক উপত্যকায় চরালে কি আল্লাহর ভাগ্যলিপি অনুসারে চরাবেন না?' তাঁদের এ আলোচনা শুনে আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বললেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهَذَا الْوَبَاءِ بِبَلَدٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهِ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

'যখন তোমরা কোনো শহরে এই মহামারি সম্পর্কে শুনতে পাবে, তখন সে শহরে প্রবেশ করবে না। আর যদি এমন কোনো শহরে সে মহামারি দেখা দেয়, যেখানে তোমরা অবস্থানরত থাকো, তবে তার থেকে পলায়ন করে সেখান থেকে বের হয়ো না।'[৭১০]

হাদিসটি সহিহ বুখারি ও মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে।[৭১১] এরপর উমর ﷺ তাঁর সাথিদের নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন।[৭১২]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসুল ﷺ মদপানের শাস্তি হিসেবে জুতা ও খেজুর গাছের ডাল দিয়ে বেত্রাঘাত করতেন। আবু বকর ﷺ ৪০টি বেত্রাঘাত করতেন। যখন উমর ﷺ খিলাফতের দায়িত্ব নিলেন, তখন বললেন, "লোকেরা তো পল্লী এলাকার নিকটবর্তী হয়ে গেছে। তোমরা মদপানের শাস্তির বিষয়ে কী বলো?" তখন আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, "আমাদের মতে শরিয়তের সর্বনিম্ন

৭১০. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ২৭০।

৭১১. সহিহুল বুখারি : ৫৭২৯, সহিহু মুসলিম : ২২১৯।

৭১২. ইবনুল আসির : ২/৫৫৯-৫৬০, আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭, আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮২।

শাস্তি মদপানের শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ হবে।" ফলে উমর ﷺ মদপানের শাস্তি হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাত করেন।'[৭১৩]

আব্দুর রহমান ﷺ-এর মত গ্রহণ করে উমর ﷺ মাজুসিদের থেকে জিজিয়া নেওয়া বন্ধ করে দেন।[৭১৪] ১৩ হিজরিতে অর্থাৎ যে বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব নেন, সে বছর আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-কে হজ-কাফেলার আমির নির্ধারণ করেছিলেন।[৭১৫]

১৬ হিজরিতে বিভিন্ন বিজয়াভিযান থেকে যখন গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ আসলো, তখন উমর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, এসব বণ্টন করার আগে কোনো ছাদের নিচে রাখা হবে না।' যার কারণে আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ ও আব্দুল্লাহ বিন আরকাম ﷺ সারা রাত জেগে সেসবের পাহারাদারি করেন। পরদিন উমর ﷺ মানুষের মাঝে উপস্থিত হলে গনিমতের সম্পদ খোলা হলো। উমর ﷺ যখন গনিমতের সোনা-রুপা, মণিমুক্তা ও হিরা-জহরত দেখলেন, তখন তিনি কেঁদে দিলেন। এটা দেখে আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কাঁদছেন কেন? এটা শুকরিয়া আদায়ের সময়।' উমর ﷺ বললেন, 'আমি এ কারণে কাঁদছি না। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাআলা যে সম্প্রদায়কেই এসব দিয়েছেন, তারাই পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে মেতে উঠেছে। আর যারাই পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের মাঝেই আল্লাহ নৈরাশ্য ঢেলে দিয়েছেন।'[৭১৬]

এক রাতে উমর ﷺ আব্দুর রহমান ﷺ-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁকে দেখে আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, 'এই সময়ে আপনার আগমন?' উমর ﷺ বললেন, 'বাজার এলাকায় এক যাত্রীদল এসে নেমেছে। তাদের ওপর আমার চোরের ভয় হচ্ছে। চলুন, আমরা গিয়ে তাদের পাহারাদারি করি।' তাঁরা উভয়ে বাজারে এসে একটি উঁচু জায়গায় বসে গল্প করে সারা রাত পাহারা দিলেন।[৭১৭]

---

৭১৩. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮২, হাদিসটি সহিহুল বুখারি ও মুসলিমে আছে।
৭১৪. আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭।
৭১৫. আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭, তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/১।
৭১৬. ইবনুল আসির : ২/৫২২।
৭১৭. ইবনুল আসির : ৩/৫৭।

অবশেষে একদিন ফজরের সালাতে উমর ﷺ যখন আততায়ী দ্বারা আক্রান্ত হলেন, তখন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর হাত ধরে তাঁকে সামনে এগিয়ে দিলেন। তিনি অতি সংক্ষেপে সালাত শেষ করলেন।[৭১৮]

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ উভয় শাইখের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আস্থার মানুষ ছিলেন। অনুরূপ তিনি নবিজি ﷺ এবং সকল মুসলিমের আস্থার জায়গা ছিলেন।

শুরা পরিষদের সাথে

২৩ হিজরির জিলহজ মাসের তিন বা চার দিন বাকি থাকতে আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ শাহাদাত বরণ করেন।[৭১৯] উমর ﷺ যখন জখমের ব্যথা অনুভব করলেন, তখন আব্দুর রহমান ﷺ-এর হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন। তিনি অতি সংক্ষেপে সালাত শেষ করলেন। উমর ﷺ-কে ধরাধরি করে বাড়িতে নেওয়া হলো। উমর ﷺ আব্দুর রহমান ﷺ-কে ডেকে বললেন, 'আমি আপনাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে চাচ্ছি।' আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, 'মানে, আপনি আমাকে সে বিষয়ে উপদেশ দিতে চাচ্ছেন, তাই না?' উমর ﷺ বললেন, 'না, এমনটা না।' আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, 'আমি তাতে কখনো প্রবেশ করব না।' উমর ﷺ বললেন, 'তাহলে আপনি আমাকে চুপ থাকার প্রতিশ্রুতি দিন; যাতে আমি সেসব সাহাবিকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, যাঁদের প্রতি রাসুল ﷺ সন্তুষ্ট থেকে ইনতিকাল করেছেন।' এরপর তিনি আলি, উসমান, জুবাইর ও সাদ ﷺ-কে ডেকে বললেন, 'তোমাদের ভাই তালহার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো। যদি তিনি আসেন, তবে তো হলো; অন্যথায় তোমাদের বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলবে।'[৭২০] এরপর বললেন, 'যদি সাদের ওপর দায়িত্ব আসে, তাহলে তো কথা শেষ। আর যদি অন্য কেউ খলিফা হয়, তবে তাঁর দ্বারা যেন সাহায্য নেয়। কারণ আমি তাঁকে অক্ষমতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করিনি।' আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ-কেও তাঁদের পরামর্শসভায় রাখলেন—তবে খিলাফতের কোনো অংশ তাঁর জন্য ছিল না।[৭২১]

---

৭১৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৩৩৭।

৭১৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৩৮, আল-ইবার : ১/২৭।

৭২০. ইবনুল আসির : ৩/৫০।

৭২১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৩৩৯।

আর এভাবেই আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁ ছিলেন শুরার ছয় সদস্যের একজন।[৭২২]

উমর ﵁-কে কবরে দাফন করা হলো। দাফনের সময় আব্দুর রহমান ﵁-ও কবরে নেমেছিলেন।[৭২৩] দাফনকার্য শেষে মিকদাদ বিন আসওয়াদ ﵁ শুরার ছয় সদস্যদের একত্রিত করলেন। আর আবু তালহা আল-আনসারি ﵁-কে তাঁদের নির্জনতাকে নিশ্চিত করতে বললেন।

আব্দুর রহমান ﵁ তাঁর সাথিদের বললেন, 'আমাদের মধ্যে কে এ দায়িত্ব থেকে নিজেকে বের করে নেবে এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করবে?' কেউ উত্তর দিলেন না। তখন তিনি বললেন, 'আমি এ দায়িত্ব থেকে বের হয়ে গেলাম।' উসমান ﵁ বললেন, 'এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির জন্য সর্বপ্রথম আমি প্রস্তুত হলাম।' তখন সকলে বলে উঠল, 'আমরাও রাজি হয়ে গেলাম।' শুধু আলি ﵁ চুপ থাকলেন। আব্দুর রহমান ﵁ বললেন, 'আবুল হাসান, আপনি কী বলেন?' আলি ﵁ বললেন, 'আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন, সত্যকে প্রাধান্য দেবেন। নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না এবং কোনো আত্মীয়কে বিশেষ নজরে দেখবেন না এবং উম্মাহর কল্যাণে কোনো প্রকার ত্রুটি করবেন না।' তখন আব্দুর রহমান ﵁ বললেন, 'তোমরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও, যে এর ব্যত্যয় ঘটাবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা আমার সঙ্গ দেবে। তোমাদের জন্য আমি যাকে মনোনীত করব, তোমরা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আর আমি আল্লাহকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আত্মীয়তার কারণে কোনো আত্মীয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবো না এবং মুসলিমদের কল্যাণ সাধনে কোনো প্রকার ত্রুটি করব না।' এরপর তিনি তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাঁরাও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।[৭২৪]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুর রহমান ﵁ শুরা সদস্যদের বললেন, 'আপনারা কি চান, আমি অনুসন্ধান করে দেখে আপনাদের একজন মনোনীত

---

৭২২. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৩, আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৯৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৩, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০০, আল-ইসতিআব : ২/৪৮৫।
৭২৩. ইবনুল আসির : ৩/৫২।
৭২৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইবনুল আসির : ৩/৬৫-৬৯।

করি?' তখন আলি ﷺ বললেন, 'জি, হ্যাঁ। আপনি আসমানবাসীর কাছেও বিশ্বস্ত এবং জমিনবাসীর কাছেও বিশ্বস্ত।'[৭২৫] যেমনটা রাসুল ﷺ-ও বলেছেন।[৭২৬]

সে হিসেবে তিনি আলি ﷺ-এর মাধ্যমে অনুসন্ধান করা শুরু করে দিলেন। তাঁকে বললেন, 'আত্মীয়তার সূত্রে রাসুল ﷺ-এর সাথে আপনার যে ঘনিষ্ঠতা, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা এবং ইসলামে আপনার যে বড় বড় অবদান, সে হিসেবে হয়তো আপনি বলবেন, উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি খিলাফতের বেশি হকদার, এটা অবাস্তবও নয়। কিন্তু, আপনার অনুপস্থিতির কারণে যদি অন্য কাউকে দেওয়া হতো, তাহলে আপনি এদের মধ্যে কাকে বেশি হকদার মনে করেন?' তিনি বললেন, 'উসমান।'

এভাবে তিনি উসমান ﷺ-এর সাথেও একান্তে মিলিত হলেন। তাঁকে বললেন, 'আপনি হয়তো বলবেন, আমি বনু আবদে মানাফের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, রাসুল ﷺ-এর জামাতা এবং তাঁর চাচাতো ভাই। আপনার আছে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা এবং দান-দক্ষিণার কথা। তো আমাকে বাদে এ দায়িত্ব কার জিম্মায় যাবে? কিন্তু আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন, তাহলে এদের মধ্যে কাকে বেশি হকদার মনে করেন?' তিনি বললেন, 'আলি।'

আব্দুর রহমান ﷺ রাতে ঘুরে ঘুরে রাসুল ﷺ-এর সাহাবিদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে দেখা করে তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। অবশেষে উমর ﷺ খলিফা নির্বাচনের জন্য তিন দিনের যে সময়-সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন, যখন সে সময় পূর্ণ হয়ে সকাল হলো, তিনি তখন উসমান, জুবাইর ও সাদ ﷺ-কে ডাকলেন। প্রথমে জুবাইর ﷺ-কে বললেন, 'বনু আবদে মানাফ ও খিলাফতের মাঝ থেকে আপনি সরে যান।' জুবাইর ﷺ বললেন, 'আমার অধিকার আলি ﷺ-কে দিলাম।' অতঃপর সাদ ﷺ-কে বললেন, 'তোমার অধিকারটা আমাকে দিয়ে দাও।' সাদ ﷺ বললেন, 'যদি তা নিজের জন্য নেন, তবে তাহলে ঠিক আছে। আর যদি উসমানকে মনোনীত করেন, তবে আমার কাছে আলি বেশি প্রিয়। আপনি নিজের জন্য বাইআত নিয়ে নিন। এর থেকে আমাদের স্বস্তি দিন। আমাদের মাথার বোঝা হালকা

---

৭২৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৪, আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭।
৭২৬. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৫, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০১।

করুন।' তিনি সাদকে বললেন, 'আমি তো নিজেকে মনোনীত করার কাজে নিয়োজিত করেছি। যদি তা না করতাম, তাহলে ফিরিয়ে দিতাম না।'

তিনি আলি ﷺ-কে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে একাকী কথা বললেন। এরপর উসমান ﷺ-কে ডাকলেন। এবং উভয়ের সাথে আবার কথা বললেন। ফজরের সালাতের পর শুরার সদস্যদের একত্রিত করলেন। আনসার ও মুহাজিরদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকেও উপস্থিত থাকতে বললেন। তাঁদের উপস্থিতিতে মসজিদ ভরে উঠল। এরপর বললেন, 'প্রিয় উপস্থিতি, সকলের মতামত হচ্ছে, "প্রত্যেক ব্যক্তি তার পছন্দের ব্যক্তির পক্ষে মত ব্যক্ত করবে।" অতএব আপনারা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করুন।'

তখন একদল আলি ﷺ-কে মনোনীত করল, আরেক দল উসমান ﷺ-কে মনোনীত করল। প্রত্যেক দলই তার পছন্দের ব্যক্তিকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। তখন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ বললেন, 'হে আব্দুর রহমান, মানুষ ফিতনায় পড়ার আগেই ফায়সালা চূড়ান্ত করে ফেলো।' আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, 'আমি ব্যাপারটি খতিয়ে দেখেছি, আবার বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শও করেছি। সুতরাং হে আমিরুল মুমিনিনের মনোনীত ব্যক্তিবর্গ, আপনারা নিজেদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগের সুযোগ রাখবেন না।'

আলি ﷺ-কে ডেকে বললেন, 'আপনার কাছে আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি হলো, আপনি কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসুল ও পরবর্তী খলিফাদ্বয়ের আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।' আলি ﷺ বললেন, 'আমি আমার সর্বোচ্চ জ্ঞান ও সামর্থ্য দিয়ে আমল করার আশা রাখি।'

উসমান ﷺ-কে ডেকে একই কথা বললেন। উসমান ﷺ বললেন, 'অবশ্যই আমি সে অনুসারেই আমল করব।' এবার আব্দুর রহমান ﷺ উসমান ﷺ-এর হাতে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি শুনে রাখুন। আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ, আমার কাঁধে যে জিম্মাদারি ছিল, তা আমি উসমানের কাঁধে অর্পণ করলাম।' এ বলে তিনি উসসমান ﷺ-এর হাতে বাইআত দিলেন। এরপর সকলে উসমান ﷺ-এর হাতে বাইআত দিল।[৭২৭]

---

৭২৭. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইবনুল আসির : ৩/৬৯-৭৫।

আব্দুর রহমান ﷺ খিলাফত ও রাষ্ট্রের উচ্চপদের নির্মোহতা এবং স্বীয় আমানতদারিতা, অবিচলতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে অবশ্যই এই বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু মানুষ এ ব্যাপারে মতানৈক্য করে, আব্দুর রহমান ﷺ সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক করেছিলেন নাকি ভুল করেছিলেন। অথচ এ বিষয়ে কেউই মতভেদ করে না যে, তিনি অনন্য দক্ষতার সাথে শুরা টিমকে পরিচালনা করেছিলেন। যা বাস্তবিকই বিরাট প্রশংসার দাবি রাখে।

উসমান ﷺ-এর সঙ্গে

২৯ হিজরি সনে উসমান ﷺ হজ করেন। হজে গিয়ে সর্বপ্রথম তিনি মিনায় তাঁবু গাড়েন। মিনায় এবং আরাফায় তিনি কসরের পরিবর্তে পূর্ণ সালাত আদায় করেন। ফলে উসমান ﷺ-এর ব্যাপারে মানুষ সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কথা বলে। বিষয়টিকে অনেক সাহাবি দোষ হিসেবে দেখেন। আলি ﷺ তাঁকে বললেন, 'নতুন কোনো ঘটনাও ঘটল না, আবার পূর্বেও এমনটা হয়নি। অথচ আপনি নবিজি ﷺ-এর যুগ পেয়েছেন। পেয়েছেন আবু বকর ও উমর ﷺ-এর যুগ। তাঁরা দুই রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন। খিলাফতের শুরুতে আপনিও দুই রাকআত পড়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কোন মত গ্রহণ করলেন?' তখন উসমান ﷺ বললেন, 'এটা একান্ত আমার ব্যক্তিগত মত।'

এ সংবাদ আব্দুর রহমান ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তিনিও সে হজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসে উসমান ﷺ-কে বললেন, 'এ স্থানে কি রাসুল ﷺ এবং আবু বকর ও উমর ﷺ-এর সঙ্গে দুই রাকআত সালাত পড়েননি? শুরুর দিকে আপনি নিজেও তো দুই রাকআত করে পড়েছেন।' উসমান ﷺ বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু আমি জানতে পারলাম, ইয়েমেন থেকে আসা কিছু হজ পালনকারী এবং সাধারণ মানুষ বলেছে যে, মুকিমের জন্য দুই রাকআত সালাত। তারা আমার সালাত দিয়ে প্রমাণ দিয়েছে—যেহেতু মক্কায় আমার পরিবার আছে, আবার তায়িফেও আমার সম্পদ আছে।' তখন আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, 'এ ব্যাপারে কী ওজর থাকতে পারে? আর আপনি যে বলছেন, "মক্কায় আপনার পরিবার আছে", তবে মদিনাতেও তো আপনার পরিবার আছে। যখন ইচ্ছা

তখন আপনি তাকে নিয়ে বের হন। আপনি কেবল আপনার বাড়িতেই অবস্থান করেন। আর তায়িফে আপনার যে সম্পদের কথা বলছেন, সে সম্পদ আর আপনার মাঝে তিন দিনের দূরত্ব বিদ্যমান। আর ইয়েমেনের হজকারী ও অন্যদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলব, যখন রাসুল ﷺ-এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হচ্ছিল, তখন ইসলামের বিধিবিধান কম ছিল। এরপর আবু বকর ও উমর ؓ দুই রাকআত করে পড়েছেন। আর এখন ইসলাম স্থিতি লাভ করেছে।' তখন উসমান ؓ বলেন, 'এটা আমার একক মত।'

আব্দুর রহমান ؓ সেখান থেকে বের হয়ে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ-এর কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন, 'হে আবু মুহাম্মাদ, আপনি যা জানতেন, তা পরিবর্তন করা হয়েছে।' ইবনে মাসউদ ؓ বললেন, 'তবে আমি কী করব?' আব্দুর রহমান বললেন, 'আপনার ইলম ও মত অনুযায়ী আমল করুন।' ইবনে মাসউদ ؓ বললেন, 'মতানৈক্য মন্দ জিনিস। আর আমি আমার সাথিদের নিয়ে চার রাকআত আদায় করেছি।' আব্দুর রহমান ؓ বললেন, 'আমি আমার সাথিদের নিয়ে দুই রাকআত পড়েছি। অবশ্য এখন চার রাকআত পড়ব।'

আব্দুর রহমান ؓ উসমান ؓ-কে যথেষ্ট উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু যখন উসমান ؓ স্বীয় মতের ওপর অটল থেকেছেন, তখন তিনি ফিতনার আশঙ্কায় তাঁর মত গ্রহণ করেছেন। কারণ সাহাবায়ে কিরাম ফিতনা পছন্দ করতেন না।

আব্দুর রহমান ؓ উসমান ؓ-এর সম্বন্ধেও ভাই ছিলেন। তিনি উসমান ؓ-এর বৈপিত্রেয় বোন উম্মে কুলসুম ؓ-কে বিয়ে করেছিলেন।[৭২৮] একবার আব্দুর রহমান ؓ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল, উসমান ؓ কিছু সদাকার উট বনু হাকামের কিছু লোককে দান করেছেন। আব্দুর রহমান ؓ উটগুলো নিয়ে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন। অথচ উসমান ؓ তখন বাসগৃহেই অবস্থান করছিলেন।[৭২৯]

উরওয়া বিন জুবাইর ؓ থেকে বর্ণিত, একবার জুবাইর ؓ উসমান ؓ-এর কাছে এসে বললেন, 'আব্দুর রহমান দাবি করছে, রাসুল ﷺ এবং উমর ؓ

৭২৮. ইবনুল আসির : ৩/৭২।
৭২৯. ইবনুল আসির : ৩/১৬৭।

তাঁকে অমুক অমুক জমির মালিকানা দিয়েছে।' উসমান ﷺ বললেন, 'আব্দুর রহমান বিন আওফ নিজেই তাঁর পক্ষে এবং বিপক্ষে সাক্ষী।' হাদিসটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ বর্ণনা করেছেন।[৭৩০]

এ পদ্ধতিতে উসমান ﷺ আব্দুর রহমান ﷺ-এর শুদ্ধতা ও সূচিতার বিবরণ দেওয়া সত্যিই তাঁর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও সীমাহীন আস্থারই প্রমাণ বহন করে।

ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন

১. তাঁর জীবনকাল

আব্দুর রহমান ﷺ হস্তীবাহিনী ঘটনার ১০ বছর পরে, অর্থাৎ ৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৩২ হিজরিতে, অর্থাৎ ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা মুনাওয়ারায় ইনতিকাল করেন।[৭৩১] চন্দ্রবর্ষ হিসেবে তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।[৭৩২] অপর এক বর্ণনামতে চন্দ্রমাস হিসেবে তাঁর বয়স তখন ৭২ বছর।[৭৩৩]

অপর এক বর্ণনামতে তিনি ৩১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। আবার বলা হয়, ৩২ হিজরিতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চন্দ্রবর্ষ হিসেবে ৭৫ বছর।[৭৩৪]

আরেক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি হিজরি ৩২ অথবা ৩১ সনে ইনতিকাল করেন। এবং চন্দ্রবর্ষ হিসেবে ৭২ বছর জীবন লাভ করেন।[৭৩৫]

তিনি হস্তীবাহিনী ঘটনার ১০ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন—এতে কোনো দ্বিমত নেই। আর অধিকাংশের মতে ৭২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।[৭৩৬] এর

---

৭৩০. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮২।
৭৩১. তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/১৪৩, আল-ইবার : ১/৩৩, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৫।
৭৩২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৫।
৭৩৩. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০২।
৭৩৪. আল-ইসতিআব : ২/৮৫৫, উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৭।
৭৩৫. আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭।
৭৩৬. ইবনুল আসির : ৩/১৩৬, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ৬/৩৪৬।

অর্থ দাঁড়াল, তিনি সৌরবর্ষ হিসেবে (৫৮১-৬৫২) আয়ু লাভ করেছিলেন ৭১ বছর। এবং চন্দ্রবর্ষ হিসেবে প্রায় ৭৫ বছর।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﵁ কাঁধে জানাজার খাট বহন করে জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে শেষ বিদায় জানান।[৭৩৭] তখন তিনি বলেছিলেন, 'হায়, আমাদের মহৎ ব্যক্তিকে আজ বিদায় জানাতে হলো।'

যেদিন আব্দুর রহমান ﵁ মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন আলি ﵁-কে বলতে শোনা গেল, 'হে আওফের পুত্র, যাও যাও—জীবনের পঙ্কিলতা ডিঙিয়ে সব নির্মলতা অর্জন করেছ।'[৭৩৮]

২. অসিয়ত ও উত্তরাধিকার

আব্দুর রহমান ﵁ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্পত্তি থেকে ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, এক হাজার ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করার অসিয়ত করে যান। এই অসিয়তও করেন যে, বদরি সাহাবিদের প্রত্যেককে চার হাজার করে স্বর্ণমুদ্রা দেবে। সে সময়ে বদরি সাহাবির সংখ্যা ছিল ১০০ জন। তাঁদের মধ্যে উসমান ﵁-ও ছিলেন। মৃত্যুবরণের সময় তিনি বিশাল সম্পত্তি রেখে যান। তাঁর প্রায় সব সম্পত্তি ব্যবসা থেকে আসত। তিনি ওয়ারিসি সম্পত্তি হিসেবে রেখে যান এক হাজার উট, তিন হাজার বকরি ও ১০০ ঘোড়া। জুরফ[৭৩৯] এলাকায় বিশটি সেচ দানকারী উটের মাধ্যমে তিনি চাষাবাদ করতেন। প্রতি বছর সেখান থেকে তিনি তাঁর পরিবারের ভরণপোষণ করতেন।

তাঁর ওয়ারিসি সম্পত্তি থেকে তামারুজ বিনতে আসবাগ অষ্টমাংশের এক-চতুর্থাংশ (৩২ ভাগের এক ভাগ) পেয়েছিলেন। যার মোট পরিমাণ এক লাখ দিরহাম। তিনি তিন স্ত্রী রেখে মারা যান। ওয়ারিসসূত্রে প্রত্যেক স্ত্রী ভাগে ৮০ হাজার করে দিরহাম লাভ করেন।[৭৪০]

---

৭৩৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৫।
৭৩৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৬।
৭৩৯. মদিনা থেকে সিরিয়ার দিকে তিন মাইল দূরত্বে এলাকার নাম জুরফ। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/৮৭।
৭৪০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৬-১৩৭, উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৭।

তাঁর ওয়ারিসদের প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণ যদি এত বেশি হয়, তাহলে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত হবে!? বিশেষত সেই জমানায়। আবার তিনি দিনে-রাতে দুই হাতে দান-সদাকাও করেছিলেন। যার কথা আমরা ঐতিহাসিকদের সূত্রে বর্ণনা করব।

মোট কথা তিনি অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু জাকাত-সদাকা আদায়ে তিনি কোনো প্রকার কৃপণতা করতেন না।

৩. তাঁর দান-সদাকা

নবিযুগে জিহাদের পথে আমরা তাঁর প্রকাশ্য দানের পরিমাণ উল্লেখ করেছি। আর অপ্রকাশ্য দানের পরিমাণের কথা তো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

এবার আমরা জিহাদ ছাড়া তাঁর সাধারণ সদাকার কথা আলোচনা করব। তিনি একদিনে ৩০ জন দাস মুক্ত করেছেন।[৭৪১] ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর জীবনে ৩০ হাজার দাস মুক্ত করেছেন।[৭৪২] এ ব্যাপারে যত সংখ্যাই উল্লেখ করা হোক, প্রকৃতপক্ষে তাঁর দাসমুক্তির সংখ্যা আরও বেশি হবে।

আম্মাজান আয়িশা ﵂ বর্ণনা করেন। রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ أَمْرَكُنَّ لَمِمَّا يُهِمُّنِي بَعْدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ

'আমার পরে তোমাদের বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। তোমাদের ব্যাপারে কেবল ধৈর্যশীলরাই ধৈর্যধারণ করতে পারবে।'[৭৪৩]

এরপর আম্মাজান আয়িশা ﵂ আব্দুর রহমানের ছেলে আবু সালামাকে বলেন, 'আল্লাহ তোমার বাবাকে জান্নাতের সুমিষ্ট পানি পান করান।' তিনি রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণীদের নিকট তাঁর ব্যবসার মাল থেকে ৪০ হাজার দিরহাম পৌছিয়ে দিয়েছেন। হাদিসটি ইমাম তিরমিজি ﵀ বর্ণনা করে বলেন, 'হাদিসটি হাসান সহিহ।'[৭৪৪]

---

৭৪১. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৪, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০০।
৭৪২. আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৯৯।
৭৪৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৪৯, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৫৩৬০।
৭৪৪. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮৪।

তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, রাসুল ﷺ-এর অভাবের সময় তাঁর সমুদয় সম্পদ দিয়ে রাসুল ﷺ-কে সহায়তা করবেন। কিন্তু রাসুল ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন মেহমানদারি, অসহায়কে আহার দান এবং অভাবগ্রস্তদের দান-সদাকা করেন। এ ক্ষেত্রে যেন নিকটতম লোকের মাধ্যমে শুরু করেন। কারণ, এটা তাঁর সম্পদের পরিশুদ্ধি হিসেবে কাজ দেবে।[৭৪৫]

আম্মাজান উম্মে সালামা ﷺ বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-কে তাঁর সহধর্মিণীদের উদ্দেশে বলতে শুনেছি, "আমার পরে যে ব্যক্তি তোমাদের যত্নের সাথে দেখাশুনা করবে, সেই প্রকৃত সত্যবাদী এবং সৎকর্মশীল। হে আল্লাহ, আব্দুর রহমান বিন আওফকে জান্নাতের সুমিষ্ট পানীয় পান করান।"'[৭৪৬]

তিনি বনু নাজির গোত্র থেকে প্রাপ্য গনিমতের অংশ কাইদামার[৭৪৭] সম্পত্তি ৪০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এরপর তা রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণীদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন।[৭৪৮] তিনি উসমান ﷺ-এর কাছে তাঁর একটি জমি ৪০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে তা বনু জুহরা, অভাবী শ্রেণি এবং উম্মুল মুমিনিনদের মাঝে বণ্টন করে দেন। যখন আম্মাজান আয়িশা ﷺ তাঁর অংশ পেলেন, তখন বললেন, 'রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমার পরে তোমাদের প্রতি কেবল ধৈর্যশীলরাই দয়াপরবশ হবে। আল্লাহ আওফের পুত্রকে জান্নাতের সুমিষ্ট পানীয় পান করান।"'[৭৪৯]

তিনি রাসুল ﷺ-এর যুগে মিসর থেকে প্রাপ্য ১০০ বাহন মদিনার দরিদ্রদের মাঝে দান করে দিয়েছিলেন।[৭৫০] এরপর তাঁর কাছে শাম থেকে তাঁর একটি ব্যাবসায়িক কাফেলা পৌছলে তিনি পুরো কাফেলাকে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে হাজির হন। তখন রাসুল ﷺ তাঁর জন্য জান্নাত লাভের দুআ করেন।[৭৫১]

---

৭৪৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩২।
৭৪৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩২।
৭৪৭. মদিনার একটি জায়গার নাম কাইদামা। এটি বনু নাজির গোত্র থেকে প্রাপ্য আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর অংশ। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৭/৩০৫।
৭৪৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩২।
৭৪৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৩।
৭৫০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৯৯।
৭৫১. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮৫।

মদিনার লোকেরা যেন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর পরিবারভুক্ত ছিল। যার কারণে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দিয়ে লোকদের ঋণ দিতেন, এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন।[৭৫২]

একদিন তিনি উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা ﷺ-এর কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন, 'শ্রদ্ধেয় আম্মাজান, আমার ভয় হচ্ছে, সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে আমি ধ্বংস হয়ে যাব!' তখন আম্মাজান তাঁকে বললেন, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো।'[৭৫৩] তখন থেকে তিনি এমনভাবে হাত খুলে দান করতে লাগলেন; যেন দারিদ্র্যের কোনো ভয়ই তাঁর নেই।

একবার আব্দুর রহমান ﷺ-এর বিশাল এক উটের কাফেলা আসলো। সেদিন মদিনাবাসীর মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ বললেন, 'এটা কী?' বলা হলো, 'এটা আব্দুর রহমান ﷺ-এর ব্যাবসায়িক উটের কাফেলা।' তখন আয়িশা ﷺ বললেন, 'দেখো, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমি যেন আব্দুর রহমান বিন আওফকে পুলসিরাতে দেখতে পাচ্ছি—একবার সে কাত হয়ে যাচ্ছে আরেকবার স্থির হচ্ছে। এভাবে কোনোমতে সে পার হয়ে যায়।"' আব্দুর রহমান ﷺ এ খবর শুনে বললেন, 'এই উটের কাফেলা এবং তার ওপর বোঝাইকৃত সম্পদ সব আল্লাহর রাস্তায় সদাকা করে দিলাম।' সেদিন ওই সম্পদের চেয়ে উত্তম কোনো সম্পদ ছিল না। কারণ সেই কাফেলায় ৫০০ উট ছিল।[৭৫৪]

তিনি একজন বিরাট বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ব্যবসায় বিশাল সম্পদ ছিল। কিন্তু সে সম্পদ কেবল তাঁর হাতেই ছিল, কলবে ছিল না। এ কারণে শরিয়াহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তিনি সম্পদ জমা করেননি। তিনি তাঁর সম্পদের হক যথাযথ আদায় করেছেন।

---

৭৫২. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮৫।
৭৫৩. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৫।
৭৫৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩২, উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৫-৩১৬।

৪. তাঁর আল্লাহভীতি

তাঁর দান-দক্ষিণা ছিল অবারিত বৃষ্টিধারার মতো। তিনি কোনো বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিলে আল্লাহভীতির ভিত্তিতেই দিতেন। এক সৎ ব্যক্তি তাঁকে বাইতুল্লাহ তাওয়াফরত অবস্থায় বলতে শুনেছে, 'হে আল্লাহ, আমাকে মনের কৃপণতা থেকে রক্ষা করুন।'[৭৫৫]

তাঁর এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'সে আমার সাথি ছিল। কত উত্তম সাথিই না ছিল সে আমাদের! একদিন সে আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেল। তিনি ঘরে গিয়ে গোসল করলেন। এরপর আমাদের কাছে একটি রুটি ও খাদ্যের পাত্র নিয়ে হাজির হলেন। এরপর তিনি কেঁদে দিলেন। আমরা বললাম, "আবু মুহাম্মাদ, আপনি কাঁদছেন কেন।" তিনি বললেন, "রাসুল ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন; অথচ তিনি এবং তাঁর পরিবার কখনো পরিতৃপ্ত হয়ে জবের রুটি খেতে পারেননি। আর আমরাও মনে করতাম না, তার চেয়ে উত্তম কিছুর জন্য আমাদের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হবে।"'[৭৫৬]

আবার খাবার আনা হলো। তিনি রোজাদার ছিলেন। তিনি বললেন, 'মুসআব বিন উমাইর ﷺ ইনতিকাল করেছেন। তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁকে এমন একটি চাদরে দাফন দেওয়া হলো, মাথা ঢেকে দিলে পা বের হতো, আবার পা ঢেকে দিলে মাথা বের হয়ে যেত। হামজা ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। এরপর আমাদের এই প্রাচুর্য দেওয়া হলো। ফলে আমার ভয় হয়, না জানি আমাদের নেক আমলের বিনিময় দুনিয়াতে দিয়ে দেওয়া হলো।'[৭৫৭] এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন।

তিনি মক্কায় আসলে যে বাড়ি থেকে হিজরত করেছেন, সে বাড়িতে অবস্থান করতে অপছন্দ করতেন।[৭৫৮] তিনি তাকওয়ার কারণে সে বাড়িতে অবস্থান করতেন না।

---

৭৫৫. আল-ইসতিআব : ২/৮৪৭।

৭৫৬. আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৯৯-১০০।

৭৫৭. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/১০০।

৭৫৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩১।

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর আপন ভাগিনা মিসওয়ার বিন মাখরামা, যিনি সাহাবি ছিলেন না; কিন্তু তাঁকে সাহাবিদের সাথে তুলনা করা হতো।[৭৫৯] তিনি বলেন, 'আব্দুর রহমান ﷺ যখন শুরার দায়িত্ব পেলেন, তখন আমার কাছে খিলাফতের জন্য আব্দুর রহমান ﷺ বেশি উপযুক্ত ছিল। যদি তিনি গ্রহণ না করেন, তবে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ।' তিনি আরও বলেন, 'আমর ইবনুল আস ﷺ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "তোমার মামার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যদি তিনি এমন কাউকে এ দায়িত্ব দিয়ে দেন; অথচ তিনি জানেন, সে ব্যক্তির চেয়ে তিনিই উত্তম।" তখন আমি মামার কাছে এসে তা বললাম। তিনি বললেন, "এটা তোমাকে কে বলেছে?" বললাম, "না, তার কথা আপনাকে বলব না।" তিনি বললেন, "যদি না বলো, তবে তোমার সাথে কখনো কথা বলব না।" বললাম, "আমর ইবনুল আস।" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ, এর চেয়ে ছুরি দিয়ে আমার গলা চিড়ে দেওয়া আমার কাছে অধিকতর উত্তম।"'[৭৬০] তিনি মূলত তাকওয়ার কারণে খিলাফতের দায়িত্ব নিতে ভয় করেছেন।

তিনি জুহরের পূর্বে লম্বা সময় ধরে সালাত আদায় করতেন। যখন আজান শুনতেন, তখন উত্তম কাপড় পরে মসজিদের দিকে বের হতেন।[৭৬১]

আব্দুর রহমান ﷺ সেই ১০ জনের একজন ছিলেন, যাঁদের জান্নাতি হওয়ার ব্যাপারে রাসুল ﷺ সাক্ষ্য দিয়েছেন।[৭৬২] এবং সেই ছয়জনের একজন ছিলেন, যাঁদেরকে উমর ﷺ শুরা বানিয়েছিলেন এবং বলেছেন, 'রাসুল ﷺ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।'[৭৬৩]

রাসুল ﷺ বলেন, 'আব্দুর রহমান বিন আওফ মুসলিমদের নেতাদের একজন।'

---

৭৫৯. আল-মাআরিফ : ৪২৯ পৃ.।
৭৬০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৩-১৩৪।
৭৬১. আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭।
৭৬২. আল-ইসতিআব : ২/৮৪৬, উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৪, আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৬, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০০।
৭৬৩. আল-ইসতিআব : ২/৮৪৬।

রাসুল ﷺ আরও বলেন, 'আব্দুর রহমান আসমানেও বিশ্বাসী, জমিনেও বিশ্বাসী।'[৭৬৪]

তিনি উম্মুল মুমিনিনদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর একজন বিশ্বস্ত লোক ছিলেন।[৭৬৫] উম্মুল মুমিনিনদের সাথে তিনি হজে যেতেন। তাঁদের হাওদা সওয়ারির ওপর ওঠানামা করতেন। ১০ হিজরিতে বিদায় হজে উম্মুল মুমিনিনদের সাথে ছিলেন আব্দুর রহমান ও উসমান ﷺ।[৭৬৬]

১৩ হিজরিতে উমর ﷺ খলিফা হয়ে আব্দুর রহমান ﷺ-কে আমির করে হজকাফেলা প্রেরণ করেন। ২৩ হিজরিতে যখন উমর ﷺ জীবনের শেষ হজ পালন করেন, সে হজে তিনিও উমর ﷺ-এর সাথে হজ পালন করেন। সে বছর উমর ﷺ নবিজি ﷺ-এর সহধর্মিণীদের হজ পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁদের দেখাশোনার জন্য উসমান ﷺ ও আব্দুর রহমান ﷺ-কে নিযুক্ত করেছিলেন। উসমান ﷺ তাঁর সওয়ারি নিয়ে আম্মাজানদের সামনে সামনে চলতেন। যাতে কেউ অজান্তে তাঁদের কাছে না আসে, সেদিকে খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেক মানজিলে তাঁরা দুজন আম্মাজানদের সাথে পাহাড়ের উপত্যকায় অবতরণ করতেন। তাঁরা উপত্যকার মুখে অবস্থান নিতেন; যাতে সেদিকে কেউ যেতে না পারে।[৭৬৭]

এসব থেকে বোঝা যায়, আব্দুর রহমান ﷺ অনেকবার হজ করেছেন। নবম হিজরিতে রাসুল ﷺ-এর যুগে আবু বকর ﷺ-এর অধীনে হজ করেন। বিদায় হজে রাসুল ﷺ-এর সাথে হজ করেন। ১১ হিজরিতে হজের আমির হয়ে হজ পালন করেন। বলা হয়, এ হজে আমির ছিলেন আত্তাব বিন উসাইদ ﷺ। আমির যে-ই হোক, তিনি এ বছর হজ করেন। ১২ হিজরিতে আবু বকর ﷺ লোকদের নিয়ে হজ করেন। আর মদিনায় উসমান ﷺ-কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। বলা হয়, এ হজে আমির ছিলেন উমর ﷺ অথবা আব্দুর

---

৭৬৪. আল-ইসতিআব : ২/৮৪৬, আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৭৮।
৭৬৫. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৭৮।
৭৬৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/১০৯১।
৭৬৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৪৩। দেখুন, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৬৫-৪৬৬।

রহমান ﷺ।[৭৬৮] তিনি আমির বা মামুর যেটাই হোন, তিনি এ হজে উপস্থিত ছিলেন। ১৩ হিজরিতে উমর ﷺ খলিফা হয়ে তাঁকে হজ কাফেলার আমির বানান।[৭৬৯]

১৪ হিজরিতে তিনি রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণীদের নিয়ে হজ পালন করেন।[৭৭০]

আব্দুর রহমান ﷺ ছিলেন সেসব লোকের একজন, যারা জাহিলি যুগে নিজেদের ওপর মদকে হারাম করে নিয়েছিলেন।[৭৭১] এটা তাঁর সত্য গ্রহণে স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ বহন করে।

রাসুল ﷺ তাঁকে বনু কালবের সদাকা গ্রহণের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন—যেহেতু রাসুল ﷺ-এর কাছে তখন এ কাজের জন্য বনু কালবের কেউ ছিল না। সাধারণত রাসুল ﷺ কোনো গোত্রের সদাকা গ্রহণের জন্য সেই গোত্রের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতেন। কারণ অন্যের চেয়ে সে-ই তার গোত্র সম্পর্কে ভালো জানবেন। আবার এটাও স্পষ্ট যে, এসব কাজে কেবল সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই নিয়োগ পেতে পারে। আর আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার প্রতি রাসুল ﷺ-এর পূর্ণ ভরসা ছিল।[৭৭২]

আব্দুর রহমান ﷺ ছিলেন রাসুল ﷺ-এর বিশ্বস্ত সহযোগী। তাকওয়া ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে ছিল অনুপম আদর্শ।

৫. তাঁর ইলম

বিদায় হজে রাসুল ﷺ উমর ﷺ-কে বললেন, 'আপনি তো শক্তিশালী লোক। হাজারে আসওয়াদের স্থান খালি পেলে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন, অন্যথায় সেখানে ভিড় করে মানুষকে কষ্ট দিতে যাবেন না।' আব্দুর রহমান ﷺ-কে বলেন, 'হে আবু মুহাম্মাদ, হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার বেলায় কী

---

৭৬৮. ইবনুল আসির : ২/৩৮৩, তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৮৪; এতে আছে, তখন মদিনায় প্রতিনিধি হন কাতাদা ইবনে নুমান আল-আনসারি ﷺ।
৭৬৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৪, তারিখু ইবনি খইয়াত : ১/৮৮ এবং ১/৯৪।
৭৭০. তারিখু ইবনি খইয়াত : ১/৯৪।
৭৭১. তাহজিবুত তাহজিব : ৬/২৪৬, আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭।
৭৭২. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮০-৩৮১।

করেছেন?' তিনি বললেন, ইসতিলাম (স্পর্শ) করেছি, চুম্বন করিনি।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আপনি ঠিক করেছেন।'

আরেক রিওয়ায়াতে আছে, রাসুল ﷺ আব্দুর রহমান ﷺ-কে বলেন, 'হে আবু মুহাম্মাদ, হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের বেলায় কী করেছেন?' তিনি বললেন, 'সব পালন করেছি। শুধু হাজারে আসওয়াদ চুম্বন না করে ইসতিলাম করেছি।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আপনি ঠিক করেছেন।'[৭৭৩] এটা প্রমাণ করে, তিনি দ্বীনের সে বিষয়ে ইজতিহাদ করতেন, যে বিষয়ে শরিয়তের স্পষ্ট কোনো দলিল নেই।

একবার এক লোক মদিনায় আগমন করল। সে সকল মুহাজিরের সাথে সাক্ষাৎ করল। শুধু আব্দুর রহমান ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেল না। বলা হলো, তিনি এখন জুরফ এলাকায় তাঁর জমিনে আছেন। লোকটি সেখানে গিয়ে দেখল, আব্দুর রহমান ﷺ নিজ হাতে কোদাল দিয়ে পানির নালা কেটে দিচ্ছেন। তিনি চাদর রেখে খালি গায়ে ফসলে কাজ করছিলেন। তিনি লোকটিকে দেখে লজ্জা পেলেন। কোদাল রেখে চাদর গায়ে দিলেন। লোকটি সামনে এসে সালাম দিল। এরপর বলল, 'আপনার কাছে একটি বিষয়ে এসেছি। কিন্তু আমি তার চেয়ে আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কাছে যে দ্বীন এসেছে, আপনাদের কাছে কি সেই দ্বীন আসেনি? আমরা যা জেনেছি, আপনারাও কি তা জানেননি?' আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, 'আপনাদের কাছে যে দ্বীন এসেছে, আমাদের কাছে সে দ্বীনই এসেছে। আপনারা যা জেনেছেন, আমরাও তা জেনেছি।' তখন লোকটি বললেন, 'তাহলে কেন আমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত, দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত? কেন আমরা জিহাদে গড়িমসি করছি, জিহাদ থেকে পিছপা হচ্ছি? অথচ আপনারা আমাদের শ্রেষ্ঠজন। আমাদের পূর্বসূরি এবং আমাদের নবিজির সাহাবি? আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, 'আমাদের কাছে যে দ্বীন এসেছে, আপনাদের কাছেও সে দ্বীন এসেছে। আমরা যা জেনেছি, আপনারাও তা জেনেছেন। কিন্তু আমরা দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্যধারণ করেছি; কিন্তু প্রাচুর্য লাভ করে ধৈর্যধারণ করতে পারিনি।'[৭৭৪]

---

৭৭৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১২৫।
৭৭৪. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/১০০।

এটা প্রমাণ করে, আব্দুর রহমান ﵁ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের আসল বুঝটা বুঝতেন। কারণ ইসলাম হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের দ্বীন। তাই শরিয়াহ নির্দেশিত সীমার ভেতরে থেকে দুনিয়ার জন্যও কাজ করতে হবে এবং আখিরাতের জন্যও কাজ করতে হবে।

এ কারণে আব্দুর রহমান ﵁ রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ফতোয়া দান করতেন।[৭৭৫] আমরা দেখেছি, উমর ﵁ মহামারির কারণে 'সারাগ' এলাকা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন একটি হাদিসের ওপর ভিত্তি করে। যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁। এভাবে উমর ﵁ মদ্যপায়ীর শাস্তির ক্ষেত্রে নিজের মত ছেড়ে আব্দুর রহমান ﵁-এর মত গ্রহণ করেছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে কোনো এক অসুবিধার কারণে রেশমের পোশাক পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। যে কষ্টের কারণে আব্দুর রহমান ﵁-এর অনুমোদন হয়েছিল সে কষ্টের কারণে পরবর্তী সময়ে মুসলিমদেরও সে অনুমোদন মেলে। এ অনুমোদনটি মূলত আব্দুর রহমান ও জুবাইর ইবনুল আওয়াম ﵄-এর কারণে হয়েছিল।[৭৭৬]

রাসুল ﷺ থেকে তাঁর সূত্রে ৬৫টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে দুটি হাদিস মুত্তাফাক আলাইহি (ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন)। পাঁচটি হাদিস ইমাম বুখারি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৭৭৭] তিনি রাসুল ﷺ এবং উমর ﵁ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁর সন্তানগণ, ইবরাহিম, হুমাইদ, উমর, মুসআব, আবু সালামা। এবং তাঁর নাতি মিসওয়ার বিন ইবরাহিম, তাঁর ভাগিনা মিসওয়ার বিন মাখরামা। এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন উমর, জুবাইর বিন মুতইম, আনাস, মালিক বিন আওস বিন হাদাসান, আব্দুল্লাহ বিন আমির বিন রবিআ ও মুজালাদ বিন আবদাহ প্রমুখ। উমর ﵁ তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করে বলেন, 'আব্দুর রহমানের মাঝে আদালত এবং সন্তুষ্টি আছে।'[৭৭৮]

---

৭৭৫. আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৭।
৭৭৬. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৬৪-৩৬৫ এবং ২/৩৮২, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩১।
৭৭৭. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০১, খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ২৩২।
৭৭৮. আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৬-১৭৭, উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৬-৩১৭, তাহজিবুত তাহজিব : ৬/২৪৫, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/৩০১, তাহজিবু তাহজিবিল কামাল : ২৩২।

রাসুল ﷺ থেকে তাঁর বর্ণিত একটি হাদিস হলো :

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ سَبْعِينَ دَرَجَةً، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'একজন আবিদের ওপর একজন আলিমের ৭০টি মর্যাদা। দুই মর্যাদার মাঝে তেমনই দূরত্ব, যেমন দূরত্ব আসমান ও জমিনের মাঝে।'[৭৭৯]

আব্দুর রহমান ﷺ ছিলেন মুফতি, মুহাদ্দিস ও দ্বীনের একজন বিদগ্ধ ফকিহ। তিনি দ্বীনি বিষয়ে যেমন আলিম ছিলেন, তেমন দুনিয়ার বিষয়েও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। খলিফাদের কাছে তাঁর মতের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কারণ তিনি নিজেই নিজের পক্ষে এবং বিপক্ষে সত্যায়নপত্র।[৭৮০]

৬. তাঁর গুণাবলি

তিনি লাল মিশ্রিত সাদা রংয়ের মোলায়েম ত্বকবিশিষ্ট সুন্দর চেহারার লম্বা দেহের মানুষ ছিলেন। তাঁর চুল-দাড়িতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তাঁর হস্তদ্বয় বেশ প্রশস্ত এবং আঙুলগুলো মোটা মোটা। তিনি একটু সামনের দিকে ঝুঁকানো ছিলেন। তাঁর কোঁকড়ানো চুল ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকত। তাঁর ঘাড় একটু লম্বা ছিল। উহুদের দিন আঘাত পেয়ে সামনের দাঁত ভেঙে যায়। এবং পায়ে আঘাত লেগে খোঁড়া হয়ে যান। উহুদের দিন তিনি ৭০টি বা তারও বেশি আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর চোখের পাতা ছিল লম্বা এবং চোখদুটি ছিল ডাগর ডাগর। তাঁর ওপরের দুই দাঁত বেশ লম্বা ছিল। কখনো তাঁর ঠোঁটদ্বয় রক্তিম বর্ণ হয়ে উঠত।[৭৮১]

তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী। তাঁর বাহ্যিক অবস্থা তাঁর বীরত্ব ও পুরুষত্বের জানান দিত। এ ছাড়াও তাঁর ছিল অনেক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি।[৭৮২]

---

৭৭৯. উসদুল গাবাহ : ৩/৩১৫। মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৮৫৬; দেখুন, মুখতাসারুল জামিউস সগির : ২/১২৪।

৭৮০. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮২।

৭৮১. আল-ইসতিআব : ২/৮৪৭।

৭৮২. নাসবু কুরাইশ : ২৬৫ পৃ.।

তাঁর এক ছেলে সালিম আকবার, যে ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে ইনতিকাল করেন। সালিমের মা হলেন, উম্মে কুলসুম বিনতে উতবাহ বিন রবিআ।

তাঁর এক মেয়ে হলেন উম্মে কাসিম। তিনি জাহিলি যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা ছিলেন শাইবার মেয়ে। তাঁর অন্য সন্তানগণ হলেন, মুহাম্মাদ, ইবরাহিম, হুমাইদ, ইসমাইল, হামিদা, আমাতুর রহমান। এদের মা হলেন উম্মে কুলসুম বিনতে উতবাহ বিন রবিআ বিন আবদে শামশ।

মাআন, উমর, জাইদ, আমাতুর রহমান সুগরা। এদের মা হলেন সাহলা বিনতে আসিম বিন আদি। এরা আনসারদের থেকে।

উরওয়া আকবার, ইনি আফরিকার যুদ্ধে শহিদ হন। তাঁর মা হলেন বাহরিয়া বিনতে হানি বিন কুবাইজা।

সালিম আসগার, ইনি আফরিকা বিজয়ের দিন শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মা হলেন সাহলা বিনতে সুহাইল বিন আমর।

আবু বকর, তাঁর মা হলেন উম্মে হাকিম বিনতে কারিজ বিন খালিদ বিন উবাইদ।

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, তিনি আফরিকা বিজয়ের দিন শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মা হলেন আওস গোত্রের আবুল হুসাইন বিন রাফি এর মেয়ে।

আবু সালামা, তাঁকে আব্দুল্লাহ আসগার বলা হয়। তাঁর মা হলেন তামারুজ বিনতে আসবাগ বিন আমর। কালব গোত্রের ইনিই প্রথম নারী, যাকে কুরাইশের লোক বিবাহ করে।

আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহমান, তাঁর মা হলেন আসমা বিনতে সালামা বিন মাখরামা।

মুসআব, আমিনা, মারইয়াম। এদের মা হলেন উম্মে হুরাইস। ইনি বাহরা গোত্র থেকে বন্দী হয়ে আসেন।

সুহাইল, তাকে আবুল আবইয়াদ বলা হয়। তার মা হলেন মাজদা বিনতে ইয়াজিদ বিন সালামা।

উসমান, তার মা হলেন উম্মে গজাল। ইনি মাদায়িন যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। এবং তার থেকে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ-এর সন্তান জন্ম নেয়।

উরওয়া, ইয়াহইয়া ও বিলাল। এরা দাসীর সন্তান। উম্মে ইয়াহইয়া বিনতে আব্দুর রহমান, তার মা হলেন জাইনাব বিনতে সব্বাহ বিন সালাবা। ইনিও বাহরা গোত্র থেকে বন্দী হয়ে আসেন।

জুওয়াইরিয়া বিনতে আব্দুর রহমান, তার মা হলেন বাদিয়া বিনতে গাইলান বিন সালামা। ইনি আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর ভাগিনা মিসওয়ার বিন মাখরামার স্ত্রী ছিলেন।[৭৮৩]

সুতরাং আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর মোট ছেলের সংখ্যা হচ্ছে ২৮ জন এবং মেয়ের সংখ্যা আটজন।

আব্দুর রহমান ﷺ মৃত্যুর সময় তিনজন স্ত্রী রেখে মারা যান। তাঁর চতুর্থ স্ত্রী তামারুজ বিনতে আসবাগ ﷺ-কে মৃত্যুশয্যায় তালাক দিয়েছিলেন।[৭৮৪] কিন্তু তামারুজ ﷺ ৮০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাঁর সাথে আপস করেন। আরেক বর্ণনামতে এক লাখ দিরহামের বিনিময়ে আপস করেছিলেন।[৭৮৫]

আব্দুর রহমান ﷺ সাওদা বিনতে জামআহ ﷺ-এর দিক থেকে রাসুল ﷺ-এর ভায়েরা ছিলেন। কারণ সাওদা ﷺ-এর বোন উম্মে হাবিবা বিনতে জামআকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।[৭৮৬] আবার তিনি জাইনাব বিনতে জাহশ ﷺ-এর দিক থেকেও রাসুল ﷺ-এর ভায়েরা ছিলেন। যেহেতু জাইনাব ﷺ-এর বোন উম্মে হাবিবা বিনতে জাহশকে বিবাহ করেছিলেন। ইনি অবশ্য কোনো সন্তান জন্ম দেননি।[৭৮৭]

---

৭৮৩. আল-ইসতিআব : ২/৮৪৬, আল-মাআরিফ : ৪২৯।
৭৮৪. আর-রিয়াদুন নাদরাহ : ২/৩৮৯।
৭৮৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩৬।
৭৮৬. আল-মুহাব্বার : ১০১ পৃ., আনসাবুল আশরাফ : ১/৪০৯।
৭৮৭. আল-মুহাব্বার : ১০১ পৃ.।

আব্দুর রহমান ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ছিলেন রাসুল ﷺ-এর কাছে বাইআতকারী নারীদের একজন। তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কায় বাইআত হয়েছিলেন। তিনি শান্তিকালীন সময়ে একাকী মদিনায় হিজরত করেন। তাঁকে জুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি তাঁকে তালাক দিয়ে দেন। তারপর আব্দুর রহমান ﷺ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর গর্ভে আব্দুর রহমান ﷺ-এর দুজন সন্তান ইবরাহিম ও হুমাইদ জন্মগ্রহণ করে।[৭৮৮]

এ হলো ঐতিহাসিকদের লেখা তাঁর পরিবার ও সন্তানদের বিবরণ। আল্লাহ তাঁর সম্পদে যেমন বরকত দান করেছিলেন, তেমন তাঁর সন্তানাদিতেও বরকত দান করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর সন্তানদের থেকে কেউ তাঁর মতো হতে পারেননি। কোনো সন্তান তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হননি। তিনি যেন একাই এক উম্মাহ ছিলেন। যেন একাই নিজের তুলনা ছিলেন।

৮. তাঁর সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি

আব্দুর রহমান ﷺ একজন সত্যিকার মুসলিমের উপমা ছিলেন। দাসদের মাঝে তাঁকে আলাদা করে চেনা যেত না। তিনি তাদের সাথে মিলে ইবাদত-বন্দেগি করতেন আবার কাজও করতেন। তবে তিনি দাসদের চেয়ে ইমান ও তাকওয়ায় অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু তিনি আরামের সময়ে, পরিবারে এবং বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যে চাদর অথবা জোড়া কাপড় পরতেন। যার মূল্য ৫০০ দিরহাম বা ৪০০ দিরহাম হবে। সে সময় সেটা অনেক বড় অঙ্ক ছিল। কারণ অর্ধেক দিরহামে একটি ছাগল পাওয়া যেত।

ফিতনার পূর্বেই তিনি এ জীবন থেকে বিদায় নিয়ে নেন। এ কারণে তাঁর শেষ বিদায়ের সময় আলি ﷺ বলেছিলেন, 'হে আওফের পুত্র, ঠিক আছে যাও। তুমি তো জীবনের পঙ্কিলতা ডিঙিয়ে সব স্বচ্ছতা নিয়ে ফেলেছ।' আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফিতনা থেকে হিফাজত করেছেন।

---

৭৮৮. আল-মুহাব্বার : ৪০৭-৪০৮ পৃ.।

তিনি বিশ্বস্ত ও পরিচ্ছন্ন লোক ছিলেন। তাঁর সম্পদ মূলত তাঁর জন্য ছিল না; বরং তিনি তা অসহায় ও দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করতেন। দ্বীনি বিষয়ে যেমন আলিম ছিলেন, তেমন পার্থিব বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন। অত্যন্ত তাকওয়াবান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ী ছিলেন।

তিনি ছিলেন নির্মল চরিত্রের অধিকারী। দান-সদাকায় সিক্তহস্ত। রাতের সন্ন্যাস দিনের ঘোড়সওয়ার। তিনি দুনিয়ার জন্য এমনভাবে কাজ করতেন, যেন চিরদিন বেঁচে থাকবেন। আবার পরকালের জন্য এমনভাবে আমল করতেন, যেন আগামীকাল মৃত্যুবরণ করবেন।

তাঁর বৈশিষ্ট্যে তিনি একজন সত্যিকারের মুসলিম ছিলেন। কার্যত তাঁর জীবনে ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলির সদা প্রতিফলন ঘটত। দুনিয়ার কাজে থাকত তাঁর আখিরাত এবং আখিরাতের কাজে শামিল হতো তাঁর দুনিয়া। মসজিদে আমলবিহীন তাঁর সময় অতিবাহিত হতো না এবং মসজিদের বাইরেও তাঁর আমল ছাড়া সময় কাটত না।

কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে লড়াই করা প্রতিটি যুদ্ধেই অনন্য কীর্তির স্বাক্ষর রাখেন সাহাবি আব্দুর রহমান রা.। ফলে কোনো যুদ্ধে মুশরিকদের বন্দী করেছেন আবার কোনো যুদ্ধে মুশরিকদের হত্যা করেছেন। সম্মুখ সারিতে থেকে যেমন বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন, তেমন রাসুলের হিফাজতে তাঁর পাশে পাহাড়সম অবিচল থেকে জীবনের বাজি রেখেছেন। রাসুল ﷺ-কে হিফাজতের জন্য নিজের জীবনকে সঁপে দিয়েছিলেন। ফলে উহুদের দিন বিশের অধিক আঘাত পেয়েছিলেন। যার একটি আঘাতে তাঁর সামনের দুটি দাঁত পড়ে গিয়েছিল। এবং পায়ে আঘাত খেয়ে আজীবন খুঁড়িয়ে হেঁটেছিলেন।

তিনি সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, যারা উহুদের দিন হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে জিহাদ করেছিলেন। যার কারণে পরবর্তী সময়ে রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর অবর্তমানে অধিকাংশ সময় তাঁদেরকেই কোনো না কোনো অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া হতো।

তিনি শুধু জীবনের প্রশ্নেই প্রথম সারির মুজাহিদ ছিলেন না; বরং সম্পদের ক্ষেত্রেও ছিলেন প্রথম সারির মুজাহিদ। যেমনটা আমরা আগে আলোচনা করেছি।

তিনি ছিলেন তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী। সবার প্রিয় এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। মানুষও তাঁকে ভালোবাসত, তিনিও মানুষকে ভালোবাসতেন। তিনি মানুষকে বিশ্বাস করতেন, তিনিও মানুষের কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন। সবার আস্থাভাজন এবং সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সর্বদা ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা আঁকড়ে থাকতেন। কখনো কাউকে ধোঁকা দিতেন না, কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করতেন না, যুদ্ধের ময়দানে কোনো শিশু বা নারীকে হত্যা করতেন না এবং কারও ওপর করতেন না কোনো প্রকার জুলুম। তিনি শুধু আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার নিমিত্তে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার্থেই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতেন।

তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অধিকারী। স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করতেন। নিজের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না বা দায়িত্ব থেকে পলায়ন করতে চাইতেন না। তাঁর ছিল একটি সুউচ্চ মনোবল। যার মাঝে কোনো পরিবর্তন আসত না বিজয়ের মুহূর্তে বা পরাজয়ের কারণে। তিনি তাঁর সৈনিকদের মনোবল, শক্তি, সক্ষমতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন। যুদ্ধের কলাকৌশল এবং তার মৌলিক বিষয়াদি ছিল তাঁর হাতের পুতুল। ফলে নিজের মতো করে অতি সূক্ষ্মভাবে তিনি যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে পারতেন। তিনি ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ কমান্ডার। শত্রুপক্ষের ওপর আকস্মিকভাবে হামলা করে বসতেন। শত্রু তাঁর কলাকৌশল সম্পর্কে কোনো কিছু বুঝে উঠতে পারত না। শত্রুর যুদ্ধপ্রস্তুতির পূর্বে তিনি তাঁর সামরিক শক্তি নিয়ে হাজির হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। নিজের সৈনিকদের নিরাপত্তার জন্য তিনি সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর পরিকল্পনাগুলো হতো সুসংহত। একদিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সহায়তা, আরেক দিকে নিজ সৈনিকদের সাহায্য করে একটি পারস্পরিক টেকসই সাহায্যের সমন্বয় তৈরি করতেন। সামরিক শক্তিকে সর্বদা পাথেয় জোগান দিতেন। এবং সংহত থেকে সুসংহত করে তুলতেন শক্তির পরিচালনা বিষয়াদিকে।

তাঁর মাঝে ছিল কঠোর অধ্যবসায় ও আনুগত্যের অনুপম আদর্শ। কেন্দ্রের কোনো নির্দেশের বিরোধিতা করতেন না তিনি। কোনো ফিতনা এবং ফিতনাবাজকে পছন্দ করতেন না। স্বীয় তরবারি, হাত এবং মুখ, সবকিছুকেই তিনি ফিতনার কলঙ্ক থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতেন। বরং মুসলিমদের কল্যাণ এবং তাদের ঐক্যই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এটা ঠিক রাখতে তিনি নিজ সাধ্যের ভেতরে সবকিছুই করতেন।

তিনি নেতৃত্বকে পছন্দ করতেন না এবং তা পাওয়ার জন্য কোনো কল্পনাও করতেন না। কিন্তু জিম্মাদারি হিসেবে চলে আসলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন না। তিনি সেসব মহান ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন, যারা নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য নয়; বরং স্বীয় দ্বীন ও আকিদার কারণে কাজ করে গেছেন। যার কারণে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের সামনে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের কোনো মূল্যই থাকত না। তাঁর জানমাল সবকিছুই ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় নিয়োজিত ছিল।

যদি ইসলামের আবির্ভাব না হতো, তবে আব্দুর রহমান উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত পেত না। এ কারণে তিনি তাঁর শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যে সবকিছুই ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

ইতিহাসে আব্দুর রহমান ﷺ

আব্দুর রহমান ﷺ সর্বপ্রথম ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী আটজনের একজন। এবং আবু বকর ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী পাঁচজনের একজন। বলা হয়, তিনি হাবশায় এবং মদিনায় প্রথম হিজরতকারীদের মাঝে ছিলেন।

তিনি একসঙ্গে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ ব্যক্তির অন্যতম। খলিফা নির্ধারণের জন্য উমর ﷺ-এর বাছাইকৃত ছয় ব্যক্তির একজন। রাসুল ﷺ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

রাসুল ﷺ তাবুক যুদ্ধে তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি তাঁদের একজন, যাঁরা ইসলাম ও রাসুল ﷺ-এর হিফাজতের জন্য উহুদের দিন নিজেদের ঢাল হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন।

তিনি দুমাতুল জানদাল অভিমুখে বনু কালব গোত্রের উদ্দেশ্যে রাসুল ﷺ-এর একটি সৈন্যদলের কমান্ড করেছিলেন। এবং সেখানে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

তিনি নিজে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ না করে মুসলিমদের জন্য একজন নতুন খলিফা নির্বাচন করেছিলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে জিহাদ করার পাশাপাশি সম্পদ দিয়েও অনেক বড় জিহাদ করেছিলেন।

এই মহান ফকিহ ও দাতা সাহাবির প্রতি নাজিল হোক আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

আব্দুল্লাহ বিন আতিক আল-আনসারি ﵁

বংশধারা ও শুরুজীবন

আব্দুল্লাহ বিন আতিক বিন কাইস বিন আসওয়াদ বিন মারিই বিন কাব বিন গানাম বিন সালিমা বিন খাজরাজ আল-আনসারি।[৭৮৯]

তিনি উহুদ যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন—এতে কোনো মতভেদ নেই।[৭৯০] বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তাঁর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টি ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রচারিত হয়েছে।[৭৯১] একাধিক ব্যক্তি তাঁর বদরে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উক্তি করেছেন; কিন্তু বদরি সাহাবিদের নামের তালিকায় কোনো উৎসেই তাঁর নামটি আমি পাইনি। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে বদরি সাহাবিদের তালিকায় তাঁর নামটি অবশ্যই পাওয়া যেত।

---

৭৮৯. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৩৬১ পৃ., ইসাবাহ : ৪/১০১, উসদুল গাবাহ : ৩/২০৪, আল-ইসতিবসার : ১৬৮ পৃ.।

৭৯০. আল-ইসাবাহ : ৪/১০১।

৭৯১. আল-ইসাবাহ : ৪/১০১, উসদুল গাবাহ : ৩/২০৪, আল-ইসতিআব : ৩/৯৪৭।

যাহোক, তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মর্যাদার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় উপলক্ষ্য।

এভাবে তিনি রাসুল ﷺ-এর একটি সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৭৯২] সুতরাং তিনি রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইসলামের একজন সৈনিক হওয়ার পাশাপাশি রাসুলের একজন অন্যতম কমান্ডার ছিলেন।

আবু বকর ﷺ-এর খিলাফতকালে ১২ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে সংঘটিত ইয়ামামার[৭৯৩] যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﷺ।[৭৯৪] যা পরিচালিত হয়েছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে। সে যুদ্ধে ৪৫০ জন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেছিলেন। আবার বলা হয়, ৬০০ জন সাহাবি শহিদ হয়েছিলেন।[৭৯৫] আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﷺ এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী শহিদদের একজন ছিলেন।[৭৯৬] শাহাদাত বরণকারী সাহাবিদের মাঝে ৫০ জন অথবা ৩০ জন ছিলেন কুরআনের বাহক।[৭৯৭] কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এ যুদ্ধ ১২ হিজরিতে নয়; বরং ১১ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।[৭৯৮]

উল্লেখ আছে, তিনি সিফফিনের যুদ্ধে আলি ﷺ-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৭৯৯] সঠিক মত হচ্ছে, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য আছে। ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবিদের নামের তালিকায় তাঁর নামটিও উল্লেখ আছে।[৮০০]

---

৭৯২. আল-ইসতিবসার : ১৬৯, আল-ইসাবাহ : ৪/১০১, উসদুল গাবাহ : ৩/২০৩-২০৪, আল-ইসতিআব : ৩/৯৪৬।

৭৯৩. নাজদের একটি গ্রামের নাম ইয়ামামা। বাহরাইন ও তার মাঝে দশ দিনের দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/৫১৫-৫১৬, বর্তমানে এটি রিয়াদের মধ্যে অবস্থিত।

৭৯৪. আল-ইবার : ১/১৩।

৭৯৫. আল-ইবার : ১/১৪।

৭৯৬. তারিখু ইবনি খইয়াত : ১/৮০।

৭৯৭. তারিখু ইবনি খইয়াত : ১/৭৭।

৭৯৮. আত-তাবারি : ৩/২৮১, ইবনুর আসির : ২/৩৬০।

৭৯৯. উসদুল গাবাহ : ৩/২০৪, আল-ইসতিআব : ৩/৯৪৭, আল-ইসাবাহ : ৪/১০১।

৮০০. তারিখু ইবনি খইয়াত : ১/৭৭-৮৩।

এই আব্দুল্লাহ বিন আতিক জাবর বা জাবির বিন আতিকের ভাই নন। কারণ বিশুদ্ধ মত অনুসারে জাবর বা জাবিরের বংশধারা হলো, জাবির বিন আতিক বিন হারিস বিন কাইস বিন হারিস। যা আওসের একটি শাখাগোত্র।[৮০১] পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ বিন আতিক হলেন খাজরাজ গোত্রের। আবার তিনি যে জাবিরের ভাই ছিলেন না, সেটা এ বিষয়টিও প্রমাণ করে, আওস গোত্রের সাহাবিগণ কাব বিন মালিককে হত্যা করে। আর খাজরাজ গোত্রের সাহাবিগণ আবু রাফিকে হত্যা করে। এ ব্যাপারে যুদ্ধবিষয়ক ঐতিহাসিকগণ মতভেদ করেন না।[৮০২]

মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ﷺ ও উবাদাহ বিন সামিত ﷺ থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সিরিন ﷺ। ইবনে হিব্বান ﷺ তাঁকে সিকাহ রাবিদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ ﷺ তাঁর সূত্রে 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয়ের' একটি হাদিস বর্ণনা করেন।[৮০৩]

খাইবারের একজন ইহুদি মহিলা আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﷺ-কে দুগ্ধ পান করান।[৮০৪] তিনি ইহুদিদের প্রচলিত ভাষায় তথা ইবরানি ভাষায় কথা বলতে পারতেন।[৮০৫] তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ছিল।[৮০৬]

---

৮০১. আল-ইসতিবসার : ২০৩, উসদুল গাবাহ : ৩/২০৫।
৮০২. উসদুল গাবাহ : ৩/২০৫।
৮০৩. তাহজিবুত তাহজিব : ৫/৩১২। দেখুন, খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ২০৬, জাওয়ামিউস সিরাহ-এ যুক্ত আসমাউস সাহাবাতির রুওয়াত : ৩০৭।
৮০৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৯১।
৮০৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৯২, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯১।
৮০৬. সিরাতে ইবনি হিশাম : ৩/৩১৫, আদ-দুরার : ১৯৬।

তাঁর অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির রমাদান মাসে তাঁর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।[৮০৭]

খন্দক যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়ের পর বনু কুরাইজার বিষয়টিও চূড়ান্ত করা হলো। সাল্লাম বিন আবুল হুকাইক তথা আবু রাফি হচ্ছে সেই লোকদের একজন, যারা সম্মিলিত বাহিনী প্রস্তুত করেছিল এবং রাসুল ﷺ-এর শানে কটূক্তি করেছিল। উহুদ যুদ্ধের পূর্বে আওস গোত্রের সাহাবিগণ কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেন। কল্যাণকর কাজে আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত। আওসের লোকেরা রাসুল ﷺ-এর কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য কোনো কল্যাণকর কাজ করলেই খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বলত, 'না, এ ব্যাপারে তোমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে আমাদের চেয়ে বেশি সম্মান লাভ করতে পারবে না।' তখন তাঁরা তাঁদের মতো কোনো কল্যাণকর কাজ করে ফেলত। আবার খাজরাজ গোত্রের লোকেরা কোনো কল্যাণকর কাজ করলে আওসের লোকেরাও অনুরূপ কথা বলত।

রাসুল ﷺ-এর সাথে চরম শত্রুতার অপরাধে যখন আওসের লোকেরা কাব বিন আশরাফকে হত্যা করল, তখন খাজরাজের লোকেরা বলল, 'আল্লাহর শপথ, এ ব্যাপারে তোমরা আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে না।'

এবার খাজরাজের লোকেরা আলোচনা করল। কাব বিন আশরাফের মতো এমন কে আছে, যে রাসুল ﷺ-এর সাথে দুশমনি রাখে। তখন তাদের আলোচনায় আবুল হুকাইকের পুত্র আবু রাফি এর কথা উঠে আসলো। সে খাইবারে অবস্থান করত। খাজরাজের লোকেরা রাসুল ﷺ-এর কাছে তাকে হত্যার অনুমতি চাইল। রাসুল ﷺ তাঁদের অনুমতি দিলেন। এরপর খাজরাজের পাঁচ ব্যক্তি বের হলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই খাজরাজের শাখাগোত্র বনু সালিমার লোক ছিলেন। তাঁরা হলেন আব্দুল্লাহ বিন আতিক, আব্দুল্লাহ বিন উনাইস, আবু কাতাদা হারিস বিন রিবয়ি, মাসউদ বিন সিনান ও খুজায়ি বিন আসওয়াদ ﷺ।

৮০৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯১, ইবনুল আসির : ২/১৪৬ এ আছে, এ অভিযান তৃতীয় হিজরির জুমাদাল উখরায় পরিচালিত হয়েছিল। এটা একটা ধারণা। কারণ এ অভিযান খন্দক যুদ্ধের পরে হয়েছিল।

রাসুল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আতিক ‌-কে তাঁদের আমির নিযুক্ত করলেন। তাঁদের বললেন, 'তাঁরা যেন কোনো নারী বা শিশুকে হত্যা না করে।' তাঁরা খাইবারে পৌছতে পৌছতে রাত হয়ে যায়।

আবু রাফি খাইবারে এক দুর্গের ভেতরে অবস্থান করত। দুর্গবাসী তখন সকলেই নিজ নিজ বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। আবু রাফি থাকত দোতলাবিশিষ্ট একটি উঁচু ঘরে। সেখানে যেতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হতো। সাহাবিগণ সিঁড়ি বেয়ে তার দরজা পর্যন্ত পৌছল। এরপর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তার স্ত্রী বের হয়ে এসে বলল, 'আপনারা কারা?' তাঁরা বলল, 'আমরা আরবের লোক। রসদপত্রের সন্ধান করছি।' সে তার স্বামীকে দেখিয়ে বলল, 'তাকে গিয়ে বলুন।' তাঁরা ঘরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন; যাতে কেউ তাঁদের বাধা হতে না পারে। এটা দেখে তার স্ত্রী চিৎকার দিয়ে উঠল। তাঁরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। কিন্তু পরক্ষণেই রাসুল ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ হলে তা থেকে বিরত থাকলেন। এরপর তাঁরা তরবারি দিয়ে আবু রাফি এর ওপর হামলা করেন। আবু রাফি তখন চিত হয়ে শুয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ বিন আতিক ‌ তার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিলেন এবং আরেক পাশ দিয়ে ছুরি বের হয়ে গেল। এভাবে আব্দুল্লাহ বিন উনাইসও ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সাল্লাম তখন বলছিল, 'বাঁচাও বাঁচাও।'

অভিযানের সাথিগণ আবু রাফি এর ঘর থেকে বের হয়ে আসলো। আব্দুল্লাহ বিন আতিক ‌-এর চোখের জ্যোতি কম ছিল। ফলে তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেন। তাঁর সাথিগণ তাঁকে বহন করে নিয়ে ঘাঁটিতে ফেরেন এবং আত্মগোপন করেন। এলাকাবাসী সকলে ঘর থেকে বের হয়ে এসে আগুন জ্বালায়। তারা ঘাতককে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে যায়।

অভিযানের সাথিগণ বলতে লাগলেন, 'কীভাবে জানতে পারব, আল্লাহর দুশমন মৃত্যুবরণ করেছে। জানার জন্য একজন ফিরে এসে মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ল। তিনি দেখতে পেলেন আবু রাফির নিথর দেহের চারপাশে মানুষ ভিড় করে আছে। তার স্ত্রী হাতে মশাল নিয়ে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে আর মানুষকে বলছে, 'আমি আতিকের বেটার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। এরপর নিজেকে অবিশ্বাস করে বললাম, "আতিকের বেটা এখানে কীভাবে আসবে?"

এরপর সে তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "নেই, সে ইয়াহুদের প্রভুর কাছে চলে গেছে।" সাহাবি বলেন, "ওই মুহূর্তে আমার কাছে এই কথার চেয়ে মজার কোনো বস্তু ছিল না।" ফিরে এসে সাহাবি তাঁর সাথিদের কাছে এসব ঘটনার বিবরণ দিলে তাঁরা আল্লাহর দুশমনের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন।

অভিযানের সৈনিকরা আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﷺ-কে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে হাজির হলেন এবং তাঁকে আবু রাফির হত্যার সংবাদ দিলেন। রাসুল ﷺ-এর কাছে তাঁরা প্রত্যেকই আবু রাফিকে হত্যার দাবি করল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমাদের তরবারি দেখাও।' তিনি তরবারি দেখে বললেন, 'আব্দুল্লাহ বিন উনাইসের তরবারিতে খাদ্যের আলামত দেখা যাচ্ছে; তাই আব্দুল্লাহ বিন উনাইসই তাকে হত্যা করেছে।'[৮০৮]

কাব বিন আশরাফ ও আবু রাফির হত্যার কথা উল্লেখ করে হাসসান বিন সাবিত ﷺ কবিতায় বলেন :

> 'হে হুকাইকের পুত্র, হে আশরাফের পুত্র, কত সুপ্রসন্ন তোমাদের কপাল!
>
> তোমরা এমন এক বাহিনীর সাক্ষাৎ লাভ করেছ,
>
> যারা তোমাদের কাছে ধারালো তরবারিসহ আনন্দচিত্তে হাজির হয়েছিল,
>
> যেন তারা গহিন বনের সিংহ।
>
> তারা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল,
>
> তারপর অবশ্যম্ভাবী অস্ত্র দিয়ে তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত করেছিল।
>
> এভাবেই তাঁরা প্রিয় নবির সাহায্য করেছিল, এভাবেই দ্বীনের দুশমনকে লাঞ্ছিত করেছিল।

সে সময় ইসলামের বীর সেনানীগণ এভাবেই বিস্ময়কর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। একেক করে খতম করেছিলেন ইসলাম ও নবির যত দুশমন।[৮০৯]

---

৮০৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/-৩১৪-৩১৬, আদ-দুরার : ১৯৫-১৯৬ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৯৮-২০০ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯০-৯১। দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৯১-৩৯৫, ইবনুল আসির : ২/১৪৬-১৪৮।

৮০৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩১৬-৩১৭।

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﷺ-এর ইসলামপূর্ব জীবন সম্পর্কে আমরা জানতে পারিনি। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়কাল এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় তাঁর কর্মধারা সম্পর্কে আমাদের তেমন জানা নেই।

আমরা তাঁর পরিবার ও সন্তানাদি সম্পর্কেও তেমন জানি না। তবে আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে. তিনি একজন আনসারি সাহাবি। তিনি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

আমরা তাঁর সুদীর্ঘ জীবনী থেকে কেবল সামান্য কিছুই জানি। তিনি ১১ হিজরিতে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৮১০]

আবু রাফি হত্যার অভিযানের গুরুত্ব জানতে আমাদের আগে আবু রাফি সম্পর্কে জানতে হবে।

আবু রাফি ছিল ইহুদি গোত্র বনু নাজিরের লোক। ইহুদিদের প্রাণের দাবি ছিল, শেষ নবি কেবল ইহুদি জাতি থেকেই আসবেন। আরবের অন্য কোনো জাতি থেকে আসবেন না। রাসুল ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করলেন এবং আওস ও খাজরাজের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল ﷺ-এর পাশে জমা হলো, তখন ইহুদি পণ্ডিতরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে জান বাঁচানোর তাগিদে মুখে ইসলাম প্রকাশ করল আর অন্তরে কুফরি লুকিয়ে রাখল। মনে মনে রাসুল ﷺ-এর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পুষে রাখত। ফলে রাসুল ﷺ-কে বিপাকে ফেলার জন্য তারা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করত। তারা সত্যকে গোপন করার জন্য সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটাত। কুরআনে কারিম তাদের এহেন কর্মকাণ্ড রাসুল ﷺ-কে জানিয়ে দিত।

আবু রাফি সেসব ইহুদি পণ্ডিতদের একজন ছিল, যারা রাসুল ﷺ-এর প্রতি ঘৃণা রাখত এবং বিভিন্নভাবে রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দিত।[৮১১]

---

৮১০. আত-তাবারি : ৩/২৮১, ইবনুল আসির : ২/৩৬০।
৮১১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১৩৩-১৩৪।

রাসুল ﷺ যখন বনু নাজির গোত্রকে মদিনা থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন আবু রাফি খাইবারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবু রাফি একজন বড় ব্যবসায়ী হওয়ার পরও সুদি কারবারি করত। সে উসাইদ বিন হুজাইর ﷺ-এর কাছে এক বছর মেয়াদে এক লাখ বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঋণ পেত। মদিনা থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময় সে উসাইদ ﷺ-এর সাথে মূলধনের বিনিময়ে লেনদেনের সমাপ্তি ঘটায়। আর অতিরিক্ত সুদ বাদ দিয়ে দেয়।[৮১২] মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮০ হাজার। বনি নাজির গোত্রের গনিমত থেকে পাওয়া আবু রাফির তরবারিটি রাসুল ﷺ সাদ বিন মুআজ ﷺ-কে দিয়েছিলেন।[৮১৩]

আবু রাফি এবার খাইবারে গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটে। সে কুরাইশ, বনু গাতাফান, বনু কুরাইজা ও আরও কিছু গোত্রকে ফুসলিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য সম্মিলিত বাহিনী প্রস্তুত করে।[৮১৪] তার এসব ঘৃণ্য অপচেষ্টার ফলে মদিনায় সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ হয়। যা খন্দকের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। ইহুদিরা বলেছিল, 'মদিনার পতন হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদের সাথে থাকব।' এই ইহুদিরাই কুরাইশের কাছে দাবি করেছিল, ইসলামের চেয়ে কুরাইশের ধর্ম উত্তম।[৮১৫]

আবু রাফি ইসলামের একজন জঘন্য দুশমন ছিল। সে তার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যেত। মুসলিমদের প্রতি তার এতটাই বিদ্বেষ ছিল যে, মুসলিমদের কষ্ট দিতে না পারলে তার স্বস্তি মিলত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিমদের এ দুশমনকে শেষ করা কোনো সহজ ব্যাপার ছিল না। বিশেষত যখন কয়েকটি দুর্গঘেরা অঞ্চলের মাঝে তার বসবাস। যে অঞ্চলের রয়েছে ১০ হাজার প্রশিক্ষিত সেনা।[৮১৬] আছে জরুরি মুহূর্তে তিন হাজার সেনা প্রেরণের সক্ষমতা।[৮১৭] তাই এই দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কষ্টসাধ্য কাজটি কেবল আত্মোৎসর্গী বীর বাহাদুরের কাছেই ন্যস্ত করা যায়। আর সেই দুঃসাহসী বীর হলেন আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﷺ। যার বীরত্বের কথা লোকমুখে আলোচিত

---

৮১২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৭৪।
৮১৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৭৯।
৮১৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১৯০।
৮১৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/২২৯-২৩০।
৮১৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৭৩।
৮১৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৯৩।

ছিল। সেই আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﵁ নিজেই এ দুঃসাধ্য কাজটি সম্পন্ন করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন। ফলে রাসুল ﷺ তাঁকে সে কাজের আমির নিযুক্ত করেছিলেন। আর তিনি বীরত্বের সাথে বিস্ময়কর পদ্ধতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

অবশ্য নবম হিজরিতে আলি ﵁-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে যে গবাদি পশু ও গনিমত লাভ হয়েছিল, তা হিফাজতের দায়িত্ব আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﵁-কে দেওয়া হয়েছিল।[৮১৮] আর এ জাতীয় কাজে কেবল বিশ্বস্ত ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিকেই নিয়োগ দেওয়া হয়।

নিঃসন্দেহে তিনি সেই কমান্ডারদের একজন ছিলেন, যারা কোনো ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়; বরং আকিদা-বিশ্বাসের কারণেই ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। হয়তো সে কারণে আল্লাহ তাঁকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেছিলেন।

ইতিহাসে আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﵁

ইতিহাসে তিনি আব্দুল্লাহ বিন আতিক নামে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। রাসুল ﷺ-এর বর্তমানে তিনি একটি সেনা অভিযানের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পরে তিনি বাকি জীবন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে কাটিয়ে দেন।

তিনি নিজের জান রক্ষার্থে দ্বীনকে জলাঞ্জলি দেননি; বরং দ্বীনের তরে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।[৮১৯] ইসলামের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির প্রতি তাঁর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন।

---

৮১৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৩৮৮।
৮১৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৮৪।

যিনি ছিলেন দশম প্রতিনিধি

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা رضي الله عنه

তাঁর বংশপরিচিতি ও প্রাথমিক জীবন

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা বিন সালাবা বিন ইমরুউল কাইস বিন আমর বিন ইমরুউল কাইস বিন মালিক আল-আগার বিন সালাবা বিন কাব বিন খাজরাজ।[৮২০]

তাঁর মাতা : কাবশা বিনতে ওয়াকিদ বিন আমর বিন ইতনাবা বিন জাইদ বিন মানাহ বিন মালিক আল-আগার।[৮২১] এখানে এসে তাঁর মা-বাবা দুজনের বংশধারা একত্রে মিলে যায়।

তাঁর উপনাম ছিল আবু মুহাম্মাদ। আবার বলা হয়, আবু রওয়াহা।[৮২২] হয়তো তাঁর দুটোই উপনাম ছিল। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না।[৮২৩] তিনি ছিলেন নুমান বিন বাশির رضي الله عنه-এর মামা।[৮২৪] কারণ নুমান বিন বাশির رضي الله عنه-এর মা আমরাহ رضي الله عنها তাঁর বোন ছিলেন।[৮২৫]

---

৮২০. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৩৬৩ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৫।

৮২১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৫।

৮২২. উসদুল গাবাহ : ৩/১৫৬।

৮২৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৬। সেখানে আছে তিনি বাশির বিন সাদ رضي الله عنه-এর মামা। অথচ সঠিক কথা হলো বাশির বিন সাদ رضي الله عنه হলেন, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার বোনের স্বামী।

৮২৪. উসদুল গাবাহ : ৩/১৫৭।

৮২৫. আল-ইসতিবসার : ১১২ পৃ.।

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ জাহিলি যুগেই লিখতে জানতেন। লেখার গুণটি সে সময় অল্পসংখ্যক লোকের মাঝে ছিল।

তিনি সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮২৬] আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে তিনি রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত হন। এ বাইআতে ৭৫ জন[৮২৭] মতান্তরে ৭২ জন বাইআত গ্রহণকারীর মধ্য হতে রাসুল ﷺ ১২ জনকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেন। আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ তাঁদের একজন ছিলেন।[৮২৮]

রাসুল ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় মদিনার উপত্যকা বনু সালিম বিন আওফ গোত্রে জুমআর সালাত আদায় করেন। এটি ছিল মদিনায় সর্বপ্রথম জুমআর সালাত। তখন রাসুল ﷺ-এর কাছে বনু সালিম গোত্রের লোকেরা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের মাঝে অবস্থান করতে পারেন। আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ জনবল, শক্তি ও প্রস্তুতি আছে।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমরা উটনীকে ছেড়ে দাও। কারণ সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত।' রাসুল ﷺ-এর উটনী চলতে থাকল। এরপর হারিস বিন খাজরাজের বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে সাদ বিন রবি, খারিজা বিন জাইদ, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহ এবং বনু হারিসার আরও কিছু লোক রাসুল ﷺ-এর সামনে আসলো। তাঁরা রাসুল ﷺ-এর কাছে আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আসুন আমাদের মাঝে অবস্থান করুন। আমাদের জনবল, শক্তি ও প্রস্তুতি যথেষ্ট পরিমাণ আছে।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আমার উটনীকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত।'[৮২৯]

মদিনায় রাসুল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ ও মিকদাদ ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়িয়ে দেন।[৮৩০] ফলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ মদিনায় নতুন ইসলামি সমাজের একজন অন্যতম সদস্য হয়ে যান।

---

৮২৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/২৫৬।
৮২৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৬৩ এবং ২/৬৭।
৮২৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৬৭, আনসাবুল আশরাফ : ১/২৪৪, আদ-দুরার : ৭৫ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ৯৪ পৃ., আল-মুহাব্বার : ২৬৯ পৃ.।
৮২৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১১২, আদ-দুরার : ৯৩ পৃ., জাওয়ামিউ সিরাহ : ৯৪ পৃ.।
৮৩০. আদ-দুরার : ৯৯ পৃ.।

জিহাদের ময়দানে

রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে

বদর যুদ্ধের শুরুতে মুশরিক বাহিনী থেকে উতবা বিন রবিআ, শাইবা বিন রবিআ ও ওয়ালিদ বিন উতবা সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য আহ্বান করল। তাদের জবাব দেওয়ার জন্য আফরার দুই ছেলে আওফ ও মুয়াওয়িজ এবং আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা رضي الله عنه বের হলেন। তারা বলল, 'তোমরা আমাদের সমকক্ষ নও।' তারা কেবল তাদের আপন গোত্রীয় লোকদের সাথেই মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল। তাই হামজা رضي الله عنه, আলি رضي الله عنه ও উবাইদা বিন হারিস رضي الله عنه তাদের মোকাবিলার জন্য সামনে এলেন। হামজা رضي الله عنه শাইবাকে আর আলি رضي الله عنه ওয়ালিদকে চোখের পলকেই খতম করে দিলেন। আর উবাইদা رضي الله عنه ছিলেন তাঁদের মাঝে ছোট। তিনি উতবার মোকাবিলা করেন। কিন্তু তারা উভয়ে একে অপরকে আঘাত করে উভয়ে আহত হয়। তখন হামজা رضي الله عنه উতবাকে শেষ করে দিয়ে উবাইদা رضي الله عنه-কে রাসুল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসেন।[৮৩১]

অবশেষে এ যুদ্ধে যখন মুসলিমদের জয়লাভ হলো, তখন মুসলিমদের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে রাসুল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা رضي الله عنه-কে মদিনার উঁচু এলাকায় এবং জাইদ বিন হারিসাকে মদিনার নিচু এলাকায় প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা رضي الله عنه গিয়ে বললেন, 'হে আনসারিগণ, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। রাসুল ﷺ পরিপূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ আছেন। মুশরিকরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছে। আবু জাহেল, উতবা, শাইবা ও উমাইয়া বিন খালাফসহ অনেকে নিহত হয়েছে। সুহাইল বিন আমরসহ অনেকে বন্দী হয়েছে।' আসিম বিন আদি رضي الله عنه বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার কাছে গিয়ে বললাম, "আপনি যা বলছেন, তা কি সত্য?" তিনি বললেন, "অবশ্যই। ইনশাআল্লাহ, আগামীকালই বন্দীদের নিয়ে আল্লাহর রাসুল মদিনায় পৌঁছে যাবেন।" এরপর তিনি মদিনার ঘরে ঘরে এ সংবাদ পৌঁছে দিলেন। এ আনন্দমিছিলে মদিনার শিশুরাও তাঁর সঙ্গ দিয়েছিল।'[৮৩২]

---

৮৩১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৬৫, আদ-দুরার : ১১৪ পৃ., জাওয়ামিউ সিরাহ : ১১২-১১৩ পৃ.।
৮৩২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১১৪-১১৫।

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৮৩৩] উহুদ যুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর চাচা হামজা ﷺ-এর শাহাদাতের শোক জানাতে তিনি বনু হারিসের নারীদের রাসুল ﷺ-এর ঘরের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। নারীরা আনসারি নারীদের সাথে বিলাপ করা শুরু করলে রাসুল ﷺ তাঁদের কঠিনভাবে বারণ করেন।[৮৩৪]

উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে।[৮৩৫]

চতুর্থ হিজরির শাবান মাসে রাসুল ﷺ ওয়াদামতে দ্বিতীয় বদর যুদ্ধে যান।[৮৩৬] যাওয়ার সময় আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-কে মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান।[৮৩৭] সেখানে রাসুল ﷺ বদরের পানির কূপের কাছে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান তার ওয়াদামতে মুসলিমদের সাথে লড়াইয়ের জন্য বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়নি। ফলে মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসেন।[৮৩৮]

পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে খন্দক[৮৩৯] যুদ্ধের সময় বনু কুরাইজা চুক্তি ভঙ্গ করে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। রাসুল ﷺ তাদের চুক্তি ভঙ্গের কথা জানতে পেরে বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই করার জন্য আওস গোত্রের সর্দার সাদ বিন মুআজ, খাজরাজ গোত্রের সর্দার সাদ বিন উবাদাহ এবং তাঁদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ও খাওয়াত বিন জুবাইর ﷺ-কে প্রেরণ করেন। রাসুল ﷺ তাঁদের বললেন, 'তোমরা যাচাই করে দেখো, খবরটি সত্য কি না। সত্য হলে ব্যাপারটি আমার কাছে ইঙ্গিতে বলে দেবে, সাধারণ লোকদের বুঝতে দেবে না। আর যদি তারা চুক্তি আপন অবস্থায় রাখে, তবে তা সবার সামনে বলে দিয়ো।' তাঁরা বনু কুরাইজায় গিয়ে দেখলেন, চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারে যতটুকু জানা গেছে, বাস্তব অবস্থা তার চেয়ে আরও ভয়াবহ। তাঁরা ফিরে এসে রাসুল ﷺ-কে জানালেন, 'অবস্থা খুবাইব ও তাঁর সাথিদের সাথে মুশরিকদের

---

৮৩৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৬।
৮৩৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৮৭।
৮৩৫. তারিখু খলিফাহ ইবনি খইয়াত : ১/২৬, আল-ইবার : ১/৫।
৮৩৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/২২১।
৮৩৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৮৪।
৮৩৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/২২১-২২৩।
৮৩৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/২২৯।

প্রতারণার মতো।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহু আকবার। হে মুসলিম জাতি, সুসংবাদ গ্রহণ করো।'[৮৪০]

বনু কুরাইজার চুক্তিভঙ্গের খবরটি ছড়িয়ে গেল। ফলে মুসলিম বাহিনীতে ভীতি বেড়ে গেল। অবস্থা নাজুক আকার ধারণ করল।[৮৪১]

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার বোন আমরাহ বিনতে রওয়াহা তাঁর মেয়েকে দিয়ে স্বামী ও ভাইয়ের জন্য নাস্তা পাঠান। তাঁর ছোট মেয়েটি খাবার নিয়ে খন্দকের ময়দানে পৌঁছে দেখল রাসুল ﷺ সাহাবিদের মাঝে বসে আছেন। রাসুল ﷺ তাকে দেখে বললেন, 'ভাতিজি এসো, তোমার কাছে এসব কী?' সে বলল, 'বাবা আর মামার জন্য আমার মা নাস্তা পাঠিয়েছেন।' রাসুল ﷺ কাপড় বিছিয়ে দিতে বললেন। এরপর তার খেজুরগুলো কাপড়ে রাখা হলো। রাসুল ﷺ খন্দকে উপস্থিত লোকদের নাস্তার জন্য ডাকলেন। তাঁরা সকলে একত্রে সে নাস্তা খেলেন।[৮৪২]

সারিয়্যার কমান্ডার

এ অভিযানটি হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরির শাওয়াল মাসে উসাইর বিন রাজিমকে উদ্দেশ্য করে। খাইবারে আবু রাফি যখন নিহত হলো, তখন খাইবারবাসী তার স্থানে উসাইর বিন রাজিমকে নেতা মনোনীত করল। সে রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে গাতাফান ও অন্যান্য গোত্রকে যুদ্ধের জন্য একত্রিত করছিল। খবর শুনে রাসুল ﷺ রমাদান মাসে গোপনে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ-এর নেতৃত্বে তিন ব্যক্তির একটি দল প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদের কাছে উসাইর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁরা ফিরে এসে রাসুল ﷺ-কে তার সম্পর্কে খবর দিলেন। রাসুল ﷺ তখন লোকদের আহ্বান করলেন। ফলে ৩০ জন লোক এ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ তাঁদের কমান্ডার নিযুক্ত হলেন।

তাঁরা উসাইর বিন রাজিমের কাছে এসে বললেন, 'আপনার কাছে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার আগে আমরা আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই।' উসাইর

---

৮৪০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/২৩৭-২৩৮, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪২১।
৮৪১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৫৯, আদ-দুরার : ১৮৩ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৮৮ পৃ.।
৮৪২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৭২।

বলল, 'আচ্ছা। আমিও আপনাদের কাছে নিরাপত্তা চাই।' এবং তাঁরা বললেন, 'রাসুল ﷺ আমাদেরকে আপনার কাছে একটি প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি রাসুল ﷺ-এর কাছে গেলে তিনি আপনাকে খাইবারের দায়িত্বে নিযুক্ত করে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।' প্রস্তাব শুনে উসাইর রাজি হয়ে গেল। সঙ্গে ৩০ জন ইহুদি নিয়ে সে সাহাবিদের সাথে রওয়ানা হলো। প্রত্যেক ইহুদির পেছনে একজন করে মুসলিম থাকল। তারা যখন কারকারা সিবার[৮৪৩] নামক স্থানে পৌঁছল, তখন উসাইর এ সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত হলো। সে মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করার ইচ্ছা করল। সে অভিযানে আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ-ও ছিলেন। তিনি বলেন, 'সে তরবারির দিকে মনোযোগ দিলে বিষয়টি আমি বুঝতে পারলাম। মনে মনে বললাম, 'হে আল্লাহর দুশমন, প্রতারণার করতে চাচ্ছ?' আমি আমার সওয়ারি দ্রুত চালিয়ে দিলাম এবং সবাইকে নিয়ে পানি পান করার জন্য অবতরণ করলাম। একপর্যায়ে উনাইস আমার সাথে একাকী হয়ে গেলে আমি তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করলাম। আমি তার পায়ে এবং রানে আঘাত করলাম। সে উটনী থেকে পড়ে গেল। তার হাতে একটি লাঠি ছিল। সেটা দিয়ে সে আঘাত করে আমার মাথা ফাটিয়ে দিল। তখন আমরা তার সাথি-সঙ্গীদের ওপর হামলা করে সকলকে হত্যা করে ফেললাম। আমাদের সকলেই বেঁচে গেল। আমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনার বিবরণ দিলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের জালিমদের থেকে রক্ষা করেছেন।'[৮৪৪]

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ তাঁর দায়িত্ব আদায়ে এমন দক্ষতা ও উত্তম কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে, সেখানে মুসলিমদের কোনো ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

---

৮৪৩. খাইবার থেকে মদিনার দিকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত স্থান। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/৫।
৮৪৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯২-৯৩, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৬৬৫৬৮, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৯২-২৯৩, উয়ুনুল আসার : ২/১১১, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৮।

মুতা অভিযানের পূর্বে[৮৪৫]

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ খাইবার অভিযান থেকে ফিরে এসে হুদাইবিয়া এরপর খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৮৪৬] খাইবার যুদ্ধে যাওয়ার পথিমধ্যে রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি কি আমাদের কাফেলাকে আন্দোলিত করবে না?' তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ সওয়ারি থেকে নেমে গাইতে লাগলেন :

> 'হে আল্লাহ, আপনার দয়া না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না, সালাত-সদাকা কিছুই করতাম না।
>
> আমাদের প্রতি বিশেষ রহমত নাজিল করুন, শত্রুর দেখা হলে আমাদের পদদ্বয়কে অবিচল রাখুন।
>
> মুশরিকরা তো আমাদের ওপর বিদ্রোহ করে বসেছে।'

কবিতা শুনে রাসুল ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ, তাঁর প্রতি রহম করুন।' উমর বিন খাত্তাব ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাঁর জন্য তো জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল।' আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ মুতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৮৪৭]

রাসুল ﷺ যখন খাইবারের ভূমি মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন, তখন খাজরাজের শাখাগোত্র বনু হারিসকেও একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল। প্রতি ১০০ জনের মধ্য থেকে একজনকে একটি নির্ধারিত অংশ দেওয়া হতো। এরপর ওই অংশকে ১০০ জনের মাঝে বণ্টন করা হতো। বনু হারিসের মধ্য থেকে অংশের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ।[৮৪৮]

খাইবারের বাগানে মুকুল আসার পর রাসুল ﷺ খাইবারবাসী ও মুসলিমদের মাঝে ফল নির্ধারণ করার জন্য একজন অনুমানকারী পাঠাতেন। তিনি অনুমান করে ইহুদিদের ওপর একটা পরিমাণ ধার্য করে দিতেন। যদি তারা বলত,

---

৮৪৫. সিরিয়ার সীমানায় বলকার একটি গ্রাম, যা আজরাহ থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/১৯০।

৮৪৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৬।

৮৪৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৩৯। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৬।

৮৪৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৮৯-৬৯২ এবং ২/৭১৮।

'আমাদের ওপর পরিমাণটা বেশি করে ফেললেন।' তখন তিনি বলতেন, 'তোমরা চাইলে এটা তোমাদের হবে নতুবা আমাদের হবে।' তখন ইহুদিরা বলত, 'এর ভিত্তিতে আসমান-জমিন টিকে আছে।'

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ এক বছর ইহুদিদের ওপর অনুমান করে ফল নির্ধারণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৮৪৯]

সপ্তম হিজরিতে উমরাতুল কাজায় তিনিও উপস্থিত ছিলেন।[৮৫০] সে সময় রাসুল ﷺ মক্কায় প্রবেশকালে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ রাসুল ﷺ-এর উটনীর লাগাম ধরে টানছিলেন আর আবৃত্তি করে বলছিলেন :

> 'হে কাফের সম্প্রদায়, রাসুল ﷺ-এর পথ ছেড়ে দাও। সরে দাঁড়াও, কারণ সমস্ত কল্যাণ তাঁর মাঝে রয়েছে।
>
> হে আমার রব, আমি তাঁর কথায় চির বিশ্বাসী, তা গ্রহণ করা আল্লাহর হক বলে জানি।
>
> আমরা তাঁর ইশারাকে কমান্ড করে তোমাদের হত্যা করব, যেমন প্রত্যক্ষ নির্দেশে তোমাদের হত্যা করি।
>
> তোমাদের মস্তকে বিচূর্ণকারী আঘাত করব, যে আঘাতে নিজের ঘনিষ্ঠজনকেও ভুলে যাবে।'

তখন উমর বিন খাত্তাব ﵁ বললেন, 'হে রওয়াহার পুত্র, রাসুলের সামনে হেরেমের ভেতরে এমন কবিতা আবৃত্তি করছ!' রাসুল ﷺ বললেন, 'হে উমর, তাঁকে বলতে দাও। ওই সত্তার শপথ—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কাফিরদের জন্য তাঁর কথা বর্শার আঘাতের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক।'[৮৫১]

---

৮৪৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪০৯, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৯১।
৮৫০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৬।
৮৫১. আল-ইসাবাহ : ৪/৬৭, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৭৩৬, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৭।

মুতা অভিযান

অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে রাসুল ﷺ শামের দিকে তিন হাজারের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেন পর্যায়ক্রমে জাইদ বিন হারিসা ؓ, তিনি শহিদ হলে কমান্ডার হবে জাফর বিন আবু তালিব ؓ, তিনি শহিদ হলে কমান্ডার হবে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ। বাহিনীর সকল সৈনিক অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল।

তাঁরা রওয়ানা হওয়ার সময় লোকেরা রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারদের বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। কিন্তু যখন অন্য কমান্ডারদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ-কেও বিদায়-সম্ভাষণ জানানো হলো, তখন তিনি কেঁদে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কাঁদছেন কেন, হে রওয়াহার পুত্র!' তিনি বললেন, 'আমি দুনিয়ার মায়া কিংবা আপনাদের প্রতি ভালোবাসার কারণে কাঁদছি না। আমি এ কারণে কাঁদছি, আমি রাসুল ﷺ-কে এ আয়াতখানা পড়তে শুনেছি। যেখানে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আলোচনা করে বলেছেন :

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

> 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার রবের অনিবার্য ফায়সালা।'[৮৫২]

আমি জানি না, জাহান্নামে পৌঁছার পর কীভাবে তা অতিক্রম করব।' তখন লোকেরা বলল, 'আল্লাহ তোমার সাথে থাকুন। তোমাদের থেকে অনিষ্টতা দূরে রাখুন এবং সুস্থ ও নিরাপদে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনুন।' তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ গেয়ে উঠলেন :

> 'কিন্তু আমি তো আল্লাহর ক্ষমার আশা রাখি, আকাঙ্ক্ষা করি রক্ত প্রবাহকারী একটি চূড়ান্ত আঘাতের।
>
> অথবা ধূর্ত ঘাতকের হাতে প্রাণসংহারী আঘাতের, যে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হবে আমার নাড়ি ও কলিজা।

---

৮৫২. সুরা মারইয়াম, ১৯ : ৭১।

যাতে কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলা হয়, আল্লাহ এই যোদ্ধাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেছেন।'

মুসলিম বাহিনীকে বিদায় জানানোর জন্য রাসুল ﷺ মদিনার বাইরে আসেন। তিনি বিদায় জানিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা رضي الله عنه বলে উঠলেন :

'শান্তিধারা অবিরাম হোক তাঁর ওপর, যাকে বিদায় জানালাম। তিনি শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তিনি শ্রেষ্ঠ বিদায়-সম্ভাষণীয়।'

মুসলিম বাহিনী গন্তব্যপানে চলতে থাকল এবং শামের মুআন[৮৫৩] এলাকায় গিয়ে অবতরণ করল। তাঁরা জানতে পারল, রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াস বালকান রাজ্যের মাআব[৮৫৪] এলাকায় এক লক্ষ রোমান সৈনিক নিয়ে অবস্থান করছে। লাখাম, জুজাম, ইয়ালকাইন, বাহরা ও বালিয়্যা অঞ্চল থেকে আরও এক লক্ষ যোদ্ধা তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। তাদের নেতৃত্বে আছে বালিয়্যা অঞ্চলের এক লোক। এবং তার সহযোগী হিসেবে আছে মালিক বিন ফাজান। এ সংবাদ যখন মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছল, তখন তাঁরা মুআন এলাকায় দুদিন অবস্থান করে নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল। তাঁরা বললেন, 'আমরা এ সম্পর্কে রাসুল ﷺ-কে অবগত করি। হয়তো আমাদের সাহায্যে সৈন্য পাঠাবেন অথবা কোনো নির্দেশ দেবেন, সে নির্দেশমতো আমরা কাজ করব।' তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা رضي الله عنه এক উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দান করলেন, 'হে আল্লাহর সৈনিকেরা, আল্লাহর শপথ, আপনারা তো যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, সেটাকেই অপছন্দ করছেন। আপনারা তো শাহাদাতের সন্ধানে বের হয়েছেন। আমরা কোনো সৈন্যসংখ্যা বা অস্ত্রের বলে যুদ্ধ করি না। আমরা তো কেবল এ দ্বীনের জন্য লড়াই করে থাকি। যে দ্বীনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন! সামনে চলুন। কারণ দুটি কল্যাণের কোনো একটি তো লাভ হবেই। হয়তো বিজয় নয়তো শাহাদাহ।' তখন সকলে বলে

---

৮৫৩. বালকা অঞ্চলের দিক হতে হিজাজের দিকে সিরিয়ার মরুঅঞ্চলের একটি শহরের নাম মুআন। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/৯৩। বর্তমানে তা জর্ডানের একটি শহর।

৮৫৪. বালকা অঞ্চলের দিক থেকে সিরিয়ার এক পার্শ্বে অবস্থিত একটি শহরের নাম মাআব। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৭/৩৪৯।

উঠল, 'রওয়াহার পুত্র ঠিকই বলেছে।' এরপর মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হলো। এ সময় আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ আবৃত্তি করতে লাগলেন :

'ঘোড়াগুলো হাঁকিয়েছি ফারআর আজা পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে, যার ঘাস দেখে মাতোয়ারা হয়েছিল ঘোড়াগুলো।

ঘোড়াগুলোকে স্বচ্ছ পিচ্ছিল সাদা পাথরের মোজা পরিয়েছি, যেন সে মোজার পাতাগুলো উন্নত চামড়া।

মুআনে দুদিন ধরে বিশ্রামে কাটে, বিশ্রামের পরে সেগুলো পুরো তাজাদম ফুরফুরে।

ফলে এখন রওয়ানা হয়েছি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া নিয়ে, যেগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে তপ্ত বাতাসে।

কেন যাব না, অবশ্যই মাআবের রণাঙ্গনে যাব আমরা; যদিও সেখানে রোম আরবের সকল বাহিনী আসে।'

যাহোক, মুসলিম বাহিনী তাঁদের লক্ষ্যপানে ছুটতে লাগল। সে সময় জাইদ বিন আরকাম ﵁ আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁-এর তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত হচ্ছিলেন। এ সফরে তিনিও তাঁর সাথে বের হন। আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ তাঁকে সওয়ারির পেছনে করে নিয়েছিলেন। জাইদ বিন আরকাম ﵁ এক রাতে শুনতে পেলেন, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ আবৃত্তি করছেন :

'প্রিয় সওয়ারি, যখন আমায় বহন করে পৌঁছে দেবে, হিসা পানির উৎসের পরে চার মানজিল দূরে।

তখন তোমার অবস্থা সুখকর হবে, লাঞ্ছনা বিদায় নেবে, আর আমি যেন আমার পরিবারের কাছে ফিরে না যাই।'

এ কবিতা শুনেই জাইদ বিন আরকাম ﵁ কেঁদে দিলেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ তাঁকে চুপ করিয়ে বললেন, 'আরে বোকা, আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করলে তোমার ক্ষতি কোথায়? তখন তো তুমি আমার সওয়ারিতে খুব আরাম করে বাসায় ফিরতে পারবে।'

মুসলিম বাহিনী বালকা এলাকার তুখুম জায়গা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মুতা প্রান্তরে শত্রুর মুখোমুখি হলো। মুসলিম বাহিনী সৈন্য বিন্যাস করে শত্রুর সামনে অবস্থান নিল। ডানপাশের বাহিনীর নেতৃত্বে থাকল কুতবাহ বিন কাতাদা। যিনি বনু উজরাহর লোক। বামপাশের বাহিনীর নেতৃত্বে থাকল উবাদাহ বিন মালিক আল-আনসারি।

যুদ্ধ শুরু হয়ে ডানে বামে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে জাইদ বিন হারিসা ﷺ রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডা হাতে নিয়ে লড়ে গেলেন। একপর্যায়ে বর্শার আঘাতে রক্ত ঝরতে ঝরতে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। এরপর জাফর বিন আবু তালিব ﷺ ঝান্ডা হাতে নিয়ে লড়তে থাকলেন। যুদ্ধ যখন অগ্নিমূর্তি ধারণ করল তখন তিনি লড়তে লড়তে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তাঁর ঘোড়াকে হত্যা করা হয়। তিনি শত্রুর সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করেন। ইসলামে তিনিই সর্বপ্রথম ঘোড়াসহ নিহত হন। তিনি শত্রুর সাথে লড়াই করার সময় এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন :

> 'আহা, কত নয়নাভিরাম জান্নাত, কত সন্নিকটে তা! কী যে উত্তম, কত মধুময় তার সুপেয় পানি!
>
> রোমের কথা কী বলব, তাদের মাথার ওপর শাস্তি এসে গেছে, যখন আপনজন ছেড়ে কাফির হয়ে মরছে।
>
> হাতের নাগালে পাওয়ামাত্রই তাদের আঘাত হেনে বসব।'

জাফর ﷺ ডান হাতে ঝান্ডা ধারণ করেছিলেন। তাঁর ডান হাত কেটে গেলে বাম হাতে ঝান্ডা ধারণ করেন। বাম হাত কেটে গেলে উভয় বাহু দিয়ে ইসলামের ঝান্ডা বুকে জড়িয়ে ধরেন। এরপর কাফিররা তাঁর মস্তক আলাদা করে দেয়। শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর। একটি দুর্বল বর্ণনামতে সেদিন তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল।

তাঁর পরে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ ঝান্ডা তুলে নিলেন এবং ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়লেন। সে সময় তাঁর মন তাঁকে সংকোচে ফেলে দিয়েছিল। তখন তিনি মনকে বলেছিলেন :

'হে মন, আমি শপথ করেছি, তুমি অবশ্যই যুদ্ধে নামবে, হয়তো স্বেচ্ছায় নামবে, নয়তো বাধ্য হয়ে নামবে।

যদি মানুষ তার মনকে টেনে এনে ধনুকের তারে ঝঙ্কার তোলে, তবে তুমি কেন জান্নাতকে অপছন্দ করছ?

কতকাল ধরে তুমি প্রশান্ত হয়ে আছ, তুমি তো কেবল মাটির মাত্রে এক ফোঁটা পানিমাত্র।'

তিনি আরও বলেন :

'হে মন, তুমি নিহত না হলে মৃত্যুবরণ তো করবে, মৃত্যুর এ নিয়তেই তুমি বেড়ে উঠেছ।

তুমি যা প্রত্যাশা করতে সেটাই তোমাকে দেওয়া হয়েছে, ওই দুজনের মতো করলে তবে তুমি সফল হবে।'

তাঁর এক চাচাতো ভাই গোশতওয়ালা একটি হাড্ডি এনে বলল, 'এটা খেয়ে কোমরটা সোজা করুন। কারণ আপনি এ কয়দিনে এতটুকু খাবার পাননি।' তিনি তাঁর হাত থেকে সেটা নিয়ে এক কামড় খেলেন। এরপর তিনি মানুষের মাঝে শোরগোল শুনতে পেলেন। তখন তিনি মনকে বললেন, 'তুমি এখনো দুনিয়াতে।' এ বলে তিনি তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবং লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন।

সাবিত বিন আরকাম ﷺ ঝান্ডা তুলে নিয়ে বললেন, 'হে মুসলিমগণ, আপনাদের থেকে একজনকে নির্ধারণ করুন।' লোকেরা বলল, 'আপনি।' তিনি বললেন, 'আমি এর যোগ্য নই।' তখন লোকেরা খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-কে নির্ধারণ করলেন। খালিদ ﷺ ঝান্ডা নিয়ে শত্রু বাহিনীকে পেছনে ঠেলে দিলেন এবং তাদের দূরে সরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে একত্র করে পেছনে সরে আসলেন। এরপর সকলকে নিয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হলেন।

মুসলিম বাহিনী মদিনার নিকটবর্তী হলে রাসুল ﷺ ও অন্যান্য সাহাবিগণ তাঁদের স্বাগত জানালেন। শিশু বালকরাও এসে তাঁদের স্বাগত জানাল। রাসুল ﷺ সওয়ারিতে করে মুসলিম বাহিনীর সামনে চললেন। তিনি বললেন, 'তোমরা

তোমাদের সন্তানদের নাও। আমাকে জাফরের সন্তান দাও।' আব্দুল্লাহ বিন জাফরকে আনা হলো। রাসুল ﷺ তাঁকে নিজের সামনে বসালেন। লোকেরা বলতে লাগল, 'তোমরা কি আল্লাহর রাস্তা ছেড়ে পলায়ন করেছ!' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তাঁরা পলায়ন করেনি। আল্লাহ চান তো অচিরেই তাঁরা পালটা আক্রমণ করবে।'[৮৫৫]

অবশেষে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ চির সুখের নিদ্রায় চলে গেলেন। তিনি তাঁর হাত, মুখ এবং সম্পদসহ সব দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দ্বীনের ঝান্ডা উঁচু রেখেছিলেন। মৃত্যুকোলে ঢলে পড়েছেন; কিন্তু ইসলামের পতাকাকে অবনমিত হতে দেননি। এভাবেই ইসলামের জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। যারা জীবনের মায়ায় জিহাদ থেকে পেছনে বসে থাকে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে এবং আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ-ও মৃত্যুবরণ করছে; কিন্তু দুজনের মৃত্যুর মাঝে কত ব্যবধান!

ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন

১. কবি

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ রাসুল ﷺ-এর একজন অন্যতম কবি ছিলেন। যাঁরা মুখের মাধ্যমে ইসলামের দুশমনদের প্রতিহত করতেন। তাঁরা হলেন কাব বিন মালিক আসলামি, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা, হাসসান বিন সাবিত ؓ। হাসসান বিন সাবিত ؓ ছিলেন বনু নাজ্জার গোত্রের আর বাকিরা ছিলেন খাজরাজ গোত্রের।[৮৫৬]

খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসুল ﷺ সাহাবিদের সাথে মাটি কাটেন। রাসুল ﷺ-এর বুক মাটিতে ভরে গিয়েছিল। রাসুল ﷺ তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ-এর সুরে সুর মিলিয়ে বলছিলেন :

---

৮৫৫. বিস্তারিত জানতে দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪২৭-৪৪৭, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৫৫-৭৬৯, জাওয়ামিউস সিরাহ : ২২০-২২২, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৮-১৩০, আদ-দুরার : ২২২-২২৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৮০, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/২৪১-২৫৩, সহিহুল বুখারি : ৩/১৪৩, তাবারি : ৩/৩৬-৪২, ইবনুল আসির : ২/২৩৪-২৩৮,

৮৫৬. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৮, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/২৫৮।

'হে আল্লাহ, তুমি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, সালাত পড়তাম না এবং সদাকা করতাম না।

তাই আমাদের ওপর নাজিল করুন আপনার সাকিনা, আমাদের পা অবিচল রাখুন, যদি শত্রুর মুখোমুখি হই।

পূর্বের লোকেরা আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, আমাদের সামনে কুফর পেশ করলে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি।'

হিশাম বিন উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার চেয়ে অতি দুঃসাহসী এবং অতি দ্রুত কবিতা বানাতে সক্ষম আর কাউকে দেখিনি। একদিন তাঁকে উদ্দেশ্য করে রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনলাম, 'এক মিনিটে একটি কবিতা বলো দেখি, পারো কি না। আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি।' তখন তিনি ওই মুহূর্তে গেয়ে উঠলেন।

রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তোমাকেও অবিচল রাখুন হে রওয়াহার পুত্র।' হিশাম বিন উরওয়া বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তমভাবে অবিচল রেখেছিলেন। তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যায় আর তিনি তাতে দাখিল হন।'

বর্ণিত আছে তিনি যখন কবিতায় বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে যে কল্যাণ দান করেছেন, তা অটল রাখুন।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমার জন্যও এ দুআ থাকল হে কবিদের সর্দার।'[৮৫৭]

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমাদের একজন ভাই আছে, যে অশালীন কথা বলে না।' এটা তিনি তাঁর কবিতার কারণে বলেছেন।

তিনি উপস্থিত মেধাসম্পন্ন দক্ষ কবি ছিলেন। তিনি মজবুত ও গুরুগম্ভীর সুরে কবিতা আবৃত্তি করতেন। ইসলাম ও মুসলিমদের খিদমতে তিনি তাঁর কবিতা রচনা করতেন।

---

৮৫৭. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯৩, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৮।

২. তিনি আলেম ছিলেন

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ জাহিলি যুগ থেকে লিখতে জানতেন। যেটা আমরা আগেও বলেছি। তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

فَنَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا

'রাসুল ﷺ (সফর থেকে ফিরে) রাতে বাড়িতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন।[৮৫৮]

তিনি রাসুল ﷺ থেকে আরও বর্ণনা করেন :

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ

'রাসুল ﷺ আমাদের কাউকে নাপাক অবস্থায় কুরআন মাজিদ পড়তে নিষেধ করেছেন।'[৮৫৯]

তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ অজু করে উভয় মোজার ওপর মাসেহ করেছেন।'[৮৬০]

এ ছাড়াও তিনি বিলাল ﷺ-এর সূত্রে রাসুল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেন তাঁর ভাগিনা নুমান বিন বাশির বিন সাদ, আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আনাস ﷺ। তাঁর থেকে মুরসাল সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন, আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা, কাইস বিন আবি হাজিম, উরওয়া বিন জুবাইর, আতা বিন ইয়াসার, জাইদ বিন আসলামা, ইকরিমা, বনু নাওফালের আজাদকৃত গোলাম আবুল হাসান, আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান।[৮৬১]

---

৮৫৮. দেখুন, মুখতাসারু শারহিল জামিয়িস সগির লিল মুনাওয়ি : ২/৩৪৩। হাদিসটি সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৫৭৩৬। দেখুন, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯০।
৮৫৯. সুনানু দারাকুতনি : ৪৩১; হাফিজ ইবনি হাজার ﷺ বিলাল ﷺ থেকে তাঁর সাথে এবং উসামা বিন জাইদের সাথে সনদযুক্ত করেছেন। দেখুন, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯০।
৮৬০. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯০।
৮৬১. তাহজিবুত তাহজিব : ৫/২১২। দেখুন, আল-ইসতিআব : ৩/৮৯৮।

তাঁর হাদিস বুখারি, সুনানে নাসায়ি ও সুনানে ইবনে মাজাতে এসেছে। ইমাম বুখারি ﷺ একক সূত্রে তাঁর একটি মাওকুফ হাদিস বর্ণনা করেছেন[৮৬২] এবং রাসুল ﷺ-এর সূত্রে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৮৬৩] তিনি সাহাবিদের মাঝে ফতোয়া দানকারী ছিলেন।[৮৬৪] তিনি রাসুল ﷺ-এর পক্ষ হয়ে লিখতেন।[৮৬৫]

৩. আল্লাহভীতি

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ ছিলেন রাসুল ﷺ-এর সেই কবিদের একজন, যাঁরা রাসুল ﷺ-এর পক্ষে কবিতার ভাষায় লড়তেন এবং রাসুল ﷺ-কে কষ্টদায়ক উক্তি থেকে রক্ষা করতেন। এই আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা, হাসসান বিন সাবিত ও কাব বিন মালিক ﷺ সম্পর্কে এই আয়াতটি নাজিল হয়—

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

'তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে, আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।'[৮৬৬]

আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'কোনো এক সফরে আমরা রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরমের। গরমের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য লোকেরা মাথায় হাত দিয়ে রেখেছিল। সফরসঙ্গীদের মাঝে কেবল রাসুল ﷺ ও আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ সিয়ামরত ছিলেন।'[৮৬৭]

তিনি একদিন কাঁদছিলেন। তাঁকে দেখে তাঁর স্ত্রীও কাঁদছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?' তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন, 'আপনাকে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদছি।' তখন তিনি বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি,

---

৮৬২. খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল : ১৯৭।
৮৬৩. আসমায়িস সাহাবাতির রুওয়াত- মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ : ৩১০।
৮৬৪. আসহাবুল ফুতইয়া মিনাস সাহাবাহ- মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ : ৩২২।
৮৬৫. আল-ইসাবাহ : ৪/৬৬।
৮৬৬. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২২৭।
৮৬৭. আল-ইসতিআব : ৩/৯০০, আল-ইসতিবসার : ১১০ পৃ.।

আমি জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করব; তাই জানি না, আমি তা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারব কি না!'[৮৬৮]

আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, 'কত উত্তম লোক আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা!' আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ বলেন, 'ইবনে রওয়াহার ওপর আল্লাহ রহম করুন। যেখানেই তাঁর সালাতের সময় হয়েছে, সেখানেই সে উটনী থামিয়ে সালাত আদায় করেছে।'[৮৬৯]

তিনি যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন সালাত পড়তেন। আবার যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখনও সালাত পড়ে বের হতেন।[৮৭০]

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমরা এক সফরে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা প্রচুর বৃষ্টি ও কাদামাটির মাঝে পড়ে গেলাম। রাসুল ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন, আমরা যেন নিজ নিজ সওয়ারির ওপর সালাত আদায় করি। আমরা সবাই তা-ই করলাম। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ সওয়ারি থেকে নেমে মাটির ওপর সালাত পড়লেন। তখন আমাদের এক ব্যক্তি তাঁর ব্যাপারটি নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি লোকদের আপন আপন সওয়ারিতে সালাত আদায় করতে বলেছেন। তারা সেভাবেই করেছে। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা মাটির ওপর সালাত পড়েছে। তখন রাসুল ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "সে তাঁর প্রমাণ নিয়েই তোমাদের কাছে হাজির হবে।" তিনি উপস্থিত হলে রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, "হে রওয়াহার পুত্র, আমি লোকদের তাঁদের সওয়ারির ওপর সালাত পড়তে বলেছি; কিন্তু তুমি জমিনের ওপর সালাত পড়েছ!" আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এমন এক সত্তা, যাঁকে আল্লাহ মুক্তি দিয়েছেন। আমি এ কারণে জমিনে নেমেছি, আমি এমন এক সত্তা, যাঁকে এখনো মুক্তি দেওয়া হয়নি।" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদের বলিনি, সে তাঁর প্রমাণ উপস্থাপন করবে।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার মতো নই। আপনি (জাহান্নাম

৮৬৮. আল-ইসতিবসার : ১১০ পৃ.।
৮৬৯. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯০।
৮৭০. আল-ইসতিবসার : ১১০ পৃ.।

থেকে) মুক্ত স্বাধীন আর আমরা পরাধীন।" ফলে তাঁর এ কাজের কারণে দোষারোপ করা হয়নি।'[৮৭১]

আবু দারদা ﷺ বলেন, 'আমি এমন কোনো দিন অতিবাহিত করলাম, আর সেদিন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহাকে স্মরণ করলাম না—এর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। তিনি সামনের দিক থেকে আমার সাক্ষাৎ পেলে আমার বুকে মৃদু আঘাত করতেন। আবার পেছনের দিক থেকে সাক্ষাৎ পেলে আমার ঘাড়ে মৃদু আঘাত করতেন। এরপর বলতেন, "হে উয়াইমির, এসো, কিছুক্ষণ বসে পরস্পর ইমানি আলোচনা করি।" আল্লাহ যতটুকু তাওফিক দিতেন, ততটুকু সময় বসে আমরা ইমানি আলোচনা করতাম। এরপর তিনি বলতেন, "হে উয়াইমির, এগুলো হলো ইমানের মজলিশ।"'[৮৭২]

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-এর নিয়ম ছিল। তাঁর কোনো সাথির সাথে দেখা হলে বলতেন, 'এসো, কিছুক্ষণ আমাদের রবের ওপর ইমান সম্পর্কে আলোচনা করি।' একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে এ কথা বললে লোকটি রেগে গিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি দেখেন না, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা আপনার ইমান বাদ দিয়ে কিছু সময়ের ইমানি আলোচনা করার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে!' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'রওয়াহার পুত্রের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। সে তো সেসব মজলিশকে ভালোবাসে, যে মজলিশগুলোকে ফেরেশতারা ঘিরে ধরে।'[৮৭৩]

একদিন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ রাসুল ﷺ-এর খুতবা চলাকালে হাজির হলেন। তিনি রাসুল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনলেন, 'আপনারা বসুন।' তখন তিনি মসজিদের বাইরেই বসে পড়েন। রাসুল ﷺ যখন খুতবা থেকে ফারিগ হলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার এ ব্যাপারটি জানতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের প্রতি তোমার আগ্রহকে আল্লাহ আরও বাড়িয়ে দিন।'[৮৭৪]

---

৮৭১. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯০-৩৯১।
৮৭২. উসদুল গাবাহ : ৩/১৫৭।
৮৭৩. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯১, আল-ইসাবাহ : ৪/৬৬।
৮৭৪. উসদুল গাবাহ : ৩/১৫৭, আল-ইসাবাহ : ৪/৬৬, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯১।

তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁর এক স্ত্রীকে বিয়ে করে। সে তাঁকে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-এর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি যখন ঘর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন দুই রাকআত সালাত পড়তেন। আবার যখন ঘরে আসতেন, তখনও দুই রাকআত সালাত পড়তেন। এ আমল তিনি কখনো ছাড়তেন না।'[৮৭৫]

একবার রাসুল ﷺ কিছু সাহাবির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলার আলোচনা করে শুনাচ্ছিলেন। রাসুল ﷺ-কে দেখে তিনি চুপ করলেন। তখন রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, 'তোমার সাথিদের সাথে আলোচনা করো।' তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার চেয়ে আপনি বেশি হকদার।' রাসুল ﷺ বললেন, 'শোনো, তোমরা তো সেই লোক, যাদের সাথে বসতে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاۦ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ডাকে। এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে নিজের দৃষ্টিকে তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা-অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।'[৮৭৬]

এরপর রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমাদের যে পরিমাণ লোক বসে আল্লাহর আলোচনা করে, ঠিক ওই পরিমাণ ফেরেশতা তাদের সাথে বসে আল্লাহর আলোচনা করে। যদি তারা আল্লাহর প্রশংসা করে, তবে ফেরেশতারাও আল্লাহর প্রশংসা

---

৮৭৫. আল-ইসাবাহ : ৪/৬৬।
৮৭৬. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ২৮।

করে। তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করলে ফেরেশতারাও আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করে। তারা আল্লাহর বড়ত্ব বয়ান করলে ফেরেশতারাও আল্লাহর বড়ত্ব বয়ান করে। যদি তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে ফেরেশতারা আমিন আমিন বলে। এরপর ফেরেশতারা তাদের রবের কাছে চলে যায়। তখন রব তাদের জিজ্ঞাসা করে বলেন—অথচ তিনি তাদের চেয়ে বেশি জানেন—"তোমরা কোত্থেকে এসেছ?" ফেরেশতারা বলে, "হে আমাদের রব, জমিনে আপনার কিছু বান্দা আপনার আলোচনা করেছে, আমরাও তাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম।" আল্লাহ বলেন, "তারা কী বলেছে?" ফেরেশতারা বলে, "হে আমাদের রব, তারা আপনার প্রশংসা করেছে।" আল্লাহ বলেন, "সর্বপ্রথম কার ইবাদত করেছে এবং সবশেষে কার প্রশংসা করেছে?" ফেরেশতারা বলে, "তারা আপনার পবিত্রতা বয়ান করেছে।" আল্লাহ বলেন, "আমার প্রশংসা অন্য কারও জন্য দেওয়া সমীচীন নয়।" ফেরেশতারা বলে, "হে আমাদের রব, তারা আপনার বড়ত্ব বয়ান করেছে।" আল্লাহ বলেন, "আসমান-জমিনের সকল বড়ত্ব আমারই। আমি মহা পরাক্রমশালী মহা প্রজ্ঞাময়।" ফেরেশতারা বলেন, "হে আমাদের রব, তারা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।" আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।" ফেরেশতারা বলে, "হে আমাদের রব, তাদের মাঝে তো অমুক অমুক ব্যক্তি অবস্থান করছে!" আল্লাহ বলেন, "তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের সঙ্গে উপবেশনকারীরা হতভাগ্য হয় না।'"[৮৭৭]

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ তাঁর কোনো এক সাথিকে বললেন, 'আসো, কিছুক্ষণ ইমানি আলোচনা করি।' সে সাথি বলল, 'আমরা কি মুমিন নই?' তিনি বললেন, 'কেন নই; বরং আল্লাহর আলোচনা করব, তাহলে আমাদের ইমান বৃদ্ধি পাবে।' তাঁর নিয়ম ছিল, কোনো সাথির হাত ধরে বলতেন, 'আমাদের সাথে বসুন, কিছুক্ষণ ইমানি আলোচনা করি। এতে আমাদের জিকিরের মজলিশে বসা হলো।'[৮৭৮]

---

৮৭৭. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯১-৩৯২।
৮৭৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/২৫৮।

আর এই যে আয়াতগুলো :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ - إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক ব্যাপার। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর রাস্তায় লড়াই করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।'[৮৭৯]

এ আয়াতগুলো কিছু আনসারি সাহাবির সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ ছিলেন। তারা এক মজলিশে বলাবলি করলেন, 'যদি আমরা জানতে পারতাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, তাহলে আমরা মৃত্যু পর্যন্ত সে আমল করতাম।' এরপর যখন এ আয়াতগুলো নাজিল হলো, তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ বললেন, 'আমি মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ হয়ে থাকব।' এরপরে তিনি আল্লাহর রাস্তায় থেকে শাহাদাত বরণ করেন।[৮৮০]

তাঁর একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসী ছিল। একদিন তিনি সে দাসীর ওপর রাগ হয়ে তাকে থাপ্পড় মারলেন। এরপর তিনি রাগান্বিত হয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে দাসীর কথা জানালেন। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, 'দাসীটি কেমন?' তিনি বললেন, 'সে রোজা রাখে, উত্তমরূপে অজু করে সালাত পড়ে। সে এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর আপনি আল্লাহর রাসুল।' রাসুল ﷺ বললেন, 'হে আব্দুল্লাহ, সে তো ইমানদার।' তখন আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ওই সত্তার শপথ—যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এই দাসীকে আজাদ করে বিয়ে করব।' এরপর তিনি তা-ই করলেন। এর কারণে কিছু মুশরিক তাঁকে খোঁটা দিয়ে বলত, 'সে একজন দাসীকে বিয়ে করেছে!' মুশরিকরা মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আকাঙ্ক্ষা

---

৮৭৯. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ২-৪।

৮৮০. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯২।

করত, মুসলিমরা যেন মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করে। এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয় :

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

'আর ইমানদার দাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম; যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে।'[৮৮১]

রাসুল ﷺ এক অভিযানে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-কে প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে সেদিনটি ছিল জুমআর দিন। আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ তাঁর সাথিদের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি একটু পরে আসছি। আমি রাসুল ﷺ-এর পেছনে সালাত পড়ে তোমাদের সাথে মিলিত হব।' সালাত শেষে রাসুল ﷺ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন বললেন, 'তোমার সাথিদের সাথে অভিযানে যেতে তোমাকে কীসে বাধা দিল?' তখন তিনি বললেন, 'ইচ্ছা করলাম আপনার পেছনে জুমআর সালাত আদায় করে তারপর তাঁদের সাথে মিলিত হব।' রাসুল ﷺ বললেন, 'এক সকাল অথবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় চলা দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম।' এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ তখনই রওয়ানা হয়ে যান।[৮৮২] এ ঘটনাটি মুতার অভিযানের সময় ঘটেছিল।

এ কারণে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ হয়ে যান যুদ্ধে সবার আগে গমনকারী এবং কাফেলার সবার শেষের ব্যক্তি।[৮৮৩] ইসলামের সকল শিক্ষাকে ইবাদতের মাঝে প্রতিফলন ঘটাতে তাঁর সবটুকু শ্রম ব্যয় করেছেন। ফলে তিনি আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞশীল একজন রোজাদার ও তাহাজ্জুদগুজার বান্দায় পরিণত হয়েছিলেন। ইসলামের সকল শিক্ষাকে তিনি জিহাদের ময়দানে প্রতিফলন করতেন। ইসলামের পথে কোনো যুদ্ধ থেকে তিনি পিছপা হননি। তিনি ছিলেন যুদ্ধে প্রথম গমনকারী এবং সর্বশেষ কাফেলার যাত্রী। অবশেষে ইসলাম হিফাজতের লক্ষ্যে মুতার যুদ্ধে তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করে দেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

---

৮৮১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২১।

৮৮২. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৩৯২-৩৯৩। শেষ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসায়ি ও আহমাদ ﷺ। মুখতাসারু শারহিল জামিয়িস সগির লিল মুনাওয়ি : ২/৩০৯-৩১০।

৮৮৩. আল-ইসতিআব : ৩/৮৯৮, উসদুল গাবাহ : ৩/১৫৭।

শাহাদাত বরণ

অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে মুতার যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ শাহাদাত বরণ করেন। যেমনটা আগে বলেছি। আমার গবেষণাকৃত কোনো উৎসের মধ্যে আমি তাঁর জন্মসন খুঁজে পাইনি। অনুরূপ তাঁর পরিবারের অনেকের সম্পর্কেও জানতে পারিনি। তাঁর পরিবারের দুজন নারী সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর মা কাবশাহ বিনতে ওয়াকিদ আল-খাজরাজি এবং তাঁর বোন আমরাহ বিনতে রওয়াহা ﷺ। তাঁরা দুজনই রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআতকারিণী নারীদের মধ্যে ছিলেন।[৮৮৪]

আমরাহ বিনতে রওয়াহা হচ্ছেন বাশির বিন সাদ ﷺ-এর স্ত্রী এবং নুমান বিন বাশির ﷺ-এর মা। নুমান বিন বাশির ﷺ তাঁর হাদিসে এই আমরাহ বিনতে রওয়াহার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'আমার বাবা আমাকে একটি খেজুর বাগান উপহার দিলেন। তখন আমার মা আমরাহ বিনতে রওয়াহা বললেন, "রাসুল ﷺ আমার পক্ষে সাক্ষী হওয়া ছাড়া আমি যেন সন্তুষ্ট না হই।"'

ইসলামপূর্বে কাইস বিন খাতিম আওসি এই আমরাহকে নিয়ে প্রেমকবিতা লিখত। এ কবিতাটি সে আমরাহকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে :

> 'আমরাহ হলো সম্ভ্রান্ত নারীদের মধ্যে অন্যতম, তার আঁচল থেকে মিশকের সুঘ্রাণ ভেসে আসে।'

রাসুল ﷺ-এর কবি হাসসান বিন সাবিত ﷺ একটি দীর্ঘ কবিতায় আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ এবং মুতার যুদ্ধে শহিদদের শোকগাথা রচনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন; কিন্তু বইয়ের পাতায় এখনো তাঁর আলোচনা জ্বলজ্বল করছে। এমন ব্যক্তিই মূলত এ ধরনের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

---

৮৮৪. আল-ইবার : ৪২০-৪২১ পৃ.।

কমান্ডার হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে শরিক ছিলেন। সেদিন তিনি খাজরাজের শাখাগোত্র বনু হারিসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবার, উমরাতুল কাজাসহ রাসুল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুধু মক্কা-বিজয় ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তিনি এর আগেই শাহাদাত বরণ করেন।

তিনি ছিলেন একজন জিহাদপ্রেমী সৈনিক। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের অঢেল সাওয়াব লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাঁকে জিহাদের পথে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি মুতার প্রান্তরে কাফিরদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মুসলিম বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সেদিন মুসলিম বাহিনীতে ছিল তিন হাজার সৈন্য আর শত্রু বাহিনীতে ছিল দুই লাখ সৈন্য। এ খবর শুনে মুসলিমগণ মুআন এলাকায় দুই দিন অবস্থান করে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। তখন তিনি মুসলিম বাহিনীর মাঝে অগ্নিঝরা ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভাইগণ, তোমরা যে শাহাদাতের আশায় বের হয়েছ, সেই শাহাদাতকেই কি অপছন্দ করছ! আমরা তো অস্ত্র কিংবা সৈন্যবল দিয়ে লড়াই করি না। আমরা কেবল এই দ্বীনের বলে বলীয়ান হয়ে লড়াই করি। যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। অতএব সামনে চলো। হয়তো বিজয় নয়তো শাহাদাহ, দুটির কোনো একটি অর্জন হবেই।'[৮৮৫]

ঐতিহাসিকগণ রোম সেনাদের সংখ্যা যত বেশিই বর্ণনা করুক, বাস্তবে পাঠকের সামনে এটিই স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে, রোমান সেনা ও তাদের সহযোগীরা মিলে মুসলিম সেনার তুলনায় বহুগুণে বেশি ছিল। রোমানরা তাদের দেশের অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করছিল। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনী তাদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি মদিনা থেকে বহু দূরে যুদ্ধ করছিল। এর দ্বারা উভয় বাহিনীর সামরিক সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়।

---

৮৮৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪২৯-৩০ পৃ.।

রোমানরা অস্ত্র ও জনবলের দিক থেকে মুসলিমদের বহুগুণে বেশি। তারা তাদের দেশের অভ্যন্তরে থেকে এবং কেন্দ্রীয় শক্তির পাশে থেকে যুদ্ধের ময়দানে নেমেছিল। তাদের রসদপত্র জোগানের কোনো অভাব ছিল না। তার ওপর তাদের ছিল যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা। এই অবস্থায় এবং এই পরিস্থিতিতে রোমান ও তাদের সহযোগীর ওপর আক্রমণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা বাহ্যিক দিক থেকে অদূরদর্শিতা ও মারাত্মক ভুল হবে বটে। এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহননেরই নামান্তর বলা হবে।

কিন্তু বস্তুগত এসব সমীকরণ কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যারা তাদের যুদ্ধে শুধু বস্তুর ওপরই ভরসা করে থাকে। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও আদর্শের জন্য লড়াই করে এবং লড়াই করে তাদের আকিদা-বিশ্বাস রক্ষার্থে, তাদের ক্ষেত্রে এসব বস্তুবাদী সমীকরণের কীইবা অর্থ হতে পারে। এই সমীকরণ আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-এর মতো ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চলে না। কারণ তাঁরা এমন আদর্শিক লড়াইয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যেখানে বস্তুর কোনো দখল নেই। যদি তা-ই হতো, তবে বস্তুর সমীকরণের ভিত্তিতে ফায়সালাকারী বদর যুদ্ধ সম্পর্কে কী বলা হবে? যেখানে একজন মুসলিম সেনার মোকাবিলায় তিনজন মুশরিক সেনা এসেছিল। একটি উটের মোকাবিলায় তাদের ছিল ১০০ উট। অথচ সেকালে যুদ্ধের ময়দানে উট অন্যতম উত্তম অস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হতো!

রোমান ও তাদের মিত্র বাহিনীর ওপর আক্রমণের ব্যাপারে মুসলিম বাহিনীর প্রতি আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ এক উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন। এবং মুসলিম বাহিনীও তাঁর সে বক্তব্যে সাড়া দিয়ে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণ মেলে যে, নিজের সৈনিকদের প্রতি আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-এর যেমন আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ছিল, তেমন সৈনিকদেরও তাঁদের কমান্ডার আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-এর প্রতি আস্থা ও সীমাহীন বিশ্বাস ছিল। আর কমান্ডার ও তার সৈনিকের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও আত্মবিশ্বাস থাকাটাই একজন সফল ও আদর্শ কমান্ডারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

কোনো বিশেষত্ব ও গুণাগুণ ছাড়া সৈনিকরা তাদের কমান্ডারের ওপর আস্থা রাখবে, এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার। সে কারণে রাসুল ﷺ কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়ার বেলায় কেবল সেই ব্যক্তিদেরই নির্বাচন করতেন, সে কাজের

ব্যাপারে যাদের স্পষ্ট জ্ঞান, বিশেষত্ব ও যোগ্যতা আছে। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বিষয়ে ইসলামের যে নির্দেশনা আছে, তা বাস্তবায়নের জন্য রাসুল ﷺ যে ব্যক্তি যে কাজের জন্য উপযুক্ত, তাকে সে কাজেই নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সদা সচেষ্ট থাকতেন। আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-এর প্রতি রাসুল ﷺ ও তাঁর সৈনিকদের আস্থার কারণ মূলত একটিই। আর তা হলো, তিনি ইমানি চেতনা ধারণ করার পাশাপাশি নেতৃত্বের যোগ্য হওয়ার সকল বৈশিষ্ট্য উত্তমরূপে অর্জন করেছিলেন। সে কারণে তিনি রাসুল ﷺ-এর একজন অন্যতম কমান্ডার হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। এবং সমাসীন হয়েছিলেন তাঁর সৈনিকদের আস্থার আসনে।

সংক্ষেপে তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি দ্রুততার সাথে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন। এর সাথে তিনি একজন ভালো মানের শিক্ষিত লোক ছিলেন। সে সময়ে সমাজে ভালো পড়ালেখা জানার লোক একেবারেই বিরল ছিল। যা তাঁর প্রখর মেধার প্রমাণ বহন করে।

তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক ও দুঃসাহসী সেনানায়ক। রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে অংশ নেওয়া প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি পাহাড়ের ন্যায় অটল-অবিচল ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা তখনই প্রকাশ পেয়েছে, যখন তাঁকে ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন এক ইহুদিকে হত্যার অভিযানে প্রেরণ করা হয়েছিল। সে অভিযানটি খুবই দুঃসাধ্য ছিল যে, আত্মোৎসর্গী ব্যক্তি ছাড়া কারও পক্ষেই তা সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না।

তিনি ছিলেন সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী। তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি মুতার যুদ্ধের আগ মুহূর্তে প্রকাশ পেয়েছিল। যখন কিছু লোক ছাড়া আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-এর নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ লোকই দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রোম বাহিনীর ওপর আক্রমণের জন্য আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-এর ইচ্ছাই অবশেষে পূরণ হয়েছিল।

বিজয় বা পরাজয় কোনো অবস্থাতেই তাঁর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতো না। তিনি তাঁর সৈনিকদের মানসিক অবস্থা এবং প্রবণতা সহজে বুঝতে পারতেন। তিনিও তাঁদের ভালোবাসতেন, তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসত। তাঁর

মাঝে ছিল প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আনুগত্যশীল এবং কঠোর অধ্যবসায়ের গুণে গুণান্বিত।

সমর কলাকৌশল সম্পর্কে তাঁর যথাযথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। সেসব কৌশল ও নীতি তিনি নির্ভুল ও স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োগ করতেন। যুদ্ধে লক্ষ্য যাচাই ও তার রক্ষণাবেক্ষণের নীতি ফলো করতেন। এ নীতি থেকে তিনি কখনো সরে যেতেন না; বরং তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন।

আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করতেন। আর এ আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করেই তিনি ইহুদিদের ওপর বিজয় লাভ করতে পেরেছিলেন এবং থামিয়ে দিতে পেরেছিলেন তাদের সব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড।

শক্তি সঞ্চারের নীতি মান্য করতেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করতেন, শত্রুর আকিদার দুর্বলতা এবং স্বীয় আকিদা-বিশ্বাসের যথার্থতা; এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই তিনি শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করতেন—শক্তি বা সৈন্যবলে নয়।

তিনি নিরাপত্তার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। এ কারণেই শত্রুর ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করতে পারতেন। শত্রু তাঁর ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করতে পারত না।

তিনি সর্বদার জন্য নিজের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস চাঙা রাখতেন। বরং বলা চলে তিনি নিজেই আত্মবিশ্বাসের একটি মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তিনি যেমন তরবারি দিয়ে লড়াই করতেন, তেমন আত্মোনুভূতি দিয়েও শত্রুর সাথে লড়াই করতেন। আর এ মনোবল ও আত্মবিশ্বাস সচল রাখতেন দৃঢ় বিশ্বাস ও সাচ্চা ইমানের মাধ্যমে।

তিনি নিজেকে অন্যান্য সৈনিকদের সমান মনে করতেন। কোনোভাবেই তিনি নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা ভাবতেন না। প্রতিটি কাজ বাস্তবায়ন ও প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তিনি সৈনিকদের সাথে পরামর্শ করতেন।

এ ছিল তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ। যেগুলোর কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে নেতৃত্বের প্রধান আসনে বসিয়েছিলেন। এবং এই বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে

সৈনিকগণ তাঁর প্রতি ভরসা ও আস্থা রাখতে পারতেন। আর ভরসা বা আস্থা রাখার মতো যোগ্য ব্যক্তিও ছিলেন তিনি।

ইতিহাসে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ

তিনি খাজরাজ ও আওস গোত্রের মুসলিমদের সাথে আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত হয়েছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে খাজরাজের শাখাগোত্র বনু হারিসের নেতা নিযুক্ত করেছিলেন।

বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবার, উমরাতুল কাজাসহ রাসুল ﷺ-এর সাথে সকল অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুধু মক্কা-বিজয়ে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি, কারণ এর আগেই মুতা অভিযানে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন এক ইহুদিকে হত্যার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের পথের বাধাকে অপসারণ করে দিয়েছিলেন।

তিনি মুতা অভিযানের তিন সেনানায়কের একজন ছিলেন, যাঁদের শাহাদাতের ব্যাপারে স্বয়ং রাসুল ﷺ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন।

তিনি সেসব সৎ ও নেককার কবিদের একজন ছিলেন, যাঁরা ইসলাম, মুসলিম এবং রাসুল ﷺ-এর শানে অপপ্রচারের দাঁতভাঙা জবাব দিতেন।

তিনি একজন ইলমি মজলিশের সাথি ছিলেন। অন্যান্য সাহাবিদেরকে ইমানের মজলিশে বসতে এবং ইমান তাজা করতে উৎসাহ দিতেন।

তিনি সেসব সাহাবির একজন ছিলেন, যারা ইলম ও আমলের ময়দানে সৎ, আল্লাহভীরু এবং একনিষ্ঠ বান্দা ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির প্রতি তাঁর অশেষ রহমত এবং করুণা বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

কুরজ বিন জাবির আল-ফিহরি ﵁

তাঁর বংশধারা এবং জীবনী

তাঁর নাম কুরজ বিন জাবির বিন হিসল[৮৮৬] বিন আহাব্ব বিন হাবিব বিন আমর বিন শাইবান বিন মুহারিব বিন ফিহর বিন মালিক আল-কুরাশি আল-ফিহরি।[৮৮৭]

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কুরাইশের একজন নেতৃত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে মদিনার চারণভূমিতে আক্রমণ করেছিলেন।[৮৮৮] তাকে ধাওয়া করার জন্য রাসুল ﷺ মদিনা থেকে বের হন। তখন জাইদ বিন হারিসা ﵁-কে মদিনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। রাসুল ﷺ যখন বদরের সাফওয়ান নামক জায়গায় পৌছেন, তখন কুরজ বিন জাবির রাসুল ﷺ-এর ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যান। এটা ছিল বদরের প্রথম অভিযান।[৮৮৯] মুসলিমগণ সেখান থেকে মদিনায় ফিরে আসেন।

---

৮৮৬. উসদুল গাবায় (৪/২৩৮) আছে, 'হুসাইল', আবার বলা হয় 'হাসাল'। অনুরূপ আল-ইসতিআবেও আছে (৩/১৩১০)।

৮৮৭. উসদুল গাবাহ : ৪/৩৭, আল-ইসতিআব : ৩/১৩১০, আল-ইসাবাহ : ২৯৭ পৃ.।

৮৮৮. আল-ইসাবাহ : ৫/২৯৭, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৩৮, আদ-দুরার : ১০৬, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১০২, তাবাকাতু ইবনি সাদ ও ইমাম ওয়াকিদির মাগাজিতে আছে ঘটনাটি রবিউল আওয়ালে ঘটেছিল। (২/৯) (১/১২)

৮৮৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৩৮।

তিনি হিজরতের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮৯০] তিনি খাঁটি মনে ইসলাম কবুল করেছিলেন।[৮৯১] রাসুল ﷺ তাঁকে একটি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৮৯২] এটা তাঁর প্রতি রাসুল ﷺ-এর আস্থা ও বিশ্বাসের প্রমাণ।

সারিয়্যার কমান্ডার

এ অভিযানটি ষষ্ঠ হিজরির শাওয়াল মাসে হয়েছিল।[৮৯৩] এর পেক্ষাপট হলো, উরাইনা গোত্রের আটজন লোক রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদিনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হওয়ার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন রাসুল ﷺ তাদেরকে সদাকার উটের দুধ ও পেশাব পান করার পরামর্শ দেন। তারা সদাকার উটের চারণক্ষেত্রে গিয়ে কিছুদিন অবস্থান করে। সেখানে উটের দুধ ও পেশাব পান করে সুস্থ ও সবল হয়ে যায়। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। তারা রাসুল ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে সদাকার উটনীগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে। এ সংবাদ রাসুল ﷺ-এর কাছে পৌছলে তাদের পাকড়াও করার জন্য ২০ জন ঘোড়সওয়ার প্রেরণ করেন। কুরজ বিন জাবির ؓ-কে তাঁদের কমান্ডার নিযুক্ত করেন। তাঁরা শত্রুদের পাকড়াও করে হাত-পা বাঁধে এবং উটের পিঠে বসিয়ে তাদের মদিনায় নিয়ে আসে। এরপর এ আয়াতের বিধান অনুসারে তাদের বিচার করা হয়।

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি কেবল এটা যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা হবে।

৮৯০. আল-ইসতিআব : ৩/১৩১০।
৮৯১. উসদুল গাবাহ : ৪/২৩৮।
৮৯২. আল-ইসাবাহ : ৫/২৯৭।
৮৯৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৬৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯৩।

এটা তাদের দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।'[৮৯৪]

তারা মোট ১৫টি উট নিয়ে গিয়েছিল। সব উট ফিরে পাওয়া যায়। রাসুল ﷺ-এর উটনী সম্পর্কে জানা যায়, তারা সেটাকে জবাই করে দেয়।[৮৯৫] দক্ষতা এবং সফলতার সাথেই কুরজ বিন জাবির ؓ তাঁর নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। চুরিকৃত উট উদ্ধার করার পাশাপাশি চোরদের ধরে রাসুল ﷺ-এর কাছে সোপর্দ করেছিলেন। তাদের উপস্থিত করেছিলেন ইনসাফপূর্ণ উপযুক্ত শাস্তির সামনে; যাতে তারা সেসব লোকের জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়, যারা মদিনার দিকে বাঁকা দৃষ্টি দেয়।

শাহাদাত বরণ

তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে অষ্টম হিজরির রমাদান মাসে মক্কা-বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৮৯৬] এ যুদ্ধে তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ ؓ-এর সেনাদলে ছিলেন। খালিদ ؓ খানদামা পাহাড় হয়ে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন। সেখানে সফওয়ান বিন উমাইয়া, ইকরামা বিন আবু জাহেল ও সুহাইল বিন আমর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মুসলিম বাহিনীর পথরোধ করতে অবস্থান নিয়েছিল। খালিদ ؓ অতি দক্ষতার সাথে কিছু খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। কুরজ ও খুনাইস, এ দুজন খালিদ ؓ-এর অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিলেন। হঠাৎ তাঁরা ভুলক্রমে বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং ভুল পথে চলতে থাকেন। একসময় শত্রুর কবলে পড়ে উভয়ে শাহাদাত বরণ করেন। প্রথমে খুনাইস ؓ আহত হন। তাঁকে রক্ষা করতে কুরজ ؓ তাঁর সামনে গিয়ে শত্রুর সাথে লড়াই করতে থাকেন। লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। সে সময় তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন :

---

৮৯৪. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৩৩।

৮৯৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯৩, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১৮-৩১৯, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৬৮-৫৭১, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৮-৩৭৯, উসদুল গাবাহ : ৪/২৩৭, আল-ইসতিআব : ৪/১৩১০।

৮৯৬. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৫৩, উসদুল গাবাহ : ৪/২৩৭, আল-ইসতিআব : ৪/১৩১০, তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৫০, আল-ইবার : ১/৯।

'আমি বনু ফিহরের নামজাদা ব্যক্তি, আমার হৃদয় স্বচ্ছ, উজ্জ্বল আমার মুখ, আবু সাখরকে রক্ষার্থে আজ অবশ্যই আমি লড়ব।'

খুনাইস ﷺ-এর উপনাম ছিল আবু সাখর। তিনি খুজাআ গোত্রের ছিলেন।[৮৯৭]

এখান থেকে বোঝা যায় যে, কুরজ বিন জাবির ﷺ আশঙ্কা করলেন মুশরিকরা তাঁর সঙ্গীকে শেষ করে ফেলবে। তাই সঙ্গীকে বাঁচানোর জন্য তিনি এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সঙ্গীকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেই জীবন দিয়ে দিলেন; তবুও মুসলিম ভাইকে কাফিরের হাতে ছেড়ে দেননি। ফলে তাঁরা দুজনই একসাথে শাহাদাত বরণ করেন। এটাই তাঁর প্রকৃত উদারতা ও মহত্ত্বের প্রমাণ।

তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার মর্যাদা লাভের সাথে সাথে রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। অর্জন করেছিলেন কমান্ডারের মর্যাদার পাশাপাশি জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণের লোভনীয় পুরস্কার।

কমান্ডার হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন

তাঁর সম্পর্কে আমরা যা কিছু লিখলাম, তার সাথে নতুন কিছু যুক্ত করার মতো কিছু নেই। মহান এই কমান্ডার, যিনি ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষার জন্য নিজের সবচেয়ে দামি বস্তুটি উৎসর্গ করেছেন, সে কমান্ডারের যথাযোগ্য আলোচনা লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের কলম এক অজানা কৃপণতার জালে ফেঁসে গিয়েছে। হাদিস শাস্ত্রের রিজালদের জীবনী লেখকগণ তাঁর সম্পর্কে একটি শব্দও লিখেননি। কারণ এমন কোনো হাদিস তাঁরা পাননি, যা কুরজ বিন জাবির ﷺ-এর সাথে যুক্ত করা যায়।

তিনি অষ্টম হিজরিতে মক্কা-বিজয়কালে শাহাদাত বরণ করেন।

৮৯৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৬-২৭, উসদুল গাবাহ : ৪/২৩৭, আল-ইসতিআব : ৪/১৩১০-১৩১১।

তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি : তিনি ছিলেন পাক্কা ইমানদার, উদ্যমী ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন নির্ভীক সৈনিক। সম্মুখসমরে এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বীর সেনা। তিনি এমন বৈশিষ্ট্যের কমান্ডার ছিলেন, নবিযুগে তাঁর উপস্থিতি সচরাচর থাকলেও বস্তুবাদী যুগে তা একেবারেই অপ্রতুল।

ইতিহাসে কুরজ ﵁

তিনি জাহিলি যুগে কুরাইশের অন্যতম প্রখ্যাত সর্দার ছিলেন। যদি ইসলামের ছায়াতলে তাঁর স্থান না হতো, তবে তাঁর এ সর্দারির কথা অন্ধকারেই থেকে যেত।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মদিনার পশু-চারণক্ষেত্রে হামলা এবং হামলালব্ধ সম্পদ নিয়ে পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলিম সৈনিকদের থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপরে ইসলাম গ্রহণ করে একজন খাঁটি ইমানদারে পরিণত হয়েছিলেন এবং অর্জন করতে পেরেছিলেন রাসুল ﷺ-এর আস্থা ও বিশ্বাস। ফলে রাসুল ﷺ তাঁকে অভিযানের কমান্ডার নিযুক্ত করেছিলেন।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি বিশেষ রহমত নাজিল করুন। আমিন।

কমান্ডার ও রাসুলের দূত

আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরি আল-কিনানি

বংশপরিচয়

আমর বিন উমাইয়া বিন খুয়াইলিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াস বিন আবদ বিন নাশিরা বিন কাব বিন জুদাই বিন দামরা[৮৯৮] বিন বাকর বিন আবদে মানাত বিন কিনানা।

তিনি ছিলেন আরবের একজন অন্যতম দানবীর ও দুঃসাহসী ব্যক্তি।[৮৯৯]

তিনি সূচনাতেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। প্রথমে হাবশায় হিজরত করেন এরপর মদিনায় হিজরত করেন।[৯০০] অপর একটি বর্ণনামতে, তিনি বদর ও উহুদে মুশরিকদের পক্ষ হয়ে এসেছিলেন। এ মতটি আমাদের কাছে অগ্রগণ্য বলে মনে হচ্ছে। কারণ হাবশা ও মদিনা কোনো হিজরতের মধ্যে তাঁর নাম পাওয়া যায় না। এমনকি মদিনায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন হয়েছিল, সে তালিকায়ও তাঁর নাম পাওয়া যায় না। হিজরতের পরে মুসলিমদের কোনো সামরিক বা সমষ্টিগত কাজে তাঁর তৎপরতার কথা

---

৮৯৮. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৮৫ পৃ., উসদুল গাবাহ : ৪/৮৬, আল-ইসতিআব : ৪/১১৬২।
৮৯৯. আল-ইসাবাহ : ৪/২৮৫।
৯০০. উসদুল গাবাহ : ৪/৮২, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/৪৪।

আলোচিত হয়নি। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি উহুদ যুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় আসেন।[৯০১] এ মতকে আমরা অগ্রগণ্য বলে মনে করি। তাঁর প্রথম উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় বিরে মাউনার অভিযানে।[৯০২] একটু পরেই আমরা সে আলোচনায় আসছি।

আমর বিন উমাইয়া বা তাঁর মতো স্বভাব-প্রকৃতি এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কোনো ব্যক্তি ইসলামের সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণ করবেন; কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক ঘটনাপ্রবাহে তাঁদের নাম ও অবস্থান কোনো কিছুই উল্লেখ থাকবে না, এটা কোনোভাবেই বোধগাম্য নয়। সুতরাং নতুন ইসলামে তাঁর জীবনের আলোকিত অধ্যায়ের শুরু হয় উহুদের পরে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ কল্যাণকর হয়েছিল। তিনি রাসুল ﷺ-এর একজন আস্থাভাজন লোকে পরিণত হয়েছিলেন। যার কারণে সামরিক, রাজনৈতিক ও পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁকে ব্যবহার করতেন।[৯০৩] তিনি একজন নির্ভীক দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন।[৯০৪] সাথে ছিল তাঁর শারীরিক ও চিন্তাগত এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, যার আলোচনা তাঁর পুরো জীবন ছড়িয়ে ছিল।

বিরে মাউনার অভিযানে[৯০৫]

এ অভিযান চতুর্থ হিজরির সফর মাসে[৯০৬] মুনজির বিন আমর খাজরাজি আনসারি ﷺ-এর নেতৃত্বে হয়েছিল। এ যুদ্ধের কারণ, বনু কিলাব গোত্রের আবু বারা আল-কিলাবি, যার নাম আমির বিন মালিক বিন জাফর বিন কিলাব বিন রবিআহ বিন সাসাআহ। সে রাসুল ﷺ-এর কাছে আগমন করে। রাসুল ﷺ তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে দাওয়াত কবুলও করল

---

৯০১. উসদুল গাবাহ : ৪/৮৬, আল-ইসাবাহ : ৪/৪৮৫।
৯০২. উসদুল গাবাহ : ৪/৮৬, আল-ইসাবাহ : ৪/২৮৫, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৫, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫৪, তাহজিবুত তাহজিব : ৮/৬, আদ-দুরার : ১৭২।
৯০৩. উসদুল গাবাহ : ৪/৮৬, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/২৫।
৯০৪. তাহজিবুত তাহজিব : ৮/৬, আল-ইসাবাহ : ৪/২৮৫।
৯০৫. বিরে মাউনা, বনু সুলাইমের একটি পানির উৎস। এটি বনু আমির ও বনু সুলাইমের এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ২/৭।
৯০৬. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৭৮ পৃ., আদ-দুরার : ১৬৮ পৃ., তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৩৮।

না, আবার প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যানও করল না। বরং সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, যদি আপনার কিছু সাথিকে নাজদ অধিবাসীর কাছে পাঠাতেন, তারা তাদেরকে আপনার দ্বীনের দিকে আহ্বান করবে, তাহলে আমি আশাবাদী যে, তারা অবশ্যই আপনার দ্বীন কবুল করবে।' রাসুল ﷺ তখন বললেন, 'আমার সাথিদের ব্যাপারে নাজদবাসীকে আমার ভয় হয়।' তখন আবু বারা বলল, 'আমি তাদের জিম্মাদারি নিলাম।'

রাসুল ﷺ মুনজির বিন আমর ﷺ-কে আমির বানিয়ে ৪০ জন, আরেকটি দুর্বল বর্ণনামতে ৭০ জনের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন।

এ বাহিনী বিরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছে হারাম বিন মিলহান ﷺ-কে রাসুল ﷺ-এর পত্র দিয়ে আমির বিন তুফাইলের নিকট প্রেরণ করে। যখন হারাম ﷺ তুফাইলের কাছে পত্র নিয়ে আসলো, তুফাইল পত্রের প্রতি কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে হারাম ﷺ-এর ওপর আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে। এরপর সে বাকি সাহাবিদের সাথে যুদ্ধের জন্য বনু আমিরকে উত্তেজিত করে। কিন্তু তারা তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। কারণ আবু বারা তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিল। এরপর সে বনু সুলাইমের কাছে সাহায্য চায়। তখন বনু সুলাইমের শাখাগোত্র উসাইয়্যা, রি'ল ও জাকওয়ান তার ডাকে বেরিয়ে পড়ে। তারা মুসলিমদের ঘেরাও করে ফেলে। মুসলিমরাও তাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যান এবং যুদ্ধে করে সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত নাজিল করুন। তাঁদের মাঝে শুধু কাব বিন জাইদ ﷺ বেঁচে যান। তিনি আহত হয়ে নিহতদের মাঝে পড়ে ছিলেন। নিহতদের সাথে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি খন্দকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

বাহিনীর পশু চরানোর দায়িত্বে ছিলেন আমর বিন উমাইয়া জামরি ও মুনজির বিন মুহাম্মাদ বিন উকবাহ ﷺ। তাঁরা দূর থেকে দেখতে পেলেন, মুসলিম বাহিনীর ওপর পাখি ওড়াউড়ি করছে। তাঁরা একটু সামনে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন, মুসলিম বাহিনীর লাশের ওপর পাখি উড়ছে। তখন মুনজির বিন মুহাম্মাদ আমর বিন উমাইয়াকে বললেন, 'তুমি কী মনে করো?' আমর বললেন, 'আমার মত হচ্ছে, আমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে ঘটনা শুনিয়ে দিই।' তখন মুনজির ﷺ বললেন, 'যেখানে মুনজির বিন আমর নিহত হয়েছে, সেখানে আমি

জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পছন্দ করি না।' তাঁরা শত্রুর সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন। মুনজির ﷺ শহিদ হন এবং আমর বিন উমাইয়া ﷺ বন্দী হন। যখন তিনি বললেন, 'তিনি মুজার গোত্রের লোক, তখন আমির বিন তুফাইল তাঁকে দাস বানিয়ে নেয়। এবং তার মায়ের পক্ষ থেকে তাঁকে আজাদ করে দেয়। এ ঘটনা সফর মাসের ২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সংঘটিত হয়।

আমর বিন উমাইয়া ﷺ ফেরার পথে কনাত এলাকার উপকণ্ঠে কারকারা নামক স্থানে এসে বিশ্রাম নেন। সেখানে বনু আমির গোত্রের দুজন লোক এসে তাঁর সঙ্গ নেয়। রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাদের নিরাপত্তা ছিল। কিন্তু আমর ﷺ সে ব্যাপারে কিছু জানতেন না। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলেন যে, তারা বনু আমির গোত্রের লোক। আমর বিন উমাইয়া ﷺ সুযোগ খুঁজলেন। তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন তিনি তাদের দুজনকে হত্যা করেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সাথিদের পক্ষ থেকে বনু আমিরের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আমর বিন উমাইয়া ﷺ মদিনায় এসে রাসুল ﷺ-কে সব খুলে বললেন। রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি এমন দুজনকে হত্যা করেছ, যারা আমার নিরাপত্তায় ছিল। আমি তাদের রক্তমূল্য আদায় করব। আবু বারার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি তার প্রস্তাবের ব্যাপারে সন্দেহ আর ভয়ের মধ্যে ছিলাম।'[৯০৭]

আমর বিন উমাইয়া ﷺ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, অর্থাৎ ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর এ দুঃখজনক ঘটনা রাসুল ﷺ-কে জানানোর যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, তা একটি সঠিক এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ তিনি কোনো সময়ের জন্য ভীত ব্যক্তি ছিলেন না; বরং তিনি তাঁর বীরত্বের কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু একটি মুসলিম বাহিনীকে সমূলে হত্যার সাথে জড়িত গাদ্দার কবিলার সাথে তিনি একা কীইবা করতে পারতেন। অসম লড়াইয়ে জড়িয়ে তাঁর শহিদ হওয়ারই আশঙ্কা ছিল।

আবার শহিদ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর আনসারি সাথির সিদ্ধান্ত একটি সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ, ময়দানজুড়ে তাঁর ভাইদের লাশ দেখে আপন বাড়িতে ফিরে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

---

৯০৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৪৬-৩৫৩, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/১৮৪-১৯১, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫১-৫৪, তাবারি : ২/৫৪৫-৫৪৯, ইবনুল আসির : ২/১৭১-১৭৩, ইবনু কাসির : ৭১-৭৪, সহিহুল বুখারি : ৫/১০৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৫, আদ-দুরার : ১৭০-১৭৩।

তাই আমর বিন উমাইয়া ﷺ-এর সিদ্ধান্তটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত ছিল। আর আনসারি সাহাবির সিদ্ধান্তটি ছিল আবেগতাড়িত। পরিস্থিতির বিচারে প্রতিটি সিদ্ধান্তই উপযুক্ত ছিল। তাঁরা উভয়ে ইজতিহাদ করেছিলেন। আর ইজতিহাদকারী সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করুন বা সঠিক করুন, সর্বাবস্থায় তাঁর জন্য প্রতিদান আছে।

বনু নাজিরের যুদ্ধে

এ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। বনু নাজিরের বস্তিটি ছিল গারস ও তার আশপাশের অঞ্চলে। রাসুল ﷺ কিছু মুহাজির ও আনসারি সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার মদিনা থেকে বের হন এবং মদিনার উপকণ্ঠ কুবার মসজিদে সালাত আদায় করেন। তারপর বনু নাজির গোত্রে যান। তাদের কাছে আমর বিন উমাইয়া ﷺ কর্তৃক নিহত কিলাব গোত্রের দুই ব্যক্তির দিয়াতের ব্যাপারে সহযোগিতা চান। তারা বলল, 'হে আবুল কাসিম, আপনার ইচ্ছামতো আমরা কাজ করব।' এরপর তারা একে অপরের সাথে নির্জনে মিলিত হলো এবং রাসুল ﷺ-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ষড়যন্ত্র করল। তারা বুদ্ধি করল, রাসুল ﷺ যে বাড়ির দেয়ালের ছায়ায় বসে আছেন, তার ছাদ থেকে পাথর ফেলে রাসুল ﷺ-কে হত্যা করবে।

রাসুল ﷺ তৎক্ষণাৎ উঠে দ্রুত মদিনার দিকে চললেন। তখন সাহাবিগণও তাঁর সাথে চলে আসেন।

মদিনায় এসে রাসুল ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে বনু নাজিরের নিকট এ বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে, 'তোমরা আমার দেশ থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা যে বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছা করেছ, এর কারণে আমাদের সাথে আর তোমরা বসবাস করতে পারবে না। আমি তোমাদের ১০ দিনের সময় বেঁধে দিলাম। এরপরে সেখানে কাউকে পাওয়া গেলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।' এর ওপর ভিত্তি করে বনু নাজির কয়েক দিন অবস্থান করে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। এর মধ্যে তাদের মিত্র মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাদের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, 'তোমরা এলাকা থেকে বের হয়ো না; বরং তোমরা তোমাদের দুর্গে অবস্থান করো। আমার গোত্র ও আরবের অন্যান্য গোত্র থেকে

দুই হাজার যোদ্ধা নিয়ে আমি তোমাদের দুর্গে প্রবেশ করছি। আমাদের শেষ যোদ্ধাটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমরা তোমাদের পাশে থাকব এবং বনু কুরাইজা ও তোমাদের মিত্র গাতাফান গোত্রও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।' তখন বনু নাজির রাসুল ﷺ-এর কাছে বার্তা পাঠাল যে, 'আমরা আমাদের এলাকা থেকে বের হচ্ছি না। তাই আপনি যা ইচ্ছা করুন।'

এ খবর শুনে রাসুল ﷺ তাকবির-ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। সাথে সাথে সাহাবিগণও তাকবির-ধ্বনি দিলেন। রাসুল ﷺ বললেন, 'ইহুদিরা তো যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে।'

এরপর রাসুল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে বনু নাজির অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং তাদের এলাকার খোলা স্থানে গিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। এ যুদ্ধের পতাকা ছিল আলি ؓ-এর হাতে। তারা যখন রাসুল ﷺ-এর বাহিনী প্রত্যক্ষ করল, তখন পাথর ও বর্শা নিয়ে দুর্গে অবস্থান নিল। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! বনু কুরাইজা তাদের থেকে দূরে সরে থাকল। তাদের কোনো ধরনের সাহায্য করল না। মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তাদের মিত্র গোত্র বনু গাতাফানও তাদের পরিত্যাগ করল। ফলে তারা তাদের সাহায্যের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল।

রাসুল ﷺ তাদের অবরোধ করে তাদের খেজুর গাছ কেটে দিলেন। তখন তারা বলল, 'আমরা আমাদের এলাকা থেকে বের হব।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আমি আজ সেটা গ্রহণ করব না। তবে তোমরা অস্ত্র ছাড়া শুধু নিজের জীবন আর উটে বহন করা যায় এই পরিমাণ সামানাপত্র নিয়ে বের হতে পারো।' তারা এ শর্তের ওপর আত্মসমর্পণ করল। তাদের মোট ১৫ দিন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।[৯০৮]

আমর বিন উমাইয়া ؓ ছিলেন এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ। এ যুদ্ধের কারণে মুসলিমগণ তাদের ঘরের দুশমন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।[৯০৯]

---

৯০৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫৭-৫৯, উয়ুনুল আসার : ২/৪৮-৫২, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৩৯।

৯০৯. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৮১ পৃ., আদ-দুরার : ১৮৪ পৃ., আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৩৯।

সারিয়্যার কমান্ডার

খুবাইব বিন আদি ﷺ-এর শাহাদাতের পর রাসুল ﷺ আমর বিন উমাইয়া ﷺ-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ান বিন হারবকে হত্যা করা। জাব্বার বিন সাখর আনসারি ﷺ-কে তাঁর সাথে সহযোগী হিসেবে পাঠানো হয়।[৯১০] চতুর্থ হিজরির সফর মাসে ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ছয় সদস্যের একটি দল প্রেরণ করা হয়েছিল। যাকে রাজি'র অভিযান বলে। খুবাইব বিন আদি ﷺ এই ছয়জনের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু মুশরিকরা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। তাঁদের সবাইকে হত্যা করে, শুধু খুবাইব ﷺ-কে বন্দী করে মক্কার কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। খুবাইব ﷺ-কে হেরেমের বাইরে তানয়িম নামক স্থানে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। শূলে ওঠানোর পরে তিনি বলেছিলেন :

> 'যখন মুসলিম অবস্থায় শহিদ হচ্ছি, তখন কী পরোয়া, আল্লাহর জন্য কোন পার্শ্বে আমার লাশ পতিত হবে!
>
> এটা তো কেবল আল্লাহর জন্য, যদি তিনি চান, তবে আমার কর্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বরকত দান করবেন।'

খুবাইব ﷺ সর্বপ্রথম মুসলিমদের জন্য মৃত্যুর পূর্বে দুই রাকআত সালাত পড়ার নিয়ম চালু করেন। আবু সুফিয়ান তাঁকে বলল, 'তুমি কি চাও, মুহাম্মাদ আমাদের কাছে মক্কায় নিহত হোক। আর তুমি নিরাপদে তোমার পরিবারে চলে যাও?' খুবাইব ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি আমার পরিবারে নিরাপদে থাকতে পছন্দ করি না, যখন রাসুল ﷺ-এর শরীরে সামান্য কাঁটা বিদ্ধ হবে।'[৯১১]

এর আগে অবশ্য রাসুল ﷺ আমর বিন উমাইয়া ﷺ-কে কুরাইশদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি খুবাইব ﷺ-এর মৃতদেহকে শূলের কাষ্ঠ থেকে নামিয়ে[৯১২] বহন করে মদিনায় নিয়ে এসেছিলেন। এ ঘটনা চতুর্থ হিজরির কথা।

---

৯১০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১০।
৯১১. আদ-দুরার : ১৬৮-১৬৯ পৃ.।
৯১২. উসদুল গাবাহ : ৪/৮৬, তাহজিবুত তাহজিব : ৮/৬।

আবু সুফিয়ান বিন হারবকে হত্যার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরিতে।

আমর বিন উমাইয়া ﷺ-এর দলকে প্রেরণ করার মূল কারণ হলো, আবু সুফিয়ান বিন হারব কুরাইশের কিছু লোককে বলেছিল, 'কেউ কি নেই, যে মুহাম্মাদকে গুপ্তহত্যা করবে, কারণ সে বাজারে ঘোরাফেরা করে?' এরপর তার কাছে একজন বেদুইন এসে বলল, 'আপনি দৃঢ়সংকল্প, প্রচণ্ড শক্তি ও ক্ষিপ্রগতির একজন লোক পেয়ে গেছেন। যদি আপনি আমাকে সহায়তা করেন, তবে তাকে গিয়ে হত্যা করতে পারি। এর জন্য আমার কাছে আছে বগলের নিচে রাখার মতো একটি খঞ্জর। আমি সেটিকে সযত্নে নিয়ে কোনো কাফেলার সাথে চলব। এরপর দ্রুত চলে তাদের আগেই মদিনায় পৌঁছে যাব। কারণ পথ সম্পর্কে আমি একজন অভিজ্ঞ গাইড।' আবু সুফিয়ান তাকে বলল, 'ঠিক আছে, সকালে এসো।' এরপর আবু সুফিয়ান তাকে একটি উট ও কিছু পাথেয় দিয়ে বলল, 'এবার তোমার কাজ সম্পন্ন করে ফেলো।'

পাথেয় আর উট নিয়ে লোকটি রাতে রওয়ানা হয়ে গেল। সে একটানা পাঁচ দিন চলে ষষ্ঠ দিনে মদিনার হাররা নামক স্থানে সকাল করল। এরপর সে লোকদের জিজ্ঞাসা করে রাসুল ﷺ সম্পর্কে জেনে নেয়। উটনী বেঁধে সে রাসুল ﷺ-এর কাছে যায়। রাসুল ﷺ সে সময় আবদে আশহাল গোত্রের মসজিদে অবস্থান করছিলেন। রাসুল ﷺ যখন লোকটিকে দেখলেন, তখন বললেন, 'এই লোকটা কিন্তু ধোঁকা দেওয়ার ইচ্ছা করেছে।' লোকটি যখন রাসুল ﷺ-এর অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল, তখন উসাইদ বিন হুজাইর ﷺ তার চাদরের ভেতরের দিক দিয়ে তাকে টেনে ধরল। তখন দেখা গেল, তার হাত থেকে একটি খঞ্জর পড়ে গেল। তখনই সে বলে উঠল, 'আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান!' তখন উসাইদ ﷺ তার কণ্ঠনালী ধরে ফেলল।' রাসুল ﷺ তাকে বললেন, 'আমাকে সত্য করে বলো, তোমার উদ্দেশ্য কী?' সে বলল, 'আমি নিরাপদ তো?' রাসুল ﷺ বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে।' তখন সে আবু সুফিয়ান ও তার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিল। রাসুল ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন। তখন লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল।

রাসুল ﷺ আমর বিন উমাইয়া ও সালামা বিন আসলাম ﷺ-কে আবু সুফিয়ানের নিকট প্রেরণ করার সময় বলে দেন, 'তাকে সুযোগমতো পেলে হত্যা করে ফেলবে।' তারা দুজন মক্কায় প্রবেশ করেন। আমর বিন উমাইয়া গিয়ে রাতে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে। আবু সুফিয়ানের পুত্র মুআবিয়া তাকে দেখে চিনে ফেলে এবং কুরাইশের কাছে তাঁর উপস্থিতির কথা বলে দেয়। কুরাইশরা তাঁর ব্যাপারে ভয় করতে থাকে এবং তাঁকে খুঁজতে থাকে। আমর বিন উমাইয়া ﷺ জাহিলি যুগে গুপ্তঘাতক ছিলেন। কুরাইশরা বলতে লাগল, 'আমর কোনো ভালো উদ্দেশ্যে আসেনি।' মক্কাবাসী তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। ফলে আমর ﷺ ও সালামা ﷺ মক্কা থেকে পলায়ন করলেন। পলায়নের সময় আমর ﷺ উবাইদুল্লাহ বিন মালিক তামিমির দেখা পান এবং তাকে হত্যা করে ফেলেন। তিনি আরও একজনকে হত্যা করেন। কারণ ওই ব্যক্তিকে তিনি বলতে শোনেন :

> 'জীবন থাকতে আমি মুসলিম হতে পারি না, আমি মুসলিমদের ধর্মকে ধর্মরূপে গ্রহণ করব না।'

তিনি কুরাইশের দুজন বার্তাবাহককে দেখতে পেলেন, তারা দুজন গুপ্তচরবৃত্তি করছিল। তখন একজনকে হত্যা করেন আর অপর জনকে বন্দী করে মদিনায় নিয়ে যান। মদিনায় এসে তিনি রাসুল ﷺ-কে খবর বলছিলেন আর রাসুল ﷺ তা শুনে হাসছিলেন।[৯১৩]

এ অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল কুরজ বিন জাবির ﷺ ও উমর ﷺ-এর অভিযানের ধারাবাহিকতা হিসেবে। কুরজ বিন জাবির ﷺ-এর অভিযানটি হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরির শাওয়াল মাসে আর উমর ﷺ-এর অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল সপ্তম হিজরির শাবান মাসে। সম্ভবত উমর ﷺ-এর অভিযানটিও ষষ্ঠ হিজরিতে হয়েছিল। কারণ এর সময়কালের ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিক স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। শুধু আনসাবুল আশরাফের গ্রন্থকার অষ্টম হিজরির সফর মাসের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯১৪] অথচ এটি বোধগাম্য নয়, কারণ সে সময়

---

৯১৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৯২-৯৩, উয়ুনুল আসার : ২/১১২। দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১০-৩১২, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৯-৩৮০।
৯১৪. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৯।

মুসলিমগণ হুদাইবিয়ার সন্ধিকাল অতিক্রম করছিল। আর মুসলিমগণ তাদের ওয়াদা যথাযথভাবে রক্ষা করে। কখনো তা ভঙ্গ করে না।

আমর বিন উমাইয়া ﷺ তাঁর টার্গেটে যথাযথ সফল হতে পারেননি। কারণ তাঁর সাথি বারবার বাইতুল্লাহয় সালাত আদায় করছিল আর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল। এতে তাঁদের বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায়। কারণ তিনি অনেক প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। যার কারণে তিনি এ ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা নষ্ট করে দিয়েছিলেন। এরপরও আমর ﷺ আবু সুফিয়ান ছাড়া অন্য মুশরিকদের হত্যা করে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

অন্যান্য যুদ্ধ ও অভিযানে

আমর বিন উমাইয়া ﷺ রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বিরে মাউনার পরবর্তী কিছু অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।[৯১৫] তিনি অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে তায়িফ অবরোধেও অংশগ্রহণ করেন। আমর ﷺ তায়িফবাসীর প্রতিরক্ষার বিবরণ এভাবে তুলে ধরেন, 'আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন আমাদের ওপর তাদের তির-বর্শা এত প্রচুর পরিমাণে আসতে লাগল, যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। যেন পঙ্গপালের ঝাঁক আমাদের ওপর আপতিত হচ্ছে। এতে অনেক মুসলিমই আহত হলো। রাসুল ﷺ হুবাব বিন মুনজির ﷺ-কে ডেকে বললেন, 'দেখো তো, শত্রু থেকে দূরে কোনো উঁচু জায়গা পাও কি না।' হুবাব ﷺ গ্রাম থেকে দূরে একটি উঁচু জায়গা পেয়ে রাসুল ﷺ-কে খবর দিলেন। রাসুল ﷺ সাহাবিদের পেছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম, আবু মিহজান তার সাথি-সঙ্গী নিয়ে বল্লম আর বর্শা নিক্ষেপ করছিল। তার কোনো নিক্ষেপই যেন ব্যর্থ হচ্ছিল না।'[৯১৬]

দুমাতুল জানদালে[৯১৭] খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-এর নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সে অভিযানে খালিদ ﷺ দুমাতুল জানদালের বাদশাহ

৯১৫. উসদুল গাবাহ : ৪/৮৬।

৯১৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯২৫-৯২৬।

৯১৭. দামেশক থেকে মদিনার দিকে সাত মানযিল দূরত্বে অবস্থিত দুর্গ দুমাতুল জানদাল। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৪/১০৬।

উকাইদির বিন আব্দুল মালিককে বন্দী এবং তার ভাই হাসসানকে হত্যা করতে সক্ষম হন। হাসসানের গায়ে তখন স্বর্ণখচিত একটি রেশমের চাদর ছিল। খালিদ ﵁ সেটি আমর বিন উমাইয়া ﵁-এর মাধ্যমে রাসুল ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। এটা মুসলিমগণ হাত দিয়ে ছুয়ে দেখছিল আর আশ্চর্যবোধ করছিল।[৯১৮]

খালিদ ﵁-এর বাহিনীটি রাসুল ﷺ তাবুক যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রেরণ করেছিলেন। যা সংঘটিত হয়েছিল নবম হিজরির রজব মাসে।[৯১৯] এই তাবুক যুদ্ধ ছিল রাসুল ﷺ-এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ।

বার্তাবাহক

ষষ্ঠ হিজরিতে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একটি পত্র লিখে রাসুল ﷺ হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে আমর বিন উমাইয়া ﵁-কে[৯২০] প্রেরণ করেন। বাদশাহ নাজ্জাশি পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পত্রে রাসুল ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন যে, আবু সুফিয়ান বিন হারবের কন্যা উম্মে হাবিবা ﵁-কে রাসুল ﷺ-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেবেন এবং তাঁকে ও হাবশায় অবস্থানরত মুসলিমদের মদিনায় পাঠিয়ে দেবেন।[৯২১] উম্মে হাবিবা ﵁ তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। উবাইদুল্লাহ সেখানে মুরতাদ হয়ে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। বাদশাহ নাজ্জাশি উম্মে হাবিবা ﵁-কে রাসুল ﷺ-এর তরফ থেকে বিবাহের প্রস্তাব দান করেন। তখন উম্মে হাবিবা ﵁ হাবশায় সবচেয়ে নিকটাত্মীয় হিসেবে খালিদ বিন সাইদ ﵁-কে বিবাহের জিম্মাদারি দান করেন।[৯২২] বাদশাহ নাজ্জাশি রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে ৪০০ স্বর্ণমুদ্রা মোহর হিসেবে আদায় করেন।[৯২৩] এবং রাসুল ﷺ-এর জন্য কিছু উপঢৌকন পাঠান। উপঢৌকনের মধ্যে ছিল, একটি জামা, পাজামা, পাগড়ি, উসওয়ানি চাদর এবং এক জোড়া মোজা।

---

৯১৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/১০২৬।
৯১৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬৫।
৯২০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৭৯, জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৯ পৃ.।
৯২১. উসদুল গাবাহ : ৪/৮২।
৯২২. আনসাবুল আশরাফ : ১/১৯৯- ২০০, ইবনুল আসির : ২/১১৩।
৯২৩. আনসাবুল আশরাফ : ১/২২৯, ইবনুল আসির : ২/১১৩।

বাদশাহ নাজ্জাশি জাহাজের কাপ্তানদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে বললেন, 'এই পরিমাণ লোকের জন্য কয়টি জাহাজের প্রয়োজন হবে, তোমরা চিন্তা করে আমাকে জানাও।' কাপ্তানরা দুটি জাহাজের কথা বলল। তখন বাদশাহ তাদের প্রস্তুত করলেন। হাবশায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, রাসুল ﷺ-কে সালাম জানানোর জন্য তারাও বাদশাহর কাছে মদিনা যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল। তারা বলল, 'আমরা এই সাহাবিদের সঙ্গে যেতে চাই—তাহলে আমরা তাঁদের সংগীত শুনিয়ে শুনিয়ে দাঁড় টেনে নিয়ে যেতে পারব।' বাদশাহ তাঁদের অনুমতি দিলেন। আমর বিন উমাইয়া ও মুসলিমদের সাথে তাঁরাও রওয়ানা হয়ে গেলেন। জাফর বিন আবু তালিব ﷺ-কে কাফেলার আমির নিযুক্ত করা হয়।[৯২৪]

সম্ভবত রাসুল ﷺ আমর বিন উমাইয়া ﷺ-কে নাজ্জাশির কাছে ষষ্ঠ হিজরিতে পাঠিয়েছিলেন। এরপর তিনি সপ্তম হিজরিতে ফিরে আসেন। কারণ হাবশার মুহাজিরগণ জাফর বিন আবু তালিব ﷺ-এর নেতৃত্বে খাইবার যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে ফিরে এসেছিলেন। আর খাইবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে।[৯২৫]

আবার আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে কুরাইশের প্রতিনিধি দল নাজ্জাশির কাছে পৌঁছেছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে। কিন্তু এটাও আবার উল্লেখ আছে যে, আমর ইবনুল আস হুদাইবিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিল না। যাহোক রাসুল ﷺ হুদাইবিয়া থেকে ফিরে এসে হাবশায় দূত প্রেরণ করেন।[৯২৬] আর হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে। এটা সবার জানা কথা।

তাই সঠিক কথা হলো, রাসুল ﷺ আমর বিন উমাইয়া ﷺ-কে ষষ্ঠ হিজরির শেষের দিকে হাবশায় প্রেরণ করেন এবং আমর বিন উমাইয়া ﷺ সপ্তম হিজরির শুরুর দিকে সেখান থেকে ফিরে আসেন। এখান থেকেই ঐতিহাসিকদের মাঝে আমর ﷺ-এর হাবশায় যাওয়ার সময় নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেছেন, ষষ্ঠ হিজরির কথা[৯২৭] আবার কেউ বলেছেন, সপ্তম হিজরির কথা।

---

৯২৪. আনসাবুল আশরাফ : ১/২২৯।
৯২৫. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২১১ পৃ., আদ-দুরার : ২১৮ পৃ.।
৯২৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৪২।
৯২৭. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২০৭ পৃ.।

হাবশায় আমর বিন উমাইয়া ﷺ-এর সাথে আমর ইবনুল আসের সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে আমর ইবনুল আস বলে, 'কুরাইশরা নাজ্জাশির জন্য আমাদের কাছে উপঢৌকন জমা করতে লাগল। তাঁর উপঢৌকনের জন্য আমাদের অঞ্চলের সবচেয়ে ভালো বস্তু ছিল পাকা চামড়া। আমরা তাঁর জন্য অনেক চামড়া জমা করলাম। এরপর আমরা যাত্রা করে তাঁর কাছে গেলাম। আল্লাহর কী ইচ্ছা, আমরা তখনও বাদশাহর সামনেই ছিলাম। এরই মধ্যে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো আমর বিন উমাইয়া। রাসুল ﷺ তাঁকে জাফর বিন আবু তালিব ও অন্যান্য মুসলিমদের ব্যাপারে পাঠিয়েছিলেন। সে বাদশাহর কাছে গেল, এরপর তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে গেল। তখন আমি আমার সাথিদের বললাম, "এ হলো আমর বিন উমাইয়া। এবার বাদশাহর কাছে গেলে তাকে আমার কাছে সোপর্দ করার আবেদন করব। বাদশাহ তাকে আমাকে দিলে আমি তার কল্লাটা নামিয়ে দেবো। যদি এটা করতে পারি অর্থাৎ মুহাম্মাদের দূতকে হত্যা করতে পারি, তবে কুরাইশরা মনে করবে দায়িত্বটা আমি আদায় করে দিয়েছি।" এরপর আমি বাদশাহর কাছে গেলাম। বাদশাহকে সিজদা করলাম, যেভাবে আগে করেছিলাম। বাদশাহ বলল, "স্বাগতম প্রিয় বন্ধু, আপনার দেশের কোনো উপঢৌকন আমার জন্য এনেছেন কি?" বললাম, "জি, জাহাঁপনা। আপনার জন্য অনেক চামড়া নিয়ে এসেছি।" এরপর সেগুলো আমি তাঁর কাছে দিলাম। তিনি পছন্দ করলেন এবং অনেক আগ্রহ দেখালেন। এরপর বললাম, "জাহাঁপনা, আপনার কাছ থেকে এক লোককে বের হতে দেখলাম। সে আমাদের এক দুশমনের দূত। তাকে হত্যার জন্য আমার কাছে দিন। কারণ সে আমাদের অনেক সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের ক্ষতি করেছে।" এটা শুনে বাদশাহ ক্রোধান্বিত হলেন এবং নিজেই নিজের নাকে আঘাত করলেন। আমার মনে হলো, যেন নাকটা ভেঙে গেছে।[৯২৮] ওই সময় যদি জমিনটা ফেটে যেত, তাহলে আমি সেখানে ঢুকে পড়তাম। এরপর বললাম, "জাহাঁপনা, আল্লাহর শপথ, যদি আমার কল্পনাতেও আসত যে, আপনি এটা অপছন্দ করেন, তবে কখনোই আপনার কাছে এ রকম আবেদন করতাম না।" বাদশাহ বললেন, "আপনি কি আমার কাছে এমন ব্যক্তির দূতকে হত্যার জন্য

৯২৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজির (২৭৪২) বর্ণনায় আছে, সে হাত ওপরে উঠিয়ে আমার নাকে এমন আঘাত করল, মনে হলো আমার নাকটা ফেটে গেছে।

চাচ্ছেন, যাঁর কাছে বড় ফেরেশতা আসে, যে ফেরেশতা মুসা ﷺ-এর কাছে আসত?” বললাম, “বাদশাহ নামদার, ব্যাপারটি কি আসলেই এমন?” বাদশাহ বললেন, “আফসোস তোমার জন্য হে আমর, তুমি আমার কথা শোনো, তাঁর অনুসরণ করো, কারণ অবশ্যই তিনি হকের ওপর আছেন। তিনি অবশ্যই তাঁর বিরোধীদের ওপর বিজয় লাভ করবেন, যেমন মুসা ﷺ ফিরআওন ও তার বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন।” বললাম, “আপনি কি তাঁর পক্ষ হয়ে আমার ইসলামের ওপর বাইআত নেবেন?” তিনি বললেন, “ঠিক আছে।” তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি তাঁর হাতে ইসলামের ওপর বাইআত দিলাম। এরপর আমার সাথিদের কাছে আসলাম। তাদের কাছে আমার ইসলামের কথা গোপন রাখলাম।’[৯২৯]

আমর বিন উমাইয়া ﷺ নাজ্জাশির কাছে রাসুল ﷺ-এর যে পত্রটি নিয়ে গিয়েছিলেন, তা এই :

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশি আসহামের কাছে

আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমি আপনার প্রতি আল্লাহর প্রশংসার বার্তার প্রেরণ করছি, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি রাজাধিরাজ, মহাপবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা-বিধায়ক এবং সর্বনিয়ন্তা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মারইয়াম তনয় ইসা আল্লাহর রুহ এবং কালিমা। তিনি তা সতী পূত-পবিত্রা মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। ফলে মারইয়াম ইসাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে স্বীয় কুদরতি রুহ ও ফুৎকারের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন, যেমন আদমকে স্বীয় কুদরতি হাত ও ফুৎকারে সৃষ্টি করেছেন।

৯২৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩১৮-৩১৯, ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৪২-৭৪৪, আদ-দুরার : ১৩৯-১৪৬ পৃ.।

আমি আপনাকে এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান করছি, যাঁর কোনো শরিক নেই। এবং আহ্বান করছি তাঁর আনুগত্য, আমার অনুসরণ এবং যে সত্য আমার কাছে এসেছে, তার প্রতি সমর্থন করতে। আর আমি আল্লাহর রাসুল।

আপনার কাছে আমার চাচাতো ভাই জাফর এবং কিছু মুসলিমকে প্রেরণ করেছি। তাঁরা আপনার কাছে এসে থাকলে তাঁদের আপ্যায়ন করুন এবং ক্ষমতার বড়াই করা পরিহার করুন। আমি আপনাকে এবং আপনার সৈন্যবাহিনীকে আল্লাহর দিকে ডাকছি। আমি আমার বার্তা পৌঁছে দিলাম এবং কল্যাণ কামনা করলাম। অতএব আমার উপদেশ গ্রহণ করুন।

সালাম ওই ব্যক্তির প্রতি যে হিদায়াত গ্রহণ করেছে।[৯৩০]

নাজ্জাশির প্রতি দ্বিতীয় পত্র

এ পত্র নবি মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ আসহাম নাজ্জাশির কাছে। ওই ব্যক্তির প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি কোনো স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ করেন না। এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। কারণ আমি আল্লাহর রাসুল। অতএব ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকবেন।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

৯৩০. তাবারি : ২/৬৫২, সুবহুল আশা লিল কলকশানদি : ৬/৩৭৯, আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ লিল কাসতালানি : ১/২৯১-২৯২, জাদুল মাআদ লি ইবনিল কাইয়িম : ৩/৬০।

'হে আহলে কিতাবগণ, একটি কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক সাব্যস্ত করব না। এবং আমরা আল্লাহকে ছেড়ে একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা (ইমানদারগণ) বলো, "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম।"[৯৩১]

যদি আপনি দাওয়াত গ্রহণ না করেন, আপনার সম্প্রদায়ের খ্রিষ্টানদের গুনাহ আপনার ওপর বর্তাবে।[৯৩২]

সম্ভবত আসহাম শব্দটি বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে ভুল। বাদশাহর সঠিক নাম হলো, আসহামাহ।[৯৩৩]

আমার মতে রাসুল ﷺ-এর প্রথম পত্রটি জাফর বিন আবু তালিব ﷺ-এর সাথে প্রেরণ করেছিলেন। যেমনটা আমরা জাফর ﷺ-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি।

রাসুল ﷺ-এর প্রতি নাজ্জাশির উত্তর

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের প্রতি

আসহাম বিন আবজার নাজ্জাশির পক্ষ থেকে

শান্তি বর্ষিত হোক আপনার প্রতি হে আল্লাহর নবি! আরও নাজিল হোক আল্লাহর রহমত ও বরকত, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং যিনি আমাকে ইসলামের জন্য হিদায়াত দান করেছেন।

---

৯৩১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৬৪।

৯৩২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৩/৮৩, ইমাম বাইহাকির দালায়িলুন নুবুওওয়া থেকে নকলকৃত।

৯৩৩. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৩/৭৭।

আপনার চিঠি আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। সেখানে আপনি ইসা ﷺ-এর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আসমান ও জমিনের রবের শপথ, আপনি ইসা সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, তার চেয়ে তিনি এতটুকুও বেশি নন। তিনি তেমনই, যেমন আপনি বলেছেন। আপনি যে সত্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তা স্বীকার করে নিয়েছি। আপনার চাচাতো ভাই ও তাঁর সাথিদের সমাদর করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্য ও সত্যায়িত আল্লাহর রাসুল। আমি আপনার কাছে বাইআত দিয়েছি এবং আপনার চাচাতো ভাইয়ের কাছেও বাইআত দিয়েছি। তাঁর হাতে বিশ্বজাহানের পালনকর্তার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। আপনার কাছে আমার ছেলে আরহা বিন আসহাম বিন আবজারকে পাঠিয়েছি। আমি তো কেবল নিজের ব্যাপারে ক্ষমতা রাখি। হে আল্লাহর রাসুল, আপনি চাইলে আমি আপনার কাছে চলে আসব। কারণ আমি সাক্ষ্য দিই, আপনি যা বলেন, তা হক। হে আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।'[৯৩৪]

স্বাক্ষর

ইবনে ইসহাক বলেন, 'আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে, নাজ্জাশি হাবশা থেকে তাঁর ছেলেসহ ৬০ জনকে একটি জাহাজে করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা যখন সমুদ্রের মাঝে পৌঁছে, তখন তাদের সকলকে নিয়ে জাহাজটি ডুবে যায়। ফলে সকলেই মৃত্যুবরণ করেন।'[৯৩৫]

৯৩৪. তাবারি : ২/৬৫৩, সুবহুল আশা : ৬/৪৬৬-৪৬৭, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৩/৮৪, জাদুল মাআদ : ৩০/৬০-৬১, অন্যান্য সকল উৎস জানতে দেখুন, মাজমুআতুল ওয়াসায়িকিস সিয়াসিয়্যাহ : ৪৬।

৯৩৫. তাবারি : ২/৬৫৩।

রাসুল ﷺ-এর প্রতি নাজ্জাশির পত্র

মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি

আসহামাহ নাজ্জাশির পক্ষ থেকে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনার ধর্মের মহিলাকে—যিনি আপনারই সম্প্রদায়ের মধ্য হতে—আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছি। তিনি হচ্ছেন জনাবা উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান। আপনার জন্য কিছু হাদিয়া হিসেবে একটি জামা, পাজামা, চাদর এবং এক জোড়া মোজা রেখেছি।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।[৯৩৬]

স্বাক্ষর

রাসুল ﷺ-এর নিকট নাজ্জাশির আরেকটি পত্র

মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি

আসহাম নাজ্জাশির পক্ষ থেকে

সালামুন আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। কোনো উপাস্য নেই ওই সত্তা ছাড়া, যিনি আমাকে ইসলামের পথ দান করেছেন।

আমার দেশ থেকে আপনার মুহাজির সাহাবিদের আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। আবার আমার ছেলে উরাইহাকে হাবশার ৬০ জন ব্যক্তির সাথে প্রেরণ করেছি। যদি আপনি চান, আমি নিজেই আপনার কাছে আসি, তাহলে আমি তা-ই করব। কারণ আমি সাক্ষ্য দিই যে, আপনি যা বলেন, তা সত্য।

আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।[৯৩৭]

---

৯৩৬. সকল উৎস ও তথ্য বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাজমুআতুল ওয়াসায়িকিস সিয়াসিয়্যাহ : ৪৮ পৃ.।
৯৩৭. তাবারি : ২/৬৫৩, সুবহুল আশা : ৬/৪৬৬-৪৬৭, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৮৪।

নাজ্জাশির কাছে দূত হিসেবে রাসুল ﷺ যাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি হলেন আমর বিন উমাইয়া রা.। নাজ্জাশির কাছে রাসুল ﷺ দুটি পত্র পাঠান। একটির মধ্যে নাজ্জাশিকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তাতে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেন। নাজ্জাশি রাসুল ﷺ-এর পত্র নিয়ে চোখে মুখে রাখেন। বিনয়ের বশবর্তী হয়ে সিংহাসন ছেড়ে মাটিতে বসে পড়েন। এরপর ইসলাম গ্রহণ করে কালিমাতুশ শাহাদাহ পাঠ করেন এবং বলেন, 'যদি তাঁর কাছে যেতে পারতাম, তবে অবশ্যই চলে যেতাম।' তিনি রাসুল ﷺ-এর নিকট তাঁর ইসলাম গ্রহণ, সত্যায়ন ও আনুগত্যের কথা লিখে পত্র পাঠান।

রাসুল ﷺ তাঁর অপর পত্রে নাজ্জাশিকে আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা রা.-কে রাসুল ﷺ-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাতে বলেন এবং হাবশায় অবস্থানরত মুহাজিরদের পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন। বাদশাহ তা করেছেন। উম্মে হাবিবা রা.-কে রাসুল ﷺ-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান এবং রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে ৪০০ স্বর্ণমুদ্রা মোহরানা আদায় করেন। এরপর প্রয়োজনীয় পাথেয়ের ব্যবস্থা করে দুটি জাহাজে করে মুসলিমদের আমর বিন উমাইয়া রা.-এর সাথে পাঠিয়ে দেন। তারপর বাদশাহ নাজ্জাশি রাসুল ﷺ-এর পত্রদুটি সযত্নে হাতির দাঁতে নির্মিত পাত্রে হিফাজত করেন। তিনি বলেন, 'হাবশা কখনো কল্যাণশূন্য হবে না, যতদিন রাসুল ﷺ-এর পত্রদুটি হাবশায় রক্ষিত থাকবে।'[৯৩৮]

দলিলনির্ভর যত কিতাব আমরা দেখেছি, সেসবের মধ্যে রাসুল ﷺ-এর ওই পত্রটির উল্লেখ পাইনি, যে পত্রে রাসুল ﷺ বাদশাহ নাজ্জাশিকে তাঁর সাথে উম্মে হাবিবার বিবাহ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মুসলিমদের হাবশা থেকে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেছেন।[৯৩৯]

সম্ভবত এই পত্রটি হারিয়ে গেছে এবং পরবর্তী সময়ে তার কোনো প্রতিলিপি লেখা হয়নি। কিন্তু নাজ্জাশি রাসুল ﷺ-এর সেই পত্রের নির্দেশনাবলি পালন করেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন। যেমনটা নাজ্জাশির চার ও পাঁচ নাম্বার পত্র থেকে বুঝে আসে।

---

৯৩৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৫৮-২৫৯।

৯৩৯. শারহুল মাওয়াহিব লিজ জারকানি : ৩/৩৪২, ইমতাউল মুআনাসাহ লিল মুকরিজি : ১/৩২৫। দেখুন, মাজমুআতুল ওয়াসায়িকিস সিয়াসিয়্যাহ : ৪৭-৪৮ পৃ.।

আমার কাছে যা মনে হচ্ছে, রাসুল ﷺ তাঁর প্রথম পত্রটি জাফর বিন আবু তালিব ﷺ-এর মাধ্যমে নাজ্জাশির কাছে পাঠিয়েছিলেন—যখন জাফর ﷺ মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। এ পত্রের বিষয়বস্তু থেকেও তার প্রমাণ মেলে।

নাজ্জাশির নিকট রাসুল ﷺ-এর দ্বিতীয় পত্রটি নিয়ে গিয়েছিলেন মূলত আমর বিন উমাইয়া ﷺ। কিন্তু ইমাম বাইহাকি ﷺ তাঁর 'দালায়িলুন নুবুওওয়া' গ্রন্থে পত্রটি উল্লেখ করেছেন হাবশায় হিজরতের পরবর্তী ঘটনা হিসেবে। তাঁর এ বক্তব্যটি বিতর্কপূর্ণ। কারণ এর থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, দ্বিতীয় পত্রটি পৌঁছেছিল বাদশাহ নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী সময়ে। যেভাবে অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন : রোমের হিরাক্লিয়াস, পারস্যের কাইসার, মিসরের বাদশাহ ও নাজ্জাশি। ইমাম জুহরি ﷺ বলেন, 'তাদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর একটি পত্র ছিল, অর্থাৎ এক বিষয়বস্তুর ওপর ছিল। প্রতিটি পত্রের মধ্যে এই আয়াত উল্লেখ থাকত—

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

'হে আহলে কিতাবগণ, একটি কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক সাব্যস্ত করব না। এবং আমরা আল্লাহকে ছেড়ে একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা (ইমানদারগণ) বলো, "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম।"'[৯৪০]

এটি সুরা আলে ইমরানের আয়াত। সুরা আলে ইমরান সবার মতে মাদানি সুরা। এর শুরুর ৩০টি আয়াত নাজরানের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।[৯৪১]

৯৪০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৬৪।
৯৪১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৮৩।

বাদশাহ নাজ্জাশির নাম হচ্ছে আসহামাহ।[৯৪২] অনেকেই বাদশাহ নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। মূলত সংশয়টি অমুসলিমদের পক্ষ থেকে শুরু হয়। এরপর মুসলিমরা কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই তাদের কথাগুলো বর্ণনা করতে থাকে। অথচ বাদশাহ নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ একটি প্রমাণিত বিষয়। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর রাসুল ﷺ তাঁর গায়েবানা জানাজা পড়েন। যা সহিহ বুখারি, মুসলিম, নাসায়ি ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আর গায়েবানা জানাজা কেবল মুসলিমের মৃত্যুতে পড়া হয়।

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমর বিন উমাইয়া رضي الله عنه-কে বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল, তার সবকটি লক্ষ্যই তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। যেমন : নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ বা তাঁর ইসলামকে নবায়নকরণ এবং হাবশার অন্য লোকদের ইসলাম গ্রহণ। মুহাজিরদের সেখান থেকে মদিনায় নেওয়ার কার্যক্রম এবং রাসুল ﷺ-এর সাথে উম্মে হাবিবা رضي الله عنها-এর বিবাহ সম্পন্নকরণ।

হতে পারে বাদশাহ নাজ্জাশি জাফর رضي الله عنه-এর হাতে ইসলাম গ্রহণের পরে আবার আমর বিন উমাইয়া رضي الله عنه-এর হাতেও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সে হিসেবে আগে-পরে তাঁর দুবার ইসলাম গ্রহণ করা হয়।[৯৪৩] এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

আমর বিন উমাইয়া رضي الله عنه কেবল একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধাই ছিলেন না; বরং একজন বিদগ্ধ আলোচকও ছিলেন।

মিথ্যা নবি দাবিদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের কাছেও দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন আমর বিন উমাইয়া رضي الله عنه। মুসাইলামা অবশ্য তার সম্প্রদায় বনু হানিফার সাথে মদিনা মুনাওয়ারাতেও এসেছিল। সে তখন এক আনসারি নারীর বাড়িতে অবস্থান নিয়ে রাসুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এরপর নাজদের ইমামা অঞ্চলে ফিরে যায় এবং বনু হানিফার কাছে নিজেকে নবি বলে প্রকাশ করে। দাবি করে, নবি হওয়ার ক্ষেত্রে সে রাসুল ﷺ-এর শরিক। বনু হানিফা তার অনুসরণ করে। মদিনায় বনু হানিফা ও মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের আগমন

---

৯৪২. সহিহ মুসলিম : ২/৩৩৭, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৭৭, আল-মুহাব্বার : ৭৬ পৃ.।
৯৪৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৮৩।

হয়েছিল দশম হিজরিতে।[৯৪৪] এ বছরটি ছিল প্রতিনিধি আগমনের বছর।

সম্ভবত মুসলিমদের মাঝে মুসাইলামার মুরতাদ হওয়ার খবরটি ছড়িয়ে পড়লে তখন রাসুল ﷺ আমর বিন উমাইয়া ؓ-এর মাধ্যমে মুসাইলামার কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লেখেন। মুসাইলামা প্রত্যুত্তরে লেখে, 'সেও রাসুল ﷺ-এর অনুরূপ নবি। সে রাসুল ﷺ-এর নিকট অর্ধ বিশ্বের ভাগ চেয়ে বসে এবং বলে কুরাইশরা ইনসাফ করতে পারবে না।[৯৪৫] রাসুল ﷺ-এর নিকট মুসাইলামার চিঠির লিপিটি ছিল এমন—

'আল্লাহর রাসুল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের প্রতি।

নবুওয়তের ক্ষেত্রে আমাকে আপনার অংশীদার করা হয়েছে। জমিনের অর্ধেক অংশ আমাদের, আর অর্ধেক অংশ কুরাইশের। কিন্তু কুরাইশরা জুলুম করছে।'

মুসাইলামা তার এ পত্র দুজন বার্তাবাহকের মাধ্যমে রাসুল ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করে। রাসুল ﷺ বার্তাবাহককে মুসাইলামার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তারা মুসাইলামাকে নবি হিসেবে স্বীকার করে। তখন রাসুল ﷺ তাদের বলেন, 'যদি বার্তাবাহককে হত্যা করা যেত, তবে আমি তোমাদের হত্যা করতাম।'

এরপর রাসুল ﷺ মুসাইলামার কাছে চিঠি লেখেন,

'আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মিথ্যুক মুসাইলামার প্রতি

সালাম ওই ব্যক্তির প্রতি, যে হিদায়াত অনুসরণ করে। নিশ্চয় পুরো জমিনের মালিকানা আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, এর কর্তৃত্ব দান করেন। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য নির্ধারিত।'[৯৪৬]

এ পত্রটি রাসুল ﷺ জুবাইর ইবনুল আওয়াম ؓ-এর ভাই সায়িব ইবনুল আওয়াম ؓ-কে দিয়ে প্রেরণ করেন।[৯৪৭]

---

৯৪৪. ইবনুল আসির : ২/২৯৮।
৯৪৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৩৭।
৯৪৬. ইবনুল আসির : ২/২৯৯-৩০০।
৯৪৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৩৭।

বলা হয়, মুসাইলামা ও অন্যদের নবুওয়াত দাবির বিষয়টি ঘটেছিল বিদায় হজ ও মৃত্যুশয্যায় শায়িত হওয়ার পরে। লোকেরা যখন রাসুল ﷺ-এর অসুস্থতার কথা শুনল, তখন ইয়ামানে আসওয়াদ আল-আনাসি, ইমামায় মুসাইলামা এবং বনু আসাদে তুলাইহা আল-আসাদি বিদ্রোহ করে বসে।[৯৪৮]

এর অর্থ হচ্ছে, আমর বিন উমাইয়া ﷺ মুসাইলামার কাছে পত্র নিয়ে যান প্রথম বর্ণনার দাবি অনুসারে দশম হিজরিতে এবং দ্বিতীয় বর্ণনা অনুসারে ১১ হিজরিতে।

এটা স্পষ্ট বিষয় যে, আমর বিন উমাইয়া ﷺ-এর দোভাষীর কাজটি এক গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানমূলক ছিল। এর লক্ষ্য ছিল, মুসাইলামা ও বনু হানিফার ইরতিদাদের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর এর ক্ষতির পরিধিটা জেনে নেওয়া। তিনি দেখতে পেলেন, মুসাইলামা ও বনু হানিফার বিষয়টি ক্ষমতার লোভ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে তাদের চালিকাশক্তি ছিল গোত্রীয় অহমিকা। যাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ইসলামের আগমন ঘটেছে। তাদের ইরতিদাদ ও এহেন কার্যকরণের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এ সমস্যা নিরসনে কোনো বিবেকের অবকাশ থাকে না; বরং বিবেক যেখানে নীরব থাকে, সেখানে কেবল তরবারির ভাষায় কথা চলে।

মুরতাদদের মোকাবিলা করতে হবে, এ ব্যাপারে আগাম সতর্কবার্তা দানে অন্যদের মতো আমর বিন উমাইয়া ﷺ-এরও অবদান ছিল। রাসুল ﷺ যখন মহান রবের সান্নিধ্যে চলে গেলেন, তখন আবু বকর ﷺ ইরতিদাদের ফিতনার বিরুদ্ধে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে এ ফিতনাকে অল্প সময়ের মধ্যে নির্মূল করে দেন।

৯৪৮. ইবনুল আসির : ২/৩০০।

আমর বিন উমাইয়া ﷺ রাসুল ﷺ থেকে ২০টি হাদিস বর্ণনা করেন।[৯৪৯] সিহাহ সিত্তার ইমামগণ তাঁদের কিতাবে তাঁর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর একটি হাদিস ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম ﷺ যৌথসূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং একটি হাদিস ইমাম বুখারি ﷺ একক সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৯৫০]

তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁর তিন পুত্র জাফর, আব্দুল্লাহ ও ফজল।[৯৫১] তাঁর ভাতিজা জাবরিকান, শাবি। এবং আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান, আবু কালাবাহ আল-জারমি ও আবুল মুহাজির ﷺ।[৯৫২]

অবশ্য মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর তিন পুত্র—জাফর, আব্দুল্লাহ ও ফজল রাসুল ﷺ থেকে তাঁর সবকটি হাদিস বর্ণনা করেন। কিন্তু বংশতালিকা-বিশারদগণ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু তাঁর ছেলে জাফর ও নাতি জাবরিকান বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন উমাইয়াকে উল্লেখ করেছেন।[৯৫৩] সম্ভবত তাঁর সন্তানাদির মধ্যে কেবল এ দুজনই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ফলে তাঁরা উল্লেখযোগ্য হয়েছে। কারণ বংশতালিকা-বিশারদগণ অধিকাংশ সময় অপ্রসিদ্ধদের উল্লেখ করেন না। আমর বিন উমাইয়া ﷺ হিজাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন।[৯৫৪] তিনি মদিনাতেই অবস্থান করেন এবং মদিনাতেই মৃত্যুবরণ করেন। মক্কা-বিজয়ের পরে অন্য কোনো শহরে তেমন একটা সফর করেননি।

আমরা তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে জানতে পারিনি। কিন্তু তিনি ৬০ হিজরি সনের পূর্বে মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন।[৯৫৫] সে হিসেবে

---

৯৪৯. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/২৪, আসমাউস সাহাবাতির রুওয়াত- মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ : ২৮৩ পৃ., খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ২৮৭ পৃ.।

৯৫০. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/২৫।

৯৫১. খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ২৮৭ পৃ.।

৯৫২. তাহজিবুত তাহজিব : ৮/৬।

৯৫৩. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৯৫ পৃ.।

৯৫৪. তাহজিবুত তাহজিব : ৮/৬।

৯৫৫. উসদুল গাবাহ : ৪/৮৬।

তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৫০ হিজরি দশকে।[৯৫৬] সম্ভবত তিনি অনেক লম্বা হায়াত পেয়েছিলেন। কারণ তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যের কারণে জাহিলি যুগে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাহিলি যুগে মানুষের মাঝে পরিচিতি পাওয়ার মতো বয়সে তাকে উপনীত হতে হবে।

ইবনে খইয়াত একক সূত্রে উল্লেখ করেছেন, রাসুল ﷺ আমর বিন উমাইয়া ﷺ-কে আবু সুফিয়ানের কাছে হাদিয়া দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।[৯৫৭] এ ঘটনা তিনি বিভিন্ন বাদশাহ ও নেতৃবর্গের কাছে রাসুল ﷺ-এর বার্তাবাহকদের নাম উল্লেখ করার শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু আবু সুফিয়ান কুরাইশের একজন নেতা ছিলেন। শুধু একটি উৎসগ্রন্থের প্রমাণ—তাঁর প্রসিদ্ধিসহ—সংবাদকে যেমন অপরিচিত করে তুলেছে, তেমন বাকি উৎসগ্রন্থে তার অনুপস্থিত সংবাদটির শুদ্ধতাকে সন্দেহযুক্ত করেছে।

এ সংবাদে সন্দেহের মূল কারণটি হচ্ছে, কুরাইশরা মুসলিমদের সাথে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে একটা শান্তিপূর্ণ সময় অতিক্রম করছিল। আবার ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের অবস্থান ছিল একরকম এবং অন্যান্য রাজা-বাদশাহর ব্যাপারে তার অবস্থান ছিল আরেক রকম। এ কারণে এ সংবাদের সত্যতার চেয়ে সংশয়টি বেশি শক্তিশালী।

আমর বিন উমাইয়া ﷺ ব্যক্তি হিসেবে আরবের একজন সেরা ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের পূর্বেও যেমন ছিলেন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তেমন ইসলামে এসেও হয়েছিলেন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ইসলাম ও মুসলিমদের এত বিরাট খিদমত করেছেন, যা ভুলে যাওয়ার মতো না।

আমর বিন উমাইয়া ﷺ আরবের একজন অন্যতম দুঃসাহসী বীর বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন।[৯৫৮] তিনি ছিলেন ক্ষিপ্র-গতিসম্পন্ন। বিপদ আসন্নের মুহূর্তেই উধাও হয়ে শত্রুকে ব্যর্থ করে দিতে পারতেন অনায়াসে।

---

৯৫৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৪৬।

৯৫৭. তারিখু খলিফাহ ইবনি খইয়াত : ১/৬২।

৯৫৮. তাহজিবুত তাহজিব : ৮/৬, খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ২৮৭, আল-ইসাবাহ : ৪/২৮৫।

তিনি ছিলেন উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং সুস্থ বিবেকসম্পন্ন। এ কারণে বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে দূত হিসেবে গিয়ে একজন দায়ি ইলাল্লাহ, বাগ্মী ও আলোচকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি যত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তা তাঁর আত্মোৎসর্গী ও আক্রমণাত্মক জিহাদি মনোভাবের কারণে হয়েছিল।

শূলে ঝুলন্ত খুবাইব ﵁-এর লাশ উদ্ধারের কাজকে গুরুত্বহীন ও সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। কারণ নিশ্ছিদ্র প্রহরা ঘেরা শূলির কাষ্ঠ থেকে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধারের কাজটি একদিক থেকে যেমন কাফিরদের মনোবলকে ভেঙে দিয়েছে, অপরদিকে মুসলিমদের মনোবলকে বহুগুণে চাঙা করে তুলেছে।

রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের থেকে মৃত্যুর আগে-পরে কখনো আলাদা হননি। এটা যুদ্ধে এবং শান্তি অবস্থায় মুসলিমদের মনোবলকে সমুন্নত করেছে।

খুবাইব ﵁-এর লাশ কৌশলে উদ্ধার করা কুরাইশদের মনোবলে কঠিন আঘাত হেনেছে। কারণ এ অপারেশনের কারণে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, মুসলিমরা তাদের বাড়ির অভ্যন্তরে গিয়ে দিনদুপুরে তাঁদের অভিযান সফল করার সক্ষমতা রাখে। ফলে তারা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে অনিরাপদ হয়ে পড়ে।

এ সবই ছিল আমর বিন উমাইয়া ﵁-এর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। যা তাঁর আলোকময় জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

ইতিহাসে আমর বিন উমাইয়া ﵁

তিনি ইসলামের পূর্বেও আরবের একজন খ্যাতনামা বীর ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরও বীর ছিলেন। তিনি তাঁর বীরত্বকে রাসুল ﷺ ও ইসলামের লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যপন্থী মুজাহিদ, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কমান্ডার এবং বিচক্ষণ রাষ্ট্রীয় দূত। তিনি সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির ওপর তাঁর অফুরন্ত রহমত ও বরকত নাজিল করুন।

শহিদ কমান্ডার

বাশির বিন সাদ আল-খাজরাজি আল-আনসারি ﵁

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

বাশির বিন সাদ বিন সালাবা বিন খাল্লাস বিন জাইদ বিন মালিক আল-আগার বিন সালাবা বিন কাব বিন খাজরাজ বিন হারিস বিন খাজরাজ।[৯৫৯]

তাঁর মাতা আনিসা বিনতে খলিফাহ বিন আদি বিন আমর বিন ইমরুউল কাইস বিন মালিক আল-আগার। ইনি খাজরাজ গোত্রের লোক।[৯৬০]

বাশির ﵁-এর সন্তানগণ হলেন ইবরাহিম, শায়ির মুকসির, নুমান। নুমান বিন বাশির ﵁ হিজরতের পরে আনসারিদের সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণকারী সন্তান।[৯৬১] বাশির ﵁-এর উপনাম ছিল আবু নুমান। নুমান ও উবাইয়াহর মা হলেন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁-এর বোন আমরাহ বিনতে রওয়াহা ﵂। বাশির ﵁ মৃত্যুর সময় ওয়ারিস রেখে যান।[৯৬২]

---

৯৫৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৩১, আল-ইসতিবসার : ১২১ পৃ., তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৩/২৬৪, উসদুল গাবাহ : ১/১৯৫, আল-ইসতিআব : ১/১৭২।
৯৬০. আল-ইসতিবসার : ১০৮ পৃ.।
৯৬১. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৩৬৪ পৃ.।
৯৬২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৩১।

বাশির ﷺ জাহিলি যুগে আরবি লিখতে পারতেন। অথচ তখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা একেবারে কম ছিল।

তিনি মদিনার বনু খাজরাজ ও আওস গোত্রের মুসলিমদের সাথে আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৯৬৩] বলা হয়, তিনি আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৯৬৪] সে হিসেবে তিনি মদিনাবাসীর মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য।

রাসুল ﷺ ও অন্যান্য সাহাবিগণ যখন মদিনায় হিজরত করেলেন, তখন বাশির ﷺ নতুন ইসলামি সমাজের এক কার্যকর অঙ্গে পরিণত হয়েছিলেন। যে ইসলামি সমাজ ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের মজবুত বন্ধনে বিনির্মিত।

ফাদাকের অভিযানে[৯৬৫]

বাশির ﷺ বদর,[৯৬৬] উহুদ, খন্দকসহ রাসুল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৯৬৭] সপ্তম হিজরির শাবান মাসে রাসুল ﷺ তাঁকে ৩০ জন লোক দিয়ে ফাদাক অঞ্চলের বনু মুররাহ গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাঁরা গিয়ে রাখালদের দেখা পেলেন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'শত্রুরা কোথায়?' বলা হলো, 'তারা এখন মরুভূমিতে অবস্থান করছে।' তখন তিনি তাদের উট ও ছাগল নিয়ে মদিনার দিকে চলতে লাগলেন।

এরই মধ্যে শত্রপক্ষের এক লোক আর্তচিৎকার দিয়ে উঠল এবং এ সংবাদ সে শত্রুদের জানিয়ে দিল। রাত হয়ে গেলে বাশির বিন সাদ ﷺ শত্রুর সাধারণ লোকদের মাঝে পড়ে গেলেন। পরস্পর তির বিনিময় হতে লাগল। একসময়

---

৯৬৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৬৭, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৮০, আদ-দুরার : ৭৬ পৃ.।
৯৬৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৫৩।
৯৬৫. হিজাজের একটি অঞ্চল। ফাদাক ও মদিনার মাঝে দুই দিনের দূরত্ব। আবার বলা হয়, তিন দিনের দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৬/৩৪২-৩৪৫।
৯৬৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩৩৮, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৬৫, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৩০ পৃ., আদ-দুরার : ১২৯ পৃ.।
৯৬৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৩১, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১২৪।

বাশির ﷺ-এর সাথিদের তির শেষ হয়ে গেল। তখন শত্রুরা তাঁদের ওপর হামলা করে বসল। এতে সকলেই হতাহতের শিকার হলেন। বাশির ﷺ লড়াই করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেন। তাঁর গোড়ালিতে মারাত্মক আঘাত লাগে; ফলে তাঁকে মৃত ভাবা হয়। বনু মুররাহ তাদের উট ও ছাগল নিয়ে ফিরে যায়।

অভিযানের এক সৈনিক, উলবাহ বিন জাইদ হারিসি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে সংবাদ জানায়। তাঁর পরে এসে পৌঁছান বাশির ﷺ।[৯৬৮]

য়ুমন ও জুবার অভিযান[৯৬৯]

রাসুল ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, জিনাব[৯৭০] এলাকায় বনু গাতাফানের একটি সেনাদল একত্রিত হয়েছে। আবার উয়াইনা বিন হিসন তাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে। তাদের লক্ষ্য হলো রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো। এ খবর জানতে পেরে রাসুল ﷺ বাশির বিন সাদ ﷺ-কে ডাকলেন এবং তাঁর হাতে ঝান্ডা দিয়ে ৩০০ সৈন্যের একটি দল গঠন করে য়ুমন ও জুবার অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ ঘটনা সপ্তম হিজরির শাওয়াল মাসে ঘটে।

মুসলিম বাহিনী রাতে চলত আর দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকত। এভাবে তাঁরা য়ুমন ও জুবার এলাকায় পৌঁছে গেলেন। এটি জিনাবের দিকেই ছিল। জিনাব অঞ্চলটি সাল্লাহ, খাইবার ও ওয়াদিল কুরা এলাকাগুলোর মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। মুসলিম বাহিনী অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়ল। এরপর শত্রুর কাছাকাছি হয়ে তাদের অনেক উট হস্তগত করল। উটের রাখালরা এদিক সেদিক পালিয়ে গেল। তারা গিয়ে তাদের বাহিনীকে সতর্ক করামাত্রই তারা

---

৯৬৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১১৮-১১৯, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭২৩-৭২৬। দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৮৪।

৯৬৯. য়ুমন হচ্ছে ফাইদ ও মদিনার মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত গাতাফান গোত্রের একটি পানির উৎসের নাম। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/৫২৪। আর জুবার হচ্ছে ফাইদ ও মদিনার মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত কুজাআহ গোত্রের একটি পানির উৎসের নাম। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/৪৩।

৯৭০. জিনাব, ফাইদ ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/১৪১।

ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং তাদের উঁচু এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। বাশির ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে শত্রুর এলাকায় ঢুকে কাউকে পেলেন না। তাই উটের পাল নিয়ে তিনি মদিনায় ফিরে এলেন। পথিমধ্যে বনু গাতাফানের দুজনকে পেয়ে বন্দী করেন এবং তাদেরকে সাথে করে রাসুল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলে রাসুল ﷺ তাদের ছেড়ে দেন।[৯৭১]

বাশির বিন সাদ ﷺ এভাবেই এই অভিযানে তাঁর মিশন সফল করেছিলেন।

একটি কৌশলগত নেতৃত্বে

উমরাতুল কাজা অভিযানে রাসুল ﷺ তির, তলোয়ার, ঢাল, বর্ম ও শিরস্ত্রাণ সঙ্গে নিয়েছিলেন। এবং মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-এর নেতৃত্বে ১০০ অশ্বারোহী নিয়েছিলেন। বাশির বিন সাদ ﷺ-এর নেতৃত্বে অস্ত্রগুলো আগে পাঠিয়ে দেন। বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি অস্ত্র সঙ্গে নিলেন; অথচ আমাদের ওপর তাদের শর্ত ছিল, আমরা সফরের সম্বল হিসেবে শুধু একটি অস্ত্র সঙ্গে রাখব?!' রাসুল ﷺ বললেন, 'আমরা অস্ত্র নিয়ে হেরেমে প্রবেশ করব না। অস্ত্র কেবল আমাদের কাছাকাছি থাকবে।'

রাসুল ﷺ এবং মুসলিমগণ তালবিয়া পড়তে পড়তে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এদিকে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ তাঁর অশ্ববাহিনী নিয়ে মাররুজ জাহরানে[৯৭২] পৌঁছলেন। তিনি সেখানে একদল কুরাইশ দেখতে পেলেন। তারা মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে রাসুল ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'এই তো, আল্লাহর রাসুল ﷺ আগামীকাল এখানে সকাল করবেন ইনশাআল্লাহ।' তারা বাশির বিন সাদ ﷺ-এর সাথে অনেক অস্ত্র দেখে দ্রুত কুরাইশদের কাছে গিয়ে অস্ত্র ও অশ্ববাহিনীর কথা জানিয়ে দিল। কুরাইশরা ভয় পেয়ে গেল। বলল, 'আল্লাহর শপথ, আমরা কোনো অন্যায় করিনি। আমরা তো আমাদের চুক্তির ওপর অটল আছি। তাহলে মুহাম্মাদ কী হিসেবে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে?'

---

৯৭১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২০, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭২৭-৭৩১, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৮৪।

৯৭২. মাররুজ জাহরান হচ্ছে মক্কা থেকে এক মনজিল দূরে অবস্থিত। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/২১।

রাসুল ﷺ মাররুজ জাহরানে অবতরণ করলেন এবং বাতনে ইয়াজুজ স্থানে[৯৭৩] অস্ত্রগুলো পাঠিয়ে দিলেন, যেখান থেকে হেরেমের স্থাপনাগুলো দেখা যায়। কুরাইশরা মিকরাজ বিন হাফসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করল। তারা বাতনে ইয়াজুজে এসে দেখতে পেল, রাসুল ﷺ তাঁর সাথিদের মাঝে অবস্থান করছেন। তারা রাসুল ﷺ-এর পৌঁছার পরপরই পৌঁছেছে। কুরাইশ প্রতিনিধিদল বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আমাদের ছোট থেকে ছোট প্রতারণার কথাও তো জানতে পারেননি। তারপরও হেরেমের ভেতরে আপনার কওমের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে ঢুকছেন?! অথচ শর্ত করেছেন সফরের সম্বল হিসেবে শুধু একটি অস্ত্র সঙ্গে রাখবেন।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আমরা শর্তানুসারেই প্রবেশ করব।' মিকরাজ দ্রুত ফিরে গিয়ে কুরাইশদের আশ্বস্ত করল, 'মুহাম্মাদ অস্ত্র নিয়ে হেরেমে প্রবেশ করবে না। তিনি তাঁর চুক্তির ওপর অটল আছেন।'[৯৭৪]

বাশির বিন সাদ رضي الله عنه রাসুল ﷺ-এর অধীনে কৌশলগত নেতৃত্ব পরিচালনা করেছিলেন। এর মাধ্যমে কুরাইশের মনোবলে এমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তারা প্রতারণা করার চিন্তাও করতে পারেনি। কারণ তারা স্বচক্ষে দেখেছিল মুসলিমরা স্বশস্ত্র। এ কৌশলের মাধ্যমে মূলত রাসুল ﷺ নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। যাতে পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হলে মুহূর্তে অস্ত্রকে কাজে লাগাতে পারেন। রাসুল ﷺ-এর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা এমনই সূক্ষ্ম ছিল যে, সব সম্ভাবনা মাথায় রেখে কেবল খারাপ সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই তিনি কাজ করেছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা তিনি কোনো ধরনের প্রতারণার চিন্তাও করেননি। যেহেতু ইসলামি মূল্যবোধ এবং চিরাচরিত শিক্ষায় ধোঁকা ও প্রতারণার কোনো স্থান নেই।

ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন

বাশির رضي الله عنه আনসারি হওয়ার সুবাদে তাঁকে মাদানি রাবি হিসেবে গণ্য করা হয়।[৯৭৫] তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর ছেলে নুমান এবং জাবির বিন

৯৭৩. বাতনে ইয়াজুজ, মক্কা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/৪৯০।
৯৭৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৩৩-৭৩৪।
৯৭৫. আল-ইসতিআব : ১/১৭১, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১২৪।

আব্দুল্লাহ।[৯৭৬] জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বর্ণিত একটি হাদিসে তাঁর আলোচনা এসেছে, জাবির ﷺ বলেন, 'বাশির বিন সাদকে উদ্দেশ্য করে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "হে আবু নুমান!"' তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন উরওয়া ও শাবি ﷺ। কারণ তাঁরা দুজন তাঁর সাক্ষাৎ পাননি।[৯৭৭] তাঁর ছেলে মুহাম্মাদও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন। যেহেতু তাঁর সাথেও তাঁর পিতার সাক্ষাৎ হয়নি।[৯৭৮] মুহাম্মাদ বিন ইসহাক জুহরি থেকে, তিনি হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ থেকে, তিনি নুমান বিন বাশির ﷺ থেকে, তিনি তাঁর পিতা বাশির ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, 'তিনি তাঁর এক ছেলেকে কোলে করে রাসুল ﷺ-এর কাছে এলেন। বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আমার এ ছেলেকে একটি গোলাম উপহার দিয়েছি। আমার ইচ্ছা, আপনি এ ব্যাপারে সাক্ষী হোন।" রাসুল ﷺ বললেন, "এ ছাড়া তোমার আর কোনো সন্তান আছে?" বললেন, "হ্যাঁ, আছে।" রাসুল ﷺ বললেন, "তাদেরকেও কি এরূপ উপহার দিয়েছ?" বললেন, "না।" রাসুল ﷺ বললেন, "তাহলে আমি এ ব্যাপারে সাক্ষী হব না।" জুহরি থেকেও এরূপ বর্ণনা আছে। সেখানে আছে, নুমান ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তাঁর পিতা বাশির বিন সাদ নুমানকে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে গেলেন।' এখানে নুমানকে হাদিসের মূল রাবি বানানো হয়েছে। এটি তিনটি হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি 'শিষ্টাচার' অধ্যায়ে এসেছে। আবার 'স্বেচ্ছায় অনুদান' অধ্যায়েও এসেছে।[৯৭৯] সহিহ বুখারি ও মুসলিমে সন্তানকে অনুদান দেওয়ার ঘটনার বিবরণে বাশির ﷺ-এর আলোচনা এসেছে। তাঁর হাদিস নাসায়িতে বর্ণিত হয়েছে।[৯৮০] নুমান ﷺ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেন :

«رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَها، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرَبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» «ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ»

---

৯৭৬. আল-ইসতিবসার : ১২২ পৃ.।
৯৭৭. উসদুল গাবাহ : ১/১৯৫।
৯৭৮. তাহজিবুত তাহজিব : ১/৪৬৪।
৯৭৯. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১২৪।
৯৮০. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৩/২৬৪-২৬৫।

“আল্লাহ ওই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে আমার বাণী শুনেছে, এরপর তা সংরক্ষণ করেছে। কারণ জ্ঞানের অনেক বাহক আছে, যে নিজে সমঝদার নয় (তবে যার নিকট পৌঁছাবে, সে হয়তো সমঝদার)। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক আছে, তার চেয়ে অধিক সমঝদার কারও নিকট পৌঁছায়। তিনটি গুণ এমন, যার ব্যাপারে কোনো মুসলিমের হৃদয় বিদ্বেষী হয় না: (এক) আল্লাহর জন্য আমলকে খাঁটি করা, (দুই) কর্তৃত্বশীলের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া, (তিন) মুসলিমদের জামাআতকে আঁকড়ে থাকা।’[৯৮১]

ইমাম তাবারানি ﷺ বাশির ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন :

مَنْزِلَةُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ، مَنْزِلَةُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، مَتَى مَا اشْتَكَى الْجَسَدُ اشْتَكَى لَهُ الرَّأْسُ، وَمَتَى مَا اشْتَكَى الرَّأْسُ اشْتَكَى سَائِرُ الْجَسَدِ

‘এক মুমিনের সাথে আরেক মুমিনের তুলনা হচ্ছে শরীরের সাথে মাথার মতো। তার যখন শরীর ব্যথা করে, তখন তার পুরো মাথাও ব্যথা অনুভব করে। তার যখন মাথা ব্যথা করে, তখন তার পুরো শরীর ব্যথা অনুভব করে।’[৯৮২]

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে বাশির ﷺ বলেন[৯৮৩] :

أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ.

---

৯৮১. আল-মুজামুল কাবির : ১২২৪ (২/৪১)।
৯৮২. আল-মুজামুল কাবির : ১২২৩।
৯৮৩. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১২৪।

"'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ আমাদেরকে আপনার প্রতি দরুদ প্রেরণের আদেশ দিয়েছেন। আমরা কীভাবে আপনার প্রতি দরুদ প্রেরণ করব?" রাসুল ﷺ চুপ থাকলেন। (সাহাবিগণ বলেন) "আমরা প্রত্যাশা করলাম, যদি সে রাসুল ﷺ-কে প্রশ্ন না করত!" এরপর রাসুল ﷺ বললেন, "বলো, "হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহিমের প্রতি ও তাঁর পরিবারের প্রতি। এবং মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত নাজিল করুন, যেমন বরকত নাজিল করেছেন ইবরাহিমের প্রতি ও তাঁর পরিবারের প্রতি উভয় জগতে। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত সুমহান মর্যাদার অধিকারী।" আর সালাম, তোমরা যেমনটা জানো, সেভাবে প্রেরণ করো।"'[৯৮৪]

তিনি রাসুল ﷺ-এর সংশ্রবও পেয়েছেন এবং তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করার মর্যাদাও লাভ করেছেন।[৯৮৫]

সম্ভবত তিনি কবি ছিলেন। কিছু কবিতা তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। যদি তিনি বাস্তবে কবি হয়ে থাকেন, তবে তাঁর অধিকাংশ কবিতা বিনষ্ট হয়ে গেছে অথবা তিনি অল্প কবিতা রচনা করেছিলেন।

ইবনে আসাকির ؒ একটি কবিতা বাশির ؓ-এর দিকে দৃঢ়তার সাথেই সম্বন্ধযুক্ত করেছেন।[৯৮৬] কিন্তু কবিতাটি অন্যের সাথেও সম্পৃক্ত করা হয়।[৯৮৭] তাই নিশ্চিতভাবে যেমন তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না, তেমন অন্যের বলেও চালিয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় তা সংশয়পূর্ণ। যদি তিনি বাস্তবে কবি হতেন, তবে আমরা তাঁর কোনো না কোনো কাব্যিক মহান আওয়াজ অবশ্যই শুনতে পেতাম। যেমনটা রাসুল ﷺ-এর অন্য কবিদের বেলায় ঘটেছে।

---

৯৮৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩২২০, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ১/২৬৬।
৯৮৫. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৩/২৬৪।
৯৮৬. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৩/২৬৫।
৯৮৭. মুজামুল বুলদানে বাশির ؓ-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুক্কারি তার দিওয়ানে হাসসান বিন সাবিত ؓ-এর বলেছেন। আবার হারিস বিন খাজরাজ গোত্রের সাদ বিন হুসাইনের সাথেও সম্পৃক্ত করা হয়।

হয়তো ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় বাশির ﵁-এর সবচেয়ে বড় অবদানটি হচ্ছে, রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর আবু বকর ﵁-এর হাতে বাইআত দান। কারণ বনু সায়িদার বৈঠকখানায় আনসারদের মধ্য থেকে তিনিই সর্বপ্রথম বাইআত দিয়েছিলেন।[৯৮৮] যে বাইআত আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে সম্ভাব্য ফিতনাকে রোধ করেছিল, সে বাইআতের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বনু সায়িদার বৈঠকখানায় ঘটে যাওয়া বিষয়ের ওপর কিছুটা আলোকপাত করা জরুরি মনে হচ্ছে। আবু বকর ﵁-এর বাইআত এক ফিতনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যেমনটা উমর ﵁ বলেছেন। কিন্তু আল্লাহ তার অনিষ্টতা থেকে উম্মাহকে রক্ষা করেছেন।

আনসারগণ বনু সায়িদার বসার স্থানে একত্রিত হয়ে সাদ বিন উবাদাহ ﵁-কে খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মনোনীত করেন।

সাদ বিন উবাদাহ ﵁ আল্লাহর প্রশংসা নিবেদন করার পর বললেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়, তোমাদের যে অগ্রগামিতা ও মর্যাদা, তা আরবের অন্য কারও নেই। মুহাম্মাদ ﷺ নিজ কওমে অবস্থান করে ১৩ বছর তাদের দ্বীনের দিকে ডেকেছেন। কিন্তু তাদের কেবল অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি ইমান এনেছে। তারা না পারত রাসুল ﷺ-কে রক্ষা করতে, না পারত তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করতে এবং শত্রুকে প্রতিহত করতে। একসময় আল্লাহ তোমাদের সম্মানিত ও মর্যাদাবান করার ইচ্ছা করলেন। তোমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমানের জন্য কবুল করলেন। তাওফিক দিলেন তাঁকে ও তাঁর সাথিদের রক্ষা করতে এবং তাঁকে ও তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করতে। তোমাদের শক্তি দিলেন তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ফলে তোমরাই তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর হয়ে গেলে। একপর্যায়ে গোটা আরব স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করল এবং দূরবর্তীরা বশ্যতা স্বীকার করে নিল। ফলে গোটা আরব তোমাদের তরবারির ভয়ে রাসুল ﷺ-এর সামনে নতি স্বীকার করল। এরপর তোমাদের প্রতি তাঁর রাজি ও সন্তুষ্টি থাকা

---

৯৮৮. উসদুল গাবাহ : ১/১৯৫, আল-ইসতিআব : ১/১৭২-১৭৩, আল-ইসাবাহ : ১/১৬৩, আল-ইসতিবসার : ১২১ পৃ., তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/২১৫, আনসাবুল আশরাফ : ১/৫৮০, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৮২।

অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে নিয়ে গেলেন। অতএব একচ্ছত্রভাবে এ কর্তৃত্ব তোমরাই নিয়ে নাও। এটা তোমাদের অধিকার, অন্য কারও নয়।'

আনসারগণ সকলে তাঁর কথায় সাড়া দিয়ে বললেন, 'আপনি সঠিক কথা বলেছেন, সঠিক মতামত পেশ করেছেন। আমরা এ দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে দেবো। কারণ মুমিনদের জন্য আপনি যোগ্য এবং সন্তুষ্টভাজন ব্যক্তি।'

এরপর তাঁরা আবারও নিজেদের মধ্যে কথোপকথন জারি রাখল। তাঁরা বলল, 'যদি কুরাইশ মুহাজিরগণ আমাদের সিদ্ধান্ত মেনে না নেন। তাঁরা যদি বলেন, "আমরা মুহাজির, আমরা তাঁর প্রথম সাথি, তাঁর পরিবারের লোক এবং আপনজন!"' তখন কিছু আনসার বলে উঠলেন, 'আমাদের মধ্য থেকে একজন আমির হোক এবং তাঁদের মধ্য থেকে একজন আমির। এ ছাড়া কখনোই মেনে নেবো না।' তখন সাদ ﷺ বললেন, 'এটাই প্রথম সমস্যা।'

উমর ﷺ এ সংবাদ শুনতে পেলেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর বাড়িতে এলেন। সেখানে আবু বকর ﷺ অবস্থান করছিলেন। উমর ﷺ আবু বকর ﷺ-এর কাছে খবর পাঠালেন। তিনি জানালেন, 'আমি ব্যস্ত আছি।' উমর ﷺ বললেন, 'একটি সমস্যা হয়ে গেছে, আপনার সেখানে উপস্থিত হতে হবে।' তখন আবু বকর ﷺ বের হলেন। উমর ﷺ তাঁকে খবরটি জানিয়ে দিলেন। এরপর তাঁরা উভয়ে দ্রুত বনু সায়িদার বসার স্থানে চললেন।

উমর ﷺ বলেন, 'আমরা সেখানে এসে পৌঁছলাম। আমি অবশ্য তাঁদের বলার জন্য কিছু কথা প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম। যখন আমি কাছাকাছি হয়ে বলতে যাব, তখন আবু বকর ﷺ আমাকে চুপ করিয়ে দিয়ে আমার মনের কথাগুলো তিনি নিজেই বলে দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায়ান্তে বললেন, "আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে উম্মাহর পক্ষে সাক্ষী হিসেবে একজন রাসুল প্রেরণ করেন। যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁকে এক বলে জানে। যে সময়ে মানুষ পাথর আর কাঠের তৈরি বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় লিপ্ত ছিল। আরবের লোকদের জন্য তাদের বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মুহাজিরদের তাঁর দ্বীনের সত্যায়নকারী এবং সহযোগী হিসেবে নির্বাচন করলেন। তাঁদের কবুল করলেন স্বীয় সম্প্রদায়ের

জুলুম অত্যাচার ও মিথ্যা অপবাদ সহ্য করার জন্য। সমস্ত মানুষ তাঁদের বিরোধী হয়ে গেল। তাঁদের প্রতি মানুষের ঘৃণা আর নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতার পরেও তাঁরা অসহায়ত্ব অনুভব করেনি। তাঁরাই সর্বপ্রথম জমিনে আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান এনেছেন। আবার তাঁরা রাসুলের পরিবারপরিজন এবং ঘনিষ্ঠভাজন। তাঁর পরে তাঁরাই এ খিলাফতের বেশি হকদার। এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে কেবল জালিমই বিরোধিতা করতে পারে। আর হে আনসার সম্প্রদায়, কে আছে দ্বীনের মধ্যে আপনাদের মর্যাদা অস্বীকার করবে? কে ইসলামে আপনাদের আগে অগ্রগামী হয়েছে? আল্লাহ আপনাদের তাঁর দ্বীন ও রাসুলের আনসার হিসেবে নির্বাচন করেছেন। আপনাদের কাছে তাঁর হিজরতের ভূমি ঠিক করেছেন। তাই মুহাজিরদের পরে আমাদের কাছে এমন কেউ নেই, যারা মর্যাদায় আপনাদের সমপর্যায়ের হবে। সুতরাং আমরা হলাম আমির আর আপনারা উজির। কোনো পরামর্শে আপনারা পার্থক্য দেখতে পাবেন না। আপনাদের বাদ দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না।'

এবার হুবাব বিন মুনজির বিন জামুহ বলল, 'হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদের কর্তৃত্ব নিজের হাতেই রাখো। কারণ লোকজন তোমাদের পক্ষে আছে। কোনো ব্যক্তিই তোমাদের বিরোধিতা করার সাহস করতে পারবে না। সিদ্ধান্ত কেবল তোমাদের থেকেই আসবে। তোমরা সম্মানের অধিকারী, শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী এবং তোমরা যোদ্ধা সম্প্রদায়। তোমরা কী করো, সেদিকে মানুষ তাকিয়ে আছে। মতানৈক্য করো না, অন্যথায় তোমাদের কারণে তোমাদের কর্তৃত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। এরা (মুহাজিরগণ) চাচ্ছে, তোমরা কেবল তাঁদের কথা শুনবে। তাহলে আমাদের থেকে একজন আমির হবে এবং তাঁদের থেকে একজন।'

তখন উমর ﷺ বললেন, 'অসম্ভব! একই সময় দুজন আমির হতে পারে না। আল্লাহর শপথ, আরবের লোকেরা তোমাদের থেকে আমির মেনে নেবে না, যেহেতু নবি তোমাদের থেকে নয় এবং যাঁদের থেকে নবি এসেছে, তাঁদেরকে নেতৃত্ব দিতে অসম্মত হবে না। এ ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর কর্তৃত্বের ব্যাপারে কে আছে আমাদের সাথে বিরোধ করবে— যখন আমরা তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠজন?!'

তখন হুবাব বিন মুনজির বলল, 'হে আনসার সম্প্রদায়, কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে রাখো। এই ব্যক্তি ও তাঁর সাথিদের কথায় কান দিও না। অন্যথায় তাঁরা তোমাদের অধিকার নিয়ে যাবে। যদি তাঁরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দাও এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে নাও। কারণ, আল্লাহর শপথ, তোমরাই তাদের চেয়ে বেশি হকদার। কারণ তোমাদের তরবারির কারণে মানুষ এ দ্বীনের প্রতি অনুগত হয়েছে। আমি হলাম জিন আটকানো আংটা, আমি স্বীয় সম্প্রদায়ে মর্যাদায় সবার সেরা। আমি সেই সিংহশাবকের রাখাল, যার আস্তানা সিংহশার্দূলে ভরা। আল্লাহর শপথ, তোমরা চাইলে আমি এখনই সিংহদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পারি।'

তখন উমর ﷺ বললেন, 'তাহলে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করবেন।' সে বলল, 'বরং তোমাকে ধ্বংস করবেন।'

এরপর আবু উবাইদা ﷺ বললেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরাই সর্বপ্রথম দ্বীনের সাহায্য করেছ। তাই তোমরাই প্রথম এটাকে পরিবর্তন ও বিকৃত করো না।'

বাশির বিন সাদ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়, আল্লাদহর শপথ, যদিও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে এবং দ্বীনে অগ্রগামিতার ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চয় অনেক মর্যাদা আছে, তবে এর মাধ্যমে আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নবির আনুগত্য এবং নিজেদেরকে দ্বীনের জন্য পরিশ্রান্ত করতে চেয়েছি। তাই এটা নিয়ে তাঁদের ওপর আমাদের বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না এবং এই সম্মানের দ্বারা আমরা কখনো দুনিয়া তালাশ করব না। মনে রাখবেন, মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন কুরাইশি, তাই তাঁর সম্প্রদায় এই ব্যাপারে বেশি অধিকার রাখে। আল্লাহর শপথ, এ বিষয়ে তাঁদের সাথে মতবিরোধ করতে আল্লাহ আমাকে দেখবেন না। অতএব, আল্লাহকে ভয় করুন, তাঁদের সাথে বিরোধিতা করবেন না।'

তখন আবু বকর ﷺ বললেন, 'এই যে উমর ও আবু উবাইদা উপস্থিত আছেন। আপনারা চাইলে বাইআত দিতে পারেন।' উমর ও আবু উবাইদা ﷺ বললেন, 'আশ্চর্য! আমরা আপনার ওপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করব না। আপনি মুহাজিরদের মাঝে

সবচেয়ে মর্যাদাবান, আপনি সালাতে রাসুল ﷺ-এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সালাত মুসলিমদের দ্বীনের সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা আপনাকে বাইআত দেবো।' তাঁরা বাইআত দিতে যাবেন, এর মধ্যে বাশির বিন সাদ ﷺ গিয়ে তাঁদের আগে বাইআত দিয়ে দেন। তখন হুবাব বিন মুনজির ﷺ বললেন, 'আরে বিরুদ্ধাচারী, কর্তৃত্বের ব্যাপারে কি তোমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে হিংসা করলে?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই না। আমি বরং হকদারদের সাথে বিবাদ করতে অপছন্দ করেছি।'

আওসের লোকেরা যখন বাশির ﷺ-এর কর্মকাণ্ড এবং খাজরাজের লোকদের সাদ ﷺ-কে আমির বানানোর বিষয়টি দেখল, তখন তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল—যাদের মাঝে উসাইদ বিন হুজাইর ﷺ-ও ছিলেন, তিনি ছিলেন গোত্রের নেতা—তাঁরা বলল, 'আল্লাহর শপথ, যদি খাজরাজের লোকেরা একবার এ কর্তৃত্ব পায়, তবে এর দ্বারা তাঁরা তোমাদের ওপর সর্বদা মর্যাদাবান থাকবে। তাতে তোমাদের জন্য কোনো অংশ রাখবে না। তাই যাও আবু বকরের হাতে বাইআত দাও।' তখন তাঁরা সকলে আবু বকর ﷺ-কে বাইআত দিল। ফলে সাদ বিন উবাদাহ ﷺ ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা তাদের মত থেকে সরে গেল। অবশেষে আনসার-মুহাজির সকলে এসে তাঁকে বাইআত দিলেন।[৯৮৯]

বনু সায়িদার কাছারিতে বাশির ﷺ-এর অবস্থান সত্যিই বিস্ময়কর ছিল। এর কারণে তিনি প্রত্যেক কল্যাণের উন্মোচক এবং সকল অকল্যাণের প্রতিরোধকে পরিণত হয়েছেন। তিনি কঠিনতম মুহূর্তে হক কথাটি বলেছিলেন। তাঁর মাঝে গোত্রপ্রীতি বা চাচাতো ভাইয়ের কোনো প্রভাব কাজ করেনি। বরং তিনি আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠ ছিলেন। যা বাস্তবেই অনেক মূল্যায়ন ও গভীর ভাবনার দাবি রাখে।

---

৯৮৯. ইবনুল আসির : ২/৩২৫-৩৩১, তাবারি : ৩/২০৩-২০৬, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/২৪৫-২৪৭।

বাশির ﷺ ওয়াদ্দান[৯৯০] নামক জায়গায় বাস করতেন। মুহাজিরদের সাথে তিনিও মদিনায় হিজরত করেন। সে হিসেবে তাঁকে মুহাজির বলা যায়। তিনি বনু খাজরাজ গোত্রের হওয়ায় আনসার হিসেবে গণ্য হন।

আমরা জানতে পারিনি, তিনি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি আবু বকর ﷺ-এর খিলাফতকালে খালিদ ﷺ-এর নেতৃত্বে আইনে তামরের[৯৯১] যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ১২ হিজরিতে তাঁর শাহাদাত লাভ হয়েছিল।[৯৯২] এবং আইনে তামর প্রান্তরেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৯৯৩] বাশির ﷺ ছিলেন সিমাক বিন সাদ ﷺ-এর আপন ভাই এবং সিমাক ﷺ ছিলেন একজন বদরি সাহাবি।[৯৯৪]

বাশির ﷺ অনেক লম্বা ছিলেন। তাঁর লম্বার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন, যারা ঘোড়ার পিঠ থেকে পায়ের বৃদ্ধাঙুলি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে পারতেন।[৯৯৫]

আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার নিমিত্তে এভাবেই বাশির ﷺ তাঁর সামর্থ্যের সবটুকু বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তিনি নিজের জীবনটাও উৎসর্গ করেছেন। তিনি প্রকৃত অর্থেই সেই ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য ছিলেন, যাঁরা স্বীয় আত্মার জন্য কাজ করেছেন, কখনো পকেটের জন্য কাজ করেননি। আমল করেছেন দ্বীনের জন্য, দুনিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। এবং যাঁরা দুনিয়ার বিনিময়ে পরকালকে বলি দেননি, অথবা গ্রহণ করেননি আল্লাহর প্রতিদানের বিনিময়ে মানুষের প্রতিদানকে।

---

৯৯০. ওয়াদ্দান একটি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা। যা জুহফাহ থেকে এক মানজিল দূরে অবস্থিত। ওয়াদ্দান ও আবওয়ার মাঝে ছয় মাইলের দূরত্ব। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/ ৪০৫-৪০৬।

৯৯১. কুফার পশ্চিমে আনবারের নিকটবর্তী একটি শহরের নাম আইনে তামর। মুজামুল বুলদান : ৬/২৫৩।

৯৯২. উসদুল গাবাহ : ১/১৯৫, আল-ইসাবাহ : ১/১৬২, তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৩/২৬৫।

৯৯৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৫৩।

৯৯৪. তবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫২৬।

৯৯৫. আল-মুহাব্বার : ২৩৩ পৃ.।

কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

তিনি রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহ থেকে স্বতন্ত্রভাবে দুটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমনকি তিনি সে অভিযানে নিজের জীবনটাই হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অভিযানে সফলভাবে টার্গেট পূরণ করেছিলেন।

প্রথম অভিযানটি যে ব্যর্থ হয়েছিল, সেটা তাঁর কারণে বা তাঁর কোনো সৈনিকের কারণে হয়নি। কারণ, তাঁরা বীরত্বের সাথে প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন। যার কারণে তাঁরা শাহাদাত বরণ করেন এবং তিনিও প্রায় শহিদ হয়েছিলেন। অভিযানটি ব্যর্থ হয়েছিল শক্তি ও সংখ্যায় উভয় বাহিনীর মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধানের কারণে। যেখানে মুসলিমগণ ছিলেন ৩০ জন মুজাহিদ, সেখানে মুশরিকরা ছিল অগণিত পরিমাণে। তির ও বর্শা শেষ হওয়া পর্যন্ত লড়াই করার পর মুসলিমদের আর কী করার থাকে—তাঁদের নেতৃত্বে যত বড় বীর বাহাদুর ব্যক্তিই থাক না কেন। ফলে বহু সংখ্যক শত্রুর ভিড়ে হাতে গোনা কয়েকজন মুসলিম সৈনিক হারিয়ে গিয়েছিলেন। বিস্ময়কর অবিচলতা, কঠিন যুদ্ধ ও সর্বোচ্চ কুরবানি করেও বিজয় ছিনিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অভিযানে সফলতা এসেছিল শত্রুর ওপর তাঁর আকস্মিক আক্রমণের কারণে। যেমন মুসলিমগণ রাতে পথ চলত আর দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকত। এরপর জায়গামতো পৌঁছে অতর্কিতভাবে শত্রুর ওপর আঘাত হেনেছিল এবং সফলভাবে অভিযানের টার্গেট বাস্তবায়ন করেছিল।

প্রথম অভিযানের ব্যর্থতা যদি তাঁর কোনো ত্রুটি বা অযোগ্যতার ফলে হতো, তবে রাসুল ﷺ তাঁকে নতুন করে কোনো অভিযানের নেতৃত্ব দিতেন না। এটা প্রমাণ করে বাশির رضي الله عنه-এর অভিযানে ব্যর্থতা তাঁর ত্রুটি বা অক্ষমতার কারণে ছিল না; বরং পরিস্থিতি তাঁকে চূড়ান্ত পর্যায়ের সংকটে ফেলে দিয়েছিল। যার কারণে তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল, হয়তো শাহাদাত নয়তো পরাজয়। তিনি নির্দ্বিধায় শাহাদাতকে বেছে নিয়েছিলেন। এটাই তাঁর অসাধারণ বীরত্বকে প্রমাণ করে।

উমরাতুল কাজার সময় বাশির ﷺ-এর কৌশলগত কাজের নেতৃত্বের যে সফলতা, সেটা তাঁর দ্বিতীয় অভিযানের সফলতার সামনে কম হবে না। এটা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি রাসুল ﷺ-এর আস্থা ও বিশ্বাসের প্রমাণ বহন করে।

তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত দুটি অভিযানের স্বভাবই ছিল এমন আক্রমণ করা; যাতে মুশরিকদের মনে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রভাব ফেলা যায়। আর আক্রমণের জন্য চাই নির্ভীক দুঃসাহসী এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম অধিনায়ক।

বাশির ﷺ ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা মনোবলের আদর্শিক কমান্ডার। বিজয় বা পরাজয়, কোনো অবস্থাতে তাঁর মনোবলের পরিবর্তন হতো না। দায়িত্ব পালনে সক্ষম, কখনো দায়িত্ব থেকে পলায়ন করতেন না। এবং অন্যের ঘাড়েও দায়িত্ব চাপিয়ে দিতেন না। ভারসাম্যপূর্ণ মেধা আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি তাঁর সৈনিকদের বিশেষত্ব এবং মনোভাব বুঝতে পারতেন। প্রত্যেক সৈনিককে তার উপযুক্ত দায়িত্ব প্রদান করতেন। সৈনিকরাও তাঁর প্রতি আস্থা রাখত, তিনিও তাদের প্রতি আস্থা রাখতেন। তিনি সৈনিকদের ভালোবাসতেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসত। তাঁর ছিল প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব, সাক্ষাৎ গ্রহণযোগ্যতা এবং মর্যাদাবান অতীত।

এসব বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মজবুত ইমান আর সুদৃঢ় বিশ্বাসের অনিবার্য ফল। যা তাঁকে সত্যপন্থী মুজাহিদ এবং সেরা কমান্ডারে রূপান্তরিত করেছিল।

তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি যুদ্ধের প্রচলিত নীতির ওপর প্রয়োগের সময় আমরা দেখতে পাই, তিনি টার্গেট নির্ধারণ ও সংরক্ষণের নীতি বাস্তবায়ন করছেন। তিনি সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে বিশ্বাস করতেন, সম্মুখ যুদ্ধই প্রতিরক্ষার অধিক কার্যকর মাধ্যম। সার্বিকভাবে অতর্কিত আক্রমণকে যুদ্ধের মূলনীতি হিসেবে বাস্তবায়ন করতেন। যেটা তিনি দ্বিতীয় অভিযানে বাস্তবায়ন করেছিলেন।

স্বীয় সৈনিকদের মাঝে নম্রতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মানসিক শক্তি চাঙা রাখার নীতিও পালন করতেন।

কার্য পরিচালনায় তাঁর সৈনিকদের সাথে পরামর্শ করতেন, এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। সকল কর্মে তাদের নিজের সমান ভাবতেন।

কমান্ডিংয়ের পদকে ব্যবহার করে কোনো ক্ষেত্রেই নিজেকে তাদের থেকে আলাদা করতেন না।

তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর বিদ্যাপীঠে নেতৃত্বমূলক চিন্তাধারায় একজন গ্রাজুয়েট ব্যক্তি। এবং তাওহিদের জন্য জিহাদের ময়দানে সোনালি যুগের একজন অন্যতম জেনারেল।

ইতিহাসে বাশির ﷺ

তিনি আনসারদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এবং ইসলামে অগ্রগামীদের অন্যতম। আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের একজন।

রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে বদরসহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। হয়তো সৈনিক হিসেবে অথবা জেনারেল কিংবা অধীনস্ত সেনানায়ক হিসেবে।

রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহ থেকে দুটি অভিযান তিনি পরিচালনা করেছেন। এবং এক যুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর সম্মুখ কৌশল পরিচালক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর আবু বকর ﷺ-এর খিলাফতকালে তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-এর নেতৃত্বে আইনে তামর রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণ করেন।

তিনি খাজরাজ গোত্রের প্রথম ব্যক্তি, যিনি আবু বকর ﷺ-এর হাতে খিলাফতের বাইআত দিয়ে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে সম্ভাব্য ফিতনাকে শেষ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা এ মহান বীর সাহাবির প্রতি তাঁর রহমতের অফুরন্ত করুণাধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

আমির কমান্ডার

গালিব বিন আব্দুল্লাহ আল-লাইসি ﵁

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

গালিব বিন আব্দুল্লাহ বিন মুসইর বিন জাফর বিন কালব বিন আমির বিন লাইস বিন বুকাইর বিন আবদে মানাত বিন কিনানাহ আল-কিনানি আল-লাইসি।[৯৯৬] দুর্বল মতানুসারে তাঁকে গালিব বিন উবাইদুল্লাহ বলা হয়। তবে সঠিক হলো গালিব বিন আব্দুল্লাহ।[৯৯৭]

তাঁর বংশের একটি অংশ কালবের সাথে যুক্ত হয়, সে হিসেবে তিনি কালবি। আরেক অংশ লাইসের সাথে যুক্ত হয়, সে হিসেবে তিনি লাইসি। তবে এ দুইয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ কালবি হচ্ছে লাইসি গোত্রের একটি শাখাগোত্র। এভাবে তাঁর বংশের তৃতীয় অংশ কিনানার সাথে যুক্ত করা হয়। তাই তিনি গালিব বিন আব্দুল্লাহ আল-কালবি আল-লাইসি আল-কিনানি।[৯৯৮] মোটকথা তাঁর কোনো এক পূর্বপুরুষের সাথে যুক্ত করলেই চলে।

---

৯৯৬. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৮।

৯৯৭. আল-ইসতিআব : ৩/১২৫২, উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৮।

৯৯৮. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৮, ইসাবাহ : ৫/১৮৫, আত-ইসতিআব : ৩/১২৫২, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৮১।

এখানে রিজাল শাস্ত্রের এক অংশের কিতাবে গালিব বিন ফুজালার নাম পাওয়া যায়।[৯৯৯] কিন্তু অন্য কোনো অংশে তার কোনো উল্লেখ নেই।[১০০০] যিনি গালিব বিন ফুজালাকে উল্লেখ করেছেন, তিনি ফাদাক অভিযানের নেতৃত্বকে তার সাথেই সম্পৃক্ত করেছেন; অথচ ফাদাক অভিযান পরিচালনা করেছেন গালিব বিন আব্দুল্লাহ আল-কিনানি। একটু পরেই তার আলোচনা আসছে। সেখান থেকে স্পষ্ট হবে, তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মূলত ঐতিহাসিকের ভুল হয়েছে।[১০০১] কারণ ফাদাক অভিযান গালিব বিন আব্দুল্লাহই পরিচালনা করেছেন। যা ঐতিহাসিক ও জীবনী-রচয়িতাদের ঐকমত্যে প্রমাণিত।

তিনি কখন কোথায় কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সে সম্পর্কে জানতে পারিনি। সর্বপ্রথম তাঁর আলোচনা সারিয়্যার নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনায় এসেছে। রাসুল ﷺ শুধু এমন ব্যক্তিকেই অভিযানের নেতৃত্ব দিতেন, প্রথমত, যে ইসলাম পালনে একনিষ্ঠ হয়; দ্বিতীয়ত, যে নেতৃত্বের গুণে গুণান্বিত; তৃতীয়ত, যে যুদ্ধের ময়দানের কার্যক্রম সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত; সর্বশেষ এ গুণ দেখতেন, যে সূচনাতে ইসলাম গ্রহণ করে।

এসব গুণের যা কিছুই তাঁর থাক না কেন, বড় ব্যাপার হলো গালিব رضي الله عنه সাহাবির মর্যাদা পাওয়ার সাথে রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

মাইফাআর[১০০২] অভিযান

সপ্তম হিজরির রমাদান মাসে রাসুল ﷺ মাইফাআ অভিমুখে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। মাইফাআয় বসবাসরত বনু উওয়ালা ও বনু সালাবার বিরুদ্ধে গালিব বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه-এর নেতৃত্বে ৩০০ যোদ্ধার একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অভিযানে রাসুল ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম ইয়াসার رضي الله عنه গাইড হিসেবে

---

৯৯৯. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৮, আল-ইসাবাহ : ৫/১৮৭।

১০০০. আল-ইসতিআব : ৩/১২৫২।

১০০১. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৯।

১০০২. নাজদ অঞ্চলে নাকরার দিকে বাতনে নাখলার পেছনে অবস্থিত অঞ্চলের নাম মাইফাআ। মাইফাআ ও মদিনার মাঝে ছয় মানজিলের দূরত্ব। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১১৯।

ছিলেন। মুসলিম বাহিনী শত্রুর এলাকার মধ্যভাগে হামলা করে বসে। শত্রুদের মধ্য হতে যারা মোকাবিলার জন্য সামনে এসেছিল, তাদের সবাইকে হত্যা করে। এবং তাদের গৃহপালিত পশু নিয়ে মদিনায় চলে আসে। এ অভিযানে মুসলিম বাহিনী কোনো শত্রুকে কয়েদি বানায়নি।

এই অভিযানে উসামা বিন জাইদ ﷺ ওই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছিল। এর প্রেক্ষিতে রাসুল ﷺ বলেছিলেন, 'তুমি কেন তার বুক ফেঁড়ে দেখলে না, সে সত্য বলেছে, নাকি মিথ্যা বলেছে?!' তখন উসামা ﷺ বলেছিলেন, 'এমন কারও সাথে আর লড়াই করব না, যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র সাক্ষ্য দেয়।'[১০০৩]

উসামা ﷺ যাকে হত্যা করেছিলেন, তার নাম মিরদাস বিন নাহিক। ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে উসামা ﷺ বলেন, 'আমি আর একজন আনসারি সাহাবি লোকটিকে সামনে পাই। যখন আমরা তার ওপর তরবারি উত্তোলন করি, তখন সে বলল, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" কিন্তু আমরা বিরত হলাম না। তাকে হত্যা করে ফেললাম। আমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে ঘটনাটি তাঁর কাছে বললাম। ঘটনা শুনে রাসুল ﷺ বললেন, 'হে উসামা, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?' ওই সত্তার শপথ—যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তিনি আমার সামনে কথাটি বারবার বলতে লাগলেন। এমনকি আমি কামনা করতে লাগলাম, যদি আমার ইসলাম অবস্থায় এটা না ঘটত! যদি আমি আজ ইসলাম গ্রহণ করতাম! হায়, যদি আমি তাকে হত্যা না করতাম! আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে সুযোগ দিন, আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করছি, এমন ব্যক্তির সাথে কখনো লড়াই করব না, যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে।' রাসুল ﷺ বললেন, 'হে উসামা, এখন এ কথা বলছ?' বললাম, 'এখন থেকে ওয়াদা করছি।'[১০০৪] তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়,[১০০৫]

১০০৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১১৯। দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭২৬-৭২৭, উয়ুনুল আসার : ২/১৪৭, তাবারি : ২/৪৮৩, ইবনে আসির : ২/১৩৯।
১০০৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৯৮। দেখুন, আল-বাদউ ওয়াত তারিখ : ৪/২২৮০।
১০০৫. আল-বাদউ ওয়াত তারিখ : ৪/২২৮।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ

'আর যে তোমাদের সালাম দেবে, তাকে বলো না, "তুমি মুমিন নও।" তোমরা পার্থিব জীবনে সম্পদ পেতে চাও; অথচ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে।'[১০০৬]

গালিব ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে মুশরিকদের ওপর এমনভাবে অতর্কিত হামলা করেছিলেন যে, শত্রুর মনোবলে মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। যার কারণে শত্রু পরাজয় স্বীকার করে জান নিয়ে ভাগতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি তাঁর দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করে গনিমত নিয়ে বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসেন।

কাদিদের[১০০৭] অভিযান

অভিযানটি অষ্টম হিজরির সফর মাসে কাদিদ এলাকায় বনু মুলাওয়িহ গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। রাসুল ﷺ গালিব ﷺ-এর নেতৃত্বে দশের অধিক কিছু সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদেরকে বনু মুলাওয়িহ গোত্রের ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। এরা ছিল লাইস গোত্রের শাখাগোত্র। বাহিনীটি বের হয়ে যখন কুদাইদ[১০০৮] স্থানে পৌঁছল, তখন হারিস বিন বারসা লাইসি নামক এক ব্যক্তির দেখা পেল। তাঁরা তাকে ধরে ফেললেন। হারিস বলল, 'আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমি রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বের হয়েছি।' গালিব ﷺ বললেন, 'যদি মুসলিম হয়ে থাকো, তবে আমাদের একদিন একরাতের অভিযান তোমার তেমন কোনো ক্ষতি করবে না। আর যদি ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে বের হও, তবে তোমার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত হচ্ছি।' এরপর তাঁরা তাকে বেঁধে এক ব্যক্তির প্রহরায় রেখে যায়। গালিব ﷺ প্রহরীকে বললেন, 'যদি তোমার সাথে বিরোধ বাধিয়ে দেয়, তবে তার মাথা আলাদা করে দেবে।'

১০০৬. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৯৪।

১০০৭. কাদিদ, মক্কা মদিনার মাঝে হিজাজের একটি জায়গা। যা মক্কা থেকে ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৭/২২৪।

১০০৮. মক্কার নিকটবর্তী জায়গার নাম কুদাইদ। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৭/৩৮।

এরপর বাহিনী এগিয়ে চলল। তাঁরা যখন কাদিদে পৌছালেন, সূর্য তখন অস্তমিত হচ্ছে। মুসলিম বাহিনী ওই উপত্যকায় আত্মগোপন করল। অনুসন্ধানের জন্য পর্যবেক্ষক হিসেবে আগে পাঠানো হলো জুনদুব বিন মাকিস ﷺ-কে। তিনি শত্রুর মহল্লার অতি সন্নিকটে একটি পাহাড়ে উঠে পড়লেন। এবং পুরো মহল্লাকে পর্যবেক্ষণ করতে পাহাড়ের একটি উঁচু টিলায় শুয়ে পড়লেন। এরপরের ঘটনার বর্ণনা তিনি নিজেই এভাবে দেন, 'আমি দেখতে পেলাম, মহল্লার এক ব্যক্তি তার তাঁবু থেকে বের হয়ে তার স্ত্রীকে বলছে, "আমি এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি আবছা আকৃতি দেখতে পাচ্ছি। এটা আগে কখনো দেখিনি। দেখো তো, কুকুর তোমার কোনো পাত্র নিয়ে গেল নাকি?" তার স্ত্রী বলল, "কই, না তো। সবকিছুই তো ঠিক আছে মনে হচ্ছে।" তখন সে বলল, "আমার তির-ধনুক দাও।" তার স্ত্রী তাকে ধনুকের সাথে দুটি তির দিল। সে একটি তির মারল। তিরটি আমার চোখের সামনে এসে পড়ল। আমি আপন অবস্থায় নিশ্চল পড়ে থাকলাম। এরপর তার দ্বিতীয় তিরটি এসে আমার কাঁধে বিদ্ধ হলো। আমি তিরটি খুলে ফেললাম; কিন্তু আগের মতোই নিশ্চল পড়ে থাকলাম। তখন সে তার স্ত্রীকে বলল, "কোন গুপ্তচর বা অনুসন্ধানী হলে এতক্ষণে অবশ্যই নড়াচড়া করত। দেখেছ! আমার তিরদুটো ঠিকমতোই বিদ্ধ হয়েছে। সকাল হলে দেখে এসো, কুকুরের গায়ে লেগেছে কি না।" এরপর সে তাঁবুতে প্রবেশ করল।

ততক্ষণে গৃহপালিত সব পশু আপন আপন স্থানে ঢুকে পড়েছে। সেগুলো দোহনের কাজ শেষ করে যখন সবাই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই মুসলিম বাহিনী হামলা করে বসে। এবং উট ছাগল হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। এর পরই শত্রুদের এক ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে ওঠে। ফলে এত অধিক পরিমাণ জনবল আর শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে তারা বের হয়, যার মোকাবিলা করার সমর্থ এই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর ছিল না। কিন্তু ততক্ষণে মুসলিমগণ উট-ছাগল নিয়ে অনেক দূর চলে এসেছেন। হারিস বিন বারসা এর পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে তাঁরা তাকেও তুলে নেন। এর মধ্যে শত্রুরা মুসলিমদের কাছাকাছি চলে আসে। তাদের মাঝে শুধু একটি উপত্যকার দূরত্ব ছিল। হঠাৎ পানির ঢল এসে নিম্নভূমি ভাসিয়ে দেয়। ফলে কেউ আর পার হয়ে অপর পারে যেতে পারল না। এ সুযোগে মুসলিমগণ উট-ছাগল নিয়ে দ্রুত মদিনায় পৌছে যান।

গালিব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়ে শত্রুর সার্বিক অবস্থা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর রাতে এমনভাবে শত্রুর ওপর অতর্কিতে হামলা করেছিলেন, শত্রু যার কল্পনাও কখনো করেনি। হামলার পর অতি দ্রুতই তিনি শত্রুর নাগাল থেকে সরে আসতে পেরেছিলেন। এমন দক্ষতা ও সফলতার সাথে গালিব ﷺ তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ফাদাকের অভিযানে

অষ্টম হিজরির সফর মাসে গালিব ﷺ-কে ফাদাকের ওই স্থানে প্রেরণ করা হয়, যেখানে বাশির বিন সাদ ﷺ ও তাঁর সাথিগণ শত্রুর কবলে পড়েছিলেন। প্রথমে রাসুল ﷺ ফাদাকের অভিযানের জন্য জুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ-কে প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'চলতে থাকবে, এরপর বাশির বিন সাদের আক্রান্ত হওয়ার স্থানে যাবে। আল্লাহ যদি তোমাকে বিজয় দেন, তবে কোনো শত্রুকে বাকি রাখবে না।' রাসুল ﷺ জুবাইর ﷺ-এর জন্য ২০০ যোদ্ধা প্রস্তুত করেন।[১০০৯]

এর আগে সপ্তম হিজরির শাবান মাসে বাশির বিন সাদ ﷺ-কে ৩০ জনের এক বাহিনী দিয়ে ফাদাকের বনু মুররাহ গোত্রে পাঠানো হয়েছিল।[১০১০] কিন্তু তাঁরা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সকলে শাহাদাত বরণ করেন। স্বয়ং বাশির ﷺ-ও মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। শত্রুরা তাঁকে নিহত ভেবে ফেলে গিয়েছিল।

এর মধ্যে গালিব ﷺ কাদিদের অপারেশন সফল করে মদিনায় পৌঁছে গেলেন। তখন রাসুল ﷺ জুবাইর ﷺ-এর পরিবর্তে ওই বাহিনীতে গালিব ﷺ-কে প্রেরণ করেন। সাথে উসামা বিন জাইদ ও উলবাহ বিন জাইদ ﷺ বের হন।[১০১১] গালিব ﷺ তাঁর সৈনিকদের দুজন দুজন করে জুটি বেঁধে দেন। এবং

১০০৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৬, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৩৩।

১০১০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১১৮-১১৯, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৩৩, উয়ুনুল আসার : ২/১৪৬-১৪৭।

১০১১. ইনি সেই উলবাহ বিন জাইদ আল-হারিসি, যিনি বাশির বিন সাদ ﷺ-এর বিপদগ্রস্ত বাহিনী থেকে উদ্ধার হয়ে মদিনায় গিয়ে রাসুল ﷺ-কে সংবাদ দিয়েছিলেন। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১১৯।

বলেন, 'তোমরা কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আমার আমান্য করবে না। কারণ রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে আমার আমিরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমিরকে অমান্য করল, সে আমাকে অমান্য করল।" তাই তোমরা আমাকে অমান্য করলে তোমাদের নবিকেই অমান্য করে বসবে।' তিনি বাহিনী নিয়ে সকাল সকাল শত্রুর ওপর আক্রমণ করেন। তাদের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেন। এরপর তাদের উট-ছাগল গনিমত হিসেবে নিয়ে নেন।[১০১২]

গালিব ؓ এ অভিযানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পরিপূর্ণ সফল হন। বাশির ؓ-এর সাথিদের রক্তকে তিনি বৃথা যেতে দেননি। বরং শত্রুকে মুসলিমদের রক্তের মূল্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ আক্রমণের কারণে শত্রুর মনে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে, তাদের মনোভাব একেবারে ভেঙে পড়েছিল। পক্ষান্তরে মুসলিমদের মনোবল বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। তাঁদের এ আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয় যে, তাঁদের প্রতিরক্ষার জন্য ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। তাঁদের আর্থিক বা মানবিক কোনো ক্ষতিতে তাঁরা চুপ থাকবে না।

মক্কা বিজয়াভিযান

এ অভিযানে গালিব ؓ রাসুল ﷺ-এর অগ্রবাহিনীতে ছিলেন।[১০১৩] গালিব ؓ বলেন, 'মক্কা-বিজয়ের দিন রাসুল ﷺ আমাকে সামনে প্রেরণ করলেন। যাতে গুপ্তচর হয়ে তাঁর পথকে সহজ করতে পারি। পথিমধ্যে বনু কিনানার দুগ্ধবতী উটনীর পাল দেখতে পেলাম। প্রায় ৬০০ উটনী ছিল। রাসুল ﷺ যাত্রাবিরতি করলে তাঁর জন্য দুধ দোহন করা হলো। রাসুল ﷺ দুধ পান করার জন্য সকলকে ডাকতে লাগলেন। কেউ কেউ বলল, 'আমি রোজা।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'এরা আমার অবাধ্য।'[১০১৪] মক্কা অভিযান রমাদান মাসে হয়েছিল। সে হিসেবে

১০১২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৬, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭২৩-৭২৬, উয়ুনুল আসার : ২/১৫০-১৫১, আল-মুহাব্বার : ১২০, আনসাবুল আশরাফ : ৪/১৬৮।
১০১৩. আল-ইসাবাহ : ৫/১৮৭।
১০১৪. আল-ইসাবাহ : ৫/১৮৭। দেখুন, উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৮।

রাসুল ﷺ-এর সাথে সকলে রোজা রেখেছিলেন। কিন্তু উসফান[১০১৫] ও আমাজের মধ্যবর্তী স্থান কাদিদে পৌঁছে রাসুল ﷺ আসরের সালাতের পর রোজা ভেঙে ফেলেন।[১০১৬] তিনি সওয়ারির ওপরে বসে সবাইকে জানানোর জন্য প্রকাশ্যে পানাহার করলেন এবং অন্যদেরও রোজা ভাঙার নির্দেশ দিলেন। তারপরও রাসুল ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল, কিছু লোক এখনো রোজা অবস্থায় আছে। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'এরা অবাধ্য।' রাসুল ﷺ এ কথা বলেছিলেন সফর অবস্থায় রোজা না রাখার বৈধতা বোঝানোর জন্য।[১০১৭]

তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যকে মূল্যায়ন এবং তাঁর প্রতি ভরসা থাকার কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে মক্কা বিজয়াভিযানে অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর তিনিও রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছিলেন পূর্ণরূপে। এবং অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন জিম্মাদারির সাথে।

ইরাক যুদ্ধ

রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর গালিব ؓ ইরাকের বিজয় অভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করেন। সে ধারাবাহিকতায় তিনি ১৩ হিজরি সনে উমর ؓ-এর খিলাফতকালে মুসান্না বিন হারিস ؓ-এর নেতৃত্বে বুওয়াইবের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১০১৮] এ যুদ্ধে তিনি এতটাই বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন যে, সেদিনের হাতে গোনা আত্মোৎসর্গীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।[১০১৯] অবশেষে মুসলিমগণ পারসিকদের ওপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন।[১০২০]

কাদিসিয়া যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে—যা ১৪ হিজরিতে সাদ ؓ বিন আবি ওয়াক্কাস ؓ-এর নেতৃত্বে হয়েছিল—মুসলিমদের একটি বাহিনী হিরাবাসীর ওপর

১০১৫. মক্কা থেকে দুই মারহালা দূরের গ্রামের নাম উসফান। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৬/১৭৩-১৭৪।

১০১৬. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২২৬, মুজামুল বুলদান : ৭/২২৪।

১০১৭. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২২৭ পৃ.।

১০১৮. বুওয়াইব, ইরাকে কুফার একটি নদীর নাম। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুজামুল বুলদান : ২/৩১০-৩১১।

১০১৯. ইবনুল আসির : ২/৪৪৪।

১০২০. এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন, তাবারি : ৩/৪৬০-৪৭২।

আক্রমণ করে। কিন্তু পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেল, পারস্যের কোনো রাজপরিবারের নববধূকে তাঁর স্বামীর গৃহে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ৩০ জন অনুচর ও অন্যান্য ভৃত্যের সাথে অগণিত মূল্যবান বস্তু ও প্রয়োজনীয় আরও অনেক জিনিসপত্র ছিল। মুসলিম বাহিনী সেগুলো গনিমত হিসেবে হস্তগত করল। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ তা বণ্টন করে দিয়ে উজাইব[১০২১] এলাকায় কিছু সৈনিকের প্রহরায় রেখে দেন। এবং একটি অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে বন্দীদের মদিনায় পাঠিয়ে দেন। তাদের আমির হিসেবে নিযুক্ত করেন গালিব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-কে।[১০২২]

গালিব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কাদিসিয়ার চূড়ান্ত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ তাঁকে একদল আহলুর রায়ের সাথে নাজদবাসীর কাছে প্রেরণ করেন। তাঁদেরকে সে এলাকার লোকদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়ে নাজদবাসীর অনেক লোকই এসে অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে মিলিত হয়।[১০২৩] এই গালিব বিন আব্দুল্লাহই ﷺ কাস্পিয়ান সাগরের ফটক বলে পরিচিত আজকের দারবান্ডে রাজা হরমুজকে হত্যা করেছিলেন। হরমুজ কাদিসিয়ার যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডার ছিল।[১০২৪]

রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর গালিব ﷺ কাদিসিয়ার আগে-পরে ইসলামি বিজয়াভিযানের কত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আবার প্রত্যেক যুদ্ধের প্রত্যেক মুজাহিদের ভূমিকা ও অবস্থান লিপিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকদের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য একটি কাজ। কারণ মুজাহিদের সংখ্যা ছিল অগণিত এবং যুদ্ধের ময়দানও ছিল অসংখ্য। ঐতিহাসিকগণ গালিব ﷺ-এর যতটুকু কীর্তি উল্লেখ করেছেন, লেখার জন্য আমাদের এতটুকুই যথেষ্ট। এতটুকুই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, তিনি ইসলামের বিজয়াভিযানের একজন সিংহপুরুষ ছিলেন। তিনি স্মরণীয় দিনের স্মরণীয় ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।

১০২১. উজাইব, কাদিসিয়া ও মাগিসাহ এলাকার মধ্যবর্তী একটি পানির উৎসের নাম। কাদিসিয়া ও তার মধ্যে চার মাইলের দূরত্ব। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৬/১৩১।

১০২২. তাবারি : ৩/ ৪৯৪, ইবনুল আসির : ২/৪৫৪।

১০২৩. ইবনুল আসির : ২/৪৮০।

১০২৪. আল-ইসাবাহ : ৫/১৮৭।

গালিব ﵁ থেকে হাদিসের বর্ণনা আছে। ইমাম বুখারি ﵀ তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে এবং ইমাম বাগাবি ﵀ গালিব ﵁-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। কাতান বিন আব্দুল্লাহ লাইসি ﵀ তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১০২৫] হাদিসটি মুসনাদে আহমাদে ও মুসনাদে আবু ইয়ালায় বর্ণিত হয়েছে এই সূত্রে—আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আইয়ুব ﵀ ইবরাহিম বিন সাদ থেকে। হাদিসটি আবু দাউদ ﵀ বর্ণনা করেছেন।[১০২৬] তাঁর হাদিস কম হওয়ার কারণে বর্ণনাও কম হয়েছে। তবে তাঁর বংশধারায় ইখতিলাফ বিদ্যমান আছে।

তিনি রাসুল ﷺ-এর গভর্নরদের একজন ছিলেন। কোনো এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসুল ﷺ তাঁকে মদিনায় আমির নিযুক্ত করেছিলেন।[১০২৭] এটাই তাঁর উত্তম পরিচালনার প্রতি রাসুল ﷺ-এর আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ বহন করে।

তিনি অবশ্য মুআবিয়া ﵁-এর আমলে খোরাসানের গভর্নর হয়েছিলেন। জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান তাঁকে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।[১০২৮] এটি ছিল ৪৮ হিজরির কথা।[১০২৯] তিনি সে সময়ের খোরাসানের রাজধানী মেরো[১০৩০] শহরে অবস্থান করেছিলেন।

খোরাসানে আমরা তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু জানতে পারিনি। সেখানে কতদিন অবস্থান করেছিলেন এবং কখন সেখান থেকে বিদায় নিয়েছেন, তা-ও আমরা জানতে পারিনি। অনুরূপভাবে আমরা তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কেও কিছু জানতে পারিনি। কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে ৪৮ হিজরির পরে ইনতিকাল করেছেন।

১০২৫. আল-ইসাবাহ : ৫/১৮৭, আল-ইসতিআব : ৩/১২৫২।

১০২৬. আল-ইসাবাহ : ৫/১৮৭।

১০২৭. তারিখু খলিফাহ ইবনি খইয়াত : ১/৬১।

১০২৮. আল-ইসাবাহ : ৫/১৮৭।

১০২৯. তাবারি : ৫/২৩১, ইবনুল আসির : ৩/৪৫৭। এ দুই গ্রন্থের রচয়িতা উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন, গালিব বিন ফুজালা। কিন্তু আল-ইসাবাহর লেখক উল্লেখ করেছেন, গালিব বিন আব্দুল্লাহ বলাই বেশি বিশুদ্ধ।

১০৩০. মেরো খোরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। যা শাহেজানের মেরো। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/৩৩।

আল-ইসাবাহ গ্রন্থে খোরাসানের গভর্নর বা নেতৃত্বের কথা উল্লেখ আছে গালিব বিন আব্দুল্লাহ আল-কিনানি আল-লাইসি নামে। গালিব বিন আব্দুল্লাহ বিন ফাজালা ও গালিব বিন ফাজালা আল-কিনাই কারও নামে উল্লেখ নেই। যেহেতু তিনটি নাম এক ব্যক্তিত্বকে বোঝায়, তিনি হচ্ছেন গালিব আল-কিনানি আল-লাইসি। মতানৈক্য শুধু তাঁর বংশধারায়। আর ইবনে কালবির যে বর্ণনাটি আছে, তা অন্যদের বিরোধপূর্ণ বর্ণনার[১০৩১] চেয়ে বেশি বিশুদ্ধ। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ—বিশেষত কুদামা ﷺ—ইবনে কালবির বর্ণনা উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছেন। অন্যদের বর্ণনা উল্লেখ করেননি।

ব্যাপারটি এভাবেই চলে আসছে। কারণ গালিব ﷺ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন :

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

'আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে রাসুলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর এবং রাসুলের...।'[১০৩২]

(জনপদবাসী বলতে) বনু কুরাইজা, বনু নাজির, খাইবার ও ফাদাক (বোঝানো হয়েছে।) বনু কুরাইজা ও বনু নাজির মদিনার বাসিন্দা। ফাদাক মদিনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত অঞ্চল। রাসুল ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, যার কমান্ডার ছিলেন কিনানা গোত্রের গালিব বিন ফাজালা।

অসম্ভব নয় যে, ঐতিহাসিকগণ এ বর্ণনাকে জোরপূর্বক গ্রহণ করেছেন।[১০৩৩] কারণ ঐতিহাসিক ইবনে কালবি উল্লেখ করেছেন, রাসুল ﷺ গালিব বিন আব্দুল্লাহকে ফাদাক অঞ্চলে বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। আর তাঁর পিতার নাম ফাজালা হওয়ার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের উক্তিটি হয়তো কপিকারীর পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে অথবা নামের মধ্যেই মতভেদ আছে।[১০৩৪]

১০৩১. আল-ইসাবাহ : ৫/১৮৭।
১০৩২. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ৭।
১০৩৩. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৮-১৬৯, আল-ইসাবাহ : ৫/১৮৭।
১০৩৪. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭।

যেহেতু ইবনে কালবি একাই গালিব বিন আব্দুল্লাহ নাম উল্লেখ করেননি; বরং তার সাথে অনেক ঐতিহাসিক এ নাম উল্লেখ করেছেন।

গালিব ﷺ-এর সন্তানাদি ছিল হিজাজের অধিবাসী।[১০৩৫] তাঁর সন্তানদের একটি অংশ খোরাসানের অধিবাসী।[১০৩৬] এর থেকে বোঝা যায় তিনি খোরাসানের অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু খোরাসানে গভর্নর হিসেবে একটি সময় অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর মূল সন্তানাদি হিজাজের অধিবাসী।

মানুষ হিসেবে আমরা তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্যই বের করতে পারব। কারণ তিনি রাসুল ﷺ-এর একজন অন্যতম কমান্ডার এবং গভর্নর। তিনি একদিকে যেমন ইমান, আল্লাহভীতি, আমানত ও অবিচলতার গুণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অপরদিকে নেতৃত্ব ও পরিচালনার গুণেও গুণান্বিত ছিলেন। তাই তিনি একজন সক্ষম কমান্ডার এবং অভিজ্ঞ পরিচালক। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।

গালিব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি একেবারেই স্পষ্ট ছিল। কারণ তিনি রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনটি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অনুরূপ মক্কা-বিজয়কালে মুসলিমদের অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর তাঁর জিহাদি জীবনের ধারা অব্যাহত থাকে। তাই ইরাক ও পারস্যের যুদ্ধসমূহে তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মাঝে গণ্য হয়েছিলেন।

সম্ভবত তিনি এসব সতর্কতা ও বিচক্ষণতার কারণে কাদিদ অভিযানের পথে লাইসি গোত্রের ব্যক্তিটির ইসলামের ঘোষণাকে সত্যায়ন করতে পারেননি। বরং তাকে বেঁধে একজন প্রহরীর দায়িত্বে রেখে পেছনে ফেলে যান। আর প্রহরীকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, বন্দী পলায়নের ইচ্ছা করলে মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে দেবে। কারণ এটা খুব সম্ভব ছিল যে, সে পালিয়ে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর কথা শত্রুর কাছে বলে দেবে। আর শত্রুরা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে। ফলে অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে।

১০৩৫. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৮।
১০৩৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩২২ পৃ.।

তার বিচক্ষণতা ও সতর্কতার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, নির্ভুল ও সফলভাবে অপারেশন পরিচালনা করতে সঠিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিতে তিনি একজন বিচক্ষণ এবং যোগ্য অনুসন্ধানী প্রেরণ করেছিলেন।

তিনি মানুষকে জিহাদ ও যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতেন। তাঁর সৈনিকদেরকে দুজন দুজন করে জুটি বেঁধে দিতেন। যাতে যুদ্ধের পূর্বে, যুদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধের পরেও তাঁদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা অটুট থাকে। এভাবে পরিপূর্ণ আনুগত্য, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নির্দেশ বাস্তবায়নের নির্দেশ দিতেন এবং মতভেদ ও ফিতনা থেকে দূরে থাকতে বলতেন। কারণ মতভেদের সাথে কোনো বিজয় আসে না এবং আনুগত্যের সাথে কোনো পরাজয় আসে না।

তিনি ছিলেন আক্রমণাত্মক আক্রমণের কমান্ডার। হামলার অতর্কিত নীতি অনুসরণ করতেন। এমন সময়ে অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা করতেন, যার কল্পনাও শত্রু করতে পারে না। এবং এমন স্থান থেকে হামলার ছক আঁকতেন, যার কথা শত্রুর ভাবনায়ও আসত না। হামলা করতেন হিট এন্ড রান-এর পদ্ধতিতে, অর্থাৎ ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ করে মুহূর্তেই উধাও হয়ে যেতেন। শত্রুর নাগালের বাইরে চলে যেতেন শত্রু তার হুঁশ ফিরে পাওয়ার আগেই।

হয়তো দ্রুত সঞ্চলন, দ্রুত আগমন ও দ্রুত প্রত্যাগমন করা তাঁর নেতৃত্বমূলক বৈশিষ্ট্যের অংশ ছিল। সে হিসেবে তিনিও ঝটিকা আক্রমণের একজন মেজর বলে গণ্য হতেন।

তিনি সেসব কমান্ডারের মধ্যে একজন ছিলেন, যারা সৈনিকদের মনোবল সর্বদা চাঙা রাখতেন। তাই তাঁর অন্যতম টার্গেট থাকত একদিকে নিজের সৈনিকদের মনোবল চাঙা রাখা এবং আরেক দিকে শত্রুর মনোবল ভেঙে দেওয়া।

তিনি দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন। সৈনিকদের প্রতি তাঁর যেমন আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, তেমন তাঁর প্রতিও সৈনিকদের আস্থা ও ভরসা ছিল। সৈনিকদের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতেন। তাঁর সৈনিকদের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য তিনি জানতেন। প্রত্যেককেই তার যোগ্যতা অনুসারে দায়িত্ব দিতেন। তাঁর প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব ছিল। দায়িত্ব পালন করতেন পরিপূর্ণ জিম্মাদারির সাথে। কখনো দায়িত্ব থেকে পলায়ন করতেন না কিংবা অন্য কারও ঘাড়ে

চাপিয়ে দিতেন না। প্রত্যেকের হিসাবকে নিজের সাথে মিলাতেন এবং চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রশ্নে প্রত্যেককে নিজের সাথে তুলনা করতেন। সময় শেষ হওয়ার আগেই সময়কে কাজে লাগাতেন। তাঁর ছিল একটি উপযুক্ত, কর্মক্ষম, সচল ও পরিবেশবান্ধব শরীর।

হয়তো তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ব্যক্তিগত অসাধারণ বীরত্ব বিদ্যমান ছিল। তাই তো যখন বাশির বিন সাদ ﵁-এর বাহিনী আক্রান্ত হলো, তখন রাসুল ﷺ বনু মুররাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ত্যাগী ও বীর কমান্ডার জুবাইর ইবনুল আওয়াম ﵁-কে প্রস্তুত করলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরে গালিব বিন আব্দুল্লাহ ﵁-কে প্রাধান্য দিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, ত্যাগ ও বীরত্বের মাপে তাঁর বেশ ওজন ছিল।

গালিব ﵁ রাসুল ﷺ-এর নির্বাচিত জেনারেলদের একজন ছিলেন।

ইতিহাসে গালিব ﵁

গালিব ﵁ রাসুল ﷺ-এর তিনটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। রাসুল ﷺ-এর গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ মক্কা-বিজয়ের সময় অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পরে কখনো তরবারি কোষবদ্ধ করেননি। বরং তিনি ইসলামি বিজয়াভিযানের একজন সিংহপুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর একজন অন্যতম গভর্নর ছিলেন এবং রাসুল ﷺ-এর পরে মুসলিমদেরও গভর্নর হয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির প্রতি তাঁর বিশেষ করুণাধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

ইবনে আবুল আওজা আস-সুলামি ﷺ

তাঁর বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

এক বর্ণনামতে তিনি সুলাইম গোত্রের ইবনে আবুল আওজা।[১০৩৭] আরেক বর্ণনামতে তিনি সুলাইম গোত্রের আবুল আওজা।[১০৩৮] তবে অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রথম নামটি গ্রহণ করার কারণে তিনি প্রথম নামেই বেশি প্রসিদ্ধ।

সুলাইম গোত্রধারা এভাবে চলে এসেছে, সুলাইম বিন ফাহাদ বিন গানম বিন দাওস বিন উদসান বিন আব্দুল্লাহ বিন জাহরান বিন কাব বিন হারিস বিন আব্দুল্লাহ বিন মালিক বিন নাসর বিন আজদ।[১০৩৯]

আমরা তাঁর প্রকৃত নাম সম্পর্কে জানতে পারিনি। এবং তাঁর ইসলামপূর্ব জীবন সম্পর্কেও কিছু জানতে পারিনি। ইসলাম গ্রহণ করেছেন মক্কা-বিজয়ের পূর্বে। মক্কা-বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিদের নামের তালিকায় তাঁর এ নামই উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৪০]

১০৩৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৭৫, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৯, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি ২/৭৪১, উয়ুনুল আসার : ২/১৪৯, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৮ পৃ.।

১০৩৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৮৪, আল-মুহাব্বার : ১২৩ পৃ., উসদুল গাবাহ : ৫/২৬৬।

১০৩৯. বিস্তারিত দেখুন, জামাহারাতু আনসাবিল আরব : ৩৭৬-৩৮১।

১০৪০. তাবাকাতু ইবনি সাদে বিস্তারিত তালিকা দেখুন, ৪/৩৮৯-৩৯২।

তাঁর জীবন সম্পর্কে অল্প-বিস্তর আলোচনাই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কোনো অভিযান পরিচালিত না হলে তাঁর নামের কোনো আলোচনাই বর্ণিত হতো না।

যাহোক, তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন এবং রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

অভিযানের কমান্ডার

সপ্তম হিজরির জিলহজ মাসে রাসুল ﷺ উমরাতুল কাজা আদায় করে মদিনায় আসেন। এরপর ইবনে আবুল আওজা رضي الله عنه-এর অভিযান পরিচালিত হয়।[১০৪১]

রাসুল ﷺ তাঁকে ৫০ জনের একটি বাহিনী দিয়ে সুলাইম গোত্রাভিমুখে প্রেরণ করেন। তাঁর অজান্তে বাহিনীর মাঝে সুলাইম গোত্রের এক গুপ্তচর ঢুকে যায়। বাহিনী মদিনা থেকে বের হলে সে দ্রুত তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের সতর্ক করে।[১০৪২] সুলাইম গোত্র খবর শুনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। ইবনে আবুল আওজা رضي الله عنه পৌঁছে দেখেন, শত্রুরা মোকাবিলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

তাদের এই অবস্থায় দেখে তিনি তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা বলল, 'আপনি আমাদের যার দাওয়াত দিচ্ছেন, সে বিষয়ের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

উভয় বাহিনীর মাঝে কিছুক্ষণ তির বিনিময় হয়। সুলাইম গোত্রের পক্ষে সাহায্য-সহযোগিতা আসতে থাকে। একপর্যায়ে শত্রুরা মুসলিম বাহিনীকে সব দিক থেকে ঘিরে ধরে।

মুসলিম বাহিনী প্রাণপণ লড়াই করে। একসময় তাঁদের সকলে শাহাদাত বরণ করেন। ইবনে আবুল আওজা رضي الله عنه নিহতদের মাঝে আহত অবস্থায় পড়ে

১০৪১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৯, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৪১।

১০৪২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৩, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৪১, উয়ুনুল আসার : ২/১৪৯। দেখুন, উসুদুল গাবাহ : ৫/২৬৬।

থাকেন। এরপর অষ্টম হিজরির সফর মাসে তিনি মদিনায় রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে পৌছেন।[১০৪৩]

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি সাথি-সঙ্গীসহ শাহাদাত বরণ করেন।[১০৪৪] আমি তাঁর শাহাদাতের বর্ণনাকেই প্রাধান্য দেবো। কারণ তাঁর সম্পর্কে আলোচনা এ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এর পরে কোনো যুদ্ধ বা অভিযানে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সম্ভবত এই অভিযানটি দাওয়াতি অভিযান ছিল। কিন্তু বনু সুলাইম গোত্র দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। তারা ছিল মুসলিমদের চেয়ে বহুগুণে বেশি। সংখ্যা, শক্তি ও সামর্থ্যের দিক থেকে উভয় বাহিনীর মাঝে ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কারণ মুশরিকরা তাদের নিজ এলাকায় ছিল। ফলে মূল ঘাঁটির ওপর নির্ভর করতে পেরেছে। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনী ছিল মূল ঘাঁটি মদিনা থেকে বহু দূরে। কেন্দ্র থেকে তাঁদের কাছে সাহায্য পৌঁছার পথ ছিল অনেক দীর্ঘ। যার কারণ মুশরিক বাহিনী সহজেই যে সাহায্য পেত, মুসলিম বাহিনী সে সাহায্য কষ্ট করেও অর্জন করতে পারত না।

মুশরিক বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর এই বিরাট পার্থক্য মুসলিম বাহিনীকে বিপাকে ফেলেছিল। সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করার পরও তাঁদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা দুর্বল বা হীনবল হননি এবং আত্মসমর্পণও করেননি। বরং বীরবিক্রমে লড়াই করে গেছেন। যার কারণে যুদ্ধক্ষেত্রেই সদলবলে শাহাদাতের সুধা পান করেছেন। আবার মুসলিমদের মাঝে মুশরিকদের যে গুপ্তচর ছিল, সে অনেক আগে মুসলিম বাহিনীর খবর মুশরিকদের কাছে পৌছে দিয়েছিল। যার কারণে মুশরিকরা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলিমদের সহজে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিমদের জন্য মদিনায় গুপ্তচরদের বাধা দিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কারণ তারা বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে মুসলিম সমাজে মিশে ছিল। যার কারণে ওই সময়ে এবং ওই পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থা জানা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল।

১০৪৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৩ এবং ৪/২৭৫, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৪১, উয়ুনুল আসার : ২/১৫০।

১০৪৪. তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৪৮, উসদুল গাবাহ : ৫/২৬৬। দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৮৪, আল-মুহাব্বার : ১২২ পৃ.।

ইবনে আবুল আওজা ﷺ তাঁর সৈনিকদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আদর্শ হয়ে ছিলেন। ফলে তাঁর ওপর কোনো তিরস্কার বা দোষ লাগেনি। তাঁর প্রশংসার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর আকিদা রক্ষার্থে শাহাদাত বরণ করেছেন। জীবনের মায়ায় আকিদার মাঝে কোনো ত্রুটি আসতে দেননি। বরং আকিদার হিফাজতে বীর বেশে জীবন দান করেছেন।

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

তাঁর সম্পর্কে আমরা একেবারেই সামান্য আলোচনা করলাম। কারণ তিনি হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এবং সপ্তম হিজরির শেষে শাহাদাত বরণের মাধ্যমে জীবনের সমাপ্তি টেনেছেন। এ ছাড়া ব্যক্তি হিসেবে আমরা তাঁর কোনো তথ্য যোগ করতে পারলাম না।

অবশ্য তিনি ইমান, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে একদল সাহাবির নেতৃত্ব দিয়ে বনু সুলাইম গোত্রাভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এটা তাঁর গভীর ইমানের প্রমাণ। যা তাঁর হৃদয় থেকে জাহিলি যুগের অন্ধ গোত্রপ্রীতি বের করে দিয়ে সে স্থানে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার দায়িত্ববোধ ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

সৈনিকদের যথাযথ নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে তাঁর ছিল বিচক্ষণতা, ভারসাম্যতা, উত্তম পরিচালনা, প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাস। কারণ নেতৃত্ব এমন কোনো সহজ ব্যাপার নয় যে, যে কেউ চাইলেই তার বোঝা বহন করতে পারবে। যেহেতু রাসুল ﷺ নেতৃত্বের দায়িত্ব কেবল সেই ব্যক্তিকেই দান করতেন, যে স্বীয় ইমান ও নেতৃত্বের যোগ্যতার বলে নেতৃত্বের বোঝা বহন করতে সক্ষম। কোনো বংশ, স্বজন বা অন্য কোনো সম্পর্কের কারণে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিতেন না। যেমনটা বর্তমানের শাসকরা করে থাকে। রাসুল ﷺ-এর মানদণ্ডে এসবের কোনো স্থান নেই। এবং সে ব্যক্তিদের মানদণ্ডেও সেসবের কোনো স্থান নেই, যারা রাসুল ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যথাস্থানে যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করে।

ইবনে আবুল আওজা ﷺ ছিলেন আদর্শবান কমান্ডারদের একজন, যারা নিজেদের আকিদা ও আদর্শের জন্য কাজ করতেন। স্বীয় আকিদা ও বিশ্বাসের তরে জীবন বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু জীবনের কারণে আকিদা-বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতেন না।

ইতিহাসে বিন আবুল আওজা ﷺ

তিনি মক্কা-বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। সাহাবির মর্যাদার সাথে অর্জন করেন রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে রাসুলের নেতৃত্বে জিহাদ করার সৌভাগ্য।

নিজের আকিদা-বিশ্বাস রক্ষার্থে সামনে বাড়তে বাড়তে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। শামিল হন প্রথম সারির শাহাদাত বরণকারী সাহাবিদের কাতারে।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির প্রতি তাঁর অফুরন্ত রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

পত্রবাহক শহিদ কমান্ডার

শুজা বিন ওয়াহাব আল-আসাদি ﵁

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

শুজা বিন ওয়াহাব[১০৪৫] বিন রবিআ বিন আসাদ বিন সুহাইব বিন মালিক বিন কাসির বিন গানম বিন দুদান বিন খুজাইমা আল-আসাদি।[১০৪৬] খুজাইমা আল-আসাদি কুরাইশের শাখাগোত্র আবদে শামসের মিত্র ছিল। তাকে আবু ওয়াহাব উপনামে ডাকা হতো।[১০৪৭]

শুজা ﵁ সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত করেন। মক্কার কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। সুতরাং তিনি প্রথম সারির ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন।[১০৪৮]

রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরতের অনুমতি দিলে শুজা ﵁ প্রথম হিজরতকারীদের সাথে মদিনায় হিজরত করেন।[১০৪৯] সাহাবায়ে কিরাম মক্কা থেকে মদিনায় দলে

১০৪৫. আল-ইসাবাহ : ৩/১৯৪, উসদুল গাবাহ : ২/৩৮৬, আল-ইসতিআব : ২/৭০৭।
১০৪৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯৪, আল-ইসাবাহ : ৩/১৯৪, উসদুল গাবাহ : ২/৩৮৬, আল-ইসতিআব : ২/৭০৭।
১০৪৭. উসদুল গাবাহ : ২/৩৮৬, আল-ইসতিআব : ২/৭০৭।
১০৪৮. উসদুল গাবাহ : ২/৩৮৬, আল-ইসাবাহ : ৩/১৯৪।
১০৪৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৮০। দেখুন, আদ-দুরার : ৮১, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৮৭ পৃ.।

দলে হিজরত করতে থাকেন। গানাম বিন দুদান গোত্রের সকলেই মুসলিম ছিলেন। তাঁদের নারী-পুরুষ সকলেই হিজরতের কষ্ট ভোগ করেন।[১০৫০]

মদিনায় রাসুল ﷺ শুজা ؓ ও আওস বিন খাওলি ؓ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দেন।[১০৫১] আওস বিন খাওলি ؓ ছিলেন খাজরাজ গোত্রের লোক।[১০৫২]

এভাবেই শুজা বিন ওয়াহাব ؓ তাঁর দীর্ঘ সফরের পর মুসলিমদের নিরাপদ ঘাঁটি মদিনায় স্থিরতা লাভ করেন। সঙ্গ পান এমন কিছু ভাইয়ের, যারা সুখে-দুঃখে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। পাশে এসে দাঁড়ান জীবনের কষ্টময় মুহূর্তগুলোতে। মদিনায় এসে স্বস্তির সাথে অবস্থান করা একটি স্থানের ব্যবস্থা হয়। ব্যবস্থা হয় নিরাপদে আশ্রয় নেওয়ার জায়গার। এর ফলে নিজের জীবন এবং দ্বীনি ভাইদের জীবন রক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকার সুযোগ লাভ করেন।

জিহাদি জীবন

শুজা বিন ওয়াহাব ؓ ও তাঁর ভাই উকবা বিন ওয়াহাব ؓ ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১০৫৩]

ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে গামরের উদ্দেশ্যে উক্কাশা বিন মিহসান ؓ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।[১০৫৪] ওই অভিযানে মুসলিম বাহিনী গনিমত লাভ করে নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসে।[১০৫৫]

১০৫০. বিস্তারিত দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২০/৮০-৮৩।
১০৫১. আল-মুহাব্বার : ৭২, উসদুল গাবাহ : ২/৩৮৬, আল-ইসতিআব : ৭০৭, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯৪, আল-ইসতিবসার : ১৮৬ পৃ.।
১০৫২. আল-ইসতিবসার : ১৯৪-১৮৫ পৃ.।
১০৫৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/১৫৪, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩২৬, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১১৬ পৃ., আদ-দুরার : ১২২ পৃ., আনসাবুল আশরাফ : ১/২০০, জাওয়ামিউস সিরাহ : ১১৬ পৃ., আল-ইসতিআব : ২/৭০৭, উসদুল গাবাহ : ২/৩৮৬।
১০৫৪. ফায়িদ এলাকা থেকে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত বনু আসাদ গোত্রের একটি পানির উৎসের নাম গামর। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৬১।
১০৫৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৫০।

এ ছাড়াও শুজা ﷺ রাসুল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১০৫৬] কোনো যুদ্ধ থেকে তিনি পিছপা হননি। রাসুল ﷺ-এর সাথে এবং অন্যান্য অভিযানে অংশ নেওয়া প্রতিটি রণাঙ্গনেই নিজ দায়িত্ব আদায়ে সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদের পরিচয় দিয়েছেন।

সারিয়্যার কমান্ডার

সম্ভবত শুজা ﷺ যতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার সবকটিতেই সর্বোচ্চ যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ফলে রাসুল ﷺ তাঁকে ২৪ জনের এক বাহিনীর কমান্ডার বানিয়ে অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল অষ্টম হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে বনু হাওয়াজিনের একটি অংশের বিরুদ্ধে। এদের অবস্থান ছিল বনু আমির গোত্রের এলাকার সিইয়া[১০৫৭] নামক জায়গায়। বনু আমিরের এলাকাটি ছিল মাদিন অঞ্চলের পেছনে রুকবাহ এলাকার এক প্রান্তে।

শুজা ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে বের হয়ে রাতে পথ চলতেন আর দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকতেন। এরপর গন্তব্যে পৌঁছে সকাল সকাল শত্রুর ওপর আক্রমণ করেন। তিনি তাঁর সৈনিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা আক্রমণাত্মক হামলা থেকে পিছপা না হয়। অভিযানে তাঁরা গনিমত হিসেবে অনেক গবাদি পশু লাভ করেন। গনিমত নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।

তাঁর সৈনিকদের প্রত্যেকের ভাগে ১৫টি করে উট পড়েছিল। একটি উটের সমান ১০টি মেষের তুলনা করেছিলেন। মদিনা থেকে বের হয়ে অভিযান সম্পন্ন পর্যন্ত তাঁদের ১৫ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়।[১০৫৮]

শত্রু এলাকা থেকে তাঁরা কিছু নারীদের বন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হাওয়াজিন গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের একটি প্রতিনিধি দল রাসুল ﷺ-এর কাছে আসে এবং তাদের বন্দীদের সম্পর্কে কথা বলে। তখন রাসুল ﷺ

১০৫৬. আল-ইসতিআব : ২/৭০৭, উসদুল গাবাহ : ২/৩৮৬।

১০৫৭. মদিনা মুনাওয়ারা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত মাদিন এলাকা। তার পেছনে অবস্থিত রাকবাহ এলাকার এক পাশে সিইয়া এলাকার অবস্থান। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৫/২০৩-২০৪।

১০৫৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৫৩-৭৫৪, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৭, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৮০, উয়ুনুল আসার : ২/১৫২।

শুজা ﷺ-এর সাথে বন্দীদের আপন পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। শুধু ওই দাসীকে নিজের কাছে রাখতে বলেন, যাকে তিনি নিজ টাকায় ক্রয় করেছিলেন। হাওয়াজিন গোত্রের প্রতিনিধি দল এসে উপস্থিত হলে তিনি সে দাসীকে ইচ্ছাধিকার দিলেন, চাইলে তাঁর সাথেও থাকতে পারে আবার আপন পরিবারের কাছেও চলে যেতে পারে। কিন্তু দাসী পরিবারের কাছে না গিয়ে বরং শুজা ﷺ-এর কাছে থাকতেই পছন্দ করে। শুজা ﷺ ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত দাসী তাঁর কাছেই থেকে যায়।[১০৫৯] তার গর্ভে শুজা ﷺ-এর কোনো সন্তান জন্ম নেয়নি।[১০৬০] ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আবু বকর ﷺ-এর খিলাফতকালে ১১ হিজরিতে। যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ।

শুজা ﷺ এ অভিযানে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে নিরাপদে শত্রুর ওপর জয় লাভ করে গনিমত লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং হাওয়াজিন গোত্রকে মানসিকভাবে মারাত্মক বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন।

বার্তাবাহক হয়ে গাসসানার কাছে

হুদাইবিয়ার পর মক্কা-বিজয়ের পূর্বে অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরির জিলহজ মাসে রাসুল ﷺ বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও গোত্রপ্রধানদের কাছে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন।[১০৬১] সেই ধারাবাহিকতায় শুজা বিন ওয়াহাব আসাদি ﷺ-কে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে হারিস বিন আবু শামির আল-গাসসানির কাছে প্রেরণ করেন।[১০৬২]

শুজা ﷺ বলেন, 'আমি তার কাছে পৌঁছালাম, তখন সে দামেশকের গুতা শহরে অবস্থান করছিল। এবং হিমস থেকে ইলিয়া তথা কুদসে যাওয়ার পথে বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের জন্য ভোজ ও অভ্যর্থনার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিল। আমি তার ফটকের কাছে দুই দিন কিংবা তিন দিন অপেক্ষা করলাম। দারোয়ানকে

১০৫৯. বিস্তারিত দেখুন, ইবনুল আসির : ২/৩৬০- ৩৬৭।
১০৬০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৫৬।
১০৬১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৫৮, জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৯ পৃ.।
১০৬২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৫৮, আত-তাবারি : ২/৬৪৪। দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৭৮।

বললাম, "আমি হারিসের কাছে আল্লাহর রাসুলের বার্তা নিয়ে এসেছি।" তখন সে বলল, "অমুক অমুক দিন বের হলে তবে আপনি তার কাছে যেতে পারবেন।" এর মধ্যে দারোয়ান আমাকে রাসুল ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকল। তার নাম ছিল মুরাই। আমি রাসুল ﷺ-এর গুণাবলি এবং তাঁর দাওয়াতি বিষয়গুলো তার কাছে বলছিলাম। বিবরণ শুনে তার মন বিগলিত হয় এবং চোখে পানি চলে আসে। সে আমাকে বলল, "আমি ইনজিল কিতাব পড়েছি। সেখানে হুবহু এই নবির বিবরণগুলো আমি পেয়েছি। আমি তাঁর ওপর ইমান আনছি এবং তাঁকে সত্যায়ন করছি। আমি আশঙ্কা করছি, হারিস আমাকে হত্যা করবে।" সে আমাকে বেশ আদর-আপ্যায়ন করে।

হারিস একদিন তার প্রাসাদ থেকে বের হলো এবং সিংহাসনে বসে মাথায় মুকুট পরল। এরপর আমাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলো। আমি তাকে রাসুল ﷺ-এর পত্র দিলাম। সে পত্রখানা পড়ে ছুড়ে মারল এবং বলল, "কে আমার রাজত্ব আমার থেকে ছিনিয়ে নেবে? আমি তার বিরুদ্ধে বের হচ্ছি; যদিও সে সুদূর ইয়েমেনে অবস্থান করে। হে নেতৃবর্গ, আমাকে পরামর্শ দাও।" সে রাগে গদগদ করতে করতে দাঁড়িয়ে গেল। অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিল। এরপর সে বলল, "তোমার লোককে এসব বলে দাও।"

সে হিরাক্লিয়াসের কাছে আমার খবর ও তার সিদ্ধান্ত লিখে পত্র পাঠাল। হিরাক্লিয়াস জবাবে লিখল, "তার ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকুন এবং অভিযান পরিচালনা না করে ইলিয়ায় এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করুন।" পত্র পেয়ে হারিস আমাকে ডেকে বলল, "কখন তোমার সাথির কাছে যাচ্ছ?" বললাম, "আগামীকাল।" তখন সে আমাকে ১০০ মিসকাল স্বর্ণ দেওয়ার নির্দেশ দিল। অপরদিকে মুরাই আমার কাছে এসে আমাকে পথখরচ ও কিছু পোশাক দেওয়ার নির্দেশ দিল আর বলল, "আমার পক্ষ থেকে রাসুল ﷺ-কে সালাম পৌঁছে দেবেন।" আমি এসে রাসুল ﷺ-কে সব খবর বললাম। রাসুল ﷺ বললেন, "তার রাজত্বের ধ্বংস হোক!" মুরাইয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম বললাম এবং তার কথা জানালাম। রাসুল ﷺ বললেন, "সে সত্য বলেছে।"[১০৬৩] মক্কা-বিজয়ের দিন হারিসের মৃত্যু হয়।

১০৬৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৬১। দেখুন, ইবনুল আসির : ২/২১৩, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/২৮৬, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯৪-৯৫, তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৬৩।

দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ﷺ শুজা বিন ওয়াহাব -কে পাঠিয়েছিলেন হারিস বিন আবু শামিরা গাসসানি ও তার চাচাতো ভাই বালকার বাদশাহ জাবালা বিন আইহামের কাছে।[১০৬৪] তারা তখন গুতা শহরে অবস্থান করছিল।

তৃতীয় বর্ণানায় এসেছে, রাসুল ﷺ তাঁকে জাবালা বিন আইহাম গাসসানির কাছে প্রেরণ করেছিলেন।[১০৬৫]

তবে প্রথম বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ হারিস বিন আবু শামিরাই ছিল সে সময়ের গাসাসানার বাদশাহ। আর তার চাচাতো ভাই জাবালা রাষ্ট্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল; কিন্তু সে গাসাসানার বাদশাহ ছিল না।

হারিস যেমন ইসলাম গ্রহণ করেনি, তেমন জাবালাও সেদিন ইসলাম গ্রহণ করেনি। হারিসের মৃত্যুর পর জাবালা শাসনক্ষমতা লাভ করে। তাই জাবালা ছিল গাসাসানের সর্বশেষ বাদশাহ। উমর -এর খিলাফতকালে সে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর মুরতাদ হয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যায় এবং রোমে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তার ইরতিদাদের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, সে একদিন দামেশকের বাজার অতিক্রম করছিল। অতিক্রমকালে তার ঘোড়া এক ব্যক্তিকে পা দিয়ে আঘাত করে। তখন সে ব্যক্তি লাফ দিয়ে উঠে জাবালাকে এক ঘুষি মারে। এটা দেখে গাসসানি লোকেরা তাকে ধরে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ -এর কাছে নিয়ে যায় এবং বলে, "এই লোক আমাদের সর্দারকে ঘুষি মেরেছে।" আবু উবাইদা বললেন, "এ ব্যক্তি তোমাকে ঘুষি মেরেছে, তার কোনো প্রমাণ আছে?" জাবালা বলল, "প্রমাণ দিয়ে আমি কী করব?" আবু উবাইদা বললেন, "যদি সে তোমাকে ঘুষি মেরে থাকে, তবে ঘুষির বদলায় আমিও তাকে ঘুষি মারব।" জাবালা বলল, "তাকে হত্যা করা হবে না?" আবু উবাইদা বললেন, "না।" সে বলল, "তার হাতও কেটে দেওয়া হবে না?" তিনি বললেন, "না। আল্লাহ শুধু কিসাসের আদেশ করেছেন। একটি ঘুষির বদলায় একটি ঘুষি।" তখন জাবালা সেখান থেকে বের হয়ে রোমে গিয়ে মিলিত হয় এবং খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। মৃত্যু পর্যন্ত সে সেখানে অবস্থান করে।'[১০৬৬]

১০৬৪. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৯-৩০ পৃ., সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৭৯, আল-মুহাব্বার : ৭৬ পৃ., ইবনুল আসির : ২/২১০।

১০৬৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩৭৯।

১০৬৬. আল-মাআরিফ : ৬৪৪ পৃ.। কিছু উৎসগ্রন্থে আছে, সে মদিনায় মুরতাদ হয়। তবে তার মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই।

হারিসের কাছে রাসুল ﷺ-এর পত্রের বিবরণ ছিল নিম্নরূপ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে

হারিস বিন আবু শামিরার প্রতি

সালাম ওই ব্যক্তির ওপর, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান এনে সত্যায়ন করে। আমি আপনাকে এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনার আহ্বান করছি, যাঁর কোনো শরিক নেই। তাহলে আপনার রাজত্ব ঠিক থাকবে।

শুজা বিন ওয়াহাব ؓ এ পত্র নিয়ে তার কাছে যান এবং তা পাঠ করেন। তখন সে বলল, 'আমার রাজত্ব কে কেড়ে নেবে? আমি এখুনি তার কাছে যাচ্ছি।'[১০৬৭]

শুজা বিন ওয়াহাব ؓ কঠিন মুহূর্তে তাঁর পত্র পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ তখন গাসাসানার বাদশাহ হারিস একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিল। রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয়ের পর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায়ের জন্য বাইতুল মাকদিসে যাচ্ছিল। আর তাকে স্বাগত জানানোর জন্য হারিস তখন বেশ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিল। এই সময়ে শুজা বিন ওয়াহাব ؓ হারিসের কাছে রাসুল ﷺ-এর পত্র পৌঁছে দিয়ে তাঁর দায়িত্ব আদায় করেছিলেন। সাথে বাদশাহর অনুচরদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াতে বাদশাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি দারোয়ান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম কবুল করেছিল এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি দিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। সন্দেহ নেই, শুজা ؓ তাঁর দূরদর্শী পদ্ধতির মাধ্যমে দারোয়ান ছাড়াও অন্যদের মাঝে ইসলামের প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১০৬৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/২৬৮।

আর বাদশাহ রাজত্ব হারানোর ভয়ে এবং খ্রিষ্টান রাজা হিরাক্লিয়াসের ভয়ে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিতে পারেনি। কারণ তখন হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার অঞ্চলগুলো দখল করে রেখেছিল। তার আনুগত্য আর গভর্নরের দায়িত্বের কারণে হারিস ইসলাম কবুলের সাহস পায়নি।

ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন

তিনি ছিলেন লম্বা ছিপছিপে হালকা গড়নের। রাসুল ﷺ থেকে তাঁর কোনো হাদিসের বর্ণনার উল্লেখ নেই।[১০৬৮] স্বয়ং তাঁর আলোচনাগুলো অন্য সাহাবিদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যক্তি হিসেবে তাঁর এতটুকু আলোচনা একেবারেই নগণ্য। ১১ হিজরিতে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৩ ঊর্ধ্ব।[১০৬৯]

ইমান, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। নেতৃত্বের দায়িত্বে যেমন সফল হয়েছিলেন, তেমন বার্তাবাহকের দায়িত্বেও সফলতা লাভ করেছিলেন। এটা তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা এবং উত্তম আখলাক ও উত্তম পরিচালনারই প্রমাণ বহন করে।

আকিদার জন্য জীবন দিতে কোনো কার্পণ্য করেননি। ফলে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তার জীবন আর অন্য মুসলিমদের জীবনের বিনিময়ে শক্তি-সামর্থ্যে বড় শত্রুর ওপর সহজেই বিজয় অর্জন হয়েছিল।

শুজা বিন ওয়াহাব রাঃ-এর মতো ব্যক্তিদের কারণেই বিজয় আসে। তাঁদের মতো ব্যক্তিদের কুরবানির বদৌলতেই তখন পূর্ব-পশ্চিমে ইসলামের বিজয় পতাকা পতপত করে উড়েছিল।

১০৬৮. আল-ইসতিআব : ২/৭০৭।

১০৬৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৯৫, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৩৭, আল-ইসাবাহ : ৩/১৯৪, উসদুল গাবাহ : ২/৩৮৬, আল-ইসতিআব : ২/৭০৭।

কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

বনু হাওয়াজিনের ওই অংশটি ছিল শক্তি-সামর্থ্যে কয়েকগুণ বেশি। এরপরও শুজা বিন ওয়াহাব ﷺ বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ তিনি এমন সময়ে অতর্কিত হামলা করেছিলেন, যে সময়ে আক্রমণের কথা শত্রুর কল্পনায়ও আসতে পারে না। এমন বিদ্যুৎগতিতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যার কারণে শত্রু মোকাবিলার চিন্তারও সুযোগ পায়নি; বরং তাদের সঠিকভাবে চিন্তায় ভাটা পড়েছিল। দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর দিশেহারা হয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে এই সুযোগে তিনি অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে শত্রুর জানমালে বিরাট ক্ষতি সাধন করতে পেরেছিলেন।

আকস্মিক আক্রমণ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

তিনি শুধু আকস্মিক আক্রমণ নীতির ওপরই ক্ষান্ত হননি; বরং তার সাথে যুদ্ধের বাকি নীতিগুলোও বাস্তবায়ন করেছেন। টার্গেট নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন করেছেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল রাসুল ﷺ-এর নির্দেশের বাস্তবায়ন করা। রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ ছিল শত্রুর ওপর আক্রমণ করা। শুজা বিন ওয়াহাব ﷺ তাঁর সে নির্দেশ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছেন। শত্রুর পেছনে ধাওয়া করতে সৈনিকদের নিষেধ করে দিয়েছিলেন। যাতে তাঁর সৈনিকেরা অজ্ঞাত কোনো জটিলতায় না পড়ে। এবং কোনো অকল্যাণকর কাজেও জড়িয়ে না যায়।

আক্রমণাত্মক আক্রমণের নীতি বাস্তবায়ন করেন। তিনি সেই প্রথম সারির কমান্ডারগণের মধ্যে ছিলেন, যারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের নীতি থেকে দূরে থেকে আক্রমণাত্মক আক্রমণকেই লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

নিরাপত্তার নীতি কঠোরভাবে পালন করতেন। যার কারণে শত্রু তাঁর সৈনিকের ওপর যুদ্ধের আগে, মাঝে এমনকি তার পরেও অতর্কিত হামলা করার সুযোগ পায়নি। বরং তিনিই শত্রুর ওপর অতর্কিত হামলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি প্রয়োগের নীতি পালন করতেন। এ কারণে তিনি শত্রুদের ধাওয়া করতে নিষেধ করেছিলেন। যাতে শক্তির অপচয় না হয়। এবং অনর্থক কাজে জীবনের ক্ষতি সাধন না হয়।

প্রশাসনিক বিষয়গুলো অতি চমৎকারভাবে আঞ্জাম দিতেন। ফলে তাঁর সৈনিকদের জন্য প্রশাসনিক কর্মের সকল আসবাবপত্র জোগান দিতেন। সাধারণত প্রশাসনিক কাজকে অতি সহজে বাস্তবায়নের জন্য যে আসবাবগুলোর প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তার ব্যবস্থাপনা তিনি করে রাখতেন।

মানসিক শক্তি ঠিক রাখার নীতি পালন করতেন অতি সুচারুরূপে। তাঁর অভিযানের লক্ষ্যই ছিল মুসলিম বাহিনীর মনোবলকে চাঙা রাখা এবং সকল মুশরিকের মনোবল, বিশেষত বনু হাওয়াজিনের মনোবল দুর্বল করে দেওয়া।

তিনি ছিলেন দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী, বিরল ব্যক্তিত্বপূর্ণ বীরত্ব আর সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। তাঁর ছিল একটি সুদৃঢ় ও অবিচল হৃদয়, যা জয় বা পরাজয় কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হতো না। সৈনিকদের যোগ্যতা, বৈশিষ্ট্য ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। তাদের প্রতি ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং তাঁর প্রতিও ছিল তাদের আত্মবিশ্বাস। তিনি সৈনিকদের ভালোবাসতেন এবং সৈনিকরাও তাঁকে ভালোবাসত। তিনি রাসুল ﷺ-এর একজন আস্থাভাজন লোক ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর কাছে তাঁর সম্মানজনক অবস্থান ছিল। তিনি ছিলেন সুঠাম মজবুত দেহের যুবক। শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি।

তিনি ছিলেন আদর্শবাদী কমান্ডার। আল্লাহর প্রতি ছিল তাঁর গভীর ইমান ও সীমাহীন ভরসা। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির মুজাহিদ। শাহাদাত ছিল তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ চাওয়া। যার কারণে তিনি মৃত্যুর ওপর গড়িয়ে পড়ছেন, নাকি মৃত্যু এসে তাঁর ওপর পড়ছে এটার কোনো পরোয়া করতেন না। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করতে আল্লাহর রাস্তায় তাঁর আমল থাকত সর্বদা খালিস ও সত্যনিষ্ঠ।

শুজা বিন ওয়াহাব ﷺ বাস্তবে একজন শ্রেষ্ঠ কমান্ডার ছিলেন।

বার্তাবাহক হিসেবে মূল্যায়ন

তাঁর মাঝে ছিল প্রশংসিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য। যা তাঁকে নববি বার্তার বার্তাবাহকের আসনের যোগ্য করেছিল। যে বৈশিষ্ট্যবলে তিনি বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন রোম -সম্রাটের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি গাসাসানার বাদশাহ হারিসের দরবারে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : ইসলামের সাথে গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ইসলামের গভীর শিক্ষা। যা তাঁকে আকিদার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : উত্তম আখলাক, জ্ঞান ও বাগ্মিতা। আর বনু আসাদ গোত্র আরবের বাগ্মী ও খতিব গোত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। সম্ভবত তিনি ভালোভাবে পড়ালেখা জানতেন। কারণ একটি নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থে এসেছে, গাসাসানার বাদশাহ হারিসের কাছে তিনিই রাসুল ﷺ-এর পত্র পাঠ করেছিলেন। অথচ সে সময়ে আরবে খুব অল্পসংখ্যক লোকই লেখাপড়া জানত।

তাঁর উত্তম আখলাকের একটি প্রমাণ হলো, হাওয়াজিন গোত্রের বাঁদি আপনজনদের পরিবর্তে শুজা ؓ-এর কাছে অবস্থান করাকে প্রধান্য দিয়েছিল। যদি তিনি কঠোর ও বদমেজাজি হতেন, তবে বাঁদি আপনজনদের ছেড়ে তাঁকে গ্রহণ করত না।

আরেকটি প্রমাণ হলো, তিনি গাসাসানার বাদশাহর ঘনিষ্ঠ লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। ফলে সে লোক তাঁর অনেক সম্মান ও আদর-আপ্যায়ন করে। সেই সাথে তাঁকে সত্যায়ন করে এবং উপহার হিসেবে পোশাক দান করে। নিশ্চয় এটা তাঁর উন্নত চরিত্র, মিশুক ও অন্তরঙ্গ হওয়ার প্রমাণ।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : ধৈর্য ও প্রজ্ঞা। বাদশাহর সাক্ষাৎ পাওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। একসময় তাঁর জন্য বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাতের সময় বাদশাহর সাথে কথাবার্তায় প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। বার্তা পৌঁছে দিয়ে বাদশাহ ও তার সাথের লোকদের সংবাদ রাসুল ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসেছেন।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : অত্যন্ত সুকৌশলী। বাদশাহর রক্ষীর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ বাদশাহর নিকটবর্তী হওয়া যতটা সহজ, রক্ষীর নিকটবর্তী হওয়া ততটা সহজ নয়। কিন্তু তিনি তার সাথেও বন্ধুত্ব পাততে সক্ষম হয়েছেন।

এবং ওই রক্কীই তাঁকে বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ সহজ করে দিয়েছিল। এটা শুজা ﵁-এর সুকৌশল আর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : সুদর্শন। তিনি অবশ্য লম্বা এবং হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন। কিন্তু এরপরও তিনি যে সুন্দর ও সুদর্শন ছিলেন, তার প্রমাণ হচ্ছে, হাওয়াজিন গোত্রের রমণী আপনজনদের ছেড়ে তাঁর কাছে থাকাকেই প্রধান্য দিয়েছিলেন।

ইতিহাসে শুজা বিন ওয়াহাব ﵁

তিনি সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। দুবার হিজরত করেছিলেন, প্রথমে হাবশায় পরে মদিনায়। অন্যতম বদরি সাহাবি। বদরসহ রাসুল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহ থেকে একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁর বরকতময় জীবন জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষায় লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছেন। দেহ থেকে প্রাণ আলাদা হয়েছে; কিন্তু হাত থেকে তরবারি আলাদা হয়নি।

এই মহান সাহাবির প্রতি আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

কাব বিন উমাইর আল-গিফারি ﵁

জীবনকাল

ঐতিহাসিকগণ তাঁর জীবনী সম্পর্কে খুব সামান্যই তথ্য উল্লেখ করেছেন। ফলে আমরা জানি না তিনি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামে তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। তাঁর জন্মতারিখ ও বংশধারা সম্পর্কেও তেমন জানতে পারিনি।

যারা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, তারা একেবারেই অতি সংক্ষিপ্তাকারে লিখেছেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁকে বড় সাহাবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[১০৭০] এর থেকে বোঝা যায়, তিনি সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এবং ইমান, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে অনেক বড় অবস্থানে ছিলেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদের ময়দানে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন। ফলে রাসুল ﷺ-এর একটি অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

১০৭০. আল-ইসাবাহ : ৫/৩০৭, আল-ইসতিআব : ৩/১৩২৩, উসদুল গাবাহ : ৪/২৪৬।

তিনি অষ্টম হিজরিতে শাহাদাত বরণ করেন।[১০৭১] এর বিস্তারিত আলোচনা একটু পরেই আসছে ইনশাআল্লাহ। তাঁর বরকতময় জীবনের সমাপ্তি হয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষায় জিহাদের ময়দানে জিহাদ করতে করতে।

তাঁর জিহাদ

রাসুল ﷺ তাঁকে আমির বানিয়ে একের পর এক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন।[১০৭২] কিন্তু ঐতিহাসিকগণ কেবল তাঁর একটি অভিযানই লিপিবদ্ধ করেছেন।

অষ্টম হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে ১৫ জনের একটি বাহিনী দিয়ে রাসুল ﷺ তাঁকে কুজাআ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি সিরিয়ার জাতে আতলাহ[১০৭৩] এলাকায় এসে কুজাআহ গোত্রের বিরাট এক বাহিনী দেখতে পান।[১০৭৪] তিনি তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। কিন্তু তারা দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর তির-বর্শা নিক্ষেপ শুরু করে। এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরাম প্রাণপণ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লড়াই করতে করতে সকলে শাহাদাত বরণ করেন। কাব বিন উমাইর ؓ নিহতদের মাঝে পড়ে থাকেন। রাত নেমে আসলে কিছুটা সুস্থতাবোধ করেন। এরপর মদিনার পথে রওয়ানা হন। মদিনায় এসে রাসুল ﷺ-কে ঘটনার বিবরণ শোনান। এতে রাসুল ﷺ অনেক ব্যথিত হন। পুনরায় শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু পরে জানতে পারেন, শত্রুরা সেখান থেকে অন্যত্র সরে গেছে। তাই তাদের ছেড়ে দেন।[১০৭৫]

মদিনা থেকে 'জাতে আতলাহ' যাওয়ার পথে কাব ؓ রাতে পথ চলতেন আর দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। কুজাআ গোত্রের কাছাকাছি হলে এক

১০৭১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৮, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৫২, উয়ুনুল আসার : ২/১৫২।

১০৭২. উসদুল গাবাহ : ৪/২৪৬, আল-ইসতিআব : ৩/১৩২৩।

১০৭৩. মদিনার দিকে ওয়াদিল কুরা এলাকার পেছনে অবস্থিত একটি জায়গার নাম জাতে আতলাহ। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ১/২৮৭।

১০৭৪. আল-ইসতিআব : ৩/১৩২৩।

১০৭৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৫২-৭৫৩, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৭-১২৮, উয়ুনুল আসার : ২/১৫২, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৯৬।

গুপ্তচর তাঁদের দেখে ফেলে এবং শত্রুর কাছে গিয়ে মুসলিমদের সংখ্যাস্বল্পতার কথা জানিয়ে দেয়। তখন শত্রু অশ্ববাহিনী নিয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে এবং সকলকে হত্যা করে।[১০৭৬] কুজাআ গোত্রই কাব বিন উমাইর ﷺ-কে হত্যা করেছিল।[১০৭৭]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কাব বিন উমাইর ﷺ আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর এক সৈনিক তাঁকে বহন করে মদিনায় নিয়ে আসেন।[১০৭৮] তবে সর্বসম্মত কথা হলো, তিনি এই অভিযানেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন।[১০৭৯]

কাব ﷺ কুজাআ গোত্রের ওপর আকস্মিক আক্রমণের উদ্দেশ্যে রাতে পথ চলতেন আর দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। এভাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব আদায় করেছিলেন। কিন্তু শত্রুর গুপ্তচর তাঁদের শক্তি-সামর্থ্যের কথা ফাঁস করে দেয়। ফলে শত্রু পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বেশভূষা, আকার-আকৃতিতে যখন শত্রু-মিত্র সবাই সমান। তার ওপর আবার ধু ধু মরুপ্রান্তর, সেই পরিস্থিতিতে শত্রুর গুপ্তচর শনাক্ত করে বিপদ এড়িয়ে যাওয়া কাব ﷺ-এর ওপর বাস্তবিকই দুঃসাধ্য ছিল। শত্রু ছিল সব দিক থেকেই মুসলিম বাহিনীর ওপরে। ফলে সংঘাত বাধে তুলনাহীন দুটি গ্রুপের মাঝে। আবার শত্রু লড়েছিল নিজ দেশে থেকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনী লড়েছিল কেন্দ্রীয় ঘাঁটি থেকে দূরে গিয়ে। আর বিজয়ের জন্য তাঁদের একমাত্র উপায় ছিল অতর্কিত হামলা। কিন্তু গুপ্তচরের কারণে সে সুযোগও তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়। যার কারণে তাঁদের সামনে দুই কল্যাণের একটি লাভ করা ছাড়া কোনো পথ বাকি থাকে না। কিন্তু বিজয়ের তুলনায় এই শাহাদাতের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। ফলে সকলেই শাহাদাতের তামান্নায় জীবন উৎসর্গ করেন।

১০৭৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৫৩।

১০৭৭. উসদুল গাবাহ : ৪/২৪৬, আল-ইসতিআব : ৩/১৩২৩।

১০৭৮. আল-ইসাবাহ : ৫/৩০৭।

১০৭৯. তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৪১, আল-মুহাব্বার : ১২০ পৃ., আল-ইসাবাহ : ৫/৩০৭, আল-ইসতিআব : ৩/১৩২৩, উসদুল গাবাহ : ৪/২৪৬।

তিনি বড় সাহাবিদের একজন ছিলেন। সাহাবি হওয়ার মর্যাদার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষায় এবং ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য আল্লাহর রাস্তায় সর্বাগ্রে শাহাদাত বরণকারীদের একজন ছিলেন।

এই মহান সাহাবির প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

জাফর বিন আবু তালিব رضي الله عنه

ইসলামের প্রথম বার্তাবাহক

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

জাফর বিন আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই আল-কুরাশি আল-হাশিমি। আবু তালিবের আসল নাম ছিল আবদে মানাফ। জাফর رضي الله عنه আলি رضي الله عنه-এর আপন ভাই এবং রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাই ছিলেন।[১০৮০] তাঁর উপনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ।[১০৮১]

মাতা : ফাতিমা বিনতে আসাদ বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই।[১০৮২] জাফর رضي الله عنه আবু তালিবের তিন নাম্বার সন্তান। তালিব সবার বড়, তাঁর পরে আকিল, তাঁর পরে জাফর এবং তাঁর পরে আলি رضي الله عنه। এদের প্রত্যেকেই তাঁর ছোট ভাইয়ের চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। আলি رضي الله عنه সবার ছোট ছিলেন। তাঁদের সকলের মা হলেন ফাতিমা رضي الله عنها।[১০৮৩] ইনিই প্রথম হাশিমি নারী, যাকে হাশিমি লোক বিয়ে করে। তিনি ইসলাম কবুল করে মদিনায় হিজরত

১০৮০. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৬-১২৮৭, আল-ইসাবাহ : ১/২৪৮, আল-ইসতিআব : ১/২৪২। দেখুন, নাসবু কুরাইশ : ১৭ পৃ., জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৪-১৫ পৃ.।

১০৮১. আল-ইসতিআব : ১/২৪২, আল-ইসাবাহ : ১/২৪৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৪।

১০৮২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৪, মুকাতিলুত তালিবিন : ৫ পৃ.।

১০৮৩. মুকাতিলুত তালিবিন : ৫ পৃ.। দেখুন, উসদুল গাবাহ : ১/২৮৭।

করেছিলেন। রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। রাসুল ﷺ তাঁকে অনেক সম্মান করতেন। মৃত্যুর পরে তাঁর কবরে নেমেছিলেন।[১০৮৪]

জাফর ‎ইসলাম গ্রহণ করেন আলি ‎-এর ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পরে এবং রাসুল ﷺ দারুল আরকামে প্রবেশ করার আগে।[১০৮৫] বর্ণিত আছে, আবু তালিব একবার দেখল, রাসুল ﷺ আর আলি ‎সালাত আদায় করছেন। আলি ‎রাসুল ﷺ-এর ডানে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আবু তালিব জাফর ‎-কে বললেন, 'তোমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে মিলিত হও। তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো।' আবার বলা হয়, তিনি ৩১ জন ব্যক্তির পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন ৩২ নাম্বার ইসলাম গ্রহণকারী।[১০৮৬]

অর্থাৎ তিনি সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মুহাজির ও বার্তাবাহক

রাসুল ﷺ যখন দেখতে পেলেন সাহাবিদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা অধিক পরিমাণে বেড়ে গেল আর তাঁদের জন্য তিনি কিছু করতেও পারছিলেন না। তখন সাহাবিদের বললেন, 'যদি তোমরা হাবশায় চলে যেতে! কারণ হাবশায় এক বাদশাহ আছে, তার কাছে কেউ জুলুমের শিকার হয় না। হাবশা সত্যের ভূমি। যাতে আল্লাহ তোমাদের এই বিপদ থেকে একটা স্বস্তির ব্যবস্থা করে দেন।'[১০৮৭] হাবশার বাদশাহ একজন সৎ লোক ছিলেন, তার কাছে কেউ নির্যাতনের শিকার হতো না।[১০৮৮] তাকে নাজ্জাশি বলা হতো। রাসুল ﷺ-এর পরামর্শ পেয়ে সাহাবায়ে কিরাম হাবশার দিকে রওয়ানা হলেন।[১০৮৯] এটা ছিল নবুওয়াতপ্রাপ্তির পঞ্চম বছরে।[১০৯০] এটিই ছিল ইসলামে সর্বপ্রথম হিজরত।[১০৯১]

১০৮৪. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৪৯।
১০৮৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৪।
১০৮৬. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৭। বিস্তারিত দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/ ২৬৫-২৭১, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৪৪-৪৮, আদ-দুরার : ৩৯-৪১, আল-ইসাবাহ : ১/২৪৮।
১০৮৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৩, জাওয়ামিউস সিরাহ : ৫৫ পৃ., আদ-দুরার : ৫০ পৃ.।
১০৮৮. আত-তাবারি : ২/৩২৮।
১০৮৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৩।
১০৯০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৩।
১০৯১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৩।

জাফর ﷺ যেমন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তেমন হাবশায় প্রথম হিজরতকারীদের একজন ছিলেন।[১০৯২] তিনি তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেন।[১০৯৩] সেখানে তাঁর তিন সন্তান জন্মগ্রহণ করে—আব্দুল্লাহ, আওন ও মুহাম্মাদ।[১০৯৪]

জাফর ﷺ-এর সাথে রাসুল ﷺ বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। পত্রের বক্তব্য ছিল এই—

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে

হাবশার বাদশাহ আসহাম নাজ্জাশির প্রতি

আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনার প্রতি আল্লাহর প্রশংসার বার্তা প্রেরণ করছি, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি রাজাধিরাজ, মহাপবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা-বিধায়ক এবং সর্বনিয়ন্তা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মারইয়াম তনয় ইসা আল্লাহর রুহ এবং কালিমা। তিনি তা সতী পূত-পবিত্রা মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। ফলে মারইয়াম ইসাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে স্বীয় কুদরতি রুহ ও ফুৎকারের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন, যেমন আদমকে স্বীয় কুদরতি হাত ও ফুৎকারে সৃষ্টি করেছেন।

আমি আপনাকে এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান করছি, যাঁর কোনো শরিক নেই। এবং আহ্বান করছি তাঁর আনুগত্য, আমার অনুসরণ এবং যে সত্য আমার কাছে এসেছে, তার প্রতি সমর্থন করতে। আর আমি আল্লাহর রাসুল।

১০৯২. আল-ইসাবাহ : ১/২৪৮, উসদুল গাবাহ : ১/ ২৮৭ : আল-ইসাবাহ : ১/২৪৮, আল-ইসতিআব : ১/২৪২।

১০৯৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৫।

১০৯৪. জাওয়ামিউস সিরাহ : ৫৭ পৃ., আদ-দুরার : ৫১ পৃ.।

আপনার কাছে আমার চাচাতো ভাই জাফর এবং কিছু মুসলিমকে প্রেরণ করেছি। তাঁরা আপনার কাছে এসে থাকলে তাঁদের আপ্যায়ন করুন। এবং ক্ষমতার বড়াই করা পরিহার করুন। আমি আপনাকে এবং আপনার সৈন্যবাহিনীকে আল্লাহর দিকে ডাকছি। অতএব আমি আমার বার্তা পৌঁছে দিলাম এবং কল্যাণ কামনা করলাম। অতএব আমার উপদেশ গ্রহণ করুন।[১০৯৫]

সালাম ওই ব্যক্তির প্রতি, যে হিদায়াত গ্রহণ করেছে।

এই পত্রখানা রাসুল ﷺ জাফর رضي الله عنه-কে ওই সময় দিয়েছিলেন, জাফর رضي الله عنه যখন হাবশার উদ্দেশ্যে হিজরতে যাচ্ছিলেন। যাতে বাদশাহ নাজ্জাশি তার দেশে আশ্রয় নেওয়া ভিনদেশি মুসলিম মুহাজিরদের দেখাশোনা করে।[১০৯৬] সাথে নাজ্জাশির প্রতি ইসলামের দাওয়াতও দিয়েছিলেন।

(আপনার কাছে আমার চাচাতো ভাই জাফরের সাথে কিছু মুসলিমকে প্রেরণ করছি। তারা আপনার কাছে এসে পৌঁছলে তাদের আদর-আপ্যায়ন করুন।) পত্রের এই বক্তব্য ষষ্ঠ হিজরিতে প্রেরিত পত্রের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। কারণ সে সময়ে জাফর رضي الله عنه-এর হাবশায় হিজরতের ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এবং সেখান থেকে মদিনায় ফিরে আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

তাবারি رحمه الله-এর পরের যেসব উৎসগ্রন্থে রাসুল ﷺ-এর পত্রের এই বক্তব্য উল্লেখ নেই, সেটা তাবারি رحمه الله-এর ভুল নয়। বরং পরবর্তী ঐতিহাসিকদের ভুলক্রমে এই বক্তব্য উল্লেখ হয়নি।

কুরাইশরা যখন দেখল, রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণ হাবশায় নিরাপদে ও স্বস্তিতে অবস্থান করছেন, তখন তারা কুরাইশের দুজন বিচক্ষণ লোককে নাজ্জাশির কাছে পাঠানোর পরামর্শ করল। এবং মুসলিমদের সেখান থেকে বের করে এনে আবারও জুলুম-নির্যাতন করতে চাইল। তাই আব্দুল্লাহ বিন আবু রবিআ ও আমর ইবনুল আস বিন ওয়ায়িলকে নাজ্জাশির কাছে পাঠাল। সাথে নাজ্জাশি ও তার উজিরদের জন্য অনেক উপহার-উপঢৌকন সঙ্গে দিয়ে দিল। তাদের বলে

১০৯৫. আত-তাবারি : ২/৬৫২, সুবহুল আশা : ৬/৩৭৯ । বিস্তারিত মাজমুআতুল ওসায়িকিস সিয়াসিয়্যাহ : ৪৩-৪৪ পৃ.।

১০৯৬. মাজমুআতু ওসায়িকিস সিয়াসিয়্যাহ : ৩ পৃ.।

দিল, 'মুসলিমদের সম্পর্কে নাজ্জাশির সাথে কথা বলার আগে প্রত্যেক উজিরের কাছে উপহার পৌঁছে দেবে।'

তারা নাজ্জাশির কাছে গিয়ে তার প্রত্যেক উজিরের কাছে উপহার পৌঁছে দেয় এবং প্রত্যেক উজিরকে বলে, 'কিছু নির্বোধ যুবক বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে বাদশাহর দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি। এমন এক নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে, যেটা আমরাও জানি না, আপনারাও চিনেন না। আমরা বাদশাহর কাছে তাদের সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ লোকদের পাঠিয়েছি, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য। তাই আমরা যখন তাদের ব্যাপারে বাদশাহর সাথে কথা বলব, আপনারা তখন বাদশাহকে আমাদের কাছে তাদের সোপর্দ করতে বলবেন। বাদশাহ যেন তাদের সাথে কথা না বলে। কারণ তাদের কওমের লোকেরা তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে।' উজিররা বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে।'[১০৯৭]

মুহাজিরদের আমির ছিলেন জাফর ﷺ।

আমর ইবনুল আস ও তার সাথি নাজ্জাশির কাছে উপহার এগিয়ে দিল।[১০৯৮] বাদশাহ উপহার গ্রহণ করলেন। এরপর তারা বাদশাহর সাথে কথা বলে মুসলিমদের ফিরিয়ে নিতে চাইল। তখন বাদশাহ মুসলিমদের কাছে খবর পাঠাল। মুসলিমগণ বাদশাহর কাছে হাজির হলেন। এর মধ্যে বাদশাহ তার ধর্মযাজকদের ডেকে আনলেন। তারা বাদশাহর পাশে তাদের ধর্মগ্রন্থ খুলে বসে আছেন। বাদশাহ মুসলিমদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই দ্বীনের পরিচয় কী, যার কারণে তোমরা তোমাদের সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে গেছ? আবার আমার ধর্মেও প্রবেশ করোনি বা অন্য কারোর ধর্মেও প্রবেশ করোনি?'

জাফর ﷺ বাদশাহর জবাবে বললেন, 'হে বাদশাহ, আমরা ছিলাম এক অজ্ঞ জাতি। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতাম, ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করতাম, আমাদের সবলেরা দুর্বলদের জুলুম করত। এহেন দুরবস্থার মধ্যে আমাদের

১০৯৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৫৬-৩৫৮।
১০৯৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৪।

কাছে আমাদেরই মধ্য হতে আল্লাহ একজন রাসুল প্রেরণ করলেন। তাঁর বংশমর্যাদা, সততা, আমানতদারিতা এবং পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জানি। তিনি আমাদের দাওয়াত দিলেন, আমরা যেন আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁর ইবাদত করি। আর আমরা ও আমাদের বাপদাদারা যে পাথর আর মূর্তির পূজা করতাম, তা থেকে বিরত থাকি। আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন সত্য কথা বলি, আমানত রক্ষা করি, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করি, নিষিদ্ধ ও অন্যায় রক্তপাত থেকে নিবৃত্ত থাকি। ব্যভিচার, মিথ্যা, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ এবং সতী নারীকে অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকি। আমাদের আদেশ করেছেন এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করতে। সালাত, জাকাত ও সিয়াম পালনের আদেশ করেছেন। আমরা তাঁকে সত্যায়ন করেছি। তাঁর প্রতি ইমান এনে তাঁর কাছে আসা আল্লাহর প্রত্যাদেশের অনুসরণ করেছি। তাই আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি না। আল্লাহ আমাদের ওপর যা হারাম করেছেন, আমরা তা হারাম বলে মানি। যা হালাল করেছেন, তা হালাল হিসেবে মানি। ফলে আমাদের সম্প্রদায় আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। আমাদের প্রতি নির্যাতন করেছে। আমাদের দ্বীনের কারণে আমাদের ফিতনায় ফেলেছে; যাতে আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে মূর্তিপূজার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং তারা যে অন্যায় অপকর্মকে বৈধ করেছে, আমরাও সেগুলো বৈধ মনে করি। যখন তারা আমাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলল, আমাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন চালাল এবং আমাদের ওপর আমাদের দ্বীনকে সংকীর্ণ করে তুলল, তখন আমরা আপনার দেশে চলে এসেছি। অন্যদের ছেড়ে আপনাকে বেছে নিয়েছি। আপনার প্রতিবেশী হওয়ার প্রতি আগ্রহী হয়েছি। হে বাদশাহ, আমরা আশা করেছি, আপনার কাছে আমরা নির্যাতিত হব না।'

তাঁর বক্তব্য শুনে নাজ্জাশি বলল, 'আল্লাহর কাছ থেকে যা এসেছে, তোমার কাছে তার কিছু আছে কি?' তখন জাফর ﵁ 'কাফ-হা-আইন' সুরার শুরুঅংশ তিলাওয়াত করলেন। তিলাওয়াত শুনে নাজ্জাশি কেঁদে ফেললেন। এমনকি অশ্রুতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। উপবিষ্ট ধর্মযাজকরাও কেঁদে বুক ভাসাল।[১০৯৯]

১০৯৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৫৮-৩৫৯।

এরপর নাজ্জাশি বলল, 'এই দ্বীন ও ইসা ﷺ যা নিয়ে এসেছিলেন, দুটোই এক দীপাধার থেকে এসেছে। আল্লাহর শপথ, আমি তাদেরকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করব না। এর চিন্তাও করা হবে না।'

বাদশাহর কাছ থেকে বের হয়ে আমর ইবনুল আস বলল, 'আগামীকাল আমি বাদশাহর কাছে এমন প্রমাণ নিয়ে যাব, তার মাধ্যমে তাদের দল ছিন্নভিন্ন করে দেবো।' আব্দুল্লাহ বিন রবিআ বলল, 'সে একটু ভালো ছিল, এটা করতে যেয়ো না। কারণ তাদের অনেক আপনজন আছে; যদিও তারা আমাদের সাথে বিরোধ করেছে।' আমর বলল, 'আল্লাহর শপথ, আমি বাদশাহকে বলব, তারা দাবি করে ইসা বিন মারইয়াম একজন দাস।'

পরের দিন সকালে আমর বাদশাহর কাছে গিয়ে বলল, 'বাদশাহ নামদার, ইসা সম্পর্কে তারা এক জঘন্য কথা বলে। তাদের কাছে খবর পাঠান, তাঁর সম্পর্কে কী বলে সে সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করুন।'

নাজ্জাশি ইসা ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য মুসলিমদের কাছে খবর পাঠালেন। মুসলিমগণ হাজির হলে বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা ইসা সম্পর্কে কী বলো।' তখন জাফর ﷺ বললেন, 'ইসা সম্পর্কে আমরা তা-ই বলি, যা আমাদের নবি নিয়ে এসেছেন। ইসা হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসুল, তাঁর রুহ এবং তাঁর কালিমা, যা তিনি পূত-পবিত্রা মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন।' এটা শুনে বাদশাহ নাজ্জাশি মাটিতে হাত মেরে একটি খড়কুটা তুলে নিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর শপথ, তুমি যা বললে, ইসা তার চেয়ে এই খড়কুটা পরিমাণও বেশি কিছু নয়। যাও তোমরা নিরাপদ। যে তোমাদের গালি দেবে, তার জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়েও আমি তোমাদের কাউকে কষ্ট দিতে পছন্দ করি না। এই দুজনের উপহার-উপঢৌকন ফিরিয়ে দাও। এসবের কোনো প্রয়োজন নেই আমার।' আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ বিন রবিআ হাদিয়া-তোহফা ফিরিয়ে নিয়ে অপমানিত হয়ে বাদশাহর দরবার থেকে বের হলো। আর মুসলিমগণ উত্তম প্রতিবেশিত্বের সাথে কল্যাণকর দেশে নিরাপদে থেকে গেলেন।[১১০০]

১১০০. ইবনু হিশাম : ১/৩৬০-৩৬১, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/১১৪-১১৬, উয়ুনুল আসার : ১/১১৮-১১৯।

বাদশাহ নাজ্জাশির সামনে ইসলামের ব্যাখ্যা তুলে ধরে এবং মুহাজির মুসলিমদের রক্ষার্থে জাফর ﷺ এভাবেই তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সফল হয়েছিলেন আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ বিন রবিআকে হাবশার মাটিতে ব্যর্থ করে দিতে। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

রাসুল ﷺ যখন হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন, তখন সাহাবিদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামি সমাজের ভিত্তি স্থাপনের কাজ শুরু করে দেন। সেই ধারায় জাফর ﷺ ও মুআজ বিন জাবাল ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দেন। তখন জাফর ﷺ হাবশায় অবস্থান করছিলেন।[১১০১]

অধিকাংশ ঐতিহাসিক জাফর ﷺ ও মুআজ বিন জাবাল ﷺ-এর মাঝের এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপনের কাজটি হয়েছিল রাসুল ﷺ-এর মদিনায় হিজরতের পরে বদর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত। অতঃপর বদর যুদ্ধের দিন মিরাসের আয়াত নাজিলের মাধ্যমে এই ভ্রাতৃত্বের অধিকার শেষ হয়ে যায়। জাফর ﷺ তখনও হাবশায় অবস্থান করছিলেন।[১১০২]

ষষ্ঠ হিজরিতে রাসুল ﷺ বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আমর বিন উমাইয়া দামরি ﷺ-কে প্রেরণ করেন।[১১০৩] এবং বাদশাহর প্রতি নির্দেশ দেন, উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান ﷺ-কে রাসুল ﷺ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে এবং তাঁকে-সহ হাবশার মুহাজিরদের মদিনায় পাঠিয়ে দিতে। বাদশাহ নাজ্জাশি জাফর ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুল ﷺ-এর সব নির্দেশ পালন করেন।[১১০৪]

সম্ভবত আমর বিন উমাইয়া দামরি ﷺ-কে রাসুল ﷺ প্রেরণ করেছিলেন ষষ্ঠ হিজরির শেষের দিকে। তিনি তাঁর বার্তাবাহকের কাজ শেষে সপ্তম হিজরির শুরুতে মদিনায় এসেছিলেন। কারণ জাফর ﷺ-এর নেতৃত্বে হাবশার

১১০১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/১২৪, আদ-দুরার : ৯৯ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ৯৬ পৃ., আল-ইসাবাহ : ১/২৪৮।
১১০২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৫।
১১০৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২৭৯, জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৯ পৃ.।
১১০৪. উসদুল গাবাহ : ৪/৮৬।

মুহাজিরগণ ফিরে এসেছিলেন খাইবার বিজয়ের পরপরই। আর খাইবার বিজয় হয়েছিল সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে।[১১০৫]

খাইবার বিজয়ের পর জাফর ﷺ হাবশা থেকে মদিনায় এসে পৌঁছলে রাসুল ﷺ তাঁকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খান।[১১০৬] এবং বলেন, 'ওয়াল্লাহি, আমি জানি না, আমি কোন কারণে বেশি খুশি হব, জাফরের আগমনে নাকি খাইবার বিজয়ের কারণে!'[১১০৭] অথবা বলেছেন, 'ওয়াল্লাহি, আমি জানি না, আমি বেশি খুশি হব জাফরের আগমনে নাকি খাইবার বিজয়ে!'[১১০৮] রাসুল ﷺ জাফর ﷺ-কে মসজিদের পাশে অবস্থান করতে দেন।[১১০৯] খাইবারের গনিমতে তাঁর অংশ দেন।[১১১০]

এভাবে জাফর ﷺ-এর দুটি হিজরত হয়, প্রথমে হাবশায় তারপর মদিনায়।[১১১১] মাতৃভূমি ছেড়ে দীর্ঘ ১৪ বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত করেন সুদূর হাবশায়। এরপর সপ্তম হিজরির শুরুতে মুসলিমদের প্রধান ঘাঁটি মদিনায় স্থায়ীভাবে ঠিকানা পান। হাবশায় এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মুহাজিরদের দায়িত্বশীল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশি ও হাবশার আরও অনেকে। অবশ্য অন্যদের হাতেও হাবশার অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

এখানে একটি কথা, বাদশাহ নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ তাঁর ইসলাম গ্রহণ একটি প্রমাণিত বিষয়। তাঁর ইনতিকালের খবর শুনে রাসুল ﷺ তাঁর গায়েবানা জানাজার সালাত পড়েন। এটা সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম ও সুনানে নাসায়িতে এসেছে।[১১১২]

১১০৫. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২১১ পৃ., আদ-দুরার : ২১৭ পৃ.।
১১০৬. আদ-দুরার : ২১৮ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৫।
১১০৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪১৪।
১১০৮. আদ-দুরার : ২১৮ পৃ.।
১১০৯. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৭।
১১১০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৫।
১১১১. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৭।
১১১২. ফাতহুল বারি বি-শারহিল বুখারি : ৩/৯২ এবং ৩/১৬৪; অধ্যায় : জানাজার চার তাকবির। সহিহ মুসলিম : ৩/৫৪; অধ্যায় : জানাজার তাকবির। সুনানুন নাসায়ি : ২/৩৩৭; অধ্যায় : জানাজার তাকবির।

ইসলামি ফিকহ ও অন্যান্য উৎসগ্রন্থেও এ ঘটনা এসেছে। আর গায়েবানা জানাজা কেবল মুসলিম ব্যক্তির ওপরই পড়া হয়। নাজ্জাশির যে বাদশার ওপর রাসুল ﷺ গায়েবানা জানাজা পড়েছেন, তাঁর নাম ছিল আসহামাহ।[১১১৩]

মুতার অভিযানে

অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে রাসুল ﷺ মুতা অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করেন। এ অভিযানের কারণ ছিল, বসরার বাদশাহর কাছে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে হারিস বিন উমাইর আজদি ﷺ-কে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি মুতা নামক স্থানে এসে যাত্রাবিরতি করলে শুরাহবিল বিন আমর গাসসানি তাঁকে হত্যা করে। তাঁকে ছাড়া রাসুল ﷺ-এর আর অন্য কোনো বার্তাবাহককে হত্যা করা হয়নি। এতে রাসুল ﷺ খুব মর্মাহত হন। এবং সাহাবিদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। সাহাবায়ে কিরাম দ্রুত মদিনার বাইরে জুরফ নামক স্থানে সেনাছাউনি ফেলেন। এবং তিন হাজারের বাহিনীর পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এরপর রাসুল ﷺ বললেন, 'বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে জাইদ বিন হারিসা, সে শহিদ হলে নেতৃত্ব দিবে জাফর বিন আবু তালিব, সে শহিদ হলে নেতৃত্ব দেবে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা। সেও শহিদ হলে মুসলিমরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা বানিয়ে নেবে।'

রাসুল ﷺ একটি সাদা ঝান্ডা প্রস্তুত করে জাইদ বিন হারিসা ﷺ-এর হাতে দিলেন। এরপর তাঁদের উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা হারিস বিন উমাইরের নিহত হওয়ার স্থানে গিয়ে সেখানের অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে তো ভালো। অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে।' রাসুল ﷺ মুসলিম বাহিনীর সাথে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। এবং সেখানে তাদের শেষ বিদায় জানালেন। মুসলিম বাহিনী চলা শুরু করলে বাকি মুসলিমগণ আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ তোমাদের থেকে অকল্যাণ দূরে রাখুন। গনিমতসহ সুস্থ নিরাপদে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন।'

১১১৩. আল-মুহাব্বার : ৭৬ পৃ., আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৭৭।

মুসলিম বাহিনী মদিনা থেকে বের হলে শত্রুরা তাদের অভিযানের খবর পেয়ে যায়। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা এক লাখের বেশি যোদ্ধা প্রস্তুত করে। তাদের নেতৃত্বে আসে শুরাহবিল বিন আমর। এবং তারা অগ্রগামী বাহিনীকে সামনে পাঠিয়ে দেয়।

মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার মুআন এলাকায় পৌছে জানতে পারেন, ওয়াইল, বকর, লাখম ও জুজাম গোত্র থেকে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে বালকার মাআব স্থানে স্বয়ং হিরাক্লিয়াস অবস্থান গ্রহণ করেছে।

মুসলিম বাহিনী মুআনে দুই দিন অবস্থান করে নিজেদের বিষয়ে ভাবতে থাকে। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে পত্র পাঠিয়ে অবস্থা সম্পর্কে জানাই। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ؓ রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দান করলেন। ফলে মুসলিম বাহিনী মুতা প্রান্তরের দিকে এগিয়ে যায়।

মুসলিমরা মুতা প্রান্তরে গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে মুশরিকরা এত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আর সৈন্যসামন্ত নিয়ে হাজির হয়েছে, যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারও নেই। তারপরও মুসলিম বাহিনী মুশরিকদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যায়।

জাইদ বিন হারিসা ؓ ঝান্ডা নিয়ে যুদ্ধে অবতরণ করলেন। তাঁর সাথে মুসলিমগণও যুদ্ধ করলেন। একপর্যায়ে যুদ্ধ করতে করতে তিনি বর্শার আঘাতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

এরপর জাফর ؓ এগিয়ে এসে ঝান্ডা তুলে নিলেন। এবং ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার পায়ের কব্জি কেটে দিলেন। ইসলামে এই প্রথম ঘোড়ার পায়ের কব্জি কেটে দেওয়া হয়। তিনি পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। এক রোমান সৈনিক তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে। তাঁর শরীরের অর্ধেক অংশে ৩০-এরও অধিক জখম পাওয়া যায়। শরীরের ওপরের অংশে দুই কাঁধ এবং দুই কাঁধের মাঝে ৯০টি তির ও তরবারির আঘাত লাগে। অপর বর্ণনামতে ৭২টি আঘাত লাগে।[১১১৪]

১১১৪. বিস্তারিত দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৮-৩৯।

তাঁর পরে ঝান্ডা ধারণ করেন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ। তিনিও লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। এরপর লোকেরা খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-কে কমান্ডার নির্বাচন করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে আনেন এবং সকলকে নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।[১১১৫]

এভাবেই জাফর ﷺ তাঁর রবের কাছে শহিদি আত্মা নিয়ে হাজির হন। রোম ও তার মিত্রবাহিনীর সাথে লড়াই করার সময় তিনি আবৃত্তি করেছিলেন :

> 'আহা! নয়নাভিরাম জান্নাতের কথা কী বলব, কত উত্তম ও সুপেয় তার ঠান্ডা পানীয়!
>
> রোমানদের শাস্তি ঘনিয়ে এসেছে, পরিবারপরিজন ছেড়ে যখন কাফির হয়ে মরছে।
>
> তাদের নাগালে পেলেই আঘাত করে বসব।'

জাফর ﷺ ডান হাতে ঝান্ডা ধারণ করেন। ডান হাত কেটে গেলে বাম হাতে ঝান্ডা তুলে নেন। বাম হাত কেটে গেলে দুই বাহু দিয়ে বুকের সাথে ঝান্ডা উঁচু করে ধরেন। এরপর তাঁকে শহিদ করে দেওয়া হয়।[১১১৬] রক্তে রঞ্জিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কিন্তু ইসলামের পতাকায় মাটি লাগতে দেননি। এরপর এক মুসলিম ঝান্ডা উঁচু করে ধরেন।

এমন অনন্য বীরত্ব, বিরল সাহসিকতা ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অল্প সময়ের জন্যই অস্তিত্বে আসে।

১১১৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৮-১৩০, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৫৫-৭৬৯, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪২৭-৪৪৭, জাওয়ামিউস সিরাহ : ২২০-২২৩ পৃ., আদ-দুরার : ২২২-২২৩ পৃ., ইবনুল আসির : ২/২৩৪-২৩৮, উয়ুনুল আসার : ২/১৫৩-১৫৬।
১১১৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৪৩৪।

ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন

বিশুদ্ধ মতানুসারে ইসলাম গ্রহণের সময় আলি ؓ-এর বয়স হয়েছিল ১১ বছর। বলা হয় ১০ বছর। আবার বলা হয় সাত বছর। তবে প্রথম মতটিই প্রমাণিত। কারণ রাসুল ﷺ-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স এটাই ছিল। এরপর তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে মক্কায় ১৩ বছর কাটান।[১১১৭] অর্থাৎ রাসুল ﷺ-এর হিজরতের সময় আলি ؓ-এর বয়স হয়েছিল ২৪ বছর।

জাফর ؓ আলি ؓ-এর চেয়ে ১০ বছরের বড় ছিলেন।[১১১৮] সে হিসেবে রাসুল ﷺ-এর হিজরতের সময় জাফর ؓ-এর বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর।

এরপর তিনি রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে মুতা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। তাই শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর।[১১১৯]

জাফর ؓ-এর সন্তানাদি : আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ও আওন। এদের মা হচ্ছেন আসমা বিনতে উমাইস ؓ। এরা সকলেই হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণের কিছুদিন পরে বাদশাহ নাজ্জাশির এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তখন বাদশাহ জাফর ؓ-এর কাছে এ বলে খবর পাঠায়, 'তোমার ছেলের নাম কী রেখেছ?' জাফর ؓ বলেন, 'আব্দুল্লাহ।' তখন বাদশাহ নাজ্জাশিও তার ছেলের নাম আব্দুল্লাহ রাখেন। আসমা ؓ বাদশাহ নাজ্জাশির ছেলেকে দুধ পান করানোর জন্য নিয়ে নেন এবং পূর্ণ সময় দুধ পান করান। এই সময়ে আসমা ؓ বাদশাহর মেহমান হিসেবে ছিলেন। তখন হাবশায় ইসলাম গ্রহণকারীরা আসমা ؓ-এর কাছে এসে তাদের খবরাখবর শোনাত। অবশেষে জাফর ؓ দুটি জাহাজে করে সাথিদের নিয়ে মদিনায় চলে আসেন। এবং মুতায় শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মদিনায় অবস্থান করেন।

আসমা ؓ-এর গর্ভে জাফর ؓ-এর তিন সন্তান হয়। তাদের মধ্যে মুহাম্মাদের বংশধারা শেষ হয় তার ছেলে কাসিমের ইনতিকালের মাধ্যমে। আওনের

১১১৭. মুকাতিলুত তালিবিন : ১৭ পৃ.।

১১১৮. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৭, আল-ইসতিআব : ১/২৪২, আল-ইসাবাহ : ১/২৪৮।

১১১৯. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত (১/১৪৯) গ্রন্থে আছে, মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। আর সিরাতু ইবনি হিশাম (৩/৪৩৬) গ্রন্থে আছে, মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর।

উত্তরসূরি ছিল, তবে তারা অপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আর আব্দুল্লাহ বিন জাফরের সন্তানদের মধ্যে আলি বিন আব্দুল্লাহর অনেক উত্তরসূরি হয়। এই আলির মা ছিলেন জাইনাব বিনতে আলি বিন আবু তালিব ﵁।[১১২০]

হামজা ﵁ শাহাদাত বরণের সময় এক কন্যাসন্তান রেখে যান। আলি ﵁ একবার দেখতে পেলেন লোকদের মাঝে হামজা ﵁-এর সেই কন্যা ঘোরাঘুরি করছে। তখন তিনি তার হাত ধরেন এবং ফাতিমা ﵂-এর কাছে সোপর্দ করেন। সে কন্যাসন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আলি ﵁ জাফর ﵁ ও জাইদ বিন হারিসা ﵁ বিবাদ শুরু করেন। এমনকি তাঁদের কথার আওয়াজে রাসুল ﷺ-এর ঘুম ভেঙে যায়। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'এদিকে আসো, আমি তোমাদের বিষয়ে ফায়সালা করে দিচ্ছি।' আলি ﵁ দাবি পেশ করে বললেন, 'সে আমার চাচার কন্যা। আমি তাকে মক্কা থেকে বের করে এনেছি। তাই আমি তাকে প্রতিপালনের বেশি হকদার।' জাফর ﵁ বললেন, 'সে আমার চাচার কন্যা। তার খালা আমার বিবাহে আছে।' জাইদ ﵁ বললেন, 'সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।' সবার কথা শুনে রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের দাবি ঠিক আছে।' এরপর তিনি জাফর ﵁-এর পক্ষে ফায়সালা দেন। এবং বললেন, 'খালা মায়ের মতো।' তখন জাফর ﵁ খুশিতে রাসুল ﷺ-এর চতুষ্পার্শ্বে পা ওঠানামা করে চক্কর দিতে থাকলেন। এটা দেখে রাসুল ﷺ বললেন, 'এটা আবার কী?' জাফর ﵁ বললেন, 'হাবশার লোকদের দেখেছি, তারা বাদশাহর সাথে এমন করে।' জাফর ﵁-এর স্ত্রী হলেন আসমা বিনতে উমাইস। হামজা ﵁-এর স্ত্রী হলেন সালমা বিনতে উমাইস।[১১২১]

তাঁদের বিতর্কের সময় রাসুল ﷺ জাফর ﵁-কে বলেছিলেন, 'তোমার গঠন-আকৃতি আমার গঠন-আকৃতির মতো হয়েছে। তোমার আখলাক-চরিত্র আমার আখলাক-চরিত্রের মতো হয়েছে।' অপর বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি আমার গঠন-আকৃতি ও আখলাক-চরিত্রের মতো হয়েছ।' আরেক বর্ণনায় আছে, 'তুমি

১১২০. বিস্তারিত দেখুন, জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৬৮-৬৯ পৃ., নাসবু কুরাইশ : ৮০-৮৩ পৃ.। দেখুন, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৪৯।
১১২১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/ ৩৫-৩৬। জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৩৭০ পৃ.।

আমার গঠন ও চরিত্রের সদৃশ।'[১১২২] জাফর ﷺ সেই কজনের মধ্যে ছিলেন, যারা গঠন ও আকৃতিতে রাসুল ﷺ-এর সাথে সাদৃশ্য রাখতেন।[১১২৩]

হামজা ﷺ-এর কন্যার নাম ছিল উমামাহ। রাসুল ﷺ তাকে আবু সালামা ﷺ-এর ছেলে সালামার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। রাসুল ﷺ যখন সালামা ﷺ-এর সাথে হামজা ﷺ-এর কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, 'সালামা, তোমাকে বদলা দেওয়া হলো তো?' অর্থাৎ সালামা ﷺ যে তাঁর মা উম্মে সালামাকে রাসুল ﷺ-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, তার বদলা হিসেবে রাসুল ﷺ হামজা ﷺ-এর মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন।[১১২৪]

জাফর ﷺ-এর শাহাদাত বরণের পর আসমা বিনতে উমাইস ﷺ-কে বিয়ে করেন আবু বকর সিদ্দিক ﷺ। আবু বকর ﷺ-এর ইনতিকালের পর তাঁকে বিয়ে করেন আলি ﷺ।[১১২৫]

যখন জাফর ﷺ-এর নিহতের খবর পৌঁছল, সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আম্মাজান আয়িশা ﷺ বলেন, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখতে পেলাম।[১১২৬] রাসুল ﷺ জাফর ﷺ-এর পরিবারকে শোক করার জন্য তিন দিন অবকাশ দেন। এরপর তাদের কাছে এসে বললেন, 'আজকের পরে আমার ভাইয়ের জন্য কেঁদো না।' এরপর বললেন, 'আমার ভাইয়ের সন্তানদের আমার কাছে নিয়ে আসো।' আব্দুল্লাহ বিন জাফর ﷺ বলেন, 'আমাদের নিয়ে আসা হলো, কেমন যেন আমরা তখন মুরগির বাচ্চার মতো হয়ে গিয়েছিলাম।' রাসুল ﷺ বললেন, 'নাপিত ডেকে আনো।' নাপিত ডেকে এনে আমার মাথা ন্যাড়া করা হলো। এরপর রাসুল ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি জাফরের পরিবারের অভিভাবক হয়ে যান এবং আব্দুল্লাহর উপার্জনে বরকত দান করুন।' এ দুআটি তিনবার করলেন। এরপর আসমা ﷺ এসে তার সন্তানদের এতিম হওয়ার অভিযোগ করলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি তাদের ব্যাপারে ভয় করছ; অথচ দুনিয়া-আখিরাতে আমি তাদের অভিভাবক।'[১১২৭]

১১২২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৬।
১১২৩. তাঁদের নাম দেখুন, আল-মুহাব্বার : ৪৬-৪৭ পৃ.।
১১২৪. আল-মুহাব্বার : ১০৭ পৃ.।
১১২৫. আল-মুহাব্বার : ৪৪২-৪৪৩ পৃ.।
১১২৬. আল-ইসাবাহ : ১/২৪৯।
১১২৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৭।

রাসুল ﷺ জাফর ﷺ-এর জন্য দুআ করলেন এবং বললেন, 'তোমাদের ভাই জাফরের জন্য দুআ করো। নিশ্চয় সে শহিদ। অবশ্য সে জান্নাতে প্রবেশ করে তার ইয়াকুত পাথরের দুই ডানার ওপর ভর করে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছে।'[১১২৮]

আব্দুল্লাহ বিন জাফর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমার স্মরণ আছে, যখন রাসুল ﷺ আমার মায়ের কাছে এসে আমার বাবার মৃত্যুর সংবাদ জানালেন—আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম—তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে দাড়ি দিয়ে টপকিয়ে পড়ছিল। এরপর বললেন, "হে আল্লাহ, জাফর আমার কাছে উত্তম প্রতিদান পেশ করেছে। অতএব তাঁর অবর্তমানে আপনি তাঁর পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করুন। আপনার কোনো বান্দার পরিবারের যেমন দেখাশোনা করেন, তার চেয়ে জাফরের পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করুন।" এরপর বললেন, "হে আসমা, আমি কি তোমাকে আনন্দিত করব না?" আসমা ﷺ বললেন, "অবশ্যই, আপনার প্রতি আমার বাবা-মা উৎসর্গ হোক!" রাসুল ﷺ বললেন, "আল্লাহ তাআলা জাফরকে দুটি ডানা দান করেছেন। সে ডানায় ভর করে জান্নাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" আসমা ﷺ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনার ওপর আমার বাবা-মা উৎসর্গ হোক, এটা তাহলে লোকদের জানিয়ে দিন।" তখন রাসুল ﷺ আমার হাত ধরে উঠে গেলেন। মিম্বারে উঠে আমাকে তাঁর সামনে দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসালেন। তাঁর চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছিল। কথার একপর্যায়ে বললেন, "মানুষ তার আপন ভাই ও চাচাতো ভাইদের নিয়ে আধিক্য লাভ করে। শুনুন, জাফর শহিদ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুটি ডানা দান করেছেন। ডানায় ভর করে সে জান্নাতে বিচরণ করছে।" এরপর রাসুল ﷺ মিম্বার থেকে নেমে ঘরে প্রবেশ করলেন। সাথে আমাকেও নিয়ে গেলেন। আমার পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে বললেন। সাথে আমার ভাইয়ের কাছে খবর পাঠালেন। আমরা তাঁর কাছে সকালের খাবার খেলাম। সুবহানাল্লাহ! সে খাবার অনেক উত্তম ছিল। সালমা ﷺ গম পিষে আটা করে এরপর তেল দিয়ে অনেক সুস্বাদু করে রান্না করেছিলেন। তার ওপর দিয়েছিলেন মরিচ। রাসুল ﷺ-এর সাথে আমি ও আমার ভাই খেয়ে নিলাম।

১১২৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৮।

রাসুল ﷺ তাঁর যে স্ত্রীর কাছে যেতেন, আমরাও তাঁর সাথে সে ঘরে যেতাম। এভাবে আমরা সেখানে তিন দিন অবস্থান করে বাড়িতে ফিরে আসি।'[১১২৯]

সহিহ বুখারিতে এসেছে, 'আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ যখন জাফর ﷺ-এর ছেলেকে সালাম দিতেন, তখন এভাবে সালাম দিতেন, "আস-সালামু আলাইকা ইয়া ইবনা জিল জানাহাইন।"'[১১৩০] অর্থাৎ হে দুই ডানাবিশিষ্ট ব্যক্তির ছেলে, আস-সালামু আলাইকুম। কারণ মুতার যুদ্ধে জাফর ﷺ-এর দুই হাত কেটে যায়; কিন্তু তিনি ইসলামের ঝান্ডা মাটিতে পড়তে দেননি। তাই রাসুল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাঁকে দুটি ডানা দান করেছেন। তাতে ভর করে সে জান্নাতে বিচরণ করছে।"'[১১৩১]

রাসুল ﷺ জাফর ﷺ-এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসকে জাফর ﷺ-এর শাহাদাতের সংবাদ দিলেন, তখন আসমা ﷺ চিৎকার দিয়ে উঠলেন। নারীরা তাঁর পাশে জমা হলো। ফাতিমা ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে এ বলে কাঁদতে লাগলেন, 'ও আমার চাচাজান!' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'এমন জাফরের প্রতি ক্রন্দনকারীরা যেন কাঁদে।' জাফর ﷺ-এর মৃত্যুতে রাসুল ﷺ অনেক চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরিবারের কাছে ফিরে এসে বললেন, 'তোমরা জাফরের পরিবারের (খাবারের) কথা ভুলে যেও না। কারণ তারা এখন শোকে শোকাহত।'[১১৩২] তাঁরা জাফর ﷺ-এর পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করেন। রাসুল ﷺ আসমা ﷺ-কে উপদেশ দেন, 'অশালীন কথা বলো না এবং বুক চাপড়িয়ো না।'[১১৩৩]

জাফর ﷺ-এর ছিল সুপ্রসিদ্ধ অনেক ভূমিকা, অনেক প্রশংসিত অবস্থান, সঠিক সুন্দর জবাব এবং সৎ ও উত্তম জীবনাচার। তাঁর সম্পর্কে আবু হুরাইরা ﷺ বলেছেন, 'রাসুল ﷺ-এর পরে জাফর বিন আবু তালিবের চেয়ে কেউ উত্তম জুতা ও মোজা পরিধান করেনি, উত্তম কোনো সওয়ারিতে আরোহণ করেনি এবং উত্তম কোনো পোশাকও পরিধান করেনি।' এটা বলে আবু হুরাইরা ﷺ তাঁর দয়া-দক্ষিণার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। আর দ্বীনি ক্ষেত্রে তাঁর

১১২৯. নাসবু কুরাইশ : ৮১-৮২ পৃ.।
১১৩০. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৪৯, আল-ইসাবাহ : ১/২৪৯।
১১৩১. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৮।
১১৩২. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৯।
১১৩৩. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৮০।

মর্যাদার কথা তো সবার জানা, আবু বকর সিদ্দিক ﷺ, উমর বিন খাত্তাব ﷺ ও উসমান বিন আফফান ﷺ তাঁর চেয়ে উত্তম ছিলেন। আলি ﷺ তাঁর সমান ছিলেন অথবা তাঁর চেয়ে উত্তম ছিলেন। দয়া-দক্ষিণার ক্ষেত্রে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আবু হুরাইরা ﷺ। তাঁর প্রমাণ হলো, আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত ইমাম বুখারি ﷺ-এর এই হাদিস :

وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا العُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا

'জাফর বিন আবু তালিব ছিলেন মিসকিনদের জন্য উত্তম মানুষ। তিনি আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াতেন। এমনকি তিনি আমাদের সামনে ঘিয়ের থলি বের করে দিতেন। যেখানে কিছুই থাকত না। আমরা সেটাকে ফাটিয়ে যা পেতাম, তা চেটে খেয়ে নিতাম।'[১১৩৪]

এ হাদিসটি ইমাম বুখারি ﷺ একক সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১১৩৫] সুতরাং বোঝা গেল, জাফর ﷺ বাস্তবিকই একজন দানশীল লোক ছিলেন।[১১৩৬] ইমাম বাগাবি ﷺ বর্ণনা করেছেন, আবু হুরাইরা ﷺ বলতেন, 'জাফর ﷺ মিসকিনদের ভালোবাসতেন। মিসকিনদের পাশে বসে তাদের খিদমত করতেন, আবার তারাও তাঁর খিদমত করত। তারা একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলত। রাসুল ﷺ তাঁকে মিসকিনদের পিতা বলে ডাকতেন।'[১১৩৭]

জাফর ﷺ যখন দুটি জাহাজে করে মুসলিমদের সাথে নিয়ে হাবশা থেকে খাইবারে রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলেন, তখন রাসুল ﷺ সেই মুহাজিরদের খাইবারের গনিমত থেকে অংশ দিলেন। কিন্তু এরা ছাড়া অন্য কোনো

১১৩৪. সহিহুল বুখারি : ৩৭০৮।
১১৩৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/২৫৬-২৫৭।
১১৩৬. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৪৮।
১১৩৭. আল-ইসাবাহ : ১/২৪৮।

মুহাজিরকে গনিমতের অংশ দেননি, যারা খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।[১১৩৮] জাফর ﵁-এর অংশের পরিমাণ ছিল প্রতি বছর ৫০ ওয়াসাক।[১১৩৯]

'আল-মুখতাসার' ও 'আল-মুহাজ্জাব' গ্রন্থের কয়েক জায়গায় জাফর ﵁-এর আলোচনা এসেছে। যেমন : ইদের সালাতে তাকবির অধ্যায়, শোক প্রকাশ অধ্যায়, তালাকের ক্ষেত্রে শর্ত অধ্যায় এবং লালনপালন অধ্যায়ে।[১১৪০] তাঁর সূত্রে রাসুল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ, তাঁর পরিবারের আরেকজন, উম্মে সালামা, আমর ইবনুল আস ও ইবনে মাসউদ ﵁। তাঁর ছেলের সূত্রে ইমাম নাসায়ি ﵀ তাঁর থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১১৪১]

আব্দুল্লাহ বিন জাফর ﵁ বলেন, 'আলি ﵁-এর কাছে আমি কিছু চাইলে যদি না দিতেন, তাহলে বলতাম, জাফরের হক হিসেবে দিন। তখন তিনি না দিয়ে পারতেন না।'[১১৪২]

আলি ﵁ বলতেন, 'রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমার পূর্বে এমন কোনো নবি অতিবাহিত হননি, যাঁকে সাতজন সম্ভ্রান্ত সাহায্যকারী বন্ধু দেওয়া হয়নি। আর আমাকে দেওয়া হয়েছে ১৪ জন।" এরপর তিনি তাঁদের নাম বললেন। তাঁদের মধ্যে জাফর ﵁-এর নামও উল্লেখ করলেন।[১১৪৩]

তিনি রাসুল ﷺ-এর হাওয়ারিদের একজন ছিলেন। সেই সঙ্গীগণ হলেন আবু বকর, উমর, আলি, হামজা, জাফর, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, উসমান বিন আফফান, উসমান বিন মাজউন, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ও জুবাইর ইবনুল আওয়াম ﵁। একটি দুর্বল মতানুসারে জুবাইর ইবনুল আওয়াম ﵁ একাই রাসুল ﷺ-এর বিশেষ সঙ্গী ছিলেন।[১১৪৪]

১১৩৮. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৪৮।
১১৩৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৪১।
১১৪০. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৪৮।
১১৪১. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/৯৮, খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ৬৩ পৃ.।
১১৪২. আল-ইসাবাহ : ১/২৪৮, আল-ইসতিআব : ১/২৪৪, উসদুল গাবাহ : ১/২৮৯।
১১৪৩. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৭-২৮৮।
১১৪৪. আল-মুহাব্বার : ৪৭৪ পৃ.।

মৃত্যুর পরে তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস সত্যই বলেছেন, 'আরবে তাঁর চেয়ে আমি উত্তম কোনো যুবক দেখিনি এবং আবু বকরের চেয়ে উত্তম কোনো প্রৌঢ় ব্যক্তি দেখিনি।'[১১৪৫]

জাফর ﷺ-এর সম্মান ও মর্যাদা অনেক উচ্চ এবং প্রসিদ্ধ।[১১৪৬]

কমান্ডার হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন

সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে খাইবারের যুদ্ধের পরপরই তিনি হাবশার হিজরত থেকে আবারও হিজরতের পথে মদিনায় চলে আসেন। যে কথা আমরা আগেও বলেছি।

এরপরে অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হাবশা থেকে এসে মুতার যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি এক বছর তিন মাস রাসুল ﷺ-এর সাথে কাটান। এ সময়ে কিছু অভিযান ও উমরাতুল কাজা ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি।

এরপরে আসে মুতার অভিযান। এটি ছিল রাসুল ﷺ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। কারণ এটি হয়েছিল সিরিয়ার ভূমিতে রোমান এবং তাদের আরবের মুশরিক ও খ্রিষ্টান মিত্রদের বিরুদ্ধে। এ অভিযানটি প্রথমবারের মতো সে সময়ের বিশ্বের দুই পরাশক্তির এক শক্তির মোকাবিলায় হয়েছিল। সেই সাথে এটি ছিল নিজস্ব অঞ্চলের বাইরে মোকাবিলার অভিযান। এ কারণে রাসুল ﷺ পূর্ণ মনোযোগের সাথে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এ অভিযানে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এর নেতা হিসেবে নিয়োগ দেন জাইদ বিন হারিসা, জাফর বিন আবু তালিব ও আবুদল্লাহ বিন রওয়াহার মতো যোগ্যতর কমান্ডারদের।

জাফর ﷺ রাসুল ﷺ-এর সাথে এত অল্প সময় কাটানো সত্ত্বেও মুতার মতো এত বড় গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের কমান্ডার হয়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনি রোমান ও তাদের মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিমদের এই বিরাট যুদ্ধে অংশগ্রহণ

১১৪৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৪১।

১১৪৬. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৪৯।

করেছেন। এই যুদ্ধই পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের জন্য জাজিরাতুল আরবের বাইরে গিয়ে সিরিয়ার অঞ্চলগুলো বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

মুতা অভিযানের পরিণতি যা-ই হোক না কেন, তার ফলাফল ও প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ রোমানরা এ অভিযানকে একটি গতানুগতিক সাধারণ অভিযান হিসেবে দেখেছিল। অথচ বাস্তবে সে অভিযান ছিল এক নতুন আঙ্গিকে, যার গুরুত্ব রোমানরা বুঝতে পারেনি। এটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক সুশৃঙ্খল যুদ্ধ। যা মুসলিমদের সিরিয়ার অঞ্চল বিজয়ের জন্য গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছিল।

এর পরের বছর অর্থাৎ নবম হিজরিতে রাসুল ﷺ নিজেই তাবুকের যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং মুসলিমদের শক্তি প্রদর্শন করে বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসেন।

মুতা অভিযান ও তার যুদ্ধের গুরুত্ব এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুসলিমদের ওপর তার মূল্যায়নকে রাসুল ﷺ অত্যন্ত গভীরভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। এ কারণে সে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সেরা ও উৎকৃষ্ট তিনজন কমান্ডারের ওপর। প্রথমজন শাহাদাত বরণ করলে দ্বিতীয়জন কমান্ডের দায়িত্ব নেবে। দ্বিতীয়জন শাহাদাত বরণ করলে তৃতীয়জন দায়িত্ব নিয়ে নেবে। তৃতীয়জনও শাহাদাত বরণ করলে কমান্ডের দায়িত্ব নেবে তাঁদেরই নির্বাচিত একজন। অথচ মুতা অভিযানের পূর্বে এবং পরে অন্য কোনো অভিযানে রাসুল ﷺ এভাবে একের অধিক কমান্ডার নির্ধারণ করেননি। কিন্তু এই যুদ্ধের ঝুঁকি ও গুরুত্বের প্রতি রাসুল ﷺ-এর মূল্যায়ন ও তাঁর দূরদৃষ্টিই তাঁকে এক অভিযানে তিনজন কমান্ডার নির্ধারণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এটি তাঁর সামরিক জীবনে মাত্র একবারই হয়েছিল। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তা সত্যে পরিণত করেছিল। মুসলিম বাহিনী কার্যত পরাজয় বরণ করলেও সার্বিক বিবেচনায় কিন্তু ঠিকই জয় লাভ করেছিল। এবং রোমানদের মনোবলে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

আর এটা জানা কথা যে, প্রভাবগত এই বিজয়ের বিবেচনায় বাহ্যিক পরাজয় কিছুই নয়।

মুতার মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে জাফর ﷺ-কে নেতৃত্ব দেওয়া প্রমাণ করে তিনি ছিলেন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অনন্য কমান্ডার।

জাফর ﷺ-এর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি বের করা কোনো কঠিন বিষয় নয়। তিনি ছিলেন সেই গভীর ইমানের অধিকারী কমান্ডারগণের একজন, যাঁরা আকিদার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করাকে মহা সফলতা মনে করতেন।

জাইদ বিন হারিসা ﷺ-এর শাহাদাতের পরে যখন তিনি মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে নিলেন, তখন নিশ্চিতভাবেই জানতেন, তিনি এখন শাহাদাতের পথেই হাঁটছেন। তাই পেছনে না তাকিয়ে বুক টান করে বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন। এটা তাঁর অনন্য বীরত্বের প্রমাণ, যার প্রকাশ সচারচর ঘটে না। বরং তা কেবল গভীর ইমান ও সুদৃঢ় আকিদাধারী সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদদের মাঝেই থাকে।

তিনি ছিলেন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন, স্পষ্ট ভাষী এবং জ্বলন্ত প্রতিভার অধিকারী। যা তাঁকে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করত।

তিনি ছিলেন সুদৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী। যত্নের সাথে দায়িত্ব আদায় করতেন, কখনো দায়িত্ব থেকে পলায়ন করতেন না। কিংবা অন্য কারও ঘাড়ে তুলে দিতেন না।

তাঁর ছিল এমন মানসিক শক্তি, যা জয়-পরাজয় কোনো অবস্থায় পরিবর্তন হতো না। বিপদাপদ ও কষ্ট-ক্লেশে অবিচল থাকত। তাকদির ও আল্লাহর ফায়সালার প্রতি ইমানই তাঁকে এ অবস্থায় উন্নীত করেছিল।

তিনি তাঁর সৈনিকদের মানসিক অবস্থা এবং সক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। ফলে প্রত্যেককেই তার যোগ্যতা ও সক্ষমতা অনুসারে দায়িত্ব দিতেন।

সৈনিকদের প্রতি তাঁর ছিল আত্মবিশ্বাস এবং তাঁর প্রতিও ছিল সৈনিকদের আত্মবিশ্বাস। তিনি রাসুল ﷺ ও সাহাবিদেরও আস্থার পাত্র ছিলেন। সৈনিকদের প্রতি তাঁর ছিল ভরসা ও ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতিও ছিল সৈনিকদের ভরসা ও ভালোবাসা।

তাঁর ছিল প্রভাবসম্পন্ন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। সহজেই সৈনিকদের সুশৃঙ্খল রেখে তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারতেন। তিনি নিজেও ছিলেন আনুগত্যশীল ব্যক্তি, যা তাঁর কাজকর্মে অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হিসেবে প্রতিফলিত হতো।

দ্বীনে হানিফের খিদমতে বংশসূত্রে ছিলেন শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও মাননীয় ব্যক্তি।

যুদ্ধের নীতিতে ছিলেন পূর্ণ অভিজ্ঞ। টার্গেট নির্ধারণ করতে এবং তা বাস্তবায়নে অটল থাকতেন। আক্রমণাত্মক আক্রমণকে যুদ্ধের মূল নীতি হিসেবে গণ্য করতেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতেন পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং ব্যয় করতেন মধ্যম পন্থায়। নিরাপত্তার নীতি ফলো করতেন কঠোরভাবে। সৈনিকদের মানসিক অবস্থা চাঙা রাখতেন সর্বদা। এবং প্রশাসনিক বিষয়াদির প্রতি খেয়াল রাখতেন পূর্ণ মনোযোগের সাথে।

এ অভিযানে তিনি আকস্মিক আক্রমণের নীতি ফলো করেননি। কারণ ওই পরিস্থিতিতে আকস্মিক আক্রমণ করা খুব কঠিন ছিল। যেহেতু রাসুল ﷺ-এর বার্তাবাহককে হত্যার পরে শত্রুরা আগে থেকে মুসলিমদের আক্রমণের আশঙ্কায় ছিল। কারণ বার্তাবাহককে হত্যার পরে চুপ থাকা যে কারও পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। যেহেতু ইতিপূর্বে কোনো বার্তাবাহককে হত্যা করা হয়নি। এমনকি কি মরুভূমিতে বাসকারী আরব গোত্রদের মাঝেও বার্তাবাহককে সম্মান করার রীতি প্রচলন ছিল। অথচ তারা নগরসভ্যতা থেকে দূরে অবস্থান করত।

তিনি ছিলেন একজন সেরা কমান্ডার। তাঁর প্রশংসার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি আকিদা এবং নেতৃত্বে রাসুল ﷺ-এর বিদ্যাপীঠ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

বার্তাবাহক হিসেবে মূল্যায়ন

বার্তাবাহক হিসেবে জাফর ؓ-এর বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল একেবারেই সুস্পষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যাবলি তাঁকে হাবশার বাদশাহর কাছে রাসুল ﷺ-এর বার্তা পৌছাতে উপযুক্ত করেছে এবং যোগ্য করে তুলেছে হাবশার মাটিতে ইসলামের দাওয়াতের দায়িত্ব আদায়ে। ফলে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে বাদশাহসহ হাবশার অনেক মানুষ। সেই বৈশিষ্ট্যবলে তিনি কুরাইশের চতুর বার্তাবাহকদের কূটচাল রুখে দিয়ে হাবশার মাটিতে মুহাজিরদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

অথচ কুরাইশ বার্তাবাহকদের কাছে বাদশাহ ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের জন্য কত হাদিয়া-তোহফাই না ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিমদের কাছে বাদশাহর জন্য না ছিল কোনো হাদিয়া, না ছিল কোনো প্রাচুর্যগত অবস্থান। তিনি সেখানে কষ্ট, দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের মাঝে দিন কাটাচ্ছিলেন।

অনুরূপ তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলি তাঁকে মুহাজির মুসলিম ও হাবশার নতুন মুসলিমদের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছিল। হাবশায় যতদিন অবস্থান করেছিলেন, ততদিন তিনি হাবশার সকল মুসলিমের আমির ছিলেন। অবশেষে মদিনায় এসে রাসুল ﷺ-এর সাথে মিলিত হন। কত বিশ্বস্ত এবং শক্তিশালী বার্তাবাহক ছিলেন জাফর বিন আবু তালিব ؓ! কত প্রজ্ঞাবান দায়ি ছিলেন তিনি! কী যে নির্ভীক প্রতিরক্ষাকারী ছিলেন মুসলিমদের জন্য! কী যে যোগ্য অভিজ্ঞ কমান্ডার ছিলেন তিনি!

তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্য হতে প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল ইমান ও ইসলাম। ইসলামের সাথে ছিল তাঁর গভীর ও মজবুত সম্পর্ক। তিনি ছিলেন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা সূচনাতেই ইসলামের রশি গলায় জড়িয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁর গভীর ইমানের প্রমাণ হচ্ছে, স্বীয় আকিদার কারণে পরিবার-পরিজন ও ভিটেমাটি ছেড়ে দূর হাবশায় হিজরত এবং কঠোর পরিবেশে সামান্য জীবিকার মাঝে দীর্ঘ পরদেশি জীবনে উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করা। তাঁর ইমান ও ইসলামই তাঁকে দ্বীনি ভাইদের দেখাশোনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফলে নিজের পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করতে গিয়ে কোনো অবস্থাতে তাঁদের দেখাশোনায় ভাটা পড়ত না। নতুন জীবনে তাঁদের সাথে এতটা সামঞ্জস্য রেখে চলেছিলেন যে, ভিনদেশে সেখানকার সমস্যা তাঁদের জন্য লঘু হয়ে দেখা দিয়েছিল। এটা হয়েছিল তাঁদের মাঝে পারস্পরিক পূর্ণ আস্থার কারণে। ফলে তিনি তাঁদের জন্য ছিলেন পিতা, ভাই, কমান্ডার এবং আমির।

অনুরূপ ইসলামের সাথে তাঁর নিরঙ্কুশ সম্পর্ক এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছিল সমাজের মাঝে একক ও সমষ্টিগতভাবে আদর্শগত সামঞ্জস্যতা। সীমাহীন ফলাফল অর্জনে সহায়তা করেছিল এই আদর্শগত সামঞ্জস্যতা।

কুরাইশ ছিল গোটা আরবের বিশুদ্ধ ভাষী। কুরাইশের মাঝে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী ছিল হাশিমি গোত্র। কুরাইশ প্রতিনিধি আমর বিন আস ও তার সাথির উপস্থিতিতে বাদশাহ নাজ্জাশির সামনে মুসলিমদের সমস্যা উপস্থাপন করাই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী এবং মিষ্টভাষী হওয়ার উত্তম দলিল।

তাঁর উপস্থাপনভঙ্গি ছিল সাবলিল ও সহজ সরল। যা বুঝতে কারও জন্য কষ্ট হতো না। কিন্তু এমন উপস্থাপন পেশ করা ছিল দুই-একজন ছাড়া যে কারও পক্ষে কষ্টকর বিষয়।

তিনি ছিলেন দ্বীনের আলিম। কুরআনে যা নাজিল হতো, তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন। এবং ইসলামের দলিল হিসেবে সাথিদের তিলাওয়াত করে শোনাতেন। তা প্রশ্ন উত্থাপনকারীর জন্য হতো সুস্পষ্ট জবাব।

তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। অসহায় লোকদের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।[১১৪৭] রাসুল ﷺ-এর পরে আরোহণে, পোশাক-আশাকে ও বেশভূষায় তাঁর চেয়ে উত্তম কেউ ছিল না।[১১৪৮] রাসুল ﷺ বলেছেন, 'হে জাফর, তুমি তো গঠনে এবং আখলাকে আমার সাদৃশ্য গ্রহণ করেছ।'[১১৪৯] রাসুলের এ উক্তি তাঁর উত্তম আখলাকের জ্বলন্ত প্রমাণ।

বার্তাবাহককে সফল হতে উত্তম আখলাকের মতো অন্য কোনো বস্তু নেই। কারণ উত্তম আখলাক মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। এবং মানুষকে নিজের পাশে জড়ো করে। বার্তাবাহকের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে। এতে সে বিনা কষ্টে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারে।

জাফর ﵁ ও তাঁর সাথে অন্যান্য মুহাজির মুসলিমগণ অবশ্যই সেখানে শরণার্থী হিসেবে ছিলেন। কিন্তু বাদশাহ যখন নিশ্চিত হতে পারলেন যে, তাঁরা হকের ওপর আছে, তাঁদেরকে নিজ দেশ থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে, তখন বাদশাহ তাঁদের প্রতি পূর্ণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। রক্ষা করলেন কুরাইশদের হাত থেকে। পর্যায়ক্রমে জাফর ﵁-এর অবস্থার উন্নতি হলো।

১১৪৭. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৮।
১১৪৮. উসদুল গাবাহ : ১/২৮৭।
১১৪৯. মুকাতিলুত তালিবিন : ১২ পৃ., উসদুল গাবাহ : ১/২৮৭।

এমনকি স্বয়ং বাদশাহও একজন খাঁটি মুসলিমে পরিণত হলেন। অবশেষে বাদশাহর সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে মুসলিমগণ সসম্মানে নিজ দেশে ফিরে আসেন। এই উত্তম অবস্থা থেকে অতি উত্তম অবস্থায় উন্নীত হওয়া কেবল মুসলিমদের উত্তম আখলাকের ফলে হয়েছিল। বিশেষত জাফর ﷺ-এর উত্তম আখলাক।

জাফর ﷺ ছিলেন ধৈর্যশীল ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তাঁর উত্তম ধৈর্য প্রকাশ পেয়েছিল মক্কা থেকে হাবশায় হিজরতের পথের বিপদাপদে এবং মুশরিকদের সমাজ থেকে পলায়নে। যারা কিনা ইসলাম ও মুসলিমদের ঘোর দুশমনে পরিণত হয়েছিল। এবং যেখানে যেভাবে ইচ্ছা মুসলিমদের কষ্ট দেওয়ার জন্য মক্কায় আটক রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিল। যাতে কোনোভাবে মুসলিমরা তাদের অত্যাচার আর জুলুম থেকে বাঁচতে না পারে। কুরাইশ মুশরিকরা মুহাজির মুসলিমদের হিজরত থেকে নিবৃত্ত রাখতে পশ্চাদ্ধাবন করে বেড়াত। যে মুহাজিরদের নাগালে পেত, তাঁদের নির্যাতন করতে সামান্যতম কমতি করত না।

জাফর ﷺ-এর উত্তম ধৈর্য প্রকাশ পেয়েছিল ভিটেমাটি ও আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে সুদূর হাবশায় প্রবাসজীবনে। যা দীর্ঘ হয়েছিল ১৪ বছরের বেশি সময় ধরে। এমনই তাঁর উত্তম ধৈর্য প্রকাশ পেয়েছিল কুরাইশের দূতদ্বয় এবং তাদের পক্ষীয় নাজ্জাশির ঘনিষ্ঠ লোকদের আক্রমণ ঠেকানোর সময়ে। মুসলিমদের প্রতি যাদের অবস্থান ছিল মারমুখী।

তিনি বাস্তবেই এক দুর্বিষহ কষ্টে পড়ে গিয়েছিলেন। যার মোকাবিলা করেছিলেন সবরে জামিলের মাধ্যমে। তা অতিক্রম করেছিলেন অনেক কষ্টে হৃদয়গ্রাহী সফল বক্তব্যের মাধ্যমে।

তাঁর প্রজ্ঞা সম্পর্কে বলতে হয়, নাজ্জাশি ও তাঁর সভাসদদের সামনে কুরাইশ দূত আমর ইবনুল আস ও তার সাথির মোকাবিলায় তাঁর প্রজ্ঞা জ্বলে উঠেছিল। অথচ আমর ছিল আরবের হাতে গোনা কয়েকজন লোকের মধ্যে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সাথে ছিল বাদশাহর সভাসদদের জন্য উপহারসামগ্রী। কিন্তু জাফর ﷺ-এর প্রজ্ঞা ও বিদগ্ধ কথামালা আমরের সব আশা-ভরসাকে শেষ করে দিয়েছে। তার ও তার পক্ষীয় বাদশাহর সভাসদদের কূটচাল বানচাল

করে দিয়েছিল। ফলে কূটচাল কূটচালকারীর ওপরই গিয়ে পতিত হয়েছিল। বাতিলের ওপর সত্যের বিজয় হয়েছিল। সত্য এসেছিল, বাতিল হয়েছিল দূরীভূত। আর বাতিল তো দূরীভূত হওয়ারই ছিল।

এই বিস্ময়কর বিতর্কে জাফর ﷺ-এর ভূমিকা কোনো অবস্থাতেই সহজ ছিল না।

জাফর ﷺ-এর ছিল বিস্ময়কর প্রতিভা। এ কারণেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুকৌশলী। হাবশায় হিজরতের পর থেকে মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত যতবারই তাঁকে দুর্যোগ আর জটিলতা ঘিরে ধরেছে, ততবারই তিনি তাঁর সমস্যার জন্য বের করে নিতেন উপযুক্ত সমাধান এবং তা থেকে উত্তরণের সহজ পথ।

তিনি ছিলেন লাবণ্যময় সৌন্দর্যের অধিকারী। তাঁকে দেখলে সম্মান ও শ্রদ্ধায় চোখ জ্বলজ্বল করে উঠত। রাসুল ﷺ তো তাঁর সম্পর্কে বলেছেনও, 'তোমার গঠন আমার গঠনের মতো হয়েছে, তোমার আখলাক আমার আখলাকের মতো হয়েছে।' দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি আমার আকার-আকৃতি এবং আখলাকের সাদৃশ্য পেয়েছ।' তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি আমার আকৃতি ও আখলাকের মতো।'

এটা জানা কথা যে, জাফর ﷺ ছিলেন লাবণ্যময় সৌন্দর্যের অধিকারী। তাই তো তাঁকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসের বিবরণ এমনই চমৎকার ছিল। 'গোটা আরবে জাফরের চেয়ে উত্তম কোনো যুবক আমি দেখিনি।' আর এ কথা তিনি তাঁর শাহাদাত বরণের পরে অন্য স্বামীর ঘরে গিয়ে বলেছিলেন।

জাফর ﷺ নববি বার্তার বৈশিষ্ট্যাবলির ধারক ছিলেন। গভীর ইমান, নিরেট ইসলাম, উচ্চাঙ্গ বাগ্-বিশুদ্ধতা, সুদৃঢ় জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, উত্তম ধৈর্য, বিরল প্রজ্ঞা এবং এমন সুকৌশল, যার মাধ্যমে সংকট ও জটিলতাকে সহজ করে ফেলতেন এবং এমন লাবণ্যময় সৌন্দর্য, যা বিবেক-বুদ্ধিকে তাক লাগিয়ে দিত।

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি তাঁর দায়িত্বে সফল হয়েছিলেন। যেমন সফল হয়েছিলেন তাঁর অন্য জিম্মাদারিতেও।

তিনি সূচনাযুগে ইসলাম কবুল করেছিলেন, আরকাম বিন আবু আরকামের বাড়িতে প্রবেশ করার আগে।

তিনি দুটি হিজরত করেছেন, প্রথম হিজরত হাবশায়, দ্বিতীয় হিজরত মদিনায়। হাবশা থেকে তিনিই সবার শেষে মদিনায় ফিরে এসেছিলেন। হাবশায় হিজরতের পর থেকে মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে হাবশার মুহাজিরদের আমিরুল মুমিনিন বলা হতো।

তিনি ইসলামে প্রথম নববি বার্তাবাহক। তিনিই সর্বপ্রথম রাসুল ﷺ-এর বার্তা নিয়ে বাদশাহর কাছে গিয়েছিলেন। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশি তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করেছিলেন, যেমন ইসলাম কবুল করেছিল হাবশার সাধারণ জনতা।

বাদশাহর সামনে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষায় সন্তোষজনক বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ফলে বাদশাহ নাজ্জাশি মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে কুরাইশ মুশরিকদের বিপক্ষে গিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন আরবের প্রসিদ্ধ দানবীরদের একজন। এবং অসহায় দরিদ্রদের উত্তম অভিভাবক। মুতা প্রান্তরে বিপজ্জনক অবস্থানে অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তরবারির আঘাত আর তিরবৃষ্টির পরোয়া না করে হকের পতাকা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দুই হাত কেটে যাওয়ার পরও দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ইসলামের পতাকা উঁচু করে রেখেছিলেন। এবং এ অবস্থায়ই যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাতের সুধা পান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এই মহান সাহাবির প্রতি রহমতের বৃষ্টিধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

রাসুলের অশ্বারোহী কমান্ডার

আবু কাতাদা বিন রিবয়ি আল-আনসারি ﷺ

তাঁর বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

আবু কাতাদা বিন রিবয়ি বিন বালদুমাহ বিন খুনাস বিন উবাইদ বিন আদি বিন গানম বিন কাব বিন সালিমা বিন সাদ বিন আলি বিন রাশিদ বিন সারিদাহ বিন তাজিদ বিন জুশাম বিন খাজরাজ।[১১৫০]

তাঁর আসল নাম হারিস। দুর্বল মতানুসারে বলা হয়, আসল নাম নুমান, আবার বলা হয় আমর।[১১৫১] তাঁর হারিস নামই প্রসিদ্ধ।[১১৫২] তবে তিনি উপনামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১১৫৩]

তাঁর মাতা : কাবশাহ বিনতে মুতাহহার বিন হারাম বিন সাওয়াদ বিন গানম বিন কাব বিন সালিমা।[১১৫৪] তাঁর মাতাও খাজরাজ গোত্রের।

১১৫০. আল-ইসতিবসার : ১৪৬ পৃ., জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৩৬০ পৃ., উসদুল গাবাহ : ১/৩২৭।

১১৫১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৬/১৫।

১১৫২. আল-ইসাবাহ : ৭/১৫৫।

১১৫৩. উসদুল গাবাহ : ১/৩২৭।

১১৫৪. আল-ইসতিআব : ৪/১৭৩১, আল-ইসাবাহ : ৭/১৫৫।

তাঁর বদরি হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন, তিনি বদরি। আবার কেউ কেউ তাঁকে বদরি সাহাবিদের তালিকায় উল্লেখ করেননি।[১১৫৫] অবশ্য নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থে বদরি সাহাবিদের তালিকায় তাঁর নাম পাওয়া যায় না। তাঁর বদরি হওয়ার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্য এটা প্রমাণ করে যে, তিনি সূচনাতে ইসলাম কবুল করেছিলেন। সুতরাং তিনি প্রথম সারির আনসারি সাহাবিদের একজন ছিলেন।

তাঁর মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এবং একটি অভিযান পরিচালনা করার মর্যাদাও লাভ করেছেন।

তাঁর জিহাদ

১. অভিযান ও যুদ্ধক্ষেত্রে

ক. আবু কাতাদা ﷺ উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১১৫৬] উহুদে কাফিররা হামজা ﷺ-এর লাশ বিকৃত করার কারণে রাসুল ﷺ অনেক ব্যথিত হন। আবু কাতাদা ﷺ রাসুল ﷺ-এর কষ্ট দেখে কুরাইশের থেকে এর প্রতিশোধ স্পৃহায় গদগদ করছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে হাতে ইশারা করে বসতে বলছিলেন। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহর কাছে আমি তোমার প্রতিদান প্রার্থনা করছি।' এরপর বললেন, 'হে আবু কাতাদা, কুরাইশ আমানতদার সম্প্রদায়। যে তাদের অপরাধের চেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করবে, আল্লাহ তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। যদি তোমার হায়াত বৃদ্ধি পায়, তবে দেখবে, অচিরেই তাদের আমলের কাছে তোমার আমলকে তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের কীর্তির কাছে তোমার কীর্তিকে তুচ্ছ মনে হবে। কুরাইশ যদি অহংকার না করত, তবে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য কী আছে, তা বলে দিতাম।' তখন আবু কাতাদা ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাদের এমন কাজের কারণে

১১৫৫. উসদুল গাবাহ : ৫/২৭৪।
১১৫৬. আল-ইসাবাহ : ৪/১৭৩১, উসদুল গাবাহ : ৫/২৭৪।

আমি কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য ক্রোধান্বিত হয়েছি।' রাসুল ﷺ বললেন, 'সত্য বলেছ। নবিদের সম্প্রদায়রা কত মন্দ প্রকৃতির ছিল!'[১১৫৭]

খ. তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হামরাউল আসাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১১৫৮] সে যুদ্ধে পাঁচ দিন অতিবাহিত করে রাসুল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে জুমআবারে মদিনায় ফিরে আসেন। শনিবার ফজরের সালাত আদায় করে রাসুল ﷺ বিলাল ﷺ-কে এ ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যে, রাসুল ﷺ তোমাদেরকে শত্রুর পিছু ধাওয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সাথে কেবল সে ব্যক্তিই বের হবে, যে গতকাল আমাদের সাথে উহুদে অংশগ্রহণ করেছিল।

আওস, খাজরাজ ও মুহাজিরদের সর্দাররা বের হয়ে তাদের লোকদেরকে অভিযানে বের হতে বললেন। অনেকেই তখন আহত অবস্থায় ছিলেন।

আবু কাতাদা ﷺ বনু সালিমা গোত্রে এসে বললেন, 'এই যে রাসুল ﷺ-এর ঘোষক আপনাদেরকে শত্রুর পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন।' এ কথা শুনে জখমের চিকিৎসা না করেই বনু সালিমার লোকেরা লাফ দিয়ে অস্ত্র তুলে নিলেন। বনু সালিমা থেকে ৪০ জন আহত ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য বের হলো। অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তারা রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে সারিবদ্ধ হলো। রাসুল ﷺ তাদের দিকে তাকিয়ে যখন দেখলেন, তাদের মাঝে আহতরাও আছে, তখন দুআ করে বললেন, 'হে আল্লাহ, বনু সালিমা গোত্রের প্রতি দয়া করুন।'[১১৫৯]

গ. কাতান[১১৬০] অভিমুখে আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ ﷺ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সে অভিযানে মুসলিম বাহিনী শত্রুর সারি ছিন্নভিন্ন করে অনেক উট ও ছাগল গনিমত লাভ করেছিলেন।[১১৬১]

১১৫৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৯০-২৯১।
১১৫৮. হামরাউল আসাদ মদিনা থেকে আট মাইল দূরে। বলা হয় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। দেখুন, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদানিয়্যাহ : ২/৭০।
১১৫৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৩৪-৩৩৫।
১১৬০. ফাইদের এক পাশে অবস্থিত পাহাড়ের নাম কাতান। সেখানে বনু আসাদ গোত্রের একটি পানির উৎস আছে। দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫০।
১১৬১. বিস্তারিত দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৪০-৩৪৬।

ঘ. চতুর্থ হিজরির শাবান মাসে প্রতিশ্রুত বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু কুরাইশরা মুসলিমদের মোকাবিলার ভয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।[১১৬২] এ যুদ্ধে আবু কাতাদা ﵁ অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিলেন।[১১৬৩]

ঙ. ইহুদি আবু রাফিকে হত্যার উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ হিজরির রমাদান মাসে আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﵁-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন আবু কাতাদা ﵁।[১১৬৪] সে অভিযানে তাঁরা আবু রাফিকে হত্যা করেন। আবু কাতাদা ﵁ ভুলে ধনুক রেখে এসেছিলেন। কিছু দূর আসার পর সে কথা তাঁর স্মরণ হয়। সাথিরা তাঁকে বলেছিল, 'ধনুক রাখো।' কিন্তু তিনি তাদের কথা মানলেন না। ফিরে গিয়ে আবার ধনুক নিয়ে আসলেন।[১১৬৫] এতে তিনি শত্রুর কোনো পরোয়া করেননি। অথচ আবু রাফির হত্যার পর সেখানে মানুষের ভিড় ছিল।

চ. পঞ্চম হিজরির শাবান মাসে সংঘটিত মুরাইসির যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেন।[১১৬৬]

এ যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকা বহন করেছিল সাফওয়ান জুশ শুকর। সাফওয়ান মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। মুসলিম বাহিনী বিজয় অর্জন করে মদিনায় ফিরে আসেন।

ছ. পঞ্চম হিজরির জিলকদ মাসে বনু কুরাইজার যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী হয়ে অংশগ্রহণ করেন।[১১৬৭]

জ অনুরূপ ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে জি-কারাদ যুদ্ধেও তিনি অশ্বারোহী হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১১৬৮] এ যুদ্ধে তিনি মাসআদা বিন

১১৬২. বিস্তারিত দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৫৯-৬০।

১১৬৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৮৭।

১১৬৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৯১।

১১৬৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৯৩।

১১৬৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৪০৫, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৬২। মুরাইসি খুজাআহ গোত্রের একটি পানির উৎসের নাম। মুরাইসি আর-ফারা এর মাঝে প্রায় একদিনের দূরত্ব। ওয়াফাউল ওয়াফা : ২/৩৭৩।

১১৬৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৯৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৭৪।

১১৬৮. জি-কারাদ মদিনা থেকে গাতাফান এলাকার দিকে প্রায় একদিনের দূরত্ব। ওয়াফাউল ওয়াফা : ২/৩৬০।

হাকামা ফাজারি ও হাবিব বিন উয়াইনাকে হত্যা করেন। এই যুদ্ধে 'ইয়া খাইলাল্লাহি ইরকাবি' অর্থাৎ 'হে আল্লাহর পথের অশ্বারোহী! অশ্ব চালিয়ে যাও।' বলে আহ্বান করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে এ কথা কখনো বলা হয়নি।[১১৬৯]

আবু কাতাদা ﷺ বলেন, 'আমি আমার মাথা ধুচ্ছিলাম। অর্ধেক মাথা ধুয়েছি, এমন সময় শুনতে পেলাম, আমার ঘোড়া জারওয়াহ হ্রেষাধ্বনি করে খুর দিয়ে আঘাত করছে। তখন বললাম, এই তো, যুদ্ধে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক মাথা না ধুয়েই উঠে পড়লাম। গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে ঘোড়া ছুটালাম। হঠাৎ দেখি রাসুল ﷺ চিৎকার দিয়ে বলছেন, 'সাবধান, সাবধান!' আমি মিকদাদ বিন আমর ﷺ-এর নাগাল পেয়ে যাই। কিছুক্ষণ আমি তাঁর সাথে চললাম। তাঁর ঘোড়ার চেয়ে আমার ঘোড়া উৎকৃষ্ট হওয়ার কারণে সামনে এগিয়ে গেলাম। মিকদাদ ﷺ যখন আমার সামনে ছিলেন, তখন আমাকে খবর দিয়েছিলেন, মাসআদা মুহরিজকে হত্যা করেছে। মিকদাদ ﷺ-কে বললাম, 'আমি মৃত্যুবরণ করব, অথবা মুহরিজের হত্যাকারীকে হত্যা করব।' আবু কাতাদা ﷺ শত্রুর কাছে গেলেন। মাসআদা তাঁর সামনে দাঁড়াল। আবু কাতাদা, 'এই নাও, আমি খাজরাজি'—এই কথা বলে বল্লম দিয়ে মাসআদার ওপর আঘাত হানলেন। এক আঘাতেই তার মেরুদণ্ড ভেঙে গেল এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আবু কাতাদা ﷺ ঘোড়া থেকে নেমে নিজের চাদর দিয়ে নিহত মাসআদাকে ঢেকে রাখলেন। তার ঘোড়াকে তার সাথে বেঁধে রাখলেন। এরপর ছাপ অনুসরণ করে বাহিনীর সাথে মিলিত হন। মুসলিম বাহিনী যখন সেদিক দিয়ে অতিক্রম করল, তখন আবু কাতাদা ﷺ-এর চাদর দেখতে পেল। চাদর চিনতে পেরে তাঁরা বলাবলি শুরু করল, 'এটা আবু কাতাদার চাদর।' একজন 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ল। রাসুল ﷺ বললেন, 'না, এটা আবু কাতাদার হাতে নিহত ব্যক্তি। তার ওপর সে তাঁর চাদর রেখে দিয়েছে; যাতে তোমরা চিনতে পারো যে, এটা তার নিহত ব্যক্তি। তাই তাঁকে তাঁর নিহতের সামানাপত্র নিতে দাও।' এরপর তিনি নিহতের সবকিছু নিয়ে নেন।[১১৭০]

১১৬৯. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৪৯, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩২৬, আদ-দুরার : ১৯৮ পৃ., ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৪০, জাওয়ামিউস সিরাহ : ২০২ পৃ.।

১১৭০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৪৪, আল-ইসতিবসার : ৩৩০ পৃ.।

আবু কাতাদা ﷺ বলেন, 'সেদিন যখন রাসুল ﷺ আমার দেখা পেলেন, তখন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ, তাঁকে ভরপুর বরকত দান করুন।" এবং এ কথাও বলেছেন, "তোমার চেহারা উজ্জ্বল হোক!" আমি বললাম, "আপনার চেহারাও উজ্জ্বল হোক ইয়া রাসুলাল্লাহ!" রাসুল ﷺ বললেন, "মাসআদাকে তুমি হত্যা করেছ?" আবু কাতাদা বললেন, "জি।" তখন রাসুল ﷺ তাঁকে মাসআদার ঘোড়া এবং সামানাপত্র দিয়ে দিলেন। এবং বলেন, "আল্লাহ তোমার জন্য এতে বরকত দান করুন।"'[১১৭১]

মাসআদা যে মুহরিজকে হত্যা করেছে, সে বনু আসাদ বিন খুজাইমার মুহরিজ বিন নাদলাহ। সে বনু আবদে শামসের মিত্র ছিল।[১১৭২]

জি-কারাদ যুদ্ধের দিন রাসুল ﷺ বলেন, 'আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হলো আবু কাতাদা।'[১১৭৩] সেদিন থেকে তিনি রাসুল ﷺ-এর অশ্বারোহী বলে পরিচিতি লাভ করেন।[১১৭৪]

ঝ. তিনি হুদাইবিয়াতে অশ্বারোহী হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১১৭৫]

আবু কাতাদা ﷺ বলেন, 'আমরা উমরা আদায়ের জন্য রাসুল ﷺ-এর সাথে বের হলাম। আমাদের সাথে ইহরাম পরিহিত লোকও ছিল, ইহরাম ছাড়াও ছিল। যখন আমরা আবওয়া[১১৭৬] নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম—আমি তখনও ইহরাম বাঁধিনি—তখন আমি কিছু বন্য গাধা দেখতে পেলাম। ঘোড়ায় জিন বেঁধে আরোহণ করলাম। একজনকে বললাম, "আমার চাবুকটা দাও তো।" সে দিল না। আবার বললাম, "আমার বর্শা দাও তাহলে।" সে বর্শাও দিল না। তখন ঘোড়া থেকে নেমে নিজেই চাবুক আর বর্শা নিলাম এবং আবার ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। এরপর গাধাকে আক্রমণ করে হত্যা করলাম। গাধা নিয়ে সাথিদের কাছে আসলাম। ইহরাম বাঁধা সাথিরা গাধার

১১৭১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৪৫।
১১৭২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৪৯, আল-ইসতিআব : ৩/১৩৬৪।
১১৭৩. আল-ইসতিবসার : ১৪৬ পৃ.।
১১৭৪. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৮ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮৩।
১১৭৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৭৪।
১১৭৬. আবওয়া, মদিনার প্রশাসনিক এলাকার একটি গ্রাম। ইহা ও জুহফাহর মাঝে ২৩ মাইল দূরত্ব।

গোশত খেতে সংশয় করল। এরপর আমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে পৌঁছলাম। তিনি আমাদের একটু সামনে ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "তোমাদের কাছে কিছু গোশত আছে নাকি?" আমি তাঁকে গোশতওয়ালা বাহু দিলাম। তিনি তার পুরোটাই খেয়ে নিলেন; অথচ তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আবু কাতাদাকে বলা হলো, 'কীসের জন্য তোমরা রাসুল ﷺ-এর পেছনে পড়ে গেছ?' তিনি বললেন, 'আমরা একটি গাধা রান্না করেছিলাম। রান্না শেষ করে তবেই আমরা তাঁর সাথে মিলিত হই।'[১১৭৭]

এ যুদ্ধে আবু কাতাদা ﷺ তাঁর কওমের মুনাফিকদের এমন আক্রমণ করে কথা বলেন, যার মাঝে নম্রতার কোনো লেশমাত্র ছিল না। তিনি বলেন, 'আমরা হুদাইবিয়ায় অবতরণ করলাম। সেখানে পানি একেবারেই সামান্য পরিমাণে ছিল। জাদ বিন কাইসকে বলতে শুনলাম, "এই লোকদের সাথে কীসের জন্য আমরা বের হলাম। আমাদের শেষজনও তো পিপাসায় মৃত্যুবরণ করবে।" আমি বললাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ, এমন কথা বলো না। তুমি কী জন্য বের হয়েছ?" সে বলল, "আমার কওমের সাথে বের হয়েছি।" বললাম, "কেন বের হয়েছ, তুমি কি উমরার উদ্দেশ্যে বের হওনি?" সে বলল, "না, আমি ইহরাম বাঁধিনি।"' আবু কাতাদা ﷺ বললেন, "উমরার নিয়তও করোনি?" সে বলল, "না।" রাসুল ﷺ লোকটিকে ডাক দিলে সে বর্শার ওপর ভর করে নেমে পড়ে। রাসুল ﷺ একটি বালতিতে করে অজু করলেন এবং ওই বালতিতে কুলি করলেন। এরপর সে পানি কূপে ফেলে দিলেন। তখন কূপে ঠান্ডা পানি উথলে উঠতে লাগল। আমি জাদ বিন কাইসকে দেখলাম, সে কূপের পাড়ে বসে পানির দিকে পা ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি বললাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ, তোমার কথা থাকল কোথ ায়?" সে বলল, "আমি তোমার সাথে মজা করার জন্য এটা বলেছিলাম। মুহাম্মাদকে এসবের কিছু বলো না আবার।" আমি বললাম, "তার আগে আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসব বলে দিয়েছি।" জাদ বিন কাইস রাগান্বিত হলো এবং বলল, "আমাদের কওমের এমন কিছু বালক ছেলের সাথে আমরা থেকে গেলাম, যারা আমাদের বয়স ও সম্মান কোনোটারই খেয়াল করে না। বর্তমানে ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই শ্রেয়।"' আবু কাতাদা বলেন, 'রাসুল ﷺ-কে জানানোর কারণে আমার কওমের কিছু লোক এসে আমাকে

১১৭৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/ ৫৭৬।

তিরস্কার করতে লাগল। আমি বললাম, "কত মন্দ সম্প্রদায় তোমরা! ধ্বংস হও তোমরা! তোমরা জাদ বিন কাইসের পক্ষে সাফাই গাইছ?" তারা বলল, "হ্যাঁ, সে তো আমাদের বড় ব্যক্তি। সে আমাদের সর্দার।" আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, বনু সালিমা থেকে রাসুল ﷺ তার নেতৃত্বকে সরিয়ে দিয়েছেন। তার পরিবর্তে বিশর বিন বারা ﷺ-কে আমাদের সর্দার নিযুক্ত করেছেন।"[১১৭৮] জাদ বিন কাইসের দরজার সামনে যে আরিশ পাতা ছিল, আমরা সেটা ভেঙে ফেলে বিশর বিন আমর ﷺ-এর দরজার সামনে বানিয়ে দিয়েছিলাম। কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই আমাদের সর্দার। একপর্যায়ে রাসুল ﷺ যখন বাইআতের জন্য আহ্বান করলেন, তখন জাদ বিন কাইস পলায়ন করল। সে উটনীর পেটের নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। আমার সাথে এক লোক কথা বলছিল, আমি তার হাত ধরে কথা বলতে বলতে বের হলাম। এবং জাদ বিন কাইসকে উটনীর পেটের নিচ থেকে বের করলাম। বললাম, "তোমার ধ্বংস হোক! এখানে কী জন্য ঢুকেছ? তুমি কি আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর ওপর যা নাজিল হয়েছে, তার থেকে পলায়নের জন্য এমন করেছ?" সে বলল, "না, আমি ভীতিকর আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।" আমি বললাম, "কখনোই আমি তোমার পক্ষে কথা বলব না। তোমার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।"' জাদ বিন কাইস যেদিন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সেদিন আবু কাতাদা ﷺ আপন ঘরে বসে থাকেন। কাফন-দাফন সম্পন্ন হওয়ার পরেই তিনি বের হন। এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি তার জানাজা পড়তে পারি না। কারণ আমি তাকে হুদাইবিয়ায় এই এই কথা বলতে শুনেছি এবং তাবুক যুদ্ধে এই এই কথা বলতে শুনেছি।[১১৭৯] আমি লজ্জা করছিলাম, আমার সম্প্রদায় দেখবে, আমি জানাজায় শরিক না হয়ে বাইরে অবস্থান করছি।' একটি দুর্বল মতানুসারে বলা হয়, আবু কাতাদা ﷺ উপত্যকায় তাঁর সম্পদের দিকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং জাদ বিন কাইসের দাফন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন। জাদ বিন কাইস মৃত্যুবরণ করে উসমান বিন আফফান ﷺ-এর খিলাফতকালে।[১১৮০]

১১৭৮. তাঁর জীবনী সম্পর্কে দেখুন, আল-ইসতিবসার : ১৪২ পৃ.।

১১৭৯. তাবুক যুদ্ধে সে রাসুল ﷺ-কে বলেছিল, 'আমাকে সুন্দরী নারীদের ফিতনায় ফেলবেন না। যুদ্ধ থেকে পালানোর জন্য সে এ কথা বলেছিল। দেখুন, আল-ইসতিবসার ১৪৫ পৃ., টিকা নং ৫৩৩।

১১৮০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৯০-৫৯১।

ঞ. আবু কাতাদা ﷺ রাসুল ﷺ-এর সাথে উমরাতুল কাজায় অংশগ্রহণ করেন।[১১৮১] তিনি বলেন, 'উমরাতুল কাজায় আমরা 'ফুরউ' গ্রাম হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ছাড়া আমার সব সাথি ইহরাম বেঁধেছিলেন। আমি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে সেটাকে শিকার করি। রান্না করে আমার সাথিদের কাছে নিয়ে আসি। তাদের কেউ খেলো আবার কেউ খেলো না। তাই আমি রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুল ﷺ বললেন, "খাও।"' আবু কাতাদা ﷺ বলেন, 'এরপর রাসুল ﷺ বিদায় হজ পালন করেন। সেবার বাইদা এলাকা থেকে ইহরাম বাঁধেন। আর এ উমরাটি মসজিদ থেকে হয়েছিল। কারণ এর পথ বাইদা এলাকার পথে ছিল না।[১১৮২]

ট. অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে তিনি মুতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।[১১৮৩] সম্ভবত তিনি এ যুদ্ধে সর্বোচ্চ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ফলে রাসুল ﷺ তাঁর প্রশংসা করেছেন। যেমনটা আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হলো আবু কাতাদা আর শ্রেষ্ঠ পদাতিক হলো সালামা বিন আকওয়া।'[১১৮৪]

এভাবেই আবু কাতাদা ﷺ তাঁর শক্তি-সামর্থ্যকে গচ্ছিত না রেখে জিহাদের ময়দানে উজাড় করে দিয়েছিলেন। এই সকল অভিযান ও যুদ্ধ এবং তার ইতিহাস নিয়ে যে ঘাঁটাঘাঁটি করবে, সে দেখতে পাবে, আবু কাতাদা ﷺ তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়ই ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষায় জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করেছেন। যেন তিনি নিজের আরামের জন্য একটু সময়ও গ্রহণ করেননি।

১১৮১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৩৩।
১১৮২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৩৩-৭৩৪।
১১৮৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৬২, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৮।
১১৮৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৬২।

২. দুই অভিযানের কমান্ডার

ক. খাজিরা অভিযান[১১৮৫]

অষ্টম হিজরির শাবান মাসে খাজিরা অভিমুখে অভিযান পরিচালিত হয়। এটি নাজদের মুহারিব এলাকায় অবস্থিত। আবু কাতাদা ﷺ-এর নেতৃত্বে গঠিত এ বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল ১৫ জন। তাদের যাত্রা ছিল গাতাফান অভিমুখে। রাসুল ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন, রাতের বেলা পথ চলবে এবং দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকবে। আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করবে। নারী-শিশু থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

আবু কাতাদা ﷺ তাঁর সৈনিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তাঁদের প্রতি আল্লাহর ভয় ও তাকওয়ার উপদেশ দান করেন। দুজন দুজন করে জুটি বেঁধে দেন এবং তাঁদের প্রতি কঠোর নির্দেশ জারি করেন, নিহত হওয়া বা ফিরে আসা পর্যন্ত কেউ তার সাথি থেকে পৃথক হবে না। কেউ যেন আমার কাছে এ অবস্থায় না আসে যে, আমি তাকে তার সাথি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব আর সে বলবে, আমি জানি না। আমি তাকবির বললে তোমরাও তাকবির বলে উঠবে। আমি আক্রমণ করলে তোমরাও আক্রমণ করে বসবে। আক্রমণাত্মক আক্রমণ থেকে পিছপা হবে না।

মুসলিমদের এ ক্ষুদ্র বাহিনী মুশরিকদের বস্তির ওপর আক্রমণ করে তাদের ঘেরাও করে ফেলে। তখন শত্রুর এক লোক 'হে খাদিরাবাসী' বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তাদের কিছু লোক লড়াই করে। তাদের যারা সামনে পড়ে, তাদেরকে মুসলিম বাহিনী হত্যা করে। এরপর উট ও ছাগল হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। গনিমতে উট ছিল ২০০টি এবং ছাগল ছিল দুই হাজার। সাথে অনেককে বন্দী করে নিয়ে আসে। গনিমত একত্র করে তার এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রাখেন। বাদ-বাকি নিজেদের মাঝে বণ্টন করেন। প্রত্যেকের ভাগে পড়েছিল ১২টি করে উট। একটি উটের মোকাবিলায় ১০টি ছাগলের তুলনা করেছিলেন। আবু কাতাদা ﷺ-এর ভাগে একজন সুন্দরী দাসী পড়েছিল। কিন্তু

১১৮৫. নাজদের একটি এলাকার নাম খাজিরা। তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৩২, মুজামুল বুলদান : ৩/৪৪৭।

মাহমিয়া বিন জাজআ জুবাইদি ﷺ এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আবু কাতাদা তাঁর ভাগে এই সুন্দরী দাসী লাভ করেছে। আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, আল্লাহ আপনাকে সর্বপ্রথম যে গনিমত দান করবেন, তার থেকে আমাকে একটি দাসী দেবেন।' তখন রাসুল ﷺ আবু কাতাদা ﷺ-এর কাছে সে দাসীটিকে উপহার চাইলেন। আবু কাতাদা ﷺ রাসুল ﷺ-কে দিয়ে দিলেন। এরপর রাসুল ﷺ তা মাহমিয়া বিন জাজআকে দিয়ে দেন।

এ অভিযান পরিচালনায় মোট ১৫ দিন লেগেছিল।[১১৮৬]

এ অভিযানে আবু কাতাদা ﷺ ভরপুর বিজয় লাভ করেছিলেন। তাঁর বিজয়ের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো ছিল, পরিপূর্ণভাবে আকস্মিক আক্রমণ করা। কারণ শত্রুরা যদি তাদের ওপর মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের কথা জানত, তবে তারা অবশ্যই পলায়ন করত।

খ. বাতনে ইদামে অভিযান[১১৮৭]

অষ্টম হিজরির রমাদান মাসে বাতনে ইদাম অভিমুখে আবু কাতাদা ﷺ-এর নেতৃত্বে আট সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীর অভিযান পরিচালিত হয়।

রাসুল ﷺ যখন মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা করলেন, তখন আবু কাতাদা ﷺ-কে আটজন যোদ্ধা দিয়ে বাতনে ইদাম অভিমুখে প্রেরণ করেন। এটি জি-খুশব[১১৮৮] ও জিল মারওয়া[১১৮৯] এলাকার মধ্যবর্তী জায়গা। সেখান থেকে মদিনা মুনাওয়ারা তিন বুরদের[১১৯০] দূরত্ব। এ দিকে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে মানুষ ধারণা করে রাসুল ﷺ ওই অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করবেন এবং এই খবর নিয়ে যেন মানুষ চলে যায়।

১১৮৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৭৭, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৩২-১৩৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৮১, উয়ুনুল আসার : ২/১৬১।

১১৮৭. মদিনা মুনাওয়ারায় যে উপত্যকা আছে, তা হিজাজের ওপর দিয়ে গিয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ১/১২৮। আমার মতে মদিনার উত্তর অংশে এ উপত্যকার কথা বলা হয়েছে। কারণ এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মক্কা অভিযানের বিষয়টি আড়াল করা।

১১৮৮. জি-খুশব, মদিনা থেকে এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত। দেখুন, ওয়াফাউল ওয়াফা : ২/২৯৯।

১১৮৯. জিল মারওয়া হচ্ছে ওয়াদিল কুরার একটি গ্রাম। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৮/৩৯।

১১৯০. আরবি বিশেষ দূরত্ব পরিমাপ। চার ফারসাখে এক বুরদ হয়, আর তিন মাইলে এক ফারসাখ হয়। সুতরাং এক বুরদে ১২ মাইল।

এ বাহিনীতে ছিলেন মুহাল্লাব বিন জাসসামাহ লাইসি ﷺ। বাহিনীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে আমির বিন আজবাত আশজায়ি। অতিক্রমকালে সে মুসলিম বাহিনীকে সালাম প্রদান করে। সকলে তার থেকে নিবৃত্ত থাকে। কিন্তু মুহাল্লাব বিন জাসসামাহ তাকে হত্যা করে তার মালসামানা নিয়ে নেয়। এবং তার সাথে একটি দুধের পাত্র ছিল, সে পাত্রও নিয়ে নেয়। অভিযান শেষে তাঁরা রাসুল ﷺ-এর সাথে মিলিত হলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করো, তখন তোমরা যাচাই করে নিয়ো; যে তোমাদের সালাম করে, তাকে বলো না, "তুমি মুসলিম নও।" তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ তালাশ করো; অথচ আল্লাহর কাছে রয়েছে প্রচুর সম্পদ।'[১১৯১]

এ ক্ষুদ্র বাহিনী কোনো বাহিনীর সাক্ষাৎ না পেয়ে ফিরে আসেন। এবং জি-খুশুব এলাকায় এসে শুনতে পান যে, রাসুল ﷺ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছেন। তখন 'বিন'[১১৯২] উপত্যকার পথ ধরে 'সুকইয়া' নামক স্থানে এসে রাসুল ﷺ-এর সাথে মিলিত হন। এবং মক্কা-বিজয়ে শরিক হন।[১১৯৩]

৩. পুনরায় যুদ্ধ এবং অভিযানে

ক. আবু কাতাদা ﷺ মক্কা-বিজয়ের পর অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১১৯৪]

আবু কাতাদা ﷺ বলতেন, 'আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হলাম—মুসলিম বাহিনী তখন পেছনে সরে গিয়েছিল—তখন দেখতে পেলাম, একজন মুসলিম

১১৯১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৯৪।
১১৯২. মদিনার নিকটবর্তী উপত্যকার নাম বিন। মুজামুল বুলদান : ২/৩৪৩।
১১৯৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৩৩, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৯৬০৭৯৭, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৮৬, আল-মুহাব্বার : ১২২-১২৩ পৃ.।
১১৯৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯০৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৪৯।

ও একজন মুশরিকের মধ্যে লড়াই চলছে। মুশরিক মুসলিমের ওপর চড়াও হয়েছিল। তখন পেছনে ফিরে তার কাছে আসলাম। এরপর মুশরিকের ঘাড়ে দিলাম এক ঘা। অমনি সে তাকে ছেড়ে আমাকে এসে এত জোরে ঝাপটে ধরে, এতে আমার জান বের হওয়ার উপক্রম হয়। সে আমাকে মেরেই ফেলত, যদি না ততক্ষণে তার রক্ত বের হয়ে নিঃশেষ হতো। এরপর সে পড়ে যায়। তাকে শেষ করে তার সামানা ওই অবস্থায় রেখে আমি চলে গেলাম এবং উমর বিন খাত্তাব ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম। বললাম, "লোকদের কী হলো?!" তিনি বললেন, "আল্লাহর ফায়সালা।" এরপর লোকেরা ফিরে আসলো।

রাসুল ﷺ বললেন, "যে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং এ ব্যাপারে তার সাক্ষী আছে, ওই নিহতের সামানাপত্র তার হবে।" আমি দাঁড়িয়ে বললাম, "আমার পক্ষে কে সাক্ষী দেবে?" এরপর বসলাম। রাসুল ﷺ আবার বললেন, "যে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং সে ব্যাপারে তার প্রমাণ আছে, ওই নিহতের সামানাপত্র তার হবে।" আমি দাঁড়িয়ে বললাম, "কে আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে?" এরপর বসে পড়লাম। রাসুল ﷺ বললেন, "যে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং এ ব্যাপারে তার প্রমাণ আছে, তাহলে নিহতের সামানাপত্র তার হবে।"' তখন আব্দুল্লাহ বিন উনাইস আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। এরপর আসওয়াদ বিন খুজায়ি ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেলাম, তিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। তখন দেখি, আমার যে সাথি আমার হাতে নিহতের সামানাপত্র নিয়েছিল, সে আর অস্বীকার করল না যে, আমি তাকে হত্যা করেছি।

অবশ্য আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে ঘটনা খুলে বলেছিলাম। তখন সে বলেছিল, "হে আল্লাহর রাসুল, ওই নিহতের সামানাপত্র আমার কাছে আছে। আপনি তাকে আমার পক্ষ থেকে খুশি করে দিন।" তখন আবু বকর ﷺ বললেন, "না। তিনি তোমার পক্ষ হয়ে তাকে খুশি করবেন না। কেননা, আল্লাহর কোনো সিংহ আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়াই করবে আর তুমি তার সামানাপত্রে ভাগ বসাবে, তা হবে না। তার নিহতের সামানাপত্র তার কাছে ফিরিয়ে দাও।" রাসুল ﷺ বললেন, "আবু বকর ঠিকই বলেছে। তুমি তাকে তার নিহতের সামানাপত্র দিয়ে দাও।" তখন সে আমাকে সামানাপত্র দিয়ে দেয়।

হাতিব বিন আবু বালতাআহ ﷺ আমাকে বললেন, "আবু কাতাদা, অস্ত্রটা বিক্রি করবে?" তাঁর কাছে অস্ত্রটা আমি সাত উকিয়ায় বিক্রি করে দিলাম। মদিনায় এসে সেই অর্থ দিয়ে বনু সালিমায় আমি একটি খেজুর বাগান ক্রয় করি। সে বাগানের নাম ছিল রুদাইনি। ইসলামে সর্বপ্রথম আমি এ অর্থ বিনিয়োগ করি। আজ পর্যন্ত সে সম্পদ দিয়ে আমি দিন গুজরান করছি।'[১১৯৫]

খ. নবম হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে 'ফুলস' অভিমুখে আলি ﷺ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

বাহিনীর কমান্ডার আলি ﷺ তাঁকে হুবাব বিন মুনজির ও আবু নায়িলা ﷺ-এর সাথে প্রহরায় প্রেরণ করেন। তাঁরা আপন আপন ঘোড়ায় চড়ে বাহিনীর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে ঘুরে প্রহরা দেন। সেখানে একজন কালো বালককে দেখতে পান। তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে?' সে বলে, 'আমি আমার হারানো বস্তু খুঁজছি।' তারা তাকে নিয়ে আলি ﷺ-এর কাছে আসেন। আলি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে?' সে বলে, 'আমি বিদ্রোহী।' যখন তাকে ধমক দিলেন, তখন সে বলল, 'আমি বনু নাবহানের শাখাগোত্র তায়িয়ের এক লোকের গোলাম। তারা আমাকে এ জায়গায় আসতে বলেছে। তারা বলেছে, "যদি মুহাম্মাদের অশ্বারোহীদের দেখো, তবে দ্রুত আমাদের কাছে এসে খবর জানাবে। আর আমার বন্দী হয়ে পড়ার ব্যাপারে সতর্কতা ছিল না। তোমাদের দেখে আমি যেতে চাইলাম। কিন্তু মনে মনে বললাম, তড়িঘড়ি না করে বরং তোমাদের সৈন্যসংখ্যা ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে আমার লোকদের কাছে যাই। আমি যে বিপদে পড়েছি, তার কোনো ভয় আমার ছিল না। কেন যেন আমি সেখানে বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। অবশেষে তোমাদের প্রহরীরা আমাকে ধরে ফেলে।" আলি ﷺ বললেন, "তোমার পেছনের লোকদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সত্য করে বলো।" সে বলল, "এখান থেকে বসতির শুরুর এলাকা একদিনের দূরত্ব। অশ্ব চালিয়ে প্রত্যুষে তাদের কাছে পৌঁছা যাবে। পদাতিক বাহিনী নিয়ে গেলে সন্ধ্যা হবে।'

১১৯৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯০৮-৯০৯, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৭৮-৭৯, আল-ইসতিবসার : ১৪৭ পৃ.।

আলি ﷺ তাঁর সৈনিকদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন জাব্বার বিন সখর ﷺ বললেন, 'আমি মনে করি, রাতে অশ্ব চালিয়ে সকাল সকাল তাদের কাছে পৌঁছে যাব। তারা আমাদের সম্পর্কে বেখবর থাকবে। এরপর আমরা তাদের ওপর হামলা করে বসব। রাতে কালো গোলামকে সঙ্গে করে বের হব। মূল বাহিনীর সাথে হুরাইসকে[১১৯৬] রেখে যাব। আল্লাহ চান তো তারা আমাদের সাথে এসে মিলিত হবে।' আলি ﷺ এ মতের সাথে একমত হলেন।

কালো গোলামকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হলো। ঘোড়াগুলো বেশ তেজি ছিল। এককে ঘোড়ায় দুজন করে আরোহণ করে। পালাক্রমে একবার কেউ সামনে চড়ে আরেকবার পেছনে থাকে। পেছনের ব্যক্তি সামনের ব্যক্তির সাথে নিজেকে বেঁধে রাখে। এভাবে চলতে চলতে রাত যখন গভীর হলো, তখন গোলাম মিথ্যা বলল, 'রাস্তা ভুল করেছি, সঠিক রাস্তা পেছনে ফেলে এসেছি।' আলি ﷺ বললেন, 'যেখানে ভুল করেছ, সেখানে ফিরে চলো।' এক মাইল বা তার বেশি পরিমাণ ফিরে এসে আসওয়াদ বলল, 'আমি ভুলের মধ্যে আছি।' আলি ﷺ বললেন, 'তোমার ব্যাপারে আমাদের প্রতারণার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি তো শত্রুর বসতি থেকে আমাদের ফিরিয়ে রাখতে চাচ্ছ।' (সাথিদের উদ্দেশ্য করে বললেন) 'তাকে সামনে নিয়ে আসো। হয়তো সত্য বলবে, নতুবা তোমার মাথাটা আলাদা করে দেবো।' তাকে সামনে আনার পর তার মাথার ওপর খোলা তরবারি ধরা হলো। যখন সে বিপদ দেখতে পেল, তখন বলল, 'আপনাদের সত্য বললে আমি উপকৃত হতে পারব তো?' মুসলিমরা বলল, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি যা করেছি, আপনারা তা দেখেছেন। এটা মূলত আমি সেই লজ্জাবোধ থেকেই করেছি, যেমনটা কেউ লজ্জার তাড়নায় করে থাকে। এরপর ভাবলাম, শত্রুদের বিনা কষ্টে আমার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে আসলাম। তাই তাদের একটু নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু যখন তোমাদের থেকে বিপদ আঁচ করলাম এবং আমাকে হত্যার ভয় করলাম, তখন আমার জন্য একটি ওজর তৈরি হলো। তাই তোমাদের এখন পথ দেখিয়ে দেবো।' সাহাবিগণ বললেন, 'আমাদের সাথে সত্য বলো।' সে বলল, 'তাদের বসতি তোমাদের একেবারে নিকটে।'

১১৯৬. মুসলিম বাহিনীকে ফুলস এলাকা নিয়ে যাওয়ার গাইডের নাম ছিল হুরাইস।

সেখান থেকে তাঁরা সামনে অগ্রসর হয়ে বসতির নিকটে পৌঁছে গেলেন। কুকুরের ডাক ও খোঁয়াড়ে উট-ছাগল বিচরণের আওয়াজ শুনতে পেলেন। গোলাম বলল, 'ওই হচ্ছে তাদের বাহিনীর অবস্থানস্থল। সেটা এখান থেকে এক ফারসাখ দূরে।' এটা শুনে তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। বলল, 'হাতিমের পরিবার কোথায় থাকে?" সে বলল, 'তারা বাহিনীর মধ্যস্থলে থাকে।'

ভোরে মুসলিম বাহিনী মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করে বসে। অনেককে হত্যা করে এবং অনেককে বন্দী করে। বাঁদি-দাসী ও গবাদি পশু তাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

গোলামের নাম ছিল আসলাম, সে বাঁধা অবস্থায় ছিল। বসতির এক বালিকা গোলামকে দেখে বলল, 'এ নির্বোধের কী হলো! এটা তো তোমাদের দূত আসলামের কর্ম। সেও নিরাপদ থাকেনি। সে তাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে টেনে এনেছে। তোমাদের গোপন ভেদ বলে দিয়েছে।' তখন গোলাম বলল, 'হে সম্মানিত ব্যক্তির কন্যা, আমাকে একটু কম করে বলো। আমি তাদের পথ দেখাইনি, যতক্ষণ না আমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছি।'

মুসলিম বাহিনী তাঁবু গাড়ল। পুরুষ বন্দীদের এক পাশে করল এবং নারী বন্দীদের আরেক পাশে রাখল। হাতিম পরিবার থেকে আদি বিন হাতিমের বোন এবং তার সাথে আরও কিছু নারী ছিল। তাদেরকে আলাদা এক দিকে রাখা হলো। আসলাম আলি ﷺ-কে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন?' তখন তার সামনে ইসলাম পেশ করা হলো। সে বলল, 'আমি আমার এই বন্দী সম্প্রদায়ের ধর্মের ওপর আছি। তারা যা করবে, আমিও তা করব।' আলি ﷺ বললেন, 'তুমি কি দেখছ না, তারা বাঁধা আছে। তাই তোমাকেও আমরা তাদের সাথে বেঁধে রেখেছি।' তখন সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তাদের সাথে বাঁধা থাকব। অন্যদের সাথে মুক্ত অবস্থায় থাকার চেয়ে এ অবস্থা আমার কাছে অধিক প্রিয়। তাদের যা হবে, আমারও তা-ই হবে।' তখন তাকে বাঁধা অবস্থায় বন্দীদের সাথে রাখা হলো। সে বলল, 'আমি তাদের সাথে আছি। তাদের থেকে যা দেখার, তোমরা তা-ই দেখবে।' এক ব্যক্তি তাকে বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি যা করেছ, এর চেয়ে বেশি কিছু করার তোমার দায়িত্বে ছিল না। তোমার যে অবস্থা হয়েছিল, আমাদের কারও এমন হলে আমরাও তেমন করতাম বা

তার চেয়ে বেশি করতাম। এরপরেও তুমি শোক করছ।' আরেকজন বলল, 'না, তোমার জন্য কোনো ধন্যবাদ নেই। তুমি তাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ।'

মুসলিম বাহিনী সকলেই একসাথে বন্দীদের সামনে আসলো। এরপর তাদের সামনে ইসলাম পেশ করার পর সেখানে যে ইসলাম কবুল করল, তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। আর যে প্রত্যাখ্যান করল, তাকে হত্যা করা হলো। একপর্যায়ে আসওয়াদের কাছে ইসলাম পেশ করা হলো। সে বলল, 'আল্লাহর শপথ, তরবারির কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া তিরস্কারের বিষয়। জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়।' তখন তার গোত্রের ইসলাম কবুলকারী একজন বলল, 'কী আশ্চর্য! যখন তুমি বন্দী হলে এরপর যারা নিহত হওয়ার তারা নিহত হলো, যারা বন্দী হওয়ার তারা বন্দী হলো এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে আমাদের যারা ইসলাম কবুল করার তারা ইসলাম কবুল করল, তখন কিনা তুমি এমন কথা বলছ। পোড়া কপাল! ইসলাম কবুল করে মুহাম্মাদের দ্বীনের অনুসরণ করো।' তখন সে ইসলাম কবুল করে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অতঃপর যখন ইরতিদাদের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ল, তখন তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-এর সাথে মিলে ইয়ামামার ময়দানে মন উজাড় করে জিহাদ করেন।[১১৯৭]

কালো গোলামের ঘটনা আরও অনেক দীর্ঘ। আবু কাতাদা ﷺ-এর জীবনীর সাথে তার ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই বটে; কিন্তু এর ভেতরে উত্তম আখলাকের বিবরণ আছে, তা থেকে যে কেউ শিক্ষা নিতে পারে। কারণ যুদ্ধবন্দীর প্রতি এমন সুন্দর আচরণই তাকে ইসলাম কবুলে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সহিহ হাদিসে এসেছে 'জাহিলি যুগে তোমাদের যে সেরা ছিল, সে ইসলামে এসেও সেরা—যখন সে ইসলামে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে।'[১১৯৮]

ইতিহাসে যদি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কোনো শিক্ষা না থাকে, তবে সে ইতিহাস পাঠে কোনো সার্থকতা নেই। এমন ইতিহাসের পাঠ শুধু সময়ই নষ্ট করবে।

১১৯৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৮৫-৯৮৮।
১১৯৮. মুনাবির আল-জামিউস সগির : ২/১০।

আলি ﷺ বন্দীদের দায়িত্বে নিয়োগ করেন আবু কাতাদা ﷺ-কে, আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﷺ-কে নিয়োগ করেন গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে। 'রাকাক' স্থানে এসে গনিমতের সম্পদ বণ্টন করেন। রাসুল ﷺ-এর জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু বাছাই করে রাখা হয়। এরপর রাসুল ﷺ-এর জন্য অপর একটি তরবারি রাখা হয়। এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রাখা হয় এবং হাতিম তায়িয়ের পরিবারকেও আলাদা করে রাখা হয়। তাদের বণ্টন না করে মদিনায় নিয়ে আসা হয়।[১১৯৯]

বন্দীদের মাঝে আদি বিন হাতিমের বোনও ছিল। তাকে রমলাহ বিনতে হারিসের ঘরে রাখা হয়। আদি বিন হাতিম তার এক গুপ্তচরের মাধ্যমে আলি ﷺ-এর তৎপরতার কথা জানতে পেরে সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। রাসুল ﷺ যখন আদি বিন হাতিমের বোনের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন সে বলত, 'হে আল্লাহর রাসুল, পিতা ইনতিকাল করেছেন। তার প্রতিনিধি পলায়ন করেছে। তাই আমাদের ওপর রহম করুন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করবেন।' প্রতিবারই রাসুল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমার প্রতিনিধি কে?' সে বলত, 'আদি বিন হাতিম।' তখন রাসুল ﷺ বলতেন, 'তবে কি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল থেকে পলায়ন করেছে?' একপর্যায়ে সে নিরাশ হয়ে যায়।

চতুর্থ দিন রাসুল ﷺ যখন তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন সে কোনো কথা বলে না। এক ব্যক্তি তাকে ইশারা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলো।' তখন সে রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলল।

তাকে যে লোকটি কথা বলার জন্য ইশারা করেছিল, সে লোকের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। বলা হয়, তিনি হচ্ছেন আলি ﷺ। তিনিই তোমাদের বন্দী করে এনেছেন। তুমি কি তাকে চেনো না? সে বলল, 'বন্দী হওয়ার দিন থেকে এই ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত আমি বোরকার ওপর চাদর দিয়ে ঘোমটা দিয়ে আছি। আমি তাঁর বা তাঁর কোনো সাথির চেহারা দেখিনি।'[১২০০]

আরব মুসলিমদের জন্য ইতিহাস থেকে এটি একটি নতুন শিক্ষা। এই শিক্ষাটা সে জাহিলি যুগের একজন নারী থেকে শিক্ষা করতে পারে। যে তখনও ইসলাম কবুল করেনি; কিন্তু সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক সে আঁকড়ে ধরে ছিল।

১১৯৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬৪, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৮৮।
১২০০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৮৮-৯৮৯।

গ. নবম হিজরির রজব মাসে সংঘটিত তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১২০১]

এ যুদ্ধে মুসলিমদের কিছু লোক পেছনে থেকে যায়। কোনো ধরনের সংশয়-সন্দেহ ছাড়াই তারা নিয়তের কারণে রাসুল ﷺ-এর পেছনে রয়ে যান। তাদের একজন হলেন কাব বিন মালিক ؓ। তাবুকে পৌঁছে রাসুল ﷺ তার কথা স্মরণ করেন। তখন তিনি সাহাবিদের মাঝে বসা ছিলেন। বললেন, 'কাব বিন মালিক কী করল?' বনু সালিমার এক লোক বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাকে তার প্রাচুর্য ও আত্মগরিমা আটকে রেখেছে।' তখন মুআজ বিন জাবাল ؓ বললেন, 'কত মন্দ কথা তুমি বললে! হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তার ব্যাপারে কেবল ভালোই জানি।' উক্তিকারী ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন উনাইস। বলা হয়, তার কথার যিনি জবাব দিয়েছিলেন, তিনি হলেন আবু কাতাদা। তবে মুআজ বিন জাবাল ؓ-এর কথাই আমাদের কাছে অধিক প্রমাণিত।[১২০২]

তাবুকে অংশগ্রহণকারীগণ গোশত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করল। তখন ১০ জন আনসারি সাহাবি ঘোড়ায় চড়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাঁদের মধ্যে আবু কাতাদা ؓ-ও ছিলেন। তিনি বর্শার আঘাতে শিকারে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে বর্শা দিয়ে পাঁচটি গাধা শিকার করেন এবং তাঁর সাথিরা কয়েকটি হরিণ শিকার করে। শিকার নিয়ে তাঁরা সন্ধ্যায় তাবুতে ফেরেন এবং সাথিদের সেগুলো বণ্টন করে দেন।[১২০৩]

তাবুক থেকে ফেরার পথে আবু কাতাদা ؓ রাসুল ﷺ-এর কাছাকাছি হয়ে চলছিলেন। একবার রাসুল ﷺ আরোহী অবস্থায় একটু কেঁপে একদিকে ঝুঁকে পড়লেন। আবু কাতাদা ؓ কাছে গিয়ে রাসুল ﷺ-কে সাহায্য করলেন। রাসুল ﷺ সতর্ক হয়ে বললেন, 'এটা কে?' তিনি বললেন, 'আবু কাতাদা ইয়া রাসুলাল্লাহ!' আপনার পড়ে যাওয়ার ভয় হলো, তাই আপনাকে সাহায্য করলাম।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করুন, যেমন তুমি আল্লাহর রাসুলকে হিফাজত করেছ।' একটু চলার পর আবারও তিনি এমন করলেন, আবু কাতাদা এবারও তাঁকে সাহায্য করলেন। রাসুল ﷺ সতর্ক হয়ে

১২০১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৯৭, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬৫।
১২০২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৯৭।
১২০৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/১০৩৫-১০৩৬।

বললেন, 'আবু কাতাদা, তোমার কি শেষ রাতে আরামের প্রয়োজন আছে?' তিনি বললেন, 'আপনি যা চান ইয়া রাসুলাল্লাহ! ' রাসুল ﷺ বললেন, 'দেখো তো তোমার পেছনে কে আছে ?' তিনি পেছনে দুজন বা তিনজন লোক দেখতে পেলেন। রাসুল ﷺ বললেন, 'তাদের ডাকো।' তাদের ডাকলে তারা পাঁচজন মিলে শেষ রাতে আরাম করলেন।[১২০৪]

রাসুল ﷺ মদিনায় পৌঁছলে কাব বিন মালিক رضي الله عنه তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। কাব رضي الله عنه বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-কে সালাম দিলাম। রাসুল ﷺ চেহারায় গোস্বা নিয়ে মুচকি হাসি দিলেন। এরপর বললেন, "আসো।" আমি এসে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি বললেন, "পেছনে থেকে গেলে কেন? সওয়ারির বাহন ক্রয় করনি?" আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি আপনাকে ছাড়া দুনিয়ার অন্য কারও সামনে বসতাম, তবে কোনো ওজর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বের হয়ে আসতাম। বাকপটুতায় আমার বেশ দক্ষতা আছে। কিন্তু এটা জানি, যদি আজ আপনার সামনে কোনো মিথ্যা কথা বলে রেহাই পাই, তবে অচিরেই আল্লাহ আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। আর আজ যদি কোনো সত্য কথা বলি, যার কারণে আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হন, তবে আমি আল্লাহর কাছে এর ভালো ফলের আশা রাখি। আল্লাহর শপথ, আমার কোনো ওজর ছিল না। আল্লাহর শপথ, যখন আপনার থেকে পেছনে থেকে গেলাম, তখন আমার চেয়ে কেউ শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিল না।" রাসুল ﷺ বললেন, "তুমি অবশ্য সত্য বলেছ। ওঠো, তোমার ব্যাপারে আল্লাহ ফায়সালা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

আমি উঠে গেলাম। আমার সাথে বনু সালিমার কিছু লোকও উঠল। তারা আমাকে বলল, "ইতিপূর্বে আমরা তোমার কোনো অপরাধের কথা জানি না; অথচ অন্যরা যে ওজর দেখিয়েছে, তুমি সে ওজর দেখাওনি। তোমার গুনাহের জন্য তো রাসুল ﷺ-এর ইসতিগফারই যথেষ্ট ছিল। তাদের ক্রমাগত ভর্ৎসনার কারণে আমি ইচ্ছা করলাম, রাসুল ﷺ-এর কাছে ফিরে যাই এবং পূর্বের কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করি। এরপর মুআজ বিন জাবাল ও আবু কাতাদা رضي الله عنهما-এর দেখা পেলাম। তাঁরা আমাকে বললেন, "সত্যের ওপর অটল থাকো,

---

১২০৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/১০৪০-১০৪১।

তোমার সাথিদের কথা শোনো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমার জন্য অচিরেই মুক্তির পথ করে দেবেন। আর ওজর পেশকারীরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আল্লাহ তার প্রতি রাজি হবেন এবং তাঁর রাসুলকে জানিয়ে দেবেন। আর যদি ভিন্ন কিছু হয়, তবে তাদের কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে জঘন্যভাবে তাদের তিরস্কার করবেন।" তাঁদের বললাম, "আমার এ অবস্থা কি অন্য কারও হয়েছে?" তাঁরা বললেন, "হ্যাঁ, দুই ব্যক্তি তোমার মতো বলেছে।" অথবা তাঁরা বলেছেন, "তোমার মতো তাদেরও একই অবস্থা হয়েছে।" বললাম, "তারা কারা?" তাঁরা বললেন, "হিলাল বিন উমাইয়া ও মুরারা বিন রবি।" তাঁরা আমার সামনে এমন দুজন সৎ লোকের কথা বললেন, যাদের মাঝে উত্তম আদর্শ আছে।

পেছনে থেকে যাওয়াদের মধ্য থেকে রাসুল ﷺ আমাদের এই তিন জনের সাথে লোকদের কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। লোকেরা আমাদের পরিহার করল। আমাদের ক্ষেত্রে কেমন যেন লোকেরা পরিবর্তন হয়ে গেল। একসময় আমাকে নিজের কাছে অপরিচিত মনে হতে লাগল। যে জমিনকে আমি চিনতাম, সে জমিনও আমার কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমরা ৫০ দিন অতিবাহিত করলাম। আমার দুই সাথি নিজের ঘরে বসে থাকল। আমি ছিলাম সবার শক্তিশালী। আমি লোকসমাজে, বাজারঘাটে ও সালাতে শামিল হতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। সালাতের পরে রাসুল ﷺ তাঁর মজলিশে থাকতেন, আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে সালাম করতাম। মনে মনে বলতাম, সালামের জবাবে রাসুল ﷺ কি তাঁর ঠোঁট নাড়িয়েছেন! কখনো তাঁর কাছে সালাতে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে গোপনে দৃষ্টি দিতাম। যখন আমি সালাতে মন দিতাম, তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন। যখন তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

আমার ওপর মুসলিমদের এমন কঠোরতা দীর্ঘায়িত হলো। একদিন চলতে চলতে আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল টপকিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। আল্লাহর শপথ, সে আমার সালামের উত্তর দিল না। তাঁকে বললাম, "হে আবু কাতাদা, তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তুমি কি জানো না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি।" সে চুপ করে থাকল। আবার বললাম, "হে আবু কাতাদা, তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তুমি কি জানো না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি?"

সে চুপ থাকল। তৃতীয়বার আবার তাঁকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বললাম। তখন সে বলল, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।" তখন আমার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। আমি লাফ দিয়ে বাগান থেকে বের হয়ে আসলাম।

পরের দিন বাজারে গেলাম। আমি বাজারে হাঁটছিলাম, এমন সময় দেখি, বাজারে ব্যবসা করতে আসা এক সিরিয়ার নাবতি লোক আমার সন্ধান করছে। সে বলছে, "কে আমাকে কাব বিন মালিকের সন্ধান বলে দেবে?" লোকেরা তাকে আমার দিকে ইশারা করে দেখাল। তখন সে গাসাসানার বাদশাহ হারিস বিন আবু শামিরার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পত্র দিল। সে পত্রে দেখলাম, লেখা আছে, "পরসংবাদ, আমি জানতে পেরেছি, তোমার সাথি তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তোমাকে অপমান ও লাঞ্ছনার ভূমিতে না রাখুন। তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমার কদর করব।" পত্র পড়ে বললাম, "এটাও আরেক বিপদ।" আমার বিপদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমার ব্যাপারে বেদ্বীনরাও লোভ করছে। পত্রখানা নিয়ে সোজা চুলায় নিক্ষেপ করলাম।

এ অবস্থায় ৪০ দিন অতিবাহিত করলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, রাসুল ﷺ-এর বার্তাবাহক আমার দিকে আসছে। এসে আমাকে বলল, "রাসুল ﷺ তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা হতে আদেশ করেছেন।" আমি বললাম, "তাকে তালাক দেবো, নাকি অন্য কিছু করব?" বলল, "না, বরং তার থেকে আলাদা থাকো, তার কাছে যেয়ো না।" তখন আমার স্ত্রীকে বললাম, "তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। তাদের কাছে থাকতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ এ ব্যাপারে কোনো ফায়সালা করেন।" আর হিলাল বিন উমাইয়া অনেক ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি কেঁদে মরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। তিনি খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এক নাগাড়ে দুই-তিন দিন পর্যন্ত একটু পানি বা দুধ ছাড়া কোনো খাবার স্পর্শ করতেন না। বাড়িতে বসে থাকতেন, কোথাও বের হতেন না। কারণ কেউ তার সাথে কথা বলে না। এমনকি সন্তানাদিরাও রাসুল ﷺ-এর আনুগত্যের কারণে তাকে পরিত্যাগ করেছিল। তার স্ত্রী রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, হিলাল বিন উমাইয়া অনেক বৃদ্ধ মানুষ। তার কোনো সেবক নেই। আমি তার বেশি ঘনিষ্ঠ। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি তার সেবা করতে চাই।" রাসুল ﷺ বললেন,

"আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু তাকে তোমার কাছে আসতে দিয়ো না।" তখন সে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, এখন আর আমার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। আল্লাহর শপথ, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে অঝোর ধারায় কাঁদছে। রাতদিন তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু পড়ছে। তার চোখ সাদা হয়ে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে, না জানি তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।" কাব বিন মালিক ﷺ বলেন, "আমার পরিবারের একজন আমাকে বলল, "যদি তুমি রাসুল ﷺ-এর কাছে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি চাইতে! তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তার খিদমত করার অনুমতি দিয়েছেন।" আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, আমি এ ব্যাপারে অনুমতি চাইব না। আমি একজন যুবক মানুষ। না, কখনো আমি তাঁর কাছে অনুমতি চাইব না।"

এরপর আমরা ১০ দিন এ অবস্থায় থাকলাম। আমাদের সাথে মুসলিমদের কথা বলা নিষেধের দিন থেকে ৫০ দিন পূর্ণ হলো। আমি আমাদের বাড়ির কোনো এক ছাদে ফজরের সালাত আদায় করলাম। আমার কাছে পুরো পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এমনকি আমি নিজেও আমার কাছে সংকীর্ণ হয়ে গেছি। আমি সালআ পাহাড়ের ওপর একটি তাঁবু টানিয়ে সেখানে অবস্থান করেছিলাম। হঠাৎ সালআ পাহাড়ের কাছে এক ব্যক্তিকে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার দিয়ে বলতে শুনলাম, "হে কাব বিন মালিক, সুসংবাদ গ্রহণ করো।" এটা শুনে আমি সিজদায় পড়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, বিপদ দূর হয়ে গেছে। রাসুল ﷺ ফজরের সালাতের পর আমাদের তাওবা কবুলের ঘোষণা দিয়েছেন।

যখন তাঁর আওয়াজ শুনলাম, তখন আমার কাপড়জোড়া খুলে তাঁকে দিয়ে দিলাম। আল্লাহর শপথ, এ ছাড়া সেদিন আমার কাছে অন্য কোনো বস্তু ছিল না। আবু কাতাদার কাছে দুটি কাপড় ধার নিয়ে পরিধান করলাম। এরপর রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। লোকেরা আমাকে তাওবার অভিবাদন জানিয়ে বলতে লাগল, "তোমার তাওবা কবুল ও সুখকর হোক!" আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। রাসুল ﷺ তখন লোকদের পাশে নিয়ে বসা ছিলেন। তখন তালহা বিন আবু তালহা আমার দিকে এসে আমাকে অভিবাদন জানাতে লাগল। তিনি ছাড়া কোনো মুহাজির আমার দিকে দাঁড়ায়নি। রাসুল ﷺ-কে সালাম দিলে রাসুল ﷺ-এর চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করে উঠল। আমাকে বললেন, "যেদিন তোমার মা তোমাকে জন্মদান করেছেন, সেদিনের

মতো পবিত্রতার সুসংবাদ গ্রহণ করো।" আমি বললাম, "আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে?" রাসুল ﷺ বললেন, "মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।" রাসুল ﷺ যখন আনন্দিত হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক আলোকিত হতো—যেন এক টুকরো চাঁদ। এটা তাঁর স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাঁর সামনে বসে বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে আমার তাওবার শুকরিয়া হবে, আমি আমার সমুদয় সম্পদ থেকে মুক্ত হয়ে যাব।" রাসুল ﷺ বললেন, "কিছু তোমার জন্য রাখো।" আমি বললাম, "খাইবারে যে অংশ পেয়েছিলাম, সেটা আমার জন্য রেখে দিলাম।" রাসুল ﷺ বললেন, "না।" আমি বললাম, "অর্ধেক রাখি।" রাসুল ﷺ বললেন, "না।" আমি বললাম, "তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ রাখি।" রাসুল ﷺ বললেন, "ঠিক আছে।"'

কাব রা. বলেন, 'আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সত্যের কারণে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন; তাই আল্লাহর কাছে আমার তাওবার শুকরিয়া হবে, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন কোনো মিথ্যা কথা বলব না।"' কাব রা. বলেন, 'আল্লাহর শপথ, যেদিন রাসুল ﷺ-এর কাছে সত্য বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেদিন থেকে এমন কাউকে জানি না, যাকে আল্লাহ সত্য বলার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে উত্তমভাবে পরীক্ষা করেছেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি চুল পরিমাণ মিথ্যা বলারও ইচ্ছা করিনি। আশা করি বাকি দিনগুলো আল্লাহ আমাকে হিফাজত করবেন।'

তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন :

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

'আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবির প্রতি, মুহাজিরদের প্রতি এবং আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবির সাথে ছিল, যখন তাদের একদলের অন্তর ফিরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর

তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। এবং অপর তিনজনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছেন, যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল। যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি; যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াশীল করুণাময়।'[১২০৫]

কাব বিন মালিক ﷺ বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আমাকে ইসলামের প্রতি হিদায়াত দেওয়ার পর রাসুল ﷺ-এর কাছে আমার সত্য বলা থেকে বড় কোনো নিয়ামত দান করেননি। সেদিন আমি রাসুল ﷺ-এর সামনে মিথ্যা বলিনি। বললে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম, অন্যরা মিথ্যা বলে ধ্বংস হয়েছে। যখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন :

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

"তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করবে; যেন তোমরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। অতএব তোমরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে তারা অপবিত্র, আর তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসেবে তাদের ঠিকানা হবে দোজখ। তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে; যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।"[১২০৬]

রাসুল ﷺ যাদের ওজর গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে আমাদের তিনজনের বিষয়টি আল্লাহর ফায়সালার ওপর রেখে দেন।'

১২০৫. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১৭-১১৮।
১২০৬. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৯৫-৯৬।

পশ্চাতে থেকে যাওয়া তিনজনের ঘটনার একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো। এখানে আবু কাতাদা ﷺ সম্পর্কে কিছু বিষয় বর্ণিত হয়েছে। শুধু আবু কাতাদা ﷺ-এর সম্পর্কিত অংশটুকু উল্লেখ করা সম্ভব ছিল। তাই পুরোটাই উল্লেখ করলাম; যাতে আমাদের জন্য তা শিক্ষণীয় হয়। এখানে জিহাদে না গিয়ে পেছনে পড়ে থাকাদের দুনিয়ার শাস্তির বিবরণ আছে। সাথে ইসলামি সমাজে জিহাদের আমলের গুরুত্বের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এ ছাড়াও আরও অনেক উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যমান আছে। সেসব বিষয় পাঠকদের জন্য রেখে দিলাম; যাতে কোনো কিছু উদ্‌ঘাটনের স্বাদ তারাও অনুভব করে।

তাবুক যুদ্ধে আবু কাতাদা ﷺ রাসুল ﷺ-এর পাহারাদারি করেছিলেন।[১২০৭]

৪. রাসুল ﷺ-এর পর

ক. মিথ্যা নবি দাবিদার তুলাইহা আল-আসাদি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ফিতনা খতম করে খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ 'বুতাহ'[১২০৮] অঞ্চলের মালিক বিন নুওয়াইরার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কিন্তু আনসারি সাহাবিগণ খালিদ ﷺ-এর বাহিনী থেকে পেছনে থাকতে চাইলেন। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে তারা বললেন, 'আমাদের কাছে খলিফার এ প্রতিশ্রুতি ছিল না। আমাদের কাছে খলিফার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা হচ্ছে আমরা বুজাখাহ[১২০৯] এলাকা থেকে অবসর হলে এবং তাদের এলাকা থেকে পরিপূর্ণ নিষ্কৃতি পেলে এখানেই অবস্থান করব, যতক্ষণ না তিনি আমাদের প্রতি দ্বিতীয় নির্দেশ প্রেরণ করেন।'

খালিদ ﷺ বললেন, 'যদি তোমাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি হয়, তবে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি ছিল, আমি সামনে অগ্রসর হব। আর আমি হচ্ছি তোমাদের আমির। আমার কাছেই খবরাখবর আসে। যদি আমার কাছে কোনো পত্র এবং কোনো নির্দেশ নাও আসে আর আমি কোনো সুযোগ দেখি, তবে তাকে জানাতে গিয়ে তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় হলে তাকে জানানো ছাড়াই

১২০৭. তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৬৪।

১২০৮. নাজদে খুজাইমা গোত্রের এলাকার একটি পানির উৎসের নাম বুতাহ। মুজামুল বুলদান : ৩/২১৪।

১২০৯. নাজদে তায়ি গোত্রের একটি পানির উৎসের নাম বুঝাখাহ। আবার বলা হয় সেটা আসাদ গোত্রের পানির উৎস। মুজামুল বুলদান : ২/১৬১।

আমি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করব। অনুরূপ আমরা যদি কোনো সমস্যায় পড়ি, যে ব্যাপারে খলিফার কোনো নির্দেশনা নেই, তাহলে আমাদের কাছে সর্বোত্তম ফায়সালা অনুযায়ী আমরা আমল করব। যাহোক, আমি ও আমার সাথে যারা আছে, তাদের নিয়ে মালিকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমি তোমাদের বাধ্য করতে পারি না।'

খালিদ ﷺ চলে গেলেন। আনসারগণ অনুতপ্ত হলেন। তারা বললেন, 'যদি মুসলিম বাহিনী কোনো কল্যাণ লাভ করে, তবে তোমরা তা থেকে বঞ্চিত হবে। আর যদি বিপদে পড়ে, তবে মানুষ তোমাদের পরিহার করবে।' এরপর তারা খালিদ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলেন।

খালিদ ﷺ বাতাহ অঞ্চলে পৌঁছে কাউকে পেলেন না। কারণ মালিক বিন নুওয়াইরা তার লোকদের ছড়িয়ে রেখেছিল এবং তাদের একত্র হতে নিষেধ করেছিল। তাই খালিদ ﷺ খণ্ড খণ্ড দল ছড়িয়ে দিলেন। তাদের নির্দেশ দিলেন; যাতে তারা ইসলামের দাওয়াত দেয়। যে দাওয়াত কবুল করবে না, তাকে নিয়ে আসবে এবং তাকে হত্যা করবে। আবু বকর ﷺ তাঁদের এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা কোথাও অবতরণ করলে আজান দেবে। যদি সেখানকার অধিবাসীরা আজান দেয়, তবে তাদের থেকে নিবৃত্ত থাকবে। আর যদি আজান না দেয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। তোমাদের দাওয়াতে সাড়া দিলে তাদের কাছে জাকাত চাইবে। জাকাত দিলে তা গ্রহণ করবে। আর যদি জাকাত দিতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'

খালিদ ﷺ-এর অশ্ববাহিনী সালাবা বিন ইয়ারবু গোত্রের কিছু লোকের সাথে মালিক বিন নুওয়াইরাকে বন্দী করে নিয়ে আসে। কিন্তু দলটি তাদের বন্দীদের ব্যাপারে মতানৈক্য করে বসে। আবু কাতাদা ﷺ তাদের সাথে ছিলেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, বন্দীরা আজান-ইকামাত দিয়ে সালাত আদায় করেছে। তারা যখন মতানৈক্য করল, তখন খালিদ ﷺ তাদের বন্দী করে রাখার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাদেরকে এক কনকনে শীতের রাতে বন্দী করে রাখা হলো। খালিদ ﷺ এক ঘোষককে এ ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা তোমাদের বন্দীদের তাপ দাও।' কিনানি ভাষায় এর অর্থ ছিল হত্যা করা। সৈনিকরা মনে করল তিনি হত্যা উদ্দেশ্য করেছেন; অথচ তিনি হত্যার উদ্দেশ্য নেননি। এরপর তারা বন্দীদের হত্যা করে।

দিরার বিন আজুর ﷺ হত্যা করেন মালিক বিন নুওয়াইরাকে। খালিদ ﷺ হত্যাকৃত লোকদের গোঙানি শুনে বের হন। ততক্ষণে তারা হত্যার কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে। খালিদ বললেন, 'আল্লাহ যখন কোনো ইচ্ছা করেন, তখন করে ফেলেন।' খালিদ ﷺ মালিক বিন নুওয়াইরার স্ত্রী উম্মে তামিমকে বিয়ে করেন।[১২১০]

অপর বর্ণনায় আছে, খালিদ ﷺ বনু তামিম গোত্রে খণ্ড খণ্ড দল ছড়িয়ে দেন। তার একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন দিরার বিন আজুর ﷺ। তিনি মালিক বিন নুওয়াইরার সাক্ষাৎ পান এবং উভয়ের মাঝে যুদ্ধ হয়। মালিক কিছু সঙ্গী-সাথি সহ বন্দী হয়। তাদেরকে খালিদ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের হত্যার নির্দেশ দেন। মালিককে হত্যার দায়িত্ব পান দিরার বিন আজুর ﷺ।

আরেক বর্ণনায় আছে, খালিদ ﷺ যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে মালিক ও তার বাহিনীর কাছে গেলেন, তখন মালিক খালিদ ﷺ-কে বলল, 'আমি সালাত আদায় করি, জাকাত দিই না।' খালিদ ﷺ বললেন, 'তুমি কি জানো না, সালাত ও জাকাতের একই বিধান! একটা ছাড়া অপরটা কবুল করা হয় না।' মালিক বলল, 'তোমাদের সাথি তো এ কথা বলেছে।' খালিদ ﷺ বললেন, 'তুমি কি তাকে তোমার সাথি মনে করো না।' আল্লাহর শপথ, আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছি।' এরপর উভয়ে বিতর্ক করে। তখন খালিদ ﷺ বলেন, 'আমি তোমাকে হত্যা করব।' মালিক বলল, 'তোমার সাথি কি তোমাকে এটারই নির্দেশ দিয়েছে?!' খালিদ ﷺ বললেন, 'এটা ওটা পরে।' এরপর তিনি তার হত্যার নির্দেশ দেন।[১২১১]

আবু কাতাদা ﷺ মদিনায় গিয়ে আবু বকর ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এবং মালিক ও তার সাথিদের হত্যার সংবাদ দিলেন। খবর শুনে আবু বকর ﷺ কেঁপে উঠলেন।[১২১২] তাঁর কাছে মালিকের স্ত্রীকে খালিদ ﷺ-এর বিয়ের সংবাদও জানালেন। সাথে শপথ করে বললেন, তিনি আর খালিদ ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদ করবেন না। কিন্তু আবু বকর ﷺ আবু কাতাদার ওপর অনেক

১২১০. ইবনুল আসির : ২/৩৫৮, আত-তাবারি : ৩/২৭৮।
১২১১. আত-তাবারি : ২৮০ পৃ., তারিখু আবুল ফিদা : ১/১৫৭-১৫৮।
১২১২. তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৭০।

রেগে গেলেন। একপর্যায়ে উমর ﷺ তাঁর সাথে কথা বললেন। তখন আবু কাতাদা ﷺ খালিদ ﷺ-এর কাছে ফিরে যেতে রাজি হলেন। ফিরে গিয়ে খালিদ ﷺ-এর সাথে অবস্থান করলেন। সফর শেষে খালিদ ﷺ-এর সাথে মদিনায় আসেন।[১২১৩]

আবু কাতাদা ﷺ-এর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যারা পরিতুষ্ট হতেন, উমর ﷺ তাদের একজন ছিলেন। আবু বকর ﷺ খালিদ ﷺ-কে ডেকে পাঠালেন। খালিদ ﷺ যুদ্ধের ময়দান থেকে মদিনায় আসেন। সাথে আবু কাতাদা ﷺ-ও আসেন। খালিদ ﷺ আবু বকর ﷺ-এর কাছে তাঁর ওজর পেশ করেন। আবু বকর ﷺ তাঁর ওজর গ্রহণ করে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এবং মালিকের রক্তপণ আদায় করে বন্দী ও সম্পদ ফিরিয়ে দেন।[১২১৪]

খালিদ ﷺ কেবল ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; তাই ইজতিহাদে ভুল করেছেন।[১২১৫] যে কথা আবু বকর ﷺ-ও বলেছেন। এ কারণে তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

কিন্তু আবু কাতাদা ﷺ শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর প্রশংসার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি সত্য প্রকাশ করেছেন। আমানতদারির সাথে স্পষ্ট ভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। সত্য বলা থেকে চুপ থাকেননি; যদিও সেটা তিক্ত।

এটা তাঁর সত্যের ওপর অবিচলতার প্রমাণ। তিনি সত্যের জন্য রেগে যান, সত্যের কারণে রেগে যান না। সত্যের খাতিরে তিনি কোনো তিরস্কারের পরোয়া করেন না।

বুতাহ যুদ্ধ এবং মালিক বিন নুওয়াইরার হত্যা হয়েছিল ১১ হিজরিতে।[১২১৬]

১২১৩. আত-তাবারি : ৩/২৭৮।
১২১৪. আত-তাবারি : ৩/২৭৮-২৭৯।
১২১৫. তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৭০।
১২১৬. আল-ইবার : ১/১৩।

তিনি রাসুল ﷺ থেকে ১৭০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১২১৭] ইমাম বুখারি ও মুসলিম ﷺ ১১টি হাদিস যৌথ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একক সূত্রে ইমাম বুখারি ﷺ দুটি হাদিস বর্ণনা করেন আর ইমাম মুসলিম ﷺ আটটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদিসগুলো প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।[১২১৮]

তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন রাসুল ﷺ থেকে, মুআজ বিন জাবাল ﷺ থেকে এবং উমর বিন খাত্তাব ﷺ থেকে। তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর দুই ছেলে সাবিত ও আব্দুল্লাহ এবং তাঁর আজাদকৃত গোলাম আবু মুহাম্মাদ নাফি বিন আব্বাস বিন আকরা, আনাস বিন মালিক, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন রবাহ আনসারি, মাবাদ বিন কাব বিন মালিক, আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ, আমর বিন সালিম আজ-জারকি, আব্দুর রহমান বিন মাবাদ জামানি, মুহাম্মাদ বিন সিরিন বিন নাবহান, কাবশাহ বিনতে কাব বিন মালিক ও আতা বিন ইয়াসারসহ আরও অনেকে।[১২১৯]

আবু কাতাদা ﷺ রাসুল ﷺ-এর ফতোয়া দানকারী সাহাবিদের একজন ছিলেন। তিনি খুব সামান্যই ফতোয়া দান করেছেন।[১২২০]

ইলমের ময়দানে এমনই ছিল আবু কাতাদা ﷺ-এর সুবিস্তৃত পদচারণা। এবং জিহাদের ময়দানেও তেমন ছিল তাঁর অসামান্য ভূমিকা এবং উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতা।

আলি ﷺ ও মুআবিয়া ﷺ-এর মাঝে ফিতনার সময় তিনি আলি ﷺ-এর সাথে ছিলেন। আলি ﷺ-এর সাথে তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১২২১] ৩৭ হিজরিতে খারিজিদের বিরুদ্ধে আলি ﷺ-এর যুদ্ধে তিনি পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন।[১২২২]

১২১৭. আসমাউস সাহাবিতির রুওয়াত- মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ লি ইবনি হাজম : ২৭৭ পৃ.।
১২১৮. খুলাসাতু তাহজিবি তাহজিবিল কামাল : ৪৫৭ পৃ.।
১২১৯. তাহজিবুত তাহজিব : ১২/২০৪।
১২২০. আসহাবুল ফুতইয়া মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ : ৩২৩ পৃ.।
১২২১. উসদুল গাবাহ : ৫/২৭৫, ইবনুল আসির : ৩/২২১।
১২২২. ইবনুল আসির : ৩/৩৪৫।

আলি ﷺ তাঁকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে বাদ দিয়ে কাসাম বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে নিযুক্ত করেন। ৪০ হিজরিতে আলি ﷺ ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি মক্কার গভর্নর পদে বহাল থাকেন।[১২২৩]

৫৪ হিজরিতে ৭০ বছর বয়সে তিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।[১২২৪] এ ক্ষেত্রে আলিমদের কোনো মতানৈক্য আমাদের জানা নেই।[১২২৫] ইমাম বুখারি তাঁকে আওসাত গ্রন্থে 'যিনি ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে এই মত শক্তিশালী হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, আবু কাতাদা ﷺ ৫০ হিজরির পরেও বেঁচে ছিলেন।[১২২৬] ৫০ হিজরির পরে তাঁর ইনতিকালের মতকে সমর্থন করে এ বর্ণনাটিও, মুআবিয়া ﷺ যখন মদিনায় আসলেন, তখন লোকেরা তাঁর সাথে দেখা করল। তিনি আবু কাতাদা ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা ছাড়া সকলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এল।'[১২২৭]

একটি দুর্বল মতানুসারে তিনি কুফায় বসবাস করেন এবং সেখানে ইনতিকাল করেন। আলি ﷺ তাঁর জানাজা পড়ান। অথচ তিনি ৪০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। আলি ﷺ তাঁর জানাজায় সাত তাকবির বলেন। আবার বলা হয়, ছয় তাকবির বলেন।[১২২৮]

তবে ৭০ বছর বয়সে ৫৪ হিজরিতে আবু কাতাদা ﷺ-এর ইনতিকালের মতটি অধিক বিশুদ্ধ। কারণ উলামায়ে কিরাম ও ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এভাবেই তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১২২৩. তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/১৮৫, ইবনুল আসির : ৩/৩৮৭, আল-ইবার : ১/৪৬।
১২২৪. আল-ইসতিআব : ৪/১৭৩২, আল-ইসতিবসার : ১৪৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৬/১৫, ইবনুল আসির : ৩/৫০০।
১২২৫. আল-ইসাবাহ : ৭/১৫৬।
১২২৬. তাহজিবুত তাহজিব : ১২/২০৫।
১২২৭. আল-ইসাবাহ : ৭/১৫৬।
১২২৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৬/১৫, উসদুল গাবাহ : ৫/২৭৫, আল-ইসাবাহ : ৭/১৫৬।

রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে উহুদসহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। অনুরূপ রাসুল ﷺ-এর আরও অনেক অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে দুটি অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-এর নেতৃত্বে রিদ্দার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আলি ﷺ-এর খিলাফতকালে তাঁর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর বিস্তারিত জীবনী থেকে যে শিক্ষা পাই, তা হচ্ছে, তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই অতিবাহিত হয়েছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে। আর জীবনের সামান্য অংশ ব্যয় হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রে। এর থেকে বোঝা যায়, জিহাদের ময়দানে সৈনিক ও কমান্ডারের পদে তাঁর ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা।

আরব হওয়ার সুবাদে তির-বর্শা চালনা ও তরবারির মাধ্যমে দ্বন্দ্বযুদ্ধের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জনে ছিল তাঁর বিপুল আগ্রহ। তিনি নেতৃত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে আরেকটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। আর তা হলো অর্জিত জ্ঞান।

তাঁর সামরিক ইতিহাসের পাঠ থেকে আমরা এটা সাব্যস্ত করতে পারি না যে, তিনি স্বভাবজাত কমান্ডার ছিলেন। কারণ তিনি বড় কোনো যুদ্ধে নেতৃত্ব দেননি এবং জাজিরাতুল আরবের বাইরে ইসলামের শত্রুর ওপর চূড়ান্ত কোনো বিজয়ও আনতে পারেননি। যেমনটা করেছেন অন্যান্য কমান্ডারগণ। তাই আমরা নিশ্চিন্ত মনে তাঁর দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি। এক. বাস্তব অভিজ্ঞতা, দুই. অর্জিত জ্ঞান। এর মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্যকে আমরা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করতে পারি না।

সাধারণভাবে আবু কাতাদা ﷺ-এর মাঝে যুদ্ধনীতির বৈশিষ্ট্য খুঁজলে দেখা যায়, তিনি টার্গেট নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করতেন। তাড়াপ্রবণতা থেকে দূরে থেকে সুকৌশলী পরিকল্পনায় টার্গেট বাস্তবায়ন করতেন।

তিনি ছিলেন আক্রমণাত্মক কমান্ডার। সামরিক জীবনে সৈনিক বা কমান্ডার কোনো অবস্থাতেই তিনি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের পথে হাঁটেননি। শুধু খন্দক যুদ্ধ

ছাড়া, যেহেতু সে যুদ্ধটাই ছিল আত্মরক্ষামূলক; কিন্তু সেটাও ছিল মুসলিমদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সূচনামাত্র।

তিনি আকস্মিক আক্রমণের নীতি চমৎকারভাবে বাস্তবায়ন করতেন। তিনি তাঁর দুটি অভিযান এই নীতি সামনে রেখেই আশ্চর্যজনকভাবে পরিচালনা করেছিলেন।

স্থান ও কাল উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করে অভিযানে বের হতেন। সে শক্তি খরচে মধ্যমপন্থার কথা মাথায় রাখতেন সযত্নে।

নিরাপত্তার নীতি মেনে চলতেন কঠোরভাবে। ফলে শত্রুর ওপর উত্তমভাবে আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করতে পারতেন; কিন্তু শত্রু তাঁর ওপর আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ পেত না।

তাঁর পরিকল্পনা এতটাই সুসংহত থাকত যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের পরও তাঁর থাকত উপযুক্ত পরিকল্পনা। কিন্তু সেই পরিবর্তন মূল পরিকল্পনায় কোনো প্রভাব ফেলত না।

তাঁর শক্তি ও মুসলিমদের শক্তির মাঝে, কমান্ডার ও সৈনিকদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি বাস্তবায়ন করতেন।

সৈনিকদের মানসিক অবস্থা চাঙা রাখতেন সব সময়। এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা সজাগ থাকতেন। মানসিক অবস্থা চাঙা রাখতে চালিকাশক্তি ছিল সুদৃঢ় ইমান, প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্ব, নীতি নির্ধারণ, নিঃশর্ত আনুগত্য ও প্রাণপণ বিজয়ের চেষ্টা।

যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধ চলাকালে সৈনিকদের পরিচালনায় খুবই তৎপর থাকতেন। অনুরূপভাবে তৎপর থাকতেন যুদ্ধের পরে ইনসাফের সাথে গনিমত বণ্টনে।

এ হচ্ছে আবু কাতাদা ﷺ-এর কমান্ডার হিসেবে সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি। এ ছাড়াও তিনি তাঁর সৈনিকদের দুজনের মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দিতেন। একদিকে তাদের উভয়ের মাঝে মজবুত বন্ধন, অপরদিকে তাদের ও তাঁর শক্তির মাঝে মজবুত বন্ধন নিশ্চিত করতেন। একদিকে প্রত্যেক দুজনের মাঝে নিরাপত্তার

পদ্ধতি যেমন স্পষ্ট করতেন, তেমন অপরদিকে বাহিনীর সকল সদস্যদের নিরাপত্তার পদ্ধতি স্পষ্ট করতেন।

সৈনিকদের আনুগত্য, শৃঙ্খলা এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব ও তাদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং বিজয় অর্জনে তাঁর নির্দেশনাবলি হতো সুস্পষ্ট। বলা যায় শৃঙ্খলা ও স্পষ্ট নির্দেশনার ক্ষেত্রে বাকি কমান্ডারদের থেকে তিনি এগিয়ে ছিলেন।

তাঁর নেতৃত্বের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলির ক্ষেত্রে তিনি বাকি কমান্ডারদের সদৃশ ছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ তাঁরা তো সকলেই রাসুল ﷺ-এর বিদ্যাপীঠ থেকে গ্রাজুয়েশন নিয়েছিলেন। তাঁরা একই পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন।

তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। যে শত্রুর বিরুদ্ধে ও যে ভূমিতে লড়বেন, তার তথ্য ও খবরাখবর অর্জনে তৎপর থাকতেন। এ কারণে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো হতো দ্রুত এবং সঠিক নীতির ওপর নির্ভর করে।

তিনি ছিলেন নির্ভীক দুঃসাহসী। আরবে কমান্ডার হওয়ার মূলনীতিই ছিল নির্ভীক ও দুঃসাহসী হওয়া এবং ভীরু ও কাপুরুষ না হওয়া।

তিনি ছিলেন দৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী। যুদ্ধের প্রতি এমন প্রবল ইচ্ছা তাঁর মাঝে দ্বীনি হানিফ তথা ইসলামই গেঁথে দিয়েছিল। এই ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি বিজয় বা শাহাদাতের পানে ছুটে চলতেন। এর বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যের মাঝে তা ব্যয় হতো না।

তাঁর ছিল একটি অবিচল হৃদয়। জয়-পরাজয় কোনো অবস্থায় তাতে পরিবর্তন আসত না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কদর ও ফায়সালার প্রতি অবিচল ইমানই হৃদয়ের ওপর কর্তৃত্ব করে থাকে।

তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। প্রত্যেক অবস্থার জন্য উপযোগী ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে নিতেন। সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাকে তিনি হিসেবে রেখে কাজ করতেন। যাতে মনের অজান্তে কোনো বিপদে পড়তে না হয়।

সৈনিকদের যোগ্যতা ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। ফলে প্রত্যেককে তার যোগ্যতা উপযোগী দায়িত্ব দিতেন। সৈনিকদের প্রতি ছিল তার আত্মবিশ্বাস এবং সৈনিকদেরও ছিল তাঁর প্রতি আত্মবিশ্বাস। তেমন প্রধান নেতৃত্বের কাছেও ছিল আত্মবিশ্বাস। তিনি যেমন সৈনিকদের ভালোবাসতেন, সৈনিকরাও তাঁকে তেমন ভালোবাসত।

তাঁর ছিল প্রভাব বিস্তারকারী এক ব্যক্তিত্ব। যার ফলে সৈনিকরা তাঁকে সমীহ করত; কিন্তু আতঙ্কিত হতো না। এবং স্বেচ্ছায় তাঁর আদেশ পালন করত।

তাঁর শরীর ছিল সুঠাম ও পরিবেশবান্ধব। যা তাঁকে জিহাদের পথে বাধা-বিপত্তি মাড়াতে এবং যুদ্ধের কষ্ট-ক্লেশ সহ্যে সাহায্য করত।

ইসলাম ও মুসলিমের সেবায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি একনিষ্ঠতার কারণে তিনি ছিলেন সম্মানিত শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

আর এসব বৈশিষ্ট্যের প্রাণ ছিল তাঁর অবিচল ইমান এবং ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য জানমাল উৎসর্গ করার প্রস্তুতি। যদি তাঁর এই সুদৃঢ় ও অবিচল ইমান না থাকত, তবে আজ কেন; বরং তাঁর সময়েই তাঁকে কেউ চিনত না। এবং ইতিহাসও তাঁকে স্মরণ রাখত না। এই ইমানই তাঁর মর্যাদা উন্নত করেছে এবং তাঁকে পরিণত করেছে সত্যনিষ্ঠ এবং সেরা মুজাহিদে।

ইতিহাসে আবু কাতাদা ﵁

তিনি উহুদসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। দুটি অভিযানের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দুই অভিযানে নেতৃত্ব দানের আগে আটটি গাজওয়া ও তিনটি সারিয়্যা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। আর অভিযানের পরে অংশগ্রহণ করেন দুটি গাজওয়া ও একটি সারিয়্যা অভিযানে।

তিনি রাসুল ﷺ-এর কোনো গাজওয়া বা সারিয়্যা থেকে পিছপা হননি। প্রতিটি গাজওয়া ও অভিযানে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন।

রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর পুরো জীবনটাই কাটিয়েছেন গাজওয়া ও সারিয়্যা অভিযানে। তাওহিদের কারণে মুজাহিদ অবস্থায় কখনো আরাম ও বিশ্রাম করেননি।

রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-এর নেতৃত্বে মুরতাদদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে জিহাদ করেছেন। আলি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন কখনো মুজাহিদবেশে, কখনো কমান্ডারের দায়িত্বে, কখনো বা মক্কায় গভর্নর হিসেবে। আর সব সময়ের জন্য ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা হিসেবে।

সত্যের ক্ষেত্রে তিনি কোনো তিরস্কারের পরোয়া করতেন না। সর্বদা জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুমের পক্ষে অবস্থান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির ওপর তাঁর রহমতের শিশিরধারা জারি রাখুন। আমিন।

কমান্ডার

সাদ বিন জাইদ আল-আওসি ﷺ

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

সাদ বিন জাইদ বিন মালিক বিন আবদ বিন কাব বিন আব্দুল আশহাল বিন জুশাম বিন খাজরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস বিন হারিস।[১২২৯]

তাঁর মাতা : আমরাহ বিনতে মাসউদ বিন কাইস বনি আমর বিন জাইদ মানাত বিন আদি বিন আমর বিন মালিক বিন নাজ্জার। তিনি খাজরাজ গোত্রের লোক। আমরাহ আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১২৩০] এবং তাঁর বোন উম্মে নাইয়ার বিনতে জাইদও এই বাইআতে শরিক হয়েছিলেন।[১২৩১]

আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে ৭০ জন আনসারি সাহাবির সাথে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন।[১২৩২] এই বাইআতে রাসুল ﷺ তাদের কাছে নিজের নিরাপত্তা চেয়েছিলেন, যেভাবে তারা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। আর রাসুল ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের কাছে চলে যাওয়ার বিষয়টিও

১২২৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৩৯, উসদুল গাবাহ : ২/২৭৯, আল-ইসাবাহ : ২/৭৮, জামাহারাতু আনসাবিল আশরাফ : ৩৩৯, আল-ইসতিবসার : ২০৫ পৃ.।

১২৩০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৩৯।

১২৩১. আল-মুহাব্বার : ৪১৭ পৃ.।

১২৩২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৩৯।

বাইআতে ছিল।[১২৩৩] সেই বাইআতে রাসুল ﷺ-এর সাথে আব্বাস ﷺ-ও উপস্থিত হয়েছিলেন; অথচ তখনও তিনি পূর্বের ধর্মে ছিলেন।

হিজরতের অনুমতি পেয়ে রাসুল ﷺ ও সাহাবিগণ মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে রাসুল ﷺ সাদ বিন জাইদ ﷺ ও আমর বিন সুরাকাহ ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দেন।[১২৩৪]

তিনি সূচনাতে ইসলাম কবুল করেছেন। এবং ইসলামের প্রধান দুর্গ মদিনায় নতুন ইসলামি সমাজের একজন সদস্যে পরিণত হয়েছিলেন। এতটুকু ছাড়া তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।

জিহাদ

১. গাজওয়া ও সারিয়্যা অভিযান

ক. সাদ ﷺ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১২৩৫] মদিনা থেকে বদরের ময়দানে যাওয়ার পথে সাদ ﷺ, সালামা অথবা সাল্লামা ﷺ, আব্বাদ বিন বিশর ﷺ, রাফি বিন ইয়াজিদ ﷺ ও হারিস বিন খাজামাহ ﷺ—এই পাঁচজন মিলে সাদ ﷺ-এর একটি উটনীতে পালাক্রমে আরোহণ করেন। যে উটনীটি মূলত পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হতো। পাথেয় হিসেবে সাদ ﷺ এক সা খেজুর নিয়েছিলেন।[১২৩৬] এটিই ছিল তাঁর ও তাঁর সাথিদের পাথেয়।

সম্ভবত সাদ ﷺ তাঁর সাথিদের তুলনায় একটু সচ্ছল ছিলেন। এ কারণে তিনি তাদেরকে নিজের উটে করে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং নিজের ও সাথিদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১২৩৩. জাওয়ামিউস সিরাহ : ৭৪ পৃ., আদ-দুরার : ৭৪ পৃ.।
১২৩৪. আল-ইসতিআব : ২/৫৯২, উসদুল গাবাহ : ২/২৮০।
১২৩৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩৩৩, উসদুল গাবাহ : ২/২৮০, আল-ইসাবাহ : ২/৭৮, আল-ইসতিআব : ২/৫৯২।
১২৩৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৪।

খ. তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[১২৩৭] যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসুল ﷺ সাহাবিদেরকে বনু হারিসার পথ দিয়ে উহুদে নিয়ে যান। রাসুল ﷺ বললেন, 'কে আমাদের সুন্দরভাবে শত্রুর কাছে নিয়ে যাবে।' বনু হারিসার লোক আবু খাইসামা ﷺ বললেন, 'আমি ইয়া রাসুলাল্লাহ!' তখন তিনি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে বনু হারিসার মাল-সম্পদের পাশ দিয়ে চললেন। একপর্যায়ে মিরবা বিন কাইজির মালের পাশ দিয়ে গেলেন। মিরবা মুনাফিক ছিল। তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ছিল। সে মুসলিম বাহিনীর সামনে গিয়ে মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। সাহাবিগণ তাকে হত্যার জন্য উদ্যত হলে রাসুল ﷺ বললেন, 'তাকে হত্যা করো না। সে তো অন্ধ। তার চক্ষুও অন্ধ অন্তরও অন্ধ।' অবশ্য সাদ বিন জাইদ ﷺ রাসুল ﷺ-এর নিষেধের আগেই ধনুক দিয়ে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তার মাথা বেয়ে রক্ত পড়ছিল।[১২৩৮]

গ. মুরাইসির যুদ্ধে অশ্ববাহিনীতে অংশগ্রহণ করেন।[১২৩৯] এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরির শাবান মাসে।

ঘ. পঞ্চম হিজরির জিলকদ মাসে বনু কুরাইজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেও তিনি অশ্ববাহিনীতে ছিলেন।[১২৪০]

ঙ. ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে জি-কারাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১২৪১] এ যুদ্ধেও তিনি অশ্ববাহিনীতে যোগদান করেন। রাসুল ﷺ তাঁকে অশ্ববাহিনীর আমির নিযুক্ত করেছিলেন।[১২৪২] তাঁর ঘোড়ার নাম ছিল 'লাহিক'। মুশরিকরা মুসলিমদের যে সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল, তিনি সে সম্পদের কিছু উদ্ধার করে মুশরিকদের পরাজিত করতে সক্ষম হন।[১২৪৩]

১২৩৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৩৬।
১২৩৮. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৫৮ পৃ., আদ-দুরার : ১৫৪-১৫৫ পৃ., ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২১৮, আল-ইসতিবসার : ২২৬ পৃ., আনসাবুল আশরাফ : ১/৩১৫।
১২৩৯. খুজাআহ গোত্রের একটি পানির উৎসের নাম মুরাইসি। মুরাইসি ও ফুর' এর মাঝে প্রায় এক দিনের দূরত্ব। ওয়াফাউল ওয়াফা : ২/৩৭৩। ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৪০৫।
১২৪০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৯৮।
১২৪১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮০।
১২৪২. আদ-দুরার : ১৯৮ পৃ., ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৪১।
১২৪৩. আদ-দুরার : ১৯-১৯৯ পৃ.।

সেই দিনের ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর কবি হাসসান বিন সাবিত ﷺ বলেন :

> 'আমাদের কি লাকিতার সন্তানেরা আনন্দিত করেনি, মিকদাদের অশ্বারোহী দল নিরাপদে আক্রমণ করেছেন।'

সেদিনের অশ্ববাহিনীর প্রধান যেহেতু সাদ বিন জাইদ ﷺ ছিলেন, সে কারণে তিনি হাসসান বিন সাবিত ﷺ-কে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'কীভাবে আপনি অশ্ববাহিনীকে মিকদাদের সাথে সম্পৃক্ত করলেন, কেন আমার সাথে সম্পৃক্ত করলেন না?' তখন হাসসান ﷺ অপর একটি পঙ্‌ক্তিতে ওজর পেশ করেন। কবিতায় লাকিতা বলে উম্মে হিসনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১২৪৪]

জি-কারাদ যুদ্ধে অশ্ববাহিনীর নেতৃত্ব পাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে সাদ ﷺ বলেন, 'যখন মদিনার চারণভূমি থেকে আমার কাছে খবর এল, তখন আমি বনু আশহাল গোত্রে ছিলাম। খবর শুনে আমি বর্ম পরে অস্ত্র নিয়ে আমার ঘন কেশবিশিষ্ট ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। এ ঘোড়ার নাম ছিল "নাজল"। রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে দেখি, তিনি লৌহবর্ম দিয়ে পুরো শরীর ঢেকে নিয়েছেন। তাঁর শুধু চোখদুটি দেখা যাচ্ছে। অশ্ববাহিনী তখন "কনাতের" দিকে যাচ্ছিল।[১২৪৫] রাসুল ﷺ আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "হে সাদ, অভিযানে যাও। আমি তোমাকে অশ্ববাহিনীর আমির নিযুক্ত করলাম, যতক্ষণ না আমি এসে তোমার সাথে মিলিত হই, ইনশাআল্লাহ।" এরপর ঘোড়াকে কিছুক্ষণ স্বাভাবিক গতিতে চালালাম। তারপর ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটতে থাকল। চলতে চলতে একটি ক্লান্ত ঘোড়ার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। বললাম, "এ কী?" এরপর আবু কাতাদা ﷺ-এর হাতে নিহত ব্যক্তি মাসআদার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। এরপর মুহরিজের লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। এতে আমি দুঃখ পেলাম। তারপর মিকদাদ বিন আমর ও মুআজ বিন আসের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। আমরা একসাথে হলাম। তখন শত্রুদের ধাওয়াকারী মুসলিমদের চলার ধুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁদের পেছনে ছিলেন আবু কাতাদা ﷺ। এরপর দেখি, সালামা বিন আকওয়া ﷺ অশ্ববাহিনীকে পেছনে ফেলে শত্রুর সামনে চলে গেছেন এবং তির দিয়ে তাদের শিকার করছিলেন। ফলে শত্রুরা কিছুটা থেমে

১২৪৪. আল-ইসাবাহ : ২/৭৮, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৪৮।
১২৪৫. কনাত মদিনার একটি উপত্যকা। মুজামুল বুলদান : ৭/১৬৬।

গেছে। এরপর আমরা তাদের সাথে মিলিত হয়ে কিছুক্ষণ শত্রুর ওপর হামলা করলাম। আমি হাবিব বিন উয়াইনার ওপর হামলা করে তার বাম কাঁধ নামিয়ে দিলাম। সে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিল। এবং ঘোড়া থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আমি আবার হামলা করে তাকে শেষ করে দিলাম। তার ঘোড়া নিয়ে নিলাম। সেদিন আমাদের শ্লোগান ছিল "মারো, মারো।"' এখানে হুবাইব বিন উয়াইনা হত্যার অন্য একটি কারণ আছে।

সাদ ﷺ মাসআদার সামানাপত্র নিয়ে নিয়েছিলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'না, কখনোই হবে না। আবু কাতাদা মাসআদাকে হত্যা করেছে। অতএব তাঁকে সামানাপত্র দিয়ে দাও।'[১২৪৬]

চ. ষষ্ঠ হিজরির শাওয়াল মাসে পরিচালিত কুরজ বিন জাবির ﷺ-এর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এ অভিযান ছিল মুসলিমদের সেই রাখালদের বিরুদ্ধে, যারা আমানতের খিয়ানত করেছিল এবং রাসুল ﷺ-এর আজাদকৃত গোলামের হাত-পা কেটে দিয়ে হত্যা করেছিল। এরপর চারণভূমির গবাদি পশু তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সাদ ﷺ এ অভিযানে ঘোড়সওয়ার ছিলেন। অভিযানটি ঘাতকদের বন্দী করে গবাদি পশুগুলো ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।[১২৪৭]

ছ. তিনি হুদাইবিয়ার অভিযানেও অশ্বারোহী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। একটি দুর্বল মতানুসারে তিনি সেই অশ্ববাহিনীর আমির ছিলেন, যে অশ্ববাহিনীকে রাসুল ﷺ মূল অশ্ববাহিনীর আগে গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এদের সংখ্যা ছিল ২০ জন।[১২৪৮]

১২৪৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৪৪।
১২৪৭. বিস্তারিত দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৬৮-৫৭১।
১২৪৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৭৪।

২. মানাত অভিমুখে অভিযানের কমান্ডার[১২৪৯]

মক্কা-বিজয়ের পর রাসুল ﷺ ২০ জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে সাদ বিন জাইদ ﷺ-এর নেতৃত্বে মানাত মূর্তি ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আওস, খাজরাজ ও গাসসানি সম্প্রদায়ের কাছে মানাত পূজিত ছিল। মক্কা-বিজয়ের দিন রাসুল ﷺ সাদ বিন জাইদ ﷺ-কে সেই মূর্তি ভেঙে দেওয়ার জন্য পাঠান। সাদ ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছেন। প্রহরী তাঁকে বলল, 'কী চাও?' বললেন, 'মানাতকে ভেঙে ফেলব।' তখন প্রহরী বলল, 'এর জন্য সে তোমার সাথে বোঝাপড়া করবে।'

সাদ ﷺ হেঁটে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তখন এলোমেলো কেশবিশিষ্ট এক কালো নগ্ন নারী বুক চাপড়িয়ে হায় হায় করতে করতে বের হয়ে আসলো। তখন প্রহরী বলল, 'মানাত, তোমার শক্তি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করো।' কিন্তু সাদ ﷺ তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

এরপর সাদ ﷺ তাঁর সৈনিকদের নিয়ে মূর্তির কাছে গিয়ে মূর্তিকে ভেঙে ফেলেন। তার ধনভান্ডারে তাঁরা কিছুই পাননি। এরপর তাঁরা রাসুল ﷺ-এর কাছে ফিরে আসেন। এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল রমাদানের ছয় দিন বাকি থাকতে।[১২৫০]

৩. সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদ

সাদ ﷺ বদর, উহুদ ও খন্দকসহ রাসুল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[১২৫১] কয়েকটি সারিয়্যা অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছেন। এবং গাসসানের মানাত মূর্তিসহ অন্যান্য আরব গোত্রের মূর্তি ভাঙার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এভাবে জিহাদের ময়দানে কখনো কমান্ডার এবং কখনো

১২৪৯. আরবের সবচেয়ে প্রাচীন মূর্তি হচ্ছে মানাত। মানুষ তখন এভাবে নাম রাখত আবদে মানাত। জাইদে মানাত। মক্কা-মদিনাসহ তার আশপাশের গোটা আরব এই মানাতের পূজা-অর্চনা করত। তার সামনে নজর-নাওয়াজ এবং পশু কুরবানি করত। সবচেয়ে এই বেশি সম্মান শ্রদ্ধা করত আওস এবং খাজরাজ গোত্রদ্বয়। দেখুন, কালবির কিতাবুল আসনাম : ১৩ পৃ.।

১২৫০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১/১৪৬-১৪৭। উয়ুনুল আসার : ২/১৮৫, ইবনুল আসির : ২/২৬০, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৮১।

১২৫১. আল-ইসতিআব : ২/৫৯২, আল-ইসতিবসার : ২২৬ পৃ., তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৩৯।

সৈনিক হয়ে তাঁর জিহাদের দায়িত্ব আদায় করেছেন। যা গভীর মূল্যায়নের দাবি রাখে।

তিনি বাস্তবে একজন সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদ ছিলেন।

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

আমরা তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানতে পারিনি। মানুষ হিসেবে তাঁর যতটুকু বিবরণ এসেছে, তা একেবারেই সামান্য। অথচ তিনি রাসুল ﷺ-এর একজন কমান্ডার ও বদরি সাহাবি। আর বদরি সাহাবিদের বিবরণ বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে। কারণ ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে তাঁদের ভূমিকা ছিল বিরাট।

সাদ ﷺ-এর জীবনবৃত্তান্ত তাঁর গভীর ইমানের স্বাক্ষর বহন করে। রাসুল ﷺ যখন আম্মাজান মাইমুনা ﷺ-কে বিয়ে করলেন, তখন হুয়াইতিব বিন আব্দুল উজ্জা এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, তোমার সময় শেষ, আমাদের দেশ থেকে বের হয়ে যাও।' তখন তাকে সাদ ﷺ বলেছিলেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছ। এটা তোমার দেশ নয়। এটা তাঁর দেশ। তাঁর বাপদাদার দেশ।' রাসুল ﷺ বললেন, 'সাদ, আস্তে। আমাদের প্রতিবেশীর সাথে কঠোরতা করো না। হে হুয়াইতিব, তোমাদের মাঝে আমরা বাস করছি। তোমরাও খাচ্ছ, পরছ। আমরাও খাচ্ছি পরছি, এতে তোমার সমস্যা কী?'[১২৫২]

সাদ ﷺ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে রাসুল ﷺ বনু কুরাইজার এক বন্দীকে দিয়ে নাজদে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেই বন্দীর বিনিময়ে ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয় করেছিলেন।[১২৫৩]

সাদ ﷺ রাসুল ﷺ-কে নাজরানের একটি তরবারি হাদিয়া দিয়েছিলেন। রাসুল ﷺ সে তরবারি মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ-কে দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। যখন মানুষের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেবে, তখন সেটাকে পাথরের ওপর আঘাত করে (ভোঁতা করবে), এরপর ঘরে বসে

১২৫২. আল-মুহাব্বার : ৯১-৯২ পৃ.।
১২৫৩. আল-ইসতিআব : ২/৫৯২, উসদুল গাবাহ : ২/২৮০, আল-ইসতিবসার : ২২৬ পৃ.।

থাকবে।'[১২৫৪] তিনিই ফিতনার সময় ঘরে বসে থাকার হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১২৫৫]

অনুরূপ তিনি এ হাদিসও বর্ণনা করেছেন, রাসুল ﷺ যখন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন কয়েকটি পুরাতন কাপড় জড়িয়ে বের হয়ে আসলেন এবং মিম্বারের ওপর উপবেশন করলেন। এরপর বললেন, 'লোক সকল, এই জনবসতির আনসারদের সম্পর্কে আমার উপদেশ হিফাজত করো। কারণ তারা আমার ঘনিষ্ঠজন এবং একান্ত ব্যক্তি। অতএব তাঁদের ভালো কর্মসমূহ গ্রহণ করো এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দাও।' এ হাদিসটি আবু নুআইম ﵀ একাই বর্ণনা করেছেন। হাদিসের তিন ইমাম এ হাদিসটি পিতার সাথে সম্পৃক্ত না করে বর্ণনা করেছেন।[১২৫৬] আর সাদ বিন জাইদ বিন মালিক দ্বারা এই সাদ বিন জাইদই উদ্দেশ্য। মতানৈক্য শুধু দাদার ক্ষেত্রে হয়েছে।

তাঁকে আবু আব্দুল্লাহ উপনামে ডাকা হতো। মৃত্যুর সময় তিনি উত্তরসূরি রেখে যান।[১২৫৭]

সম্ভবত তাঁর আলোচনা কম হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি রাসুল ﷺ থেকে অল্পসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন। যার কারণে সেই মুহাদ্দিসগণ তাঁর ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছেন, যারা সাধারণত সেসব বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দান করেন, যার মাধ্যমে সেরা মানুষ হিসেবে নির্বাচিত হওয়া যায়। আর ঐতিহাসিকগণ তাঁর জিহাদি কর্মধারার ওপর বেশি নজর দিয়েছেন।

তাঁর সামান্য আলোচনাই মতানৈক্যপূর্ণ হয়ে আছে। কারণ এই সামান্য আলোচনা একাধিক সাদকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই কারণে অনেক সময় বদরি সাহাবিদের আলোচনা অল্প পরিমাণে হয়ে থাকে।

কিন্তু তাঁর মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি বদরি সাহাবি। সাহাবি হওয়ার মর্যাদার পাশাপাশি লাভ করেছেন রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য।

১২৫৪. উসদুল গাবাহ : ২/২৭৯।
১২৫৫. উসদুল গাবাহ : ২/২৮০।
১২৫৬. উসদুল গাবাহ : ২/২৮০।
১২৫৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৪৩৮।

তিনি রাসুল ﷺ-এর সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কোনো যুদ্ধে তিনি পিছপা হননি। এর মধ্য থেকে পাঁচটি যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে। ঐতিহাসিকগণ সে আলোচনা উত্তমরূপে উল্লেখ করেছেন। কোনো অভিযানে তিনি ছিলেন সৈনিক, কোনো অভিযানে ছিলেন কমান্ডার।

ইসলাম গ্রহণের পর পুরো জীবনটাই তাওহিদের জন্য জিহাদে কাটিয়েছেন। প্রতিটি যুদ্ধে বীরবিক্রমে জিহাদ করেছেন। এটা তাঁর অবিচল ইমান ও গভীর আকিদা-বিশ্বাসের কারণে হয়েছিল। তবে ইসলাম না থাকলে এমন সাদের কোনো আলোচনাই উল্লেখ হতো না। যারা ইসলাম কবুল করেনি, তাদের মতো তিনিও অপরিচিত থেকে যেতেন।

কমান্ডার হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলি অন্য কমান্ডারগণের চেয়ে ভিন্ন কিছু হবে না। কারণ তাঁরা তো সকলেই ছিলেন রাসুল ﷺ-এর বিদ্যাপীঠ থেকে গ্রাজুয়েশনপ্রাপ্ত। প্রতিপালিত হয়েছেন একই পরিবেশে, একই জীবনধারায়।

এটা জানা কথা যে, রাসুল ﷺ তাঁর সকল সাহাবিকে অভিযানের কমান্ডার নিযুক্ত করেননি; বরং তাঁদের মধ্যে যারা কমান্ডারের বৈশিষ্ট্যাবলি ধারণ করতেন, তাঁদেরকেই তিনি কমান্ডার হিসেবে নির্বাচিত করতেন। তবে অন্যান্য সাহাবির প্রত্যেকই আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে দায়িত্ব লাভ করতেন। কারণ রাসুল ﷺ 'প্রতিটি ব্যক্তির যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর' নীতিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকতেন। এ নীতি থেকে তিনি চুল পরিমাণও সরতেন না। এর মাধ্যমে তিনি শক্তিশালী তিনটি মূল ভিত্তির ওপর মুসলিম ব্যক্তিকে গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। এক. সুদৃঢ় বিশ্বাস, আর তা হচ্ছে ইসলাম। দুই. তাঁর পবিত্র সিরাতে উত্তম আদর্শ। তিন. উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে বসানো। যাতে সুন্দর ও সুচারুরূপে তাঁর দায়িত্ব আদায় করতে পারেন।

সাদ ﷺ-এর নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনায় ফিরে আসি। জিহাদের ময়দানে তাঁর ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা। প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিকভাবে যুদ্ধবিদ্যায় তিনি নিজ কওমের আর দশজন ব্যক্তির মতোই ছিলেন। এর মাধ্যমে নেতৃত্বের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য—বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞান'-এর ওপর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যকে আমরা তাঁর সাথে আবশ্যিকভাবে যুক্তও করতে পারছি না এবং তাঁর থেকে আলাদাও করতে পারছি না। কারণ রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর অবর্তমানে তিনি এমন কোনো নেতৃত্ব লাভ করেননি, যেখানে তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগাতে হবে।

তবে আমরা তাঁর নেতৃত্বে শাখাগত বৈশিষ্ট্যাবলি বের করতে পারব। যেমন : তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ কারণে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক দুঃসাহসী। অবিচল ও শক্তিশালী ইচ্ছার অধিকারী। দক্ষতার সাথে দায়িত্ব বহন করতেন। দায়িত্ব থেকে কখনো পলায়ন করতেন না বা অন্যের ওপর তা চাপিয়ে দিতেন না। জয়-পরাজয় কোনো অবস্থায় তাঁর মানসিক অবস্থায় পরিবর্তন হতো না। ছিলেন দূরদৃষ্টির অধিকারী। সৈনিকদের মানসিক অবস্থা ও তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে ছিল তাঁর পূর্ণ সচেতনতা। সৈনিক কমান্ডারের মাঝে ছিল পারস্পরিক আস্থা ও আত্মবিশ্বাস। ছিল পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা। তাঁর ছিল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সুঠাম ও পরিবেশবান্ধব শরীর। ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় তিনি ছিলেন সম্মানিত, শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। যুদ্ধনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ, পারদর্শী। উপযুক্ত ও সুচারুরূপে সে নীতির বাস্তবায়নকারী। নিজেকে সৈনিকদের সমান মনে করতেন। তাদের চেয়ে নিজেকে সেরা ভাবতে পছন্দ করতেন না। বিপদের ক্ষেত্রে নিজেকে এগিয়ে দিতেন আর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সৈনিকদের অগ্রাধিকার দিতেন।

ইতিহাসে সাদ رضي الله عنه

তিনি গাজওয়াসহ রাসুল ﷺ-এর অনেক সারিয়্যা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আওস, খাজরাজ ও গাসসানের পূজিত মূর্তি মানাতের ধ্বংস অভিযানে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন। যে মূর্তির আলোচনা কুরআনে কারিমে এসেছে।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির প্রতি তাঁর রহমতের বৃষ্টিধারা জারি রাখুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

তুফাইল বিন আমর আদ-দাওসি ﷺ

তাঁর বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

তুফাইল বিন আমর বিন তারিফ বিন আস বিন সালাবা বিন সুলাইম বিন ফাহাম বিন গানম বিন দাওস বিন উদসান বিন আব্দুল্লাহ বিন জাহরান বিন কাব বিন হারিস বিন কাব বিন আব্দুল্লাহ বিন মালিক বিন নাসর বিন আজদ।[১২৫৮]

তিনি মক্কায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন এবং রাসুল ﷺ-কে সত্যায়ন করেন।[১২৫৯] তিনি একজন সম্ভ্রান্ত, কবি ও অধিক অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন মক্কায় আসলেন, তখন রাসুল ﷺ মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর আগমনের পর কুরাইশের লোকেরা তাঁর কাছে এসে বলল, 'হে তুফাইল, তুমি তো আমাদের দেশে আসলে। আমাদের সমাজে এই লোকটা যে আছে, সে আমাদের অবস্থা কঠিন করে তুলেছে। আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। আমাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। তার কথাবার্তা জাদুকরের মতো। সে পিতা-পুত্রে, ভাই-ভাইয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছে। আমরা যে সমস্যায় পড়েছি, তোমার ব্যাপারে এবং তোমার কওমের ব্যাপারে আমরা সে সমস্যার আশঙ্কা করছি। তাই তুমি তার সাথে কথা বলো না এবং তার কথা শুনতেও যেয়ো না।'[১২৬০]

১২৫৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৭, উসদুল গাবাহ : ৩/৫৪, আল-ইসাবাহ : ৩/২৮৬।
১২৫৯. আল-ইসতিআব : ২/৭৫৭।
১২৬০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৭।

সম্ভবত তুফাইল ؓ কুরাইশের এসব অভিযোগের দ্বারা কঠিনভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই তাদের অভিযোগের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, তারা আমার কানে এমন মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছিল যে, আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলাম, তাঁর থেকে আমি কিছু শুনব না এবং তাঁর সাথে কথাও বলব না। তাঁর কোনো কথা যেন আমার কাছে না পৌঁছে, সে ভয়ে মসজিদে যাওয়ার সময় কানে তুলা ভরে নিতাম। আমি তাঁর কথা শোনার ইচ্ছাও করতাম না। একবার মসজিদে গেলাম। তখন রাসুল ﷺ কাবার কাছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁর কাছে দাঁড়ালাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু কথা আমাকে না শুনিয়ে ছাড়লেন না। তাঁর থেকে সুন্দর কথা শুনতে পেলাম। তখন মনে মনে বললাম, হায়, আমার কি পোড়া কপাল! আমি তো একজন জ্ঞানী কবি ব্যক্তি। আমার কাছে ভালো-মন্দ অস্পষ্ট থাকবে না। তাহলে কী জন্য আমি এই লোকের কথা শোনা থেকে বিরত থাকব? যদি উত্তম কথা বলে, তবে তা গ্রহণ করব আর যদি মন্দ কথা বলে, তাহলে প্রত্যাখ্যান করব।'[১২৬১]

তুফাইল ؓ তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'রাসুল ﷺ ঘরে ফেরা পর্যন্ত আমি সেখানেই অবস্থান করলাম। এরপর আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে তাঁর সাথে আমিও তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। বললাম, "হে মুহাম্মাদ, তোমার কওমের লোকেরা আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। তারা তো তোমার ব্যাপারে আমাকে ভীত না করা পর্যন্ত ছাড়েনি। যার কারণে আমি আমার কানে তুলা দিয়ে বন্ধ করেছিলাম; যাতে তোমার কথা শুনতে না পারি। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তোমার কথা না শুনিয়ে ছাড়লেন না। তোমার থেকে কিছু ভালো কথা শুনলাম। তাই তোমার বিষয়টি আমার সামনে তুলে ধরো।"'[১২৬২]

রাসুল ﷺ তাঁর কাছে ইসলাম পেশ করলেন। এবং সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস তিলাওয়াত করলেন। তিনি ওই অবস্থায়ই ইসলাম কবুল করে নিলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন।[১২৬৩] যাওয়ার আগে রাসুল ﷺ-কে

১২৬১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪০৭-৪০৮।

১২৬২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৮, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪০৮, উসদুল গাবাহ : ৩/৫৪।

১২৬৩. আল-ইসাবাহ : ৩/২৮৬।

বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি এর চেয়ে কোনো উত্তম কথা এবং ইনসাফপূর্ণ বিষয় কখনো শুনিনি।'[১২৬৪]

তুফাইল ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণ হয়েছিল রাসুল ﷺ তায়িফ থেকে নির্যাতিত হয়ে ফেরার পর। এটি ছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির দশম বছরের ঘটনা।

রাসুল ﷺ তাঁকে তাঁর কওমের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে কোনো নিদর্শন দান করুন, যা আমার সাহায্যে আসবে।' রাসুল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলে আল্লাহ তাঁর চেহারায় একটি আলো দান করলেন। তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার ভয় হচ্ছে, তারা এটাকে চেহারা বিকৃতি হিসেবে মনে করবে কি না।' রাসুল ﷺ দুআ করলে সে আলো তাঁর লাঠির মাথায় চলে যায়। এরপর থেকে তিনি আলোকধারী বলে পরিচিতি লাভ করেন।[১২৬৫]

তুফাইল ﷺ তাঁর কওমের কাছে ফিরে গেলেন। বাড়িতে যাওয়ার পর তাঁর কাছে তাঁর পিতা আসলেন। তাঁর পিতা অতি বৃদ্ধলোক ছিলেন। তুফাইল ﷺ পিতাকে বললেন, 'বাবা, আমার থেকে দূরে থাকুন। কারণ আপনার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমার সাথেও আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।' পিতা বললেন, 'এমন কথা বলছ কেন হে পুত্র!' তিনি বললেন, 'ইসলাম কবুল করেছি। মুহাম্মাদের দ্বীনের অনুসরণ করেছি।' পিতা বললেন, 'প্রিয় পুত্র, তাহলে তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।' তুফাইল ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে যান—গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে আসুন। আমাকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আপনাকেও তা শিক্ষা দিই।' তিনি গোসল করে পবিত্র কাপড় পরে আসলেন। তুফাইল ﷺ পিতার কাছে ইসলাম পেশ করলে পিতা ইসলাম কবুল করলেন।[১২৬৬]

এরপর স্ত্রী তাঁর কাছে আসলো। স্ত্রীকে বললেন, 'আমার থেকে দূরে থাকো। আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই এবং তোমার সাথেও আমার কোনো

১২৬৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৮, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪০৮।
১২৬৫. আদ-দুরার : ৬৮ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ৬৭ পৃ., সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪০৮।
১২৬৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪০৮-৪০৯। তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৮।

সম্পর্ক নেই।' স্ত্রী বলল, 'আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এমন কথা বলছেন কেন!' তুফাইল ﷺ বললেন, 'ইসলাম আমার ও তোমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীনের অনুসারী হয়েছি।' স্ত্রী বলল, 'তাহলে আপনার দ্বীনই আমার দ্বীন।' তুফাইল ﷺ বললেন, 'তাহলে জিশ-শারায়ির ঝরনায় গিয়ে পাক-পবিত্র হয়ে আসো।' সে গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে আসলে তুফাইল ﷺ তার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। স্ত্রী ইসলাম কবুল করে নিল।[১২৬৭]

কিন্তু তুফাইল ﷺ-এর মা ইসলাম কবুল করল না। তিনি তাঁর কওমকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। কওমের মধ্যে শুধু আবু হুরাইরা ﷺ একা ইসলাম কবুল করলেন।[১২৬৮]

দাওসি সম্প্রদায় ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করল এবং তুফাইল ﷺ-এর বিরোধিতা করে বসল। তুফাইল ﷺ হিজরতের পূর্বে আবু হুরাইরা ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলেন। রাসুল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, দাওসি সম্প্রদায়ে ব্যভিচার আর সুদি কারবারির প্রসার লাভ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদুআ করুন।'[১২৬৯] এ সম্পর্কে আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'তুফাইল বিন আমর দাওসি ﷺ রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, দাওসি সম্প্রদায় অবাধ্যতা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করুন।"[১২৭০] সাহাবায়ে কিরাম ভয় পেয়ে গেলেন, রাসুল ﷺ-এর বদদুআর কারণে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেয় কি না।[১২৭১] কিন্তু রাসুল ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ, দাওসি সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করুন। তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।" এরপর তুফাইল ﷺ-কে বললেন, "তোমার কওমের কাছে ফিরে গিয়ে দাওয়াত দাও। তাদের সাথে নম্র আচরণ করো।"[১২৭২]

১২৬৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪০৯, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৮।
১২৬৮. আল-ইসাবাহ : ৭/২৮৭।
১২৬৯. আল-ইসতিআব : ২/৭৬১।
১২৭০. আল-ইসাবাহ : ৩/২৮৭।
১২৭১. আল-ইসতিআব : ২/৭৫৮।
১২৭২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৯।

তুফাইল ﷺ তাঁর কওমের কাছে ফিরে গেলেন। কওমের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। অপরদিকে রাসুল ﷺ হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন। একে একে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ অতিবাহিত হয়ে গেল। তুফাইল ﷺ তখনও তাঁর কওমের মাঝে থেকে কওমের লোকদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করলেন। অবশেষে কওমের যারা ইসলাম কবুল করেছে, তাদের নিয়ে তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলেন। তখন রাসুল ﷺ খাইবারের যুদ্ধে অবস্থান করছিলেন।[১২৭৩] দাওসি সম্প্রদায়ের ৭০ অথবা ৮০টি পরিবার অথবা ৯০টি পরিবার মদিনায় এসে উঠল।[১২৭৪] এরপর তারা খাইবারে রাসুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করল। রাসুল ﷺ খাইবারের গনিমতের মালে তাদের অংশ দেওয়ার ব্যাপারে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করলেন। সাহাবায়ে কিরাম এতে সম্মতি দান করেন। তাই রাসুল ﷺ তাদেরকেও খাইবারের গনিমতে অংশ দান করেন।[১২৭৫]

এভাবে আল্লাহ তাআলা দাওসি সম্প্রদায়ের যাদের হিদায়াত দেওয়ার, তুফাইল বিন আমর ও জুনদুব বিন আমরের হাতে তাদের হিদায়াত দান করেন। অথচ রাসুল ﷺ যখন দাওসি গোত্রের হিদায়াতের জন্য দুআ করেছিলেন, তখন তুফাইল ﷺ রাসুল ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আমি এটা চাইনি।' রাসুল ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, 'তাদের মাঝে নিশ্চয় তোমার মতো অনেক ভালো মানুষ আছে।' জুনদুব ﷺ জাহিলি যুগে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় সৃষ্টিজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আমি জানি না, তিনি কে!' যখন রাসুল ﷺ-এর আবির্ভাবের খবর শুনলেন, তখন তাঁর কওমের ৭৫ জন লোক সঙ্গে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলেন। তিনি ইসলাম কবুল করলে তারাও ইসলাম কবুল করে নেয়। তিনি তাদের একেকজন করে রাসুল ﷺ-এর সামনে এগিয়ে দেন। তাঁর পিতা আমর বিন হামামাহ দীর্ঘ সময় ধরে দাওসি গোত্রের শাসক ছিলেন।[১২৭৬]

১২৭৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৯, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪০৯-৪১০।
১২৭৪. আল-ইসতিআব : ২/৭৬১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৩৭, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৪৪০, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৯।
১২৭৫. উসদুল গাবাহ : ৩/৫৫, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/১৮৩।
১২৭৬. আল-ইসাবাহ : ৩/২৮৭।

খাইবার যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরির জিলকদ মাসে তিনি উমরাতুল কাজায় অংশগ্রহণ করেন। অষ্টম হিজরির রমাদান মাসে মক্কা-বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।[১২৭৭]

রাসুল ﷺ অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে হুনাইন জয় করে তায়িফ যাওয়ার ইচ্ছা করেন। তুফাইল ﷺ-কে আমর বিন হামামাহর মূর্তি "জুল-কাফফাইন" ভাঙার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন তাঁর সম্প্রদায়কে নিয়ে তায়িফে এসে মিলিত হন। তখন তুফাইল ﷺ বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে উপদেশ দান করুন।' রাসুল ﷺ বললেন, 'সালামের প্রসার ঘটাও। লোকজনকে খাবার খাওয়াও। আল্লাহকে লজ্জা করো, যেভাবে মানুষ তাঁর পরিবারের সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে লজ্জা করে। কোনো গুনাহ করে ফেললে সাথে সাথে নেক আমল করে নিয়ো। নিশ্চয় নেক আমল গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। এটা উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য উপদেশ।' এরপর তুফাইল ﷺ দ্রুত তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বের হলেন।[১২৭৮] এটা ছিল অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসের ঘটনা।

তুফাইল ﷺ জুল-কাফফাইন মূর্তিকে ভেঙে মূর্তির মুখে আগুন লাগিয়ে দেন। এরপর আবৃত্তি করেন :

> 'হে জুল-কাফফাইন, আমি তোমার গোলাম না, আমাদের জন্ম তোমার জন্মেরও অনেক আগে।
>
> আমি তো তোমার কলিজায় আগুন ধরিয়ে দিলাম।'

তাঁর সাথে তাঁর কওমের লোকেরা দ্রুত বের হলো। তাদের মধ্য থেকে ৪০০ জন পেছনে পড়ে যায়। তারা এসে তায়িফে রাসুল ﷺ-এর সাথে মিলিত হয়।[১২৭৯] তায়িফে তখন রাসুল ﷺ ৪০ দিন ধরে অবস্থান করে আসছিলেন। সাথে ট্যাংক

১২৭৭. আল-ইসাবাহ : ৩/২৮৭।

১২৭৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯২২-৯২৩।

১২৭৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৫৭, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯২৩, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪১০।

ও মিনজানিক নিয়ে গিয়েছিলেন। তায়িফ অবরোধে এ দুটি অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন।

জুল-কাফফাইন মূর্তি কাঠের তৈরি ছিল।[১২৮০] তুফাইল ﷺ যখন সেটিকে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন, তখন তার অবশিষ্ট পূজারিরা বুঝতে পারল যে, এটি একটি মিথ্যা উপাস্য। ফলে তারা সকলে ইসলাম কবুল করেন।[১২৮১] এভাবে দাওসি সম্প্রদায়ে চিরদিনের জন্য শিরকের বিলুপ্তি হয়।

শাহাদাত বরণ

তুফাইল ﷺ তায়িফের যুদ্ধ থেকে রাসুল ﷺ-এর সাথে মদিনায় ফিরে আসেন এবং রাসুল ﷺ-এর ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি মদিনাতেই অবস্থান করেন। আরবের লোকেরা যখন মুরতাদ হয়ে গেল, তখন তিনি মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধে বের হন এবং তুলাইহা আল-আসাদি ও নাজদ অঞ্চলের ফিতনা নিষ্পত্তি করা পর্যন্ত তিনি জিহাদের ময়দানে জিহাদ করেন।

এরপর ইয়ামামা অঞ্চলের জিহাদে যান। ওই জিহাদে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সাথে তাঁর পুত্র আমর বিন তুফাইলও ছিলেন। ওই যুদ্ধে তাঁর হাত কেটে যায়। এই যুদ্ধটা হয়েছিল ১১ হিজরিতে মুসাইলামাতুল কাজজাবের বিরুদ্ধে। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ।

তাঁর পুত্র আমর বিন তুফাইলের হাত পরবর্তী সময়ে সুস্থ হয়ে যায়। একবার তিনি উমর বিন খাত্তাব ﷺ-এর কাছে ছিলেন। তাঁদের সামনে খাবার আনা হলে আমর এক পাশে সরে গেলেন। তখন উমর ﷺ বললেন, 'কী হলো, তুমি হয়তো তোমার হাতের কারণে সরে গেছ?' তিনি বললেন, 'জি।' উমর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, তুমি হাতে না ধরা পর্যন্ত আমি এ খাবার মুখে দেবো না। আমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যে তোমাকে বাদ দিয়ে জান্নাতে যাবে।' এরপর আমর বিন তুফাইল উমর ﷺ-এর খিলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে শাহাদাত বরণ করেন।[১২৮২]

১২৮০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৯।
১২৮১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৪০।
১২৮২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৪০।

এখানে একটি বিরল ঘটনা উল্লেখ করছি, যা নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থগুলো উল্লেখ করেছে। সে ঘটনা হচ্ছে, তুফাইল বিন আমর ﷺ ইয়ামামার যুদ্ধে যাওয়ার সময় একটি স্বপ্ন দেখেন। সে স্বপ্নের কথা তাঁর সাথিদের কাছে বলেন, 'আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। তোমরা আমাকে তার ব্যাখ্যা বলো। আমি দেখলাম, আমার মাথা মুণ্ডন করে দেওয়া হয়েছে। আমার মুখ থেকে একটি পাখি বের হয়ে চলে গেল। একজন নারী আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমাকে তার গুপ্তাঙ্গে ভরে ফেলল। আমার ছেলে আমর কেন যেন আমাকে দ্রুত তালাশ করল। কিন্তু তার ও আমার মাঝে আড়াল তৈরি করা হলো।' সাথিগণ বললেন, 'ভালো স্বপ্ন।' তিনি বলেন, 'আমি তো এর এমন ব্যাখ্যা করেছি, মাথা মুণ্ডানোর অর্থ মাথা কেটে যাওয়া। আমার মুখ থেকে যে পাখি বের হয়েছে, সেটা আমার রুহ। যে নারী আমাকে তার গুপ্তাঙ্গে ভরে ফেলেছে, সে হচ্ছে ওই জমিন, যেখানে আমাকে দাফন করা হবে। আমি শহিদি মৃত্যুর প্রতি খুশি আছি। আর আমার ছেলে আমাকে তালাশের অর্থ এটাই মনে করি যে, সে অচিরেই শাহাদাত তালাশ করবে। তবে আমি মনে করছি না যে, সে এই সফরে আমার সাথে মিলিত হবে।' তুফাইল ﷺ ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর ছেলে তখন আহত হন, এরপর উমর ﷺ-এর খিলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[১২৮৩]

বিরল হওয়ার কারণে এ ঘটনা আমি উল্লেখ করলাম। চাইলে পাঠক এটা সত্যায়নও করতে পারে, মিথ্যাও বলতে পারে। যেহেতু পাঠক তার ইচ্ছার ব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু সত্য স্বপ্নে বাস্তবতা থাকে। আমি শুধু যাচাই করে কোনো কিছুকে সত্যায়ন করতে পারি।

১২৮৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪১১, আল-ইসতিআব : ২/৭৬৬, উসদুল গাবাহ : ৩/৫৫।

তুফাইল ﷺ হিজরতের পূর্বে শুরুর দিকে ইসলাম কবুল করেছেন। এরপর নিজ কওমের কাছে গিয়ে তাদের আল্লাহর দিকে ডেকেছেন। আল্লাহ তাঁর হাতে তাদের হিদায়াত দান করেছেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান সম্ভ্রান্ত সচ্ছল এবং অধিক অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি। স্বীয় সম্প্রদায়ে মান্যবর ব্যক্তিত্ব।[১২৮৪]

তিনি ইসলাম কবুল করার পর কুরাইশরা তাঁকে ধমকি দিয়েছিল। তখন কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে তিনি কবিতা বলেছিলেন।

আমরা তাঁর জন্মসন সম্পর্কে জানতে পারিনি। রাসুল ﷺ থেকে তাঁর কোনো হাদিসের বর্ণনা নেই।[১২৮৫] তাঁর মর্যাদার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর পতাকাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

জাহিলি যুগে গোত্রপ্রধানরা নিজ গোত্রকে পরিচালনা করত। ইসলাম এসে এ আনুগত্যকে এই শর্তে বহাল রাখে, যদি গোত্রপ্রধান ইসলাম কবুল করে খাঁটি ইমানদারে পরিণত হয় এবং নেতৃত্বের যোগ্যতার সাথে তার নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনো আপত্তি না থাকে।

তুফাইল ﷺ দাওস গোত্রের অন্যতম নেতা ছিলেন। সাথে তিনি তাঁর গোত্রের নিকট রাসুল ﷺ-এর প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন। তাই খাইবারের যুদ্ধের সময় পর্যন্ত তাঁর হাতে ৭০ থেকে ৯০টি পরিবার ইসলাম কবুল করে। এরপর তিনি তাদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। মক্কা-বিজয়ের পর দাওস গোত্রের মূর্তি জ্বালিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আদায়ে ছুটে গেছেন। কারণ রাসুল ﷺ তাঁকে এই মূর্তি জ্বালিয়ে দিতে একটি বাহিনীর কমান্ডার নিয়োগ করেছিলেন। ফলে দাওস গোত্রের এমন একজনও আর অবশিষ্ট ছিল না, যে ইসলামের ঘোষণা দিয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেয়নি। সুতরাং তুফাইল ﷺ পুরো দাওসি গোত্রকে তায়িফ অবরোধ ও

১২৮৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৩৭, উসদুল গাবাহ : ৩/৫৪, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৩৭, আল-ইসতিআব : ২/৭৫৯।
১২৮৫. তাহজিবু ইবনি আসাকির : ৭/৬৩।

রিদ্দার যুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জীবনের সমাপ্তি করেছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অর্জিত সামরিক জ্ঞান ছিল। তবে তিনি স্বভাবগতভাবে কমান্ডার ছিলেন কি না, এটা নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। কারণ তিনি এমন কোনো চূড়ান্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেননি, যা তাঁর এই গুণকে প্রমাণিত করবে।

তাঁর নেতৃত্বের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি রাসুল ﷺ-এর বাকি কমান্ডারদের থেকে বেশি বিপরীত হবে না। কারণ তাঁরা সকলে একই বিদ্যাপীঠ থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণ ছিল, যা তাঁকে অন্যের চেয়ে সেরা করে তুলেছিল।

তাঁর প্রশংসার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি রাসুল ﷺ-এর অন্যতম কমান্ডার এবং প্রথম সারির শহিদদের একজন।

ইতিহাসে তুফাইল رضي الله عنه

যারা শুরুর দিকে অর্থাৎ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের আগে ইসলাম কবুল করেছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন ছিলেন।

তিনি রাসুল ﷺ কর্তৃক নিজ গোত্রে প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তাঁর হাতে তাঁর কওমকে হিদায়াত দান করেছেন। তিনি তাঁর কওমের মূর্তি ভেঙে ফেলেছেন। ফলে মূর্তি ভাঙার পর তাঁর কওমের সকলে ইসলাম কবুল করে।

তিনি আকিদা রক্ষার্থে রিদ্দার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ফলে তিনি আরবের লোক ইসলামে ফিরে আসার কারণ হিসেবে পরিণত হন।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির প্রতি তাঁর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

বেদুইন কমান্ডার
উয়াইনা বিন হিসন আল-ফাজারি ﵁

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে

১. তাঁর বংশধারা

উয়াইনা বিন হিসন বিন হুজাইফা বিন বদর বিন আমর বিন জুওয়াই বিন লুজান বিন সালাবা বিন আদি বিন ফাজারা বিন জুবইয়ান বিন বাগিদ বিন রাইস বিন গাতাফান বিন সাদ বিন কাইস বিন গাইলান বিন মুজার বিন নিজার বিন মাআদ বিন আদনান।[১২৮৬] তাঁর নাম ছিল মূলত হুজাইফা। কিন্তু এক দুরারোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর চোখ স্ফীত হয়ে যায়। তখন থেকে তাঁকে বলা হয় আবু উয়াইনা।[১২৮৭] তাঁর উপনাম ছিল আবু মালিক।[১২৮৮]

২. আরবের দিনগুলোতে

ক. উয়াইনার পিতা হিসন বিন হুজাইফা দুই গোত্রের নেতৃত্ব দিত—আসাদ ও গাতাফান। উয়াইনা উকাজ বাজারে এসে দেখল, লোকেরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করছে। তিনি তখন বললেন, 'আমি মনে করি এই লোকদের কোনো ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি নেই। আগামী বছর বেঁচে থাকলে নিশ্চয় এটা বুঝতে পারবে।'

১২৮৬. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ২৫৫-২৫৬ পৃ., উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭।
১২৮৭. আল-মাআরিফ : ৩০২ পৃ.।
১২৮৮. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭, আল-ইসাবাহ : ৫/৫৫, আল-ইসতিআব : ৩/১২৪৫।

এরপর সে পরের বছর তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের ওপর হামলা করে বসে। এই হচ্ছে দ্বিতীয় হারবুল ফুজ্জার বা পাপিষ্ঠদের যুদ্ধের কারণ। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কিনানা গোত্র ও কাইস গোত্রের মাঝে। কাইস গোত্র যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে।[১২৮৯]

খ. এই যুদ্ধ হাতিবের যুদ্ধ বলে পরিচিত ছিল। হাতিব হলো আওস গোত্রের লোক।

এ যুদ্ধের কারণ হচ্ছে, হাতিব হচ্ছে একজন সম্ভ্রান্ত ও সর্দার ব্যক্তি। বনু সালাবা গোত্রের এক লোক তার কাছে এসে মেহমান হয়। একদিন সেই মেহমান বনু কাইনুকার ইহুদিদের বাজারে যায়। ইবনে ফুসহুম নামে পরিচিত ইয়াজিদ বিন হারিস তাকে দেখতে পায়। জাইদ বিন হারিস হলো খাজরাজ গোত্রের লোক। সে এক ইহুদিকে বলল, 'যদি এই সালাবি লোকটার পশ্চাদ্দেশে থাপ্পড় মারতে পারো, তবে আমার এ চাদর তোমার।' সে চাদর নিয়ে মেহমানের নিতম্বে এমন জোরে থাপ্পড় মারল, বাজারের সকলে শুনতে পেল। তখন সালাবি লোক চিৎকার দিয়ে বলল, 'হে হাতিবের পরিবারের লোকেরা, তোমাদের মেহমানের পশ্চাদ্দেশে থাপ্পড় মেরে লাঞ্ছিত করা হয়েছে!' এ খবর হাতিব শুনতে পেল। হাতিব এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কে এমন করেছে?' সালাবি লোকটি সেই ইহুদির দিকে ইশারা করল। হাতিব তখন তরবারি দিয়ে ইহুদিকে হত্যা করে ফেলল। ইবনে ফুসহুম সে খবর জানতে পারল। তাকে বলা হলো, 'সেই ইহুদিকে হাতিব হত্যা করেছে।' তখন সে দ্রুত তার পিছে ছুটে তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু ততক্ষণে হাতিব বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তখন ইবনে ফুসহুম আওস গোত্রের এক লোককে পেয়ে তাকে হত্যা করে। এভাবে আওস ও খাজরাজের মাঝে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে।

খবর শুনে উয়াইনা বিন হিসন ও খিয়ার বিন মালিক ফাজারি তাদের মাঝে মধ্যস্ততা করার জন্য মদিনায় আসেন। সন্ধি করার জন্য আওস ও খাজরাজের লোকদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের প্রত্যেকের দাবি আদায়ের জিম্মাদারি নেন। কিন্তু তারা সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে উভয়ের মাঝে তুমুল যুদ্ধ

১২৮৯. আল-মাআরিফ : ৬০৩-৬০৪ পৃ.। হারবুল ফুজ্জার প্রথম এবং দ্বিতীয়ের বিস্তারিত ইতিহাস দেখুন, ইবনুল আসির : ১/৫৮৮-৮৯৫।

বেধে যায়। উয়াইনা ও খিয়ার স্বচক্ষে যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেন। যুদ্ধে উভয় দলের কঠোরতা ও একগুঁয়েমি দেখে তাদের মাঝে সন্ধির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান। সে যুদ্ধে খাজরাজ গোত্রের জয় হয়েছিল। এই দিনটিও আরবের এক প্রসিদ্ধ এবং স্মরণীয় দিন।[১২৯০]

৩. মুসলিমদের সাথে সন্ধি

একবার ফাজারা গোত্রের শাখাগোত্র বনু বদর বিন আমরের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঘুরে ঘুরে খাবার জোগান করা ছাড়া তাদের কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না। তাদের সংবাদ দেওয়া হলো, 'তাগলিমিন' থেকে 'বাতনে নাখল' পর্যন্ত একটি জলধারা আছে। উয়াইনা তখন বদরের লোকদের নিয়ে 'বাতনে নাখল'-এর সন্নিকটে চলে গেল। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর সে রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের ভয় পেল। তাই মদিনায় এসে রাসুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। রাসুল ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যানও করে না, আবার গ্রহণও করে না। সে রাসুল ﷺ-কে বলে, 'আমি আপনার প্রতিবেশী হওয়ার ইচ্ছা করছি। তাই আমার সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হোন।' রাসুল ﷺ তার সাথে তিন মাসের সন্ধিচুক্তি করেন। চুক্তির সময় যখন শেষ হলো, তখন সে তার সম্প্রদায়কে নিয়ে নিজ এলাকায় ফিরে গেল। এই সময়ের মধ্যে তারা বেশ মোটাতাজা হয় এবং তাদের গবাদি পশুগুলো মোটাতাজা হয়ে দুধে ওলান ভরে যায়। এই এলাকার পরিবেশের প্রতি তারা মুগ্ধ হয়ে যায়।

সম্ভবত এই চুক্তি পঞ্চম হিজরিতে হয়েছিল। কারণ এই বছর শাওয়াল মাসে রাসুল ﷺ বনু মুসতালিকের যুদ্ধে ছিলেন। অতঃপর মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ফিতনার যে আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল, সেটার প্রতিকারের জন্য রাসুল ﷺ সাহাবিদের দ্রুত মদিনায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে লোকেরা সারা দিন একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। সন্ধ্যার পর রাতেও চলতে চলতে সকাল করে এবং দ্বিতীয় দিনের শুরুর অংশও চলতে থাকে। একপর্যায়ে রোদ্রের তাপে তাঁরা কষ্ট পেতে থাকেন। অতঃপর সওয়ারি থেকে অবরতণ করামাত্রই ক্লান্তির কারণে সবার চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে। মুসলিমরা আশঙ্কা করেন যে, এমন দ্রুত গতিতে চলার কারণ

১২৯০. ইবনুল আসির : ২/৬৭১-৬৭২।

হয়তো এটা হবে যে, উয়াইনা বিন হিসন মদিনায় আক্রমণ করে বসেছে; অথচ মদিনায় তখন শুধু নারী ও শিশুরা অবস্থান করছে। আর নবিজি ﷺ ও উয়াইনার মাঝে যে সন্ধি হয়েছিল, তার সময় তখন শেষ হয়ে গেছে। মুসলিমরা খুবই ভয় পেলেন। তাঁদের ভয়ের খবর রাসুল ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি সাহাবিদের বললেন, 'মদিনার ব্যাপারে তোমাদের কোনো ভয় নেই।' তিনি তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন, "মদিনা নিরাপদ।"[১২৯১]

৪. সম্মিলিত বাহিনীর সাথে

খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে। এ যুদ্ধের কারণ ছিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে একদল ইহুদি বিভিন্ন গোত্রের যোদ্ধাদের একত্রিত করে। তারা মক্কায় এসে কুরাইশদের যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং যুদ্ধে এলে তাদের সাহায্য করার ওয়াদা করে। কুরাইশরা তাদের ডাকে সাড়া দেয়। এরপর তারা গাতাফানের কাছে যায় এবং সেখানেও এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা তাদের ডাকে সাড়া দেয়।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী বের হয়। ওদিক থেকে গাতাফানের লোকেরা বের হয়। ফাজারি গোত্রের নেতৃত্ব দেয় উয়াইনা বিন হিসন। মুররা গোত্রের নেতৃত্ব দেয় হারিস বিন আওফ মুররি। আশজা' গোত্রের নেতৃত্ব দেয় মাসউদ বিন রুখাইলা।[১২৯২] গাতাফান এলাকায় ইহুদিদের ডাকে সবার আগে উয়াইনা লাব্বাইক বলেছিল। এ সম্মিলিত বাহিনীর বিবরণ দিয়ে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়—

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ

'স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তারা তোমাদের ওপরের দিক থেকে এসেছিল।'[১২৯৩]

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে উয়াইনা বিন হিসন ও গাতাফানের অন্যান্য বাহিনী।

وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ

১২৯১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪১২।
১২৯২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৪৩, আদ-দুরার : ১৭৯ পৃ.।
১২৯৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ১০।

'এবং তোমাদের নিচের দিক থেকে এসেছিল।'[১২৯৪]

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী।[১২৯৫]

উয়াইনা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। গাতাফান গোত্রের অশ্ববাহিনী নিয়ে সে মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে এবং অনর্থক পাথর ও তির-বর্শা নিক্ষেপ করে।[১২৯৬]

উয়াইনাসহ সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডাররা খন্দক অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[১২৯৭]

রাসুল ﷺ উয়াইনা বিন হিসনের কাছে লোক পাঠিয়ে মদিনার এক-তৃতীয়াংশ খেজুরের বিনিময়ে তার লোকদের নিয়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু উয়াইনা অর্ধেক খেজুরের বিনিময় ছাড়া সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন রাসুল ﷺ সাদ বিন মুআজ ও সাদ বিন উবাদাহ ؓ-এর সাথে পরামর্শ করেন। তাঁরা বলেন, 'আপনাকে যদি কোনো কিছুর আদেশ করা হয়, তাহলে আপনি তা করে ফেলুন। আর যদি এমন কিছু না হয়, তবে আমরা তো তাদের তরবারি ছাড়া কিছুই দিতে রাজি নই।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তাহলে এটাই হোক।'[১২৯৮]

খন্দকের যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে উয়াইনার এক বিরাট ভূমিকা ছিল। একদল ইহুদির ডাকে সাড়া দিয়ে সবার আগে সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তার কওমের বিরাট অংশকে এ যুদ্ধে নিয়ে এসেছিল। সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের জন্য প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা করেছিল। কিন্তু সে তার চেষ্টায় সফল হতে পারেনি। সম্মিলিত বাহিনীর সাথে সেও ব্যর্থ হয়ে মদিনা থেকে ফিরে গিয়েছিল।

১২৯৪. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ১০।
১২৯৫. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৪৪।
১২৯৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৬৭।
১২৯৭. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭০।
১২৯৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/২৩৯-২৪০, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৪৬, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৪৭৭-৪৮০, আদ-দুরার : ১৮৪ পৃ.।

৫. জি-কারাদ যুদ্ধে

ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে ৪০ জন অশ্বারোহী নিয়ে উয়াইনা গাবাহ স্থানে রাসুল ﷺ-এর দুগ্ধবতী উটনীর পালে আক্রমণ করে। সেখানে বনু গিফার গোত্রের এক লোক ও তার স্ত্রী ছিল। আক্রমণকারীরা লোকটিকে হত্যা করে উটনীর সাথে তার স্ত্রীকেও নিয়ে যায়।[১২৯৯] উটনীর সংখ্যা ছিল ২০টি।[১৩০০] মুসলিমগণ তাদের হাত থেকে তা উদ্ধার করেন।[১৩০১] আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়।[১৩০২] অথচ এর আগে রাসুল ﷺ উয়াইনার সাথে তিন মাসের চুক্তি করেছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তার সম্প্রদায়ের লোক এবং গবাদি পশু খেয়েদেয়ে বেশ মোটাতাজা হয়েছিল। এরপর যে ঘোড়াগুলো রাসুল ﷺ-এর চুক্তির সময়ে খেয়ে সবল হয়েছিল, উয়াইনা সেই ঘোড়াগুলোর ওপর চড়ে রাসুল ﷺ-এর উটনীর পালে আক্রমণ করে বসে। তাই হারিস বিন আওফ তাকে বলেছিল, 'মুহাম্মাদকে তুমি অনুগ্রহের কত মন্দ প্রতিদান দিয়েছ! তাঁর দেশে সুস্থ সবল হয়ে তারপর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ।' উয়াইনা বলেছিল, 'তুমি যেমন মনে করো, সেটা তেমনই হয়েছে।'[১৩০৩]

৬. খাইবারের ইহুদিদের সাথে

খাইবারের ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হয়েছিল সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে। উয়াইনা গাতাফান গোত্রকে সাথে নিয়ে ইহুদিদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু তারা খাইবারের কোনো দুর্গে প্রবেশ করল না। রাসুল ﷺ উয়াইনার কাছে খবর পাঠালেন যে, তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে ফিরে যাও। এর বিনিময়ে খাইবারের এই বছরের অর্ধেক খেজুর তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। উয়াইনা বলেছিল, 'আমি আমার প্রতিবেশী ও মিত্রদের শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারি না।'[১৩০৪]

১২৯৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩২৩, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৫৩৯, জাওয়ামিউস সিরাহ : ২০১ পৃ.।
১৩০০. আল-মাআরিফ : ১৪৯ পৃ.।
১৩০১. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২০৩ পৃ.।
১৩০২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৮০-৮৪, উয়ূনুল আসার : ২/৮৪-৮৮।
১৩০৩. আল-মাআরিফ : ৩০৩ পৃ.।
১৩০৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৫০।

দ্বিতীয় বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে এসেছে, ইহুদি কিনানা বিন আবুল হুকাইক বন্ধুত্ব ও সাহায্যের জন্য যখন গাতাফান গোত্রে গেল, তখন গাতাফানিরা তার সাথে মিত্রতা করল। গাতাফানিরা ছিল চার হাজার। তাদের নেতৃত্বে ছিল উয়াইনা বিন হিসন। এরপর গাতাফানি বাহিনী রাসুল ﷺ-এর আগমনের তিন দিন আগে ইহুদিদের সাথে নাতাত দুর্গে প্রবেশ করে। রাসুল ﷺ যখন খাইবারে পৌছলেন, তখন সাদ বিন উবাদাহ ﵁-কে গাতাফান গোত্রের কাছে পাঠালেন। তারা তখন দুর্গে অবস্থান করছিল। সাদ ﵁ দুর্গের ফটকের কাছে পৌঁছে ডাক দিয়ে বললেন, 'আমি উয়াইনা বিন হিসনের সাথে কথা বলতে চাই।' উয়াইনা তাঁকে দুর্গে ঢুকাতে চাইলেন। কিন্তু মারহাব ইহুদি বলল, 'তাকে ভেতরে আনবেন না, কারণ সে আমাদের দুর্গে ফাঁক-ফোকর ও দুর্বলতা দেখে ফেলবে এবং কোন দিক দিয়ে দুর্গে আক্রমণ করা যায়, সেটাও দেখে নেবে। বরং আমরা বের হয়ে তার কাছে যাই।' উয়াইনা বলল, 'আমি চাইলাম, সে ভেতরে এসে দুর্গের শক্তি এবং এই বিশাল সৈন্যবহর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুক।' কিন্তু মারহাব তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তাই উয়াইনা দুর্গের ফটকের বাইরে গেল।

সাদ ﵁ বললেন, 'রাসুল ﷺ আমাকে তোমার কাছে এ বলে পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে খাইবার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা ফিরে যাও এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। যদি আমরা খাইবার জয় করতে পারি, তাহলে খাইবারের এক বছরের খেজুর তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে।' উয়াইনা বলল, 'আল্লাহর শপথ, কোনো কিছুর বিনিময়ে আমরা আমাদের মিত্রদের শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারি না। আর আমরা ভালোভাবে জানি, তুমি ও তোমার সাথি যে শক্তি নিয়ে এসেছ, তা দিয়ে এখানে কুলাতে পারবে না। এরা তো দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান করছে। এদের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রও অনেক বেশি। যদি এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, তবে তুমি ও তোমার দলবল ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি যুদ্ধের ইচ্ছা করলে কালবিলম্ব না করে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তোমার ওপর আক্রমণ করবে। আল্লাহর শপথ, এরা কুরাইশ সম্প্রদায়ের মতো নয় যে, তোমাদের কাছে যাবে। সুযোগ পেলে আক্রমণ করবে, অন্যথায় ফিরে আসবে। এরা দিনের পর দিন ধরে তোমাকে যুদ্ধের ফাঁদে আটকে রাখবে, যতক্ষণ না তারা ক্লান্তি অনুভব করে।' কথা শুনে সাদ ﵁ বললেন, 'আমি

সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমাকে তোমার এই দুর্গেই আটক থাকতে হবে। অবশেষে তোমাকে আমরা যার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সেটাকে তুমি নিজেই তালাশ করবে। কিন্তু তখন আমরা তোমাকে তরবারি ছাড়া কিছুই দেবো না। হে উয়াইনা, ইয়াসরিবের ইহুদিদের পরিণতি কী হয়েছিল, তা তো তুমি দেখেছ। কীভাবে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে!'

সাদ ﵁ রাসুল ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে সবকিছু বললেন। এরপর বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তো পূরণ করবেন। অবশ্যই তিনি তাঁর দ্বীনের বিজয় দেবেন। তাই এই বেদুইনকে একটি খেজুরও দেবেন না। হে আল্লাহর রাসুল, যদি সে তরবারির খপ্পরে পড়ে যায়, তবে ইহুদিদের ছেড়ে নিজের ঘরের দিকে দৌড়ে পালাবে, যেমন সে খন্দকের যুদ্ধে করেছে।'

রাসুল ﷺ সাহাবিদের সেই দুর্গে হামলার নির্দেশ দিলেন, যে দুর্গে গাতাফানের বাহিনী অবস্থান করছে। সন্ধ্যায় তিনি এ নির্দেশ দিয়ে দেন। তখন রাসুল ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা করল যে, 'সকাল সকাল নায়িম দুর্গের সামনে ঝান্ডা নিয়ে অবস্থান নেবে, যেখানে গাতাফানের বাহিনী অবস্থান করছে।' এরপর ওই দিন ও রাতব্যাপী ভীতিকর অবস্থায় অতিবাহিত হয়। এরপর যখন দুর্গে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ হলো, তখন গাতাফানের বাহিনী নিচু দেওয়াল দিয়ে টপকিয়ে এবং সিঁড়ি বেয়ে বের হয়ে যায়। কিনানা বিন আবুল হুকাইককে এ খবর দেওয়া হলে সে ভেঙে পড়ে। সে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

কিনানা বলল, 'আমরা এই বেদুইনদের সাথে থেকে ভুল করেছি। তাদের কাছে ধরনা দিলাম, তারা আমাদের ওয়াদা দিয়ে প্রতারণা করল। আমার জীবনের শপথ, তারা আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না দিলে আমরা কখনোই মুহাম্মাদের সাথে যুদ্ধের ইচ্ছা করতাম না। আমরা সাল্লাম বিন আবুল হুকাইকের কথা স্মরণ রাখতে পারিনি। সে বলেছিল, "এই বেদুইনদের কাছে কখনো সাহায্য চাইতে যেয়ো না। কারণ আমরা তাদের পরীক্ষা করেছি। বনু কুরাইজাকে সাহায্যের সময় আমরা তাদের পরখ করে দেখেছি। তারা তাদের ধোঁকা দিয়েছে। আমরা তাদের কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে দেখিনি।

হুয়াই বিন আখতাব সাহায্যের জন্য তাদের মাঝে ঘোরাঘুরি করেছে আর তারা মুহাম্মাদের সাথে চুক্তির জন্য ধরনা দিয়েছে। এরপর মুহাম্মাদ বনু কুরাইজায় আক্রমণ করে বসলে এই গাতাফানিরা নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যায়।'

গাতাফানের বাহিনী যখন 'হাইফায়' নিজ পরিবারের কাছে পৌঁছল, তখন দেখতে পেল, তাদের পরিবাররা আপন অবস্থায় বসে আছে। পরিবারের লোকেরা তাদের বলল, 'আমরা ধারণা করেছি, তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করছ; কিন্তু তোমাদের কাছে কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

উয়াইনা কয়েক দিন আপন পরিবারে অবস্থান করল। এরপর তার এক সাথি দ্বিতীয়বার ইহুদিদের সাহায্যের জন্য তাকে আহ্বান করল। তখন হারিস বিন আওফ তাকে বলল, 'হে উয়াইনা, তুমি আমার কথা শোনো। ঘরে বসে থাকো। ইহুদিদের সাহায্যের চিন্তা বাদ দাও। কারণ আমি মনে করছি না যে, তুমি খাইবারে ফিরে যাবে আর ততক্ষণে মুহাম্মাদ তা জয় করে নেয়নি। সেখানে তোমাকে আমি নিরাপদ মনে করছি না।' কিন্তু উয়াইনা তার কথা মানল না; বরং সে বলল, 'না, আমার মিত্রদের কোনো কিছুর বিনিময়ে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবো না।'

উয়াইনা যখন খাইবারের দুর্গ থেকে পরিবারের কাছে ফিরে গেল, তখন রাসুল ﷺ এক এক করে দুর্গে আক্রমণ করতে থাকেন।[১৩০৫]

এভাবে খাইবারের সব দুর্গ মুসলিমদের পদানত হয়ে যায়। দুর্গগুলোতে মুসলিমগণ বহু কিছু লাভ করেন। যেমন : খাবার, পোশাক, আসবাবপত্র, গম, আটা, খেজুর, ঘি, মধু, তেল, চর্বি, তৈজসপত্র, চিনির ড্রাম, ছাগল, ভেড়া, গরু। এ ছাড়াও মিনজানিকসহ অসংখ্য অগণিত যুদ্ধাস্ত্র লাভ করেন। সুআব বিন মুআজ দুর্গে ইয়েমেনি কারুকার্য করা মোটা ২০টি রেশমের কাপড়, এক হাজার পাঁচশটি মখমলের পোশাক, চিনির ড্রাম ও প্রচুর পরিমাণ খাবার লাভ করেন। কিছু মদের পাত্রও পান, সেগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দেন। মুসলিম বাহিনী ওই দুর্গ থেকে এক মাসেরও বেশি সময় খাবার গ্রহণ করেন এবং সওয়ারিগুলোকেও সেখানের দানা-পানি দেন।

১৩০৫. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৫০-৬৫২।

মুসলিমগণ সুআব বিন মুআজ দুর্গ থেকে খাবার, সওয়ারির খাবার ও পোশাক-আশাক স্থানান্তর করছিল আর উয়াইনা তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এসব দেখে সে বলল, 'আমাদের কেউ কি নেই, এই খাবারগুলো থেকে আমাদের সওয়ারিকে খাবার দেবে? এসবের যোগ্য হকদার ছিল আমাদের পরিবারের লোকেরা।' মুসলিমরা তখন তাকে তিরস্কার করে।[১৩০৬]

উয়াইনা দ্বিতীয়বার খাইবারে ফিরে এসে দেখে রাসুল ﷺ খাইবার জয় করে নিয়েছেন। মুসলিমগণ সেখানে গনিমত সংগ্রহ করছে। তখন উয়াইনা বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের থেকে যা লাভ করেছ, তা থেকে আমাকে কিছু দাও। কারণ আমি তোমার সাথে যুদ্ধ না করে ফিরে গেছি। আমার মিত্রদের একা ফেলে রেখেছি। তোমার ওপর কোনো বাড়াবাড়ি না করে চার হাজার সৈন্য নিয়ে ফিরে গেছি।' কিন্তু রাসুল ﷺ তাকে গনিমতের কিছুই দেননি।

এবার উয়াইনা ভালো মানুষ সেজে ইহুদিদের কাছে বলতে লাগল, 'আজকের মতো কঠিন দিন আমি আর দেখিনি। আল্লাহর শপথ, আমি মনে করতাম না, তোমরা ছাড়া অন্য কেউ মুহাম্মাদকে কাবু করতে পারবে। আমি ভাবলাম, তোমরা শক্তি-সম্পদে একটি সমৃদ্ধ সম্প্রদায়। এই দুর্ভেদ্য দুর্গে থেকেও তোমরা নিজ হাতে ধন-সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিলে। এত পরিমাণ খাবার ও পানি খাওয়ার মতো লোক পাওয়া যেত না।' ইহুদিরা বলল, 'আমরা জুবাইর দুর্গে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু "দুবুল" নালা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। গরম ছিল প্রচণ্ড পরিমাণে। পিপাসায় আমরা কাতর হয়ে পড়েছিলাম।

উয়াইনা বলল, 'তোমরা তো নায়িম দুর্গে পরাজিত হয়ে জুবাইর দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলে।' এরপর সে নিহতদের ব্যাপারে খবর নিতে লাগল। খবর শুনল আর বলল, 'হায়, এই বীর বাহাদুরও নিহত হয়েছে। পুরা হিজাজে ইহুদিদের কোনো সমকক্ষ ছিল না।'

সালাবা বিন সাল্লাম বিন আবুল হুকাইক তার কথা শুনে বলল, 'হে উয়াইনা, তুমি তাদের ধোঁকা দিয়েছ। তাদের ছেড়ে চলে গেছ। ইতিপূর্বে বনু কুরাইজার সাথেও এমন করেছিলে।'

১৩০৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৬৪-৬৬৫।

গাতাফান গোত্রের এক লোক উয়াইনাকে বলল, 'আপনি তো আপনার মিত্রদের সাহায্য করেননি। ফলে আপনার কারণে তারা আমাদেরও মিত্রতা রক্ষা করবে না। আর আপনি যখন ফিরে যাবেন, তখন মুহাম্মাদের কাছে এক বছরের খেজুরও নিয়ে ফিরতে পারছেন না।' এরপর উয়াইনা আফসোস করতে করতে আপন জায়গায় ফিরে গেল।[১৩০৭] না মিত্রকে সাহায্য করল, না শত্রুর কোনো ক্ষতি করতে পারল।

৭. মুসলিমদের বিরুদ্ধে গাতাফান গোত্রের সেনা সমাবেশ

হুসাইল বিন নুয়াইরা নামক আশজা গোত্রের এক লোক রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলো। সে রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে খাইবারে গাইড হয়েছিল। রাসুল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হুসাইল, কোথা থেকে আসলে।' সে বলল, 'জিনাব থেকে।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমার পেছনের পরিস্থিতি কী?' সে বলল, 'জিনাব অঞ্চলে বনু গাতাফানের একদল লোক দেখলাম। উয়াইনা তাদেরকে জিনাব অঞ্চলে এ বলে পাঠিয়েছে, হয়তো তোমরা আমাদের কাছে আসবে, নয়তো আমরা তোমাদের কাছে যাব। জিনাবের লোকেরা তার কাছে খবর পাঠিয়েছে, আপনি আমাদের কাছে আসুন। তাহলে আমরা সকলে মিলে মুহাম্মাদের ওপর আক্রমণ করব।' তারা আপনার উদ্দেশ্যে আসছে অথবা আপনার কোনো অঞ্চলে আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসছে।

রাসুল ﷺ আবু বকর رضي الله عنه ও উমর رضي الله عنه-কে ডেকে খবর শুনালেন। তাঁরা বললেন, 'বাশির বিন সাদকে প্রেরণ করুন।' রাসুল ﷺ বাশির رضي الله عنه-কে ডাকলেন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে ৩০০ জনের একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। তাঁদের নির্দেশ দিলেন, রাতে পথ চলবে আর দিনে আত্মগোপন করে থাকবে। তাদের সাথে হুসাইল বিন নুয়াইরা গাইড হিসেবে বের হলো।[১৩০৮] এটি সপ্তম হিজরির শাওয়াল মাসের ঘটনা।[১৩০৯]

১৩০৭. বিস্তারিত দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৭৫-৬৭৭।
১৩০৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭২৭-৭২৮।
১৩০৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২০, উয়ুনুল আসার : ২/১৪৭।

বাশির ﷺ দিনে আত্মগোপন থেকে রাতে পথ চলে খাইবারের নিম্ন এলাকায় পৌঁছে গেলেন। এরপর 'সালাহ' নামক স্থানে অবতরণ করেন। 'সালাহ' থেকে বের হয়ে শত্রুর নিকটবর্তী হন। গাইড তাদের বলল, 'তোমাদের ও শত্রুর মাঝে অর্ধ দিন বা এক-তৃতীয়াংশ দিনের পথ বাকি আছে। তোমরা যদি চাও, তবে তোমরা আত্মগোপন করে থাকবে আর আমি তোমাদের চর হিসেবে গিয়ে তোমাদের কাছে খবর নিয়ে আসব। আর যদি চাও, তাহলে আমরা সকলে একসাথে যেতে পারি।' তাঁরা তাকে চর হিসেবে আগে পাঠিয়ে দিলেন। গাইড অল্প কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'একটু সামনেই তাদের গাবাদি পশুর চারণভূমি। তোমরা কি সেখানে আক্রমণ করতে চাও?'

সাহাবিদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিল। কেউ বললেন, 'এখানে আক্রমণ করলে শত্রুরা সতর্ক হয়ে যাবে।' আবার কেউ বলল, 'আমাদের সামনে যা পড়েছে, তার ওপরই আক্রমণ করব। এরপর শত্রুদের ওপর আক্রমণ করব।' শেষমেশ তাঁরা আক্রমণ করে গবাদি পশু হস্তগত করেন। প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু লাভ করেন। রাখালরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং দ্রুত গিয়ে তাদের সৈন্যদের খবর বলে দেয়। খবর শুনে শত্রুসেনা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের এলাকার উঁচু অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

বাশির ﷺ তাঁর সৈনিকদের নিয়ে শত্রুর এলাকায় পৌঁছে যান। কিন্তু সেখানে কাউকে না পেয়ে হস্তগত করা গবাদি পশু নিয়ে ফিরে আসেন। ফেরার সময় 'সালাহ' নামক স্থলে উয়াইনার একজন গুপ্তচরকে পান। তাঁরা তাকে হত্যা করেন। এরপর উয়াইনার বাহিনীর দেখা পান। কিন্তু উয়াইনা তখনও সাহাবিদের খবর বুঝতে পারেনি। ফলে সাহাবায়ে কিরাম অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণ করে বসেন। উয়াইনার বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম তাদের পিছু ধাওয়া করে একজন বা দুজনকে পাকড়াও করেন। তাদের নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে হাজির হন। তারা ইসলাম কবুল করেন। রাসুল ﷺ তাদের ছেড়ে দেন।[১৩১০]

১৩১০. ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭২৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২০, উয়ুনুল আসার : ২/১৪৭-১৪৮, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৭৯।

হারিস বিন আওফ আল-মুররি উয়াইনার মিত্র ছিল। উয়াইনা পরাজিত হয়ে তার দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় হারিসের সাথে তার দেখা হয়। হারিস তার পথ আগলে দাঁড়ালে সে বলে, 'না, পথ আটকাবে না। আমি থামতে পারব না। আমার পেছনেই মুহাম্মাদের বাহিনী ধেয়ে আসছে।' সে এ কথা বলছিল আর ঘোড়া ছুটানোর জন্য ঘোড়ায় পদাঘাত করছিল।

হারিস বলল, 'এখনো কি তোমার অবস্থান নিয়ে ভাবার সময় হয়নি? মুহাম্মাদ তো পুরো অঞ্চল পদানত করে ফেলেছে। আর তুমি অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করছ!' হারিস বলে, 'এরপর আমি মুহাম্মাদের অশ্ববাহিনীর রাস্তা থেকে সরে এমন স্থানে অবস্থান নিলাম; যাতে আমি তাদের দেখতে পাই এবং তারা আমাকে দেখতে না পায়। তাই আমি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাত পর্যন্ত অবস্থান করলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তাদের কেবল ভীতিই তাড়া করেছিল। পরে আমি উয়াইনার সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, "আমি সেখানে রাত পর্যন্ত অবস্থান করেছি। কিন্তু ধাওয়া করার মতো কাউকে দেখিনি।" তখন উয়াইনা বলল, "ব্যাপারটি এমনই ছিল, আমি তো বন্দিত্বকে ভয় পেয়েছিলাম। একাধিক স্থানে আমার কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি মুহাম্মাদের কাছে জমা আছে, সেটা তো তুমি জানো।"' হারিস বলল, 'বনু নাজির, খন্দকের দিন, বনু কুরাইজা এবং তার পূর্বে খাইবারে বনু কাইনুকার পরিণতি আমি স্পষ্ট দেখেছি। আমাদের সাথে তুমিও তা দেখেছ।' উয়াইনা বলল, 'তা অবশ্য ঠিক আছে। কিন্তু আমার মন আমাকে স্থির হতে দিচ্ছে না।' তখন হারিস বলল, 'মুহাম্মাদের সাথে মিলিত হও।' উয়াইনা বলল, 'আমি তাঁর অনুসারী হয়ে যাব! লোকেরা আমার আগে তাঁর কাছে চলে গেছে। তারা তো পরবর্তীদের হেয়জ্ঞান করবে। তারা বলবে, "আমরা বদর ইত্যাদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।"' হারিস বলল, 'তুমি যেমনটা মনে করো, তেমনই হবে। যদি আমরা আগে তাঁর কাছে যেতাম, তবে আমরা তাঁর উচ্চ পর্যায়ের সাথিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম। তাঁর সম্প্রদায় এখনো তাঁর সাথে একটি চুক্তির মধ্যে আছে। সে তাদের একটি সুযোগের অপেক্ষায় আছে। যতক্ষণ চুক্তি ঠিক থাকে।' উয়াইনা বলল, 'আমি ভেবে দেখি।'

তারা উভয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলো। পথিমধ্যে তারা ফারওয়াহ বিন হুবাইরার পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। ফারওয়াহ তখন উমরার

উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। তারা পরস্পর আলাপ করছিল। এরপর ফারওয়াহকে তারা তাদের উদ্দেশ্যের কথা বলে দিল। ফারওয়াহ বলল, 'যদি তোমরা একটু সময় নিয়ে অপেক্ষা করতে, তাঁর কওম যে চুক্তির মধ্যে আছে, তার ব্যাপারে তারা কী করে? আর আমিও তোমাদের কাছে তাদের খবর নিয়ে আসতাম।' তখন তারা রাসুল ﷺ-এর কাছে যাওয়া পিছিয়ে দিল।

ফারওয়াহ মক্কায় গিয়ে কুরাইশের সর্দার ও গোত্রের বড় বড় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বুঝল, তাদের এমন অবস্থা যে, মুসলিমদের বাস্তবে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

ফারওয়াহ ফিরে এসে হারিস ও উয়াইনার সাথে দেখা করে বলল, 'তোমরা চিন্তাভাবনা করে তাঁর কাছে যাও।' তারা রাসুল ﷺ-এর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু এক পা আগে বাড়ালে আরেক পা পেছনে হটে। তারা কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না।[১৩১১]

ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী অবস্থা

১. ইসলাম গ্রহণ

উয়াইনা ﷺ মক্কা-বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার বলা হয়, মক্কা-বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মুসলিম অবস্থায়ই মক্কা-বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।[১৩১২] ইবনে হাজার আসকালানি ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি মক্কা-বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা-বিজয়সহ হুনাইন ও তায়িফ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।'[১৩১৩] আমার কাছে এ মতটি অগ্রগণ্য। কারণ তিনি মক্কা-বিজয়ের পূর্বে তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি দৃঢ়তার সাথেই উল্লেখ করেছেন। অথচ অন্যরা এভাবে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেননি। বরং বলেছেন, 'তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন হয়তো মক্কা-বিজয়ের পূর্বে অথবা তার পরে।'

১৩১১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৭২৭- ৭৩১।

১৩১২. আল-ইসতিআব : ৩/১৪৪৯, উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/৪৯।

১৩১৩. আল-ইসাবাহ : ৫/৫৫।

ইবনে হাজার ﷺ-এর মতকে আমি আরও এক কারণে অগ্রাধিকার দেবো। একটু পরেই সে কারণ আমি উল্লেখ করছি।

আমরা জানি না, তিনি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তবে সপ্তম হিজরি পর্যন্ত মুশরিক ছিলেন। সম্ভবত সপ্তম হিজরির শেষের দিকে অথবা অষ্টম হিজরির শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর ওই বছরে রমাদান মাসে রাসুল ﷺ-এর সাথে মক্কা বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

২. মক্কা বিজয়াভিযানে

উয়াইনা ﷺ নাজদে আপন পরিবারের সাথে অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে খবর এল, রাসুল ﷺ কোনো এক দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন। পুরো আরবের লোক তাঁর কাছে জমায়েত হয়েছে। তখন তিনি তাঁর কওমের কিছু লোককে সাথে নিয়ে মদিনায় আসেন। মদিনায় এসে দেখেন, রাসুল ﷺ দুই দিন আগে বের হয়ে গেছেন। দেরি না করে তখনই 'আরজ' অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে রাসুল ﷺ-এর দেখা পান। রাসুল ﷺ যাত্রাবিরতি করলে তিনি রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার সফর ও সফরসঙ্গীদের কথা জানতে পেরে দ্রুত রওয়ানা হই। আমার কওমকে একত্রিত করার সময় পাইনি। তাহলে আমাদের কাফেলা আরও বড় হতে পারত। যুদ্ধের কোনো সাজসরঞ্জামও দেখছি না এবং কোনো ঝান্ডাও দেখছি না। তবে কী ইচ্ছা করেছেন? ইহরামের আসবাবপত্রও তো দেখছি না। তাহলে কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন ইয়া রাসুলাল্লাহ!' রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ যেখানে চান।'

তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে চললেন। 'সুকইয়ায়' এসে দেখেন, আকরা বিন হাবিস ﷺ-এর সাথে তাঁর কওমের ১০ জন লোক। তারাও তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছেন।

'কুদাইদে' এসে রাসুল ﷺ অনেকগুলো নিশান ও ঝান্ডা প্রস্তুত করলেন। উয়াইনা ﷺ যখন দেখতে পেলেন, প্রত্যেক গোত্র নিশান ও ঝান্ডা ধারণ করছে, তখন তিনি আঙুল কামড়াতে লাগলেন। আবু বকর ﷺ বললেন, 'কীসের জন্য এমন আফসোস করছ?' তিনি বললেন, 'আমার কওমের জন্য আফসোস লাগছে। তারা মুহাম্মাদের সাথে বের হতে পারল না। মুহাম্মাদ ﷺ কোথায় যাওয়ার

ইচ্ছা করেছেন হে আবু বকর!' আবু বকর ﷺ বললেন, 'আল্লাহ যেখানে চান।' এরপর রাসুল ﷺ আকরা বিন হাবিস ও উয়াইনাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।[১৩১৪]

মক্কা-বিজয় হয়েছিল অষ্টম হিজরির রমাদান মাসে।[১৩১৫]

কুদাইদে রাসুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হয় সুলাইম গোত্রের। তারা ছিল ৯০০ জন। তারা প্রত্যেকে ছিল অশ্বারোহী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সাথে রাসুল ﷺ-এর বার্তাবাহকদ্বয়ও ছিল। তাদের কাছেই রাসুল ﷺ এই দুই বার্তাবাহককে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা বলেন, 'আমরা তাদের কাছে যাওয়ামাত্রই তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দ্রুত রাসুল ﷺ-এর কাছে রওয়ানা হয়।'[১৩১৬] আব্বাস বিন মিরদাস সুলামি বলেন, 'রাসুল ﷺ চলা অবস্থায় আমি সাক্ষাৎ করি। একপর্যায়ে রাসুল ﷺ 'মুশাল্লাল' পাহাড় থেকে নিচে নামলেন। যুদ্ধাস্ত্রগুলো আমরা প্রকাশ্যে বহন করে নামলাম। আমরা ঘোড়ার লাগাম টানাটানি করে নামলাম। এরপর আমরা রাসুল ﷺ-এর সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ তাঁর পাশে ছিলেন। তখন উয়াইনা ﷺ পেছন থেকে ডাক দিয়ে উঠল, 'এই যে আমি উয়াইনা। এই তো বনু সুলাইম। তারা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাজির হয়েছে। তারা অশ্বারোহী বীরপুরুষ দক্ষ তিরন্দাজ।' আমি বললাম, 'হে লোক ক্ষান্ত হও। তুমি তো জানো, আমরা অশ্বারোহণে, তির নিক্ষপণে, তির চালনায় তোমার চেয়ে এবং তোমার কওমের চেয়েও সেরা।' তখন উয়াইনা বলল, 'তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি নিচে। এসবের মধ্যে আমরাই বরং তোমার চেয়ে সেরা।' তখন রাসুল ﷺ তাদের হাত দ্বারা ইশারা করলে তারা চুপ হয়ে গেলেন।'[১৩১৭]

১৩১৪. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজির : ২/৮০৩-৮০৪।
১৩১৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৩৪, উয়ুনুল আসার : ২/১৬৩, আদ-দুরার : ২২৭ পৃ.।
১৩১৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৮১২-৮১৩।
১৩১৭. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৮১৩-৮১৪।

৩. হুনাইন যুদ্ধে[১৩১৮]

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে। উয়াইনা ﷺ মুসলিম বাহিনীর সাথে এই যুদ্ধে শরিক হন।[১৩১৯]

রাসুল ﷺ হুনাইনে একদিন সালাত আদায় করে এক পাশে গিয়ে একটি গাছের নিচে বসে পড়েন। তখন উয়াইনা রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে আমির বিন আজবাত আলজায়িরি রক্তপণের দাবি করতে লাগল। সাথে আকরা বিন হাবিস ছিলেন। তিনি মুহাল্লিম বিন জাসসামার পক্ষ অবলম্বন করেন। তারা দুজনই রাসুল ﷺ-এর সামনে বিবাদ করতে লাগলেন। উয়াইনা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, না, আমি তার রক্ত বৃথা যেতে দেবো না, যতক্ষণ না আমি তার নারীদের মাঝে লাঞ্ছনা ঢুকিয়ে দিতে পারি এবং আমার নারীদের মাঝে পেরেশানি ঢুকিয়ে দিতে পারি।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি কি দিয়ত নেবে?' উয়াইনা দিয়ত নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। রাসুল ﷺ-এর সামনে আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অনর্থক কথা বলাবলি শুরু হয়ে গেল। একপর্যায়ে বনু লাইস গোত্রের মুকাইতাল নামের এক লোক এসে দাঁড়াল। সে ছিল বেঁটে, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত। সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, ইসলামের সূচনাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে তার সমাধান আমি কেবল এমনই দেখেছি যে, ছাগলের পালকে পানি পান করানোর জন্য ঘাটে নেওয়া হতো। অতঃপর তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রথম ছাগলকে পাথর নিক্ষেপ করা হলে সব ছাগলই পালিয়ে যেত। (অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা করলে তখন হত্যার ভয়ে আর কেউ এই পথে পা বাড়াবে না।) অতএব আজকে আগের সুন্নাহ অনুসারে ফায়সালা করুন। পরিবর্তন করলে পরে পরিবর্তন করুন।' তখন রাসুল ﷺ হাত উঠিয়ে বললেন, 'তোমরা দিয়ত গ্রহণ করো। এখন ৫০টি নাও। মদিনায় ফিরে গেলে বাকি ৫০টি নিয়ো।' রাসুল ﷺ সেখানে অবস্থান করলেন, যতক্ষণ না তারা তা কবুল করলেন।

১৩১৮. তায়িফের পূর্বের এক উপত্যকার নাম হুনাইন। হুনাইন ও মক্কার মাঝে তিন দিনের দূরত্ব। মুজামুল বুলদান : ৩/১৫৮।

১৩১৯. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭, আল-ইসতিআব : ৩/১২৪৯, আল-আসাবাহ : ৫/৫৫, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/৪৯।

হত্যাকারী মুহাল্লিম বিন জাসসামা লোকদের এক পাশেই অবস্থান করছিল। লোকেরা তাকে পীড়াপীড়ি করে বলল, 'তুমি রাসুল ﷺ-এর কাছে যাও, তাহলে তিনি তোমার জন্য ইসতিগফার করবেন।' তখন সে দাঁড়াল। সে ছিল অনেক লম্বা ফরসা বর্ণের। তার পরনে এক জোড়া কাপড় ছিল। ওই কাপড়ে তাকে কিসাস হিসেবে হত্যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। সে এসে রাসুল ﷺ-এর সামনে বসল। তখন তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। সে রাসুল ﷺ-কে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছে যে খবর পৌঁছেছে, ঘটনা এমনই ছিল। আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমার নাম কী?' সে বলল, 'মুহাল্লিম বিন জাসসামা।' রাসুল ﷺ বললেন, 'ইসলামের সূচনাতে তুমি তাকে তোমার অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছ। হে আল্লাহ, মুহাল্লিমকে ক্ষমা করো না।' এ কথা তিনি উঁচু আওয়াজে বললেন। এতে মানুষ ভয়ে কেঁপে উঠল। সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে, তা এমনই ছিল। আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' রাসুল ﷺ উচ্চ আওয়াজে আবারও ওই কথা বললেন। লোকেরা তা শুনে কেঁপে উঠল। 'হে আল্লাহ, মুহাল্লিমকে ক্ষমা করো না।' তৃতীয়বারও তিনি এভাবে বললেন। এরপর রাসুল ﷺ তাকে বললেন, 'যাও।' সে চাদরের আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে রাসুল ﷺ-এর সামনে থেকে উঠে গেল। দমরা আস-সুলামি বলতেন, 'আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, রাসুল ﷺ ঠোঁট নাড়িয়ে তার জন্য ইসতিগফার করেছেন। কিন্তু আল্লাহর কাছে রক্তের কী মূল্য, এটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে এভাবে বলেছিলেন।'[১৩২০]

মুহাল্লিম বিন জাসসামা বাতনে ইদাম অভিমুখে আবু কাতাদা আনসারি ﷺ-এর অভিযানে গিয়েছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে আমির বিন আদবাত আশজায়ি অতিক্রম করে এবং আবু কাতাদা ﷺ-এর বাহিনীকে ইসলামের নিয়ম অনুসারে সালাম করে। ফলে বাহিনীর সকলেই তার থেকে নিবৃত্ত থাকে। কিন্তু মুহাল্লিম বিন জাসসামা আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে এবং তার মালসামানা ও একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী জব্দ করে। বাহিনীটি যখন ফিরে এসে রাসুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করল, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়—

১৩২০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯১৯- ৯২১।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ،

'হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করো, তখন যাচাই করে নিয়ো এবং যে তোমাদের সালাম করে, তাকে তোমরা বলো না যে, তুমি মুসলিম নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের অন্বেষণ করো। বস্তুত আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে।'[১৩২১]

এ অভিযানের বাহিনী কোনো শত্রুর দেখা না পেয়ে ফেরার পথে 'জি-খুশবে' এসে জানতে পারে যে, রাসুল ﷺ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তখন তারা 'সুকইয়া' নামক জায়গায় এসে রাসুল ﷺ-এর সাক্ষাৎ পান।[১৩২২]

আমির বিন আদবাত আশজায়ির রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য উয়াইনার দাবির কারণ ছিল, আমির ছিল গাতাফানের শাখাগোত্র আশজায়ের লোক।[১৩২৩] আর উয়াইনা ؓ ছিলেন গাতাফান গোত্রের সর্দার।

আর আকরা বিন হাবিস মুহাল্লিম বিন জাসসামার পক্ষ নেওয়ার কারণ হচ্ছে, জাসসামা হচ্ছে লাইস গোত্রের লোক। লাইস গোত্র আর তামিম গোত্র হচ্ছে, চাচা গোত্র।[১৩২৪] আকরা বিন হাবিস ছিলেন তামিম গোত্রের সর্দার।

উয়াইনা আর আকরা-এর এমন বিতর্ক নিঃসন্দেহে জাহিলি যুগের একটি প্রথা হিসেবে গণ্য হয়। রাসুল ﷺ এই বিতর্কের উত্তম সমাধান করেছেন।

১৩২১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৯৪।
১৩২২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৯৭।
১৩২৩. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ২৪৯ পৃ.।
১৩২৪. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৮০ ও ১৯৮ পৃ.।

৪. তায়িফ অবরোধে

অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে তায়িফ অবরোধ হয়েছিল।[১৩২৫] এ অবরোধে উয়াইনা ﷺ-ও অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৩২৬]

এখানে এমন অনেক বর্ণনা আছে, যেগুলো থেকে বোঝা যায়, তিনি বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের সাথে ছিলেন আর গোপনে গোপনে তায়িফবাসীর সাথে ছিলেন। তিনি যেন মুশরিকদের বিজয় আর মুসলিমদের পরাজয় কামনা করেছিলেন। কিন্তু বর্ণনাগুলো বিশ্বাসের পর্যায়ে উন্নীত হয় না। সে কারণে বর্ণনাগুলো এখানে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

রাসুল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে তায়িফ থেকে 'জিরানায়'[১৩২৭] এসে অবতরণ করলেন। সাথে ছিল হাওয়াজিন গোত্রের ছয় হাজার নারী ও শিশু এবং অসংখ্য অগণিত উট, ঘোড়া ও গবাদি পশু।

সেখানে হাওয়াজিন গোত্রের একদল প্রতিনিধি আসলো। এর মধ্যে তারা ইসলাম কবুল করেছে। তারা বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আপনজন। আমাদের ওপর কী বিপদ এসেছে, সেটা আপনার কাছে গোপন নয়। অতএব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।'

এরপর জুহাইর নামে হাওয়াজিন গোত্রের শাখাগোত্র বনু সাদ বিন বকর গোত্রের আরেক লোক দাঁড়াল। তার উপনাম ছিল আবু সুরাদ। সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, গবাদি পশুর খোঁয়াড়ের মধ্যে আপনার ফুফু, খালা ও দুধমায়েরা অবস্থান করছে। যারা আপনাকে প্রতিপালন করেছিল। যদি আমরা হারিস বিন আবু শামরা অথবা নুমান বিন মুনজিরকে দুধ পান করাতাম আর আপনি যেমন আমাদের ওপর চড়াও হয়েছেন, তারাও তেমন আমাদের ওপর চড়াও হতো,

---

১৩২৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৫৮।

১৩২৬. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭, আল-ইসাবাহ : ৫/৫৫, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/৪৯।

১৩২৭. মক্কা ও তায়িফের মাঝে অবস্থিত একটি পানির উৎসের নাম জিরানা। তায়িফের চেয়ে মক্কার বেশি নিকটবর্তী। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ৩/১০৯।

তবে আমাদের প্রতি তার দয়া ও অনুগ্রহের প্রত্যাশা করতাম। প্রতিপালিতদের মাঝে আপনিই সবার সেরা।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমাদের স্ত্রী-সন্তান তোমাদের কাছে বেশি প্রিয় নাকি তোমাদের ধন-সম্পদ।' তারা বলল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের সম্পদ আর মান-সম্মানের মাঝে ইচ্ছাধিকার দিলেন। আপনি বরং আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ফিরিয়ে দিন। তারাই আমাদের কাছে বেশি প্রিয়।'

রাসুল ﷺ তাদের বললেন, 'আমার এবং আব্দুল মুত্তালিবের বংশের অধীনে যারা আছে, তাদেরকে আমি তোমাদের দিয়ে দিলাম। লোকদের নিয়ে আমি জোহরের সালাত আদায় করলে তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে, "আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাপারে আমরা রাসুল ﷺ-এর মাধ্যমে মুসলিমদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করছি এবং মুসলিমদের মাধ্যমে রাসুল ﷺ-এর কাছে সুপারিশ করছি। তখন আমি তোমাদের দিয়ে দেবো আর তোমাদের জন্য লোকদের কাছে সুপারিশ করব।'

রাসুল ﷺ জোহরের সালাত আদায় করার পর হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা দাঁড়িয়ে সেভাবেই কথা বলল, যেভাবে রাসুল ﷺ তাদের বলেছিলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন 'আচ্ছা, আমার এবং আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের অধীনে যে নারী-শিশুরা আছে, তাদের আমরা তোমাদের কাছে দিয়ে দিলাম।' তখন মুহাজিরগণ বললেন, 'আমাদের অধীনে যারা আছে, আমরা তাদের রাসুল ﷺ-কে দিয়ে দিলাম। আকরা বিন হাবিস বললেন, 'তবে আমি ও তামিম গোত্র দেবো না।' উয়াইনা বললেন, 'আমি ও ফাজারা গোত্রের লোকেরা দেবো না।' আব্বাস বিন মিরদাস বললেন, 'আমি ও সুলাইম গোত্রের লোকেরা দেবো না।' সুলাইম গোত্রের লোকেরা বলে উঠল, 'আমরা দেবো, আমাদের অধীনে যারা আছে, আমরা তাদের রাসুল ﷺ-কে দিয়ে দিলাম।'

রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে এই বন্দীদের থেকে বিরত থাকবে, আমি তাকে এর পরের যুদ্ধে প্রাপ্য বন্দী থেকে প্রত্যেক বন্দীর বিনিময়ে ছয়জন করে দেবো।' তখন লোকেরা হাওয়াজিন গোত্রের নারী-শিশুদের ফিরিয়ে দিল।[১৩২৮]

১৩২৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/১৩৪-১৩৬, জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৪৪-২৪৫ পৃ., আদ-দুরার : ২৪৫ পৃ.।

এখান থেকে রাসুল ﷺ মুওয়াল্লাফাতুল কুলুবদের গনিমতের অংশ দান করলেন, সম্পদের মাধ্যমে যাদের মন ঠিক রাখা হয়। তারা ছিলেন গণ্যমান্য বক্তিবর্গ। তাদেরকে দিয়ে তাদের গোত্রের লোকদের মন জয় করা হয়েছিল। অন্যান্য কবিলা ও গোত্রের সর্দার এবং কুরাইশ সর্দারদেরও দিয়েছিলেন। গোত্রের সর্দারদের মধ্যে আকরা বিন হাবিসকে ১০০ উট দিয়েছিলেন। মালিক বিন আওফ নাসরিকে ১০০ উট, উয়াইনা বিন হিসনকে ১০০ উট এবং আব্বাস বিন মিরদাসকে কয়েকটি উট দিয়েছিলেন।[১৩২৯] তখন আব্বাস বিন মিরদাস অসন্তুষ্ট হয়েছিল, তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'যাও, তার মুখটা বন্ধ করে দাও।' সাহাবায়ে কিরাম তাকে এই পরিমাণ দিলেন যে, সে মুখ বন্ধ করে থাকল।[১৩৩০]

এটা সত্য যে, উয়াইনা ও আকরা আব্বাসের মতো ছিলেন না। স্বীয় গোত্রের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। পক্ষান্তরে আব্বাসের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফাজারা গোত্রের লোকেরা উয়াইনার আনুগত্য করত, কোনো বিষয়ে তার অবাধ্যতা করত না। অনুরূপ তামিম গোত্রের লোকেরাও আকরা বিন হাবিসের আনুগত্য করত। কিন্তু সুলাইম গোত্র আব্বাসকে অমান্য করত।

তাই উয়াইনা ও আকরা-এর মতো আব্বাসকে দেওয়া উচিত হতো না। রাসুল ﷺ-ও এমনটা করেছেন।

গনিমত বণ্টনের ক্ষেত্রে আনসারি যুবকরা কিছু কথা বলেছিল, যা তাদের বয়োবৃদ্ধ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পছন্দ করেননি। রাসুল ﷺ তখন তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, আল্লাহ ইসলামের প্রতি তাদের হিদায়াত দিয়ে এবং রাসুল ﷺ-এর বাসস্থান তাদের সাথে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তিনি নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের সম্পদ দিয়ে ইসলামের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করেছেন। তখন আনসার যুবকগণ সন্তুষ্ট হয়ে যান।[১৩৩১]

১৩২৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/১৩৯-১৪০, আদ-দুরার : ২৪৬-২৪৭ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৪৬ পৃ.।

১৩৩০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/১৪০-১৪১, আদ-দুরার : ২৪৭ পৃ., ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৪৬-৯৪৭।

১৩৩১. জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৪৭ পৃ.। বিস্তারিত দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/১৪৬-১৪৮।

একজন রাসুল ﷺ-কে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি উয়াইনা বিন হিসন ও আকরা বিন হাবিসকে ১০০ করে উট দিলেন, আর জুআইল বিন সুরাকাকে তো কিছুই দিলেন না।' রাসুল ﷺ বললেন, 'ওই সত্তার শপথ—যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, জুআইল বিন সুরাকা জমিনের বুকে উয়াইনা বিন হিসন ও আকরা বিন হাবিসের মতো সকল ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। কিন্তু আমি তাদের দুজনের মন ঠিক রাখার জন্য দিয়েছি। আর জুআইল বিন সুরাকাকে আমি ইসলামের কাছে ন্যস্ত করে দিয়েছি।'[১৩৩২]

৫. তামিম গোত্র অভিমুখী অভিযানের কমান্ডার

রাসুল ﷺ জিরানা থেকে ফিরে জিলকদের ২৭ তারিখে মদিনায় এসে জুমআর সালাত আদায় করেন। জিলকদ মাসের অবশিষ্ট দিন ও জিলহজের পুরো মাস মদিনায় অবস্থান করেন। মুহাররমের চাঁদ উদিত হলে জাকাত আদায়কারীদের প্রেরণ করেন। বুসর বিন সুফিয়ান কাবিকে প্রেরণ করেন কাব গোত্রে। বুসর ﷺ বনু কাব গোত্রের জাকাত উসুলের জন্য বের হলেন। একটি দুর্বল মতানুসারে তাদের জাকাত আদায় করেন নুআইম বিন আব্দুল্লাহ নাহাম আদাওয়ি। বুসর ﷺ এসে দেখেন কাব গোত্রের উপত্যকা 'জাতে আশতাত', আবার বলা হয় 'উসফানে' তাদের একটি পুকুরপাড়ে তামিম গোত্রের শাখাগোত্র বনু জুহাইম ও বনু আমির বিন জুনদুব এসে অবস্থান করছে। তিনি জাকাত গ্রহণের জন্য খুজাআ গোত্রের লোকদের গবাদি পশু একত্র করার নির্দেশ দিলেন। খুজাআর লোকেরা সব উপত্যকা থেকে জাকাত জমা করলেন। এটাকে তামিম গোত্র অপছন্দ করে বলল, 'এটা কী? তোমাদের থেকে তো অন্যায়ভাবে সম্পদ নেওয়া হচ্ছে।' তারা উত্তেজিত হয়ে বর্ম পরিধান করল এবং তরবারি কোষমুক্ত করল। তখন খুজাআ গোত্রের লোকেরা বলল, 'আমরা তো ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এটা আমাদের দ্বীনের অংশ।' তামিম গোত্রের লোকেরা বলল, 'আল্লাহর শপথ, কখনো একটি উটও সেখানে পৌছবে না।'

জাকাত আদায়কারীরা যখন তাদের দেখল, তখন ভয়ে পালিয়ে গেল। সে সময় পুরো আরবে ইসলাম ব্যাপকতা লাভ করেনি। তখনও কিছু আরব গোত্র পূর্বের

১৩৩২. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/১৪৩-১৪৪।

ধর্মের ওপর ছিল। রাসুল ﷺ জাকাত আদায়কারীদের বলে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন মধ্যম পর্যায়ের মাল উসুল করে, উত্তম পর্যায়ের মাল থেকে না নেয়। জাকাত আদায়কারী মদিনায় এসে রাসুল ﷺ-কে ঘটনার বিবরণ দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি তিনজনের সঙ্গে ছিলাম। (তামিম গোত্রের বদ আচরণের কারণে) খুজাআ গোত্রের লোকেরা তামিম গোত্রের লোকদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে তাদের এলাকা থেকে বের করে দেয়। তাদের বলে দেয়, তোমাদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা না থাকলে তোমরা তোমাদের জায়গায় পৌঁছার আগেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর শত্রুতার কারণে আমাদের ওপর, এমনকি স্বয়ং তোমাদের ওপরও বিপদ নেমে আসত। কারণ তোমরা রাসুল ﷺ-এর লোকদেরকে জাকাতের মাল প্রদান করছ। এ জন্য তারা তাদের এলাকায় ফিরে গেছে।'

রাসুল ﷺ বললেন, 'এই লোকগুলো যে এমন আচরণ করল, কে আছে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেবে?' তখন সর্বপ্রথম উয়াইনা ؓ দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাদের জন্য আমি আছি হে আল্লাহর রাসুল, তাদের পিছু ধাওয়া করব; যদিও তারা "ইয়াবরিন" এলাকা পর্যন্ত চলে যাক না কেন। অতঃপর আল্লাহ চান তো তাদেরকে আপনার কাছে হাজির করব। এরপর আপনি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করবেন অথবা তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।'[১৩৩৩]

নবম হিজরির মুহাররম মাসে রাসুল ﷺ উয়াইনা বিন হিসন ؓ-কে কমান্ডার বানিয়ে ৫০ জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদের মাঝে কোনো মুহাজির বা আনসার সাহাবি ছিলেন না। তাদের বনু তামিম গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। তারা রাতে পথ চলতেন আর দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকতেন। এরপর তাদের ওপর আক্রমণ করেন। মুসলিম বাহিনী দেখে শত্রুরা দৌড়ে পালাতে থাকে। তাদের ১১ জন পুরুষ, ১১ জন নারী ও ৩০ জন শিশু বন্দী হয়। উয়াইনা ؓ তাদের টেনে টেনে মদিনায় নিয়ে আসেন। রাসুল ﷺ তাদের বন্দী করে রাখার আদেশ দিলে তাদেরকে রমলাহ বিনতে হারিসের বাড়িতে রাখা হয়।

১৩৩৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৭৩-৯৭৫।

বন্দীদের মুক্তির জন্য তামিম গোত্রের কয়েকজন সর্দার আসে। যেমন : উতারিদ বিন হাজিব, জিবরিকান বিন বাদর, কাইস বিন আসিম, আকরা বিন হাবিস, কাইস বিন হারিস, নুআইম বিন সাদ, আমর বিন আহতাম ও রবাহ বিন হারিস বিন মুজাশি। তাদের দেখে নারী-শিশুরা কাঁদতে শুরু করে। তারা তাড়াতাড়ি রাসুল ﷺ-এর দরজায় গিয়ে ডাকতে থাকে, 'হে মুহাম্মাদ, আমাদের কাছে আসুন।'

রাসুল ﷺ বের হলেন এবং তখন বিলাল رضي الله عنه সালাতের ইকামাত দিলেন। তারা রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলার জন্য তাঁর পিছু লেগে থাকল; ফলে রাসুল ﷺ তাদের সাথে অবস্থান করলেন। এরপর চলে গেলেন এবং জোহরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে মসজিদের প্রাঙ্গণে বসলেন। তামিম গোত্রের প্রতিনিধি দল উতারিদ বিন হাজিবকে এগিয়ে দিল। সে সুন্দর ভঙ্গিমায় কথা বলল। রাসুল ﷺ সাবিত বিন কাইস বিন শামমাস رضي الله عنه-কে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের কথার জবাব দিলেন।[১৩৩৪] এরপর তারা তাদের কবি জিবরিকানকে এগিয়ে দিল। রাসুল ﷺ হাসসান বিন সাবিত رضي الله عنه-কে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের জবাব দিলেন।[১৩৩৫]

তখন বনু তামিমের প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়—

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

'আর যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ।'[১৩৩৬]

এরপর রাসুল ﷺ তাদের বন্দীদের ফিরিয়ে দেন।[১৩৩৭]

১৩৩৪. উভয় বক্তার উক্তিগুলো দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৭৬-৯৭৭, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২২৪।

১৩৩৫. উভয় কবির কবিতাগুলো দেখুন, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৭৭-৯৭৮, সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/২২৫-২৩২।

১৩৩৬. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ৪।

১৩৩৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬০-১৬১, উয়ুনুল আসরি : ২/২০৩-২০৫।

উয়াইনা ﷺ এই অভিযানের নেতৃত্বের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পেরেছিলেন। ফলে রাসুল ﷺ ও মুসলিমদের সুধারণা অর্জন করেছিলেন। তামিম গোত্রকে জাকাত না দেওয়ার কারণে এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা তারা কখনো ভুলতে পারবে না। তিনি তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করেছিলেন। যে সময়ে হামলা করেছিলেন, তার কল্পনাও করতে পারেনি শত্রুরা। এর মাধ্যমে তিনি শত্রুর চিন্তাশক্তিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন। যার ফলে শত্রু মোকাবিলা তো দূরের কথা, নিজেকে রক্ষা করারও সুযোগ পায়নি। যুদ্ধের ইচ্ছা তাদের উবে গিয়েছিল। জান নিয়ে পালানো ছাড়া তাদের সামনে কোনো পথ বাকি ছিল না। ফলে অল্প সংখ্যক সৈন্য বাহিনী তামিম গোত্রের বিশাল বাহিনীর ওপর জয় লাভ করেছিল। উয়াইনা ﷺ-এর বাহিনীর বিজয়ের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তামিম গোত্রের এলাকা থেকে তিনি নিরাপদে বাহিনী নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর জীবনটা সংশয়ের মধ্যে ছিল। যার কারণে মানুষ তাঁর বিষয়ে মতানৈক্যে পড়ে গেছে। ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মূল্যায়নে আমরা তাঁর এ বিষয়টি আলোচনা করব। অভিযান পরিচালনায় তাঁর উত্তম নেতৃত্বের ব্যাপারে যারা মতানৈক্য করেছে, তাদের কথা আমি বিশ্বাস করি না। সম্ভবত এই দায়িত্বই উয়াইনা ﷺ-এর জীবনের আলোকিত অধ্যায়। যার মূল্যায়নে কেউ মতানৈক্য করবে না।

ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন

উয়াইনার পিতা হিসন ছিলেন তার কওমের সর্দার। তার ছিল ১০ ছেলে। তাদের মধ্যে আছে উয়াইনা, কাইস, খারিজা, হাসসান, জাবিয়া, উকবা ও আমির।[১৩৩৮]

ভাইদের মধ্যে উয়াইনা বড় ছিলেন না। কিন্তু তার বাবা অন্য ভাইদের ছেড়ে তাকে পরবর্তী সর্দার হিসেবে মনোনীত করেন। কুরজ বিন উকাইল তাকে আঘাত করেছিল। সেই আঘাত থেকে তার ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষতই তার মৃত্যুর কারণ হয়। মৃত্যুর সময় তার দশ ছেলেকে একত্র করে বলেন, 'আমি যে অসুস্থতার মাঝে আছি, এতেই হয়তো আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। তোমাদের

১৩৩৮. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ২৫৬ পৃ.।

কে আমার কথা শুনবে?' তারা বলল, 'সকলে শুনবে।' তখন হিসন বড় জনকে দিয়ে শুরু করলেন। 'আমার এই তরবারি নিয়ে আমার বুকে রাখো। এরপর সজোরে চাপ দাও; যাতে করে আমার পিঠ দিয়ে তা বের হয়ে যায়।' বড় ছেলে বলল, 'শ্রদ্ধেয় বাবা, কেউ কি তার পিতাকে হত্যা করতে পারে?' এরপর হিসন একে একে সবার কাছে এই নির্দেশ দিল। কিন্তু উয়াইনা ছাড়া সকলে অস্বীকার করল। উয়াইনা বলল, 'বাবা, আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন, তাতে কি আপনার ইচ্ছা ও শান্তি নেই? এই ক্ষেত্রে কি আমার আনুগত্য করার অধিকার নেই?' হিসন বলল, 'অবশ্যই।' উয়াইনা বলল, 'তাহলে আমাকে বলুন, তরবারি কীভাবে আপনার বুকে রাখব।' হিসন বলল, 'বৎস, তরবারি ফেলে দাও। আমি তোমাদের পরীক্ষা করতে চেয়েছি; যাতে আমি জানতে পারি, আমার জীবদ্দশায় কে আমার বেশি আনুগত্য করে। কারণ মৃত্যুর পর সেই আমার বেশি আনুগত্য করবে। সুতরাং আমার পর তুমি আমার সন্তানদের সর্দার। আমার সর্দারি তোমার কাঁধে ন্যস্ত করলাম।' এরপর বনু বদর গোত্রকে একত্র করে এই কথা জানিয়ে দিলেন। বাবার মৃত্যুর পর উয়াইনা সর্দারির দায়িত্ব পালন করেন এবং পিতার ঘাতক কুরজকে হত্যা করেন।[১৩৩৯]

উয়াইনার সন্তানাদি : ইমরান, আবান, সাইদ, উকবাহ, হাবিব, জাইদ ও আনবাসাহ।[১৩৪০]

জাহিলি যুগে উয়াইনা জাররারদের একজন ছিলেন। তিনি দশ হাজার লোকের নেতৃত্ব দিতেন।[১৩৪১] জাররার কেবল তাকে বলা হতো, যে কমপক্ষে এক হাজার লোকের নেতৃত্ব দিত। তিনি গাতাফান গোত্রসহ তাগলিব গোত্র পর্যন্ত পরিচালনা করতেন।[১৩৪২]

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাদের একজনে পরিণত হন, সম্পদের মাধ্যমে যাদের মন ঠিক রাখা হতো।[১৩৪৩] তাদের মন ঠিক রাখার মাধ্যমে রাসুল ﷺ

১৩৩৯. আল-ইসাবাহ : ৫/৫৫-৫৬।
১৩৪০. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ২৫৬ পৃ.।
১৩৪১. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭, আল-মুহাব্বার : ২৪৯ পৃ.।
১৩৪২. আল-মুহাব্বার : ২৪৯ পৃ.।
১৩৪৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/১৩৯, আদ-দুরার : ২৪৬ পৃ.।

তাদের কওমের মন ঠিক রাখতেন।[১৩৪৪] উয়াইনা ছাড়া বাকি এমন লোকদের ইসলাম একনিষ্ঠ হয়েছিল। তার ব্যাপারটি সর্বদা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল।[১৩৪৫] তিনি ছিলেন বেদুইন, রূঢ়, অভদ্র, পাগল, নির্বোধ এবং কওমের অনুসরণীয় ব্যক্তি।[১৩৪৬] তিনি আরবের হাতে গোনা কয়েকজন নির্বোধ লোকের একজন ছিলেন।[১৩৪৭]

বলা হয়, তিনি একবার অনুমতি ছাড়া রাসুল ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করেন। তখন রাসুল ﷺ বলেন, 'অনুমতি কোথায়?' তখন তিনি বলেন, 'মুজার গোত্রের কারও কাছে আমি অনুমতি চাইনি।'[১৩৪৮]

উয়াইনা রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলেন। তখন আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها রাসুল ﷺ-এর কাছে ছিলেন। তিনি বললেন, 'এ কে?' এ ঘটনা পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার আগে ঘটে। রাসুল ﷺ বললেন, 'সে আয়িশা।' উয়াইনা বলল, 'আমি আপনার জন্য উম্মে বানিনকে নিয়ে আসতে পারতাম না, তাহলে তাকে বিয়ে করতে পারতেন!' এমন কথা শুনে আয়িশা رضي الله عنها ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'এ লোক কে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'এ হচ্ছে নির্বোধ অনুসরণীয় ব্যক্তি।' অর্থাৎ সে এমন নির্বোধ, যার কওম তাকে মান্য করে।[১৩৪৯]

এ ঘটনা সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় আছে, উয়াইনা রাসুল ﷺ-এর কাছে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করল। রাসুল ﷺ বললেন, 'অনুমতি কোথায়?' সে বলল, 'ইতিপূর্বে আমি মুজার গোত্রের কারও কাছে অনুমতি চাইনি।' আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها তখন রাসুল ﷺ-এর কাছে বসা ছিলেন। উয়াইনা বলল, 'এই লাল টুকটুকে মানুষটা কে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'মুমিনদের মা।' উয়াইনা বলল, 'তাঁর চেয়েও কি সুন্দরী নারী আপনার কাছে আনব না, তাহলে আপনি তাকে বিয়ে করতে পারতেন?' আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এ লোক কে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'এ হচ্ছে নির্বোধ মান্যবর ব্যক্তি। তার যে অবস্থা দেখছ, ওই অবস্থায়ই সে তার কওমের সর্দার।'[১৩৫০]

১৩৪৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/১৩৯।
১৩৪৫. আদ-দুরার : ২৫২ পৃ.।
১৩৪৬. আদ-দুরার : ২৭১ পৃ.।
১৩৪৭. আল-মুহাব্বার : ৩৮০ পৃ.।
১৩৪৮. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭।
১৩৪৯. আল-ইসতিআব : ৩/১২৪৯-১২৫০।
১৩৫০. আল-ইসতিআব : ৩/১২৫০, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪১৪।

রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর উয়াইনা আরবের অন্যান্য গোত্রের সাথে মুরতাদ হয়ে যায়। তুলাইহা আল-আসাদি নবি দাবি করলে সে তার ওপর ইমান এনে তার সাথে মিলিত হয়। তুলাইহা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ উয়াইনাকে ধরে আবু বকর ﷺ-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। তাকে বেঁধে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। মদিনার বালকেরা খেজুর গাছের ডাল দিয়ে তাকে প্রহার করে আর তাড়িয়ে নেয়। তারা বলে, 'হে আল্লাহর দুশমন, ইমান আনার পর তুমি আল্লাহকে অস্বীকার করলে!' সে বলত, 'আমি তো ইমান আনিনি।' আবু বকর ﷺ তার সাথে কথা বলার পর সে ইসলামের দিকে ফিরে আসে। আবু বকর ﷺ তার তাওবা গ্রহণ করেন এবং তার জন্য নিরাপত্তা লিখে দেন।[১৩৫১]

আকরা বিন হাবিস ও উয়াইনা বিন হিসন আবু বকর ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা, আমাদের পাশে একটি জলাভূমি আছে। সেখানে কোনো ঘাস-লতাপাতা জন্মে না এবং কোনো উপকারেও আসে না। আপনি চাইলে আমাদের তা দিয়ে দিতে পারেন।' আবু বকর ﷺ তাদের কথায় সাড়া দিয়ে জমিনটি তাদের লিখে দিলেন এবং কিছু লোককে তার সাক্ষী বানালেন। তাদের মাঝে উমর ﷺ উপস্থিত ছিলেন না। তারা সাক্ষী বানানোর জন্য উমর ﷺ-এর কাছে গেল। উমর ﷺ কাগজটি নিয়ে তাতে থুথু দিয়ে মুছে দিলেন। তখন তারা উমর ﷺ-কে বিড়বিড় করে মন্দ কথা বলল। উমর ﷺ বললেন, 'রাসুল ﷺ যখন তোমাদের মনস্তুষ্টির জন্য সম্পদ দিতেন, তখন ইসলাম দুর্বল ছিল। আল্লাহ এখন ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। যাও, তোমরা নিজেরা চেষ্টা করে উপার্জন করো।' তারা আবু বকর ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলল, 'খলিফা আপনি নাকি উমর।' আবু বকর ﷺ 'বরং সে খলিফা, যদি খলিফা হতে চায়।' উমর ﷺ ক্ষুব্ধ অবস্থায় হাজির হলেন। আবু বকর ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি যে তাদের ভূমিটি দিয়েছেন, সেটি আপনার ব্যক্তিমালিকানা নাকি সকল মুসলিম এর মালিক।' আবু বকর ﷺ বললেন, 'বরং সকল মুসলিম তার মালিক।' উমর ﷺ বললেন, 'তাহলে কেন এই দুজনকে নির্দিষ্ট করে দিলেন?' আবু বকর ﷺ বললেন, 'আমার সাথের লোকদের সাথে পরামর্শ করেছি। তাঁরা আমাকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছে।

১৩৫১. আল-মাআরিফ : ৩০৩-৩০৪ পৃ.।

আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, খিলাফতের ব্যাপারে আমার চেয়ে তুমি বেশি শক্তিশালী। তাই আমি পরাস্ত হয়েছি।'[১৩৫২]

আবু বকর ﵁-এর ইনতিকালের পর উমর ﵁ খিলাফতের মসনদে বসেন। উয়াইনার এক ভাতিজা উমর ﵁-এর সভাসদদের মধ্যে ছিলেন। তার নাম ছিল হুর বিন কাইস। উমর ﵁-এর সভাসদগণ হতেন কুরআনের বাহক যুবক এবং প্রৌঢ় বয়সের। একবার উয়াইনা এসে তার ভাতিজাকে বলল, 'তুমি কি আমাকে এই লোকের কাছে নিয়ে যাবে না?' হুর বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে, আপনি তাঁর সামনে অনর্থক কথা বলবেন।' উয়াইনা বলল, 'না, এমন কিছু করব না।' হুর তাকে উমর ﵁-এর কাছে নিয়ে গেলেন। উয়াইনা বলল, 'হে খাত্তাবের বেটা, তুমি তো ইনসাফমতো বণ্টন করো না। দানদক্ষিণা করো না।' কথা শুনে উমর ﵁ খুব রেগে গেলেন। মনে হলো যেন তিনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তখন উয়াইনার ভাতিজা বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনে বলেছেন :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং জাহিলদের উপেক্ষা করো।"[১৩৫৩]

এ লোক তো জাহিলদের একজন।' উমর ﵁ তাকে ছেড়ে দিলেন। কিতাবুল্লাহর সামনে উমর ﵁ চুপসে যেতেন।[১৩৫৪]

উমর ﵁-এর ইনতিকালের পর উসমান ﵁ খিলাফতের মসনদে বসেন। উসমান ﵁ উয়াইনার মেয়েকে বিয়ে করেন।[১৩৫৫] উয়াইনা একবার উসমান ﵁-এর কাছে গেল। উসমান ﵁-কে বলল, 'হে আফফানের বেটা, উমরের মতো আমাদের সাথে আচরণ করো। কারণ সে আমাদের এত পরিমাণ দিয়েছিল যে, আমাদের আর কোনো প্রয়োজন হতো না। সে আমাদের মাঝে

১৩৫২. আল-ইসাবাহ : ৫/৫৬, তারিখু উমর ইবনিল খাত্তাব লি ইবনিল জাওজি : ৩২-৩৩ পৃ.।
১৩৫৩. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৯৯।
১৩৫৪. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭, আল-ইসতিআব : ৩/১২৫০-১২৫১।
১৩৫৫. আল-ইসতিআব : ৩/১২৫০, উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭।

সবচেয়ে আল্লাহভীরু ছিল।' উসমান ﷺ বললেন, 'শুনুন, তারপরও আপনারা তাঁর আচরণে সন্তুষ্ট ছিলেন না।' এরপর তাকে বললেন, 'আপনার রাতের খাবারের আগ্রহ আছে?' সে বলল, 'আমি রোজাদার।' উসমান ﷺ বললেন, 'আপনি কি তাহলে সওমে বিসাল পালন করেন?' উয়াইনা বলল, 'সওমে বিসাল কী?' উসমান ﷺ বললেন, 'দিন-রাত এক নাগাড়ে রোজা রেখে সন্ধ্যার সময় ইফতার করা।' উয়াইনা বলল, 'না, দিনে রোজা রাখার চেয়ে আমার কাছে রাতে রোজা রাখা অনেক সহজ মনে হয়েছে।'[১৩৫৬]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে উয়াইনাকে বলতে শোনা গেল, 'আমি অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সন্তান।' আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বললেন, 'তিনি তো হচ্ছেন ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম।' তখন উয়াইনা চুপ হয়ে গেল।[১৩৫৭]

তার মাঝে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মতো কঠোরতা ছিল। তিনি কঠোর প্রকৃতির বেদুইনদের একজন ছিলেন।[১৩৫৮]

তার সূত্রে রাসুল ﷺ-এর কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই।[১৩৫৯] তিনি রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে ফাজারা গোত্রের জাকাত আদায়কারীদের একজন ছিলেন।[১৩৬০] উসমান বিন আফফান ﷺ-এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন।[১৩৬১] আমরা তার জন্মসন ও মৃত্যুসন সম্পর্কে জানতে পারিনি। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিলেন।[১৩৬২] মৃত্যুর সময় সন্তানাদি রেখে যান।

উৎসগ্রন্থ থেকে তার সকল আলোচনা একত্র করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে সামান্য কিছু টীকা যুক্ত করেছি। কারণ তার আলোচনা আমার কাছে একেবারেই স্পষ্ট। মানুষ হিসেবে তার জীবন ও ব্যক্তিত্বের গুণাবলির

১৩৫৬. আল-মাআরিফ : ৩০৪ পৃ.।
১৩৫৭. উসদুল গাবাহ : ৪/১৬৭, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/৪৯।
১৩৫৮. আল-ইসাবাহ : ৫/৫৫, উসুদল গাবাহ : ৪/১৬৭, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ২/৪৯।
১৩৫৯. আল-ইসাবাহ : ৫/৫৫।
১৩৬০. তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত : ১/৬৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৫৩০।
১৩৬১. আল-ইসাবাহ : ৫/৫৬।
১৩৬২. আল-মাআরিফ : ৩০৪ পৃ.।

অভিভাবকত্ব করে এই বর্ণনাগুলো। তাই টীকা যুক্ত না করে শুধু তার আলোচনাগুলো একত্র করার ওপরই ক্ষান্ত হয়েছি। স্পষ্ট থাকার কারণে টীকা সংযুক্ত করার কোনো প্রয়োজন অনুভব হয়নি।

উয়াইনা সম্পর্কে যতই বলা হোক। সম্ভবত তার গোত্রীয় নেতৃত্ব আঁকড়ে ধরা, আরবের গোত্রীয় সর্দারির প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব, গর্ব-অহংকার, দুনিয়াবি স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা, জাহিলি অন্ধ-অনুসরণে একগুঁয়েমি এবং ইসলাম বিরোধী বৈশিষ্ট্যের কারণে জীবদ্দশায় তিনি মানুষের করুণা ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর পর ঐতিহাসিকগণ তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। আবার রাসুল ﷺ তো তার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। তাই তাকে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। জাকাত উসুলকারী বানিয়েছিলেন। ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও সহানুভূতির সাথে তাকে প্রচুর পরিমাণে দান-অনুদান করেছেন। মানসিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য ইসলামি সমাজে তার অবস্থান উঁচু করার চেষ্টা করেছেন। সমাজের ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাহিলি যুগের বক্রতা, একগুঁয়েমি ও পঙ্কিলতাকে ভোলানোর বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে অতীতকে স্মরণ করেছে, বারবার আলোচনায় এনেছে। অতীতকে ভুলে যায়নি অথবা ভুলে যাওয়ার ভান করেছে। বরং তার হৃদয় অতীতের প্রতি প্রবল আসক্ত হয়ে থাকত।

যা কিছুই হোক, সর্বাবস্থায় তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার মর্যাদা এবং রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে যুদ্ধ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। একটি অভিযান পরিচালনাসহ একটি প্রশাসনিক কাজে দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। এটাই তাঁর মর্যাদার জন্য যথেষ্ট। আর ইসলাম তো পূর্বের সকল গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।

কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

উয়াইনা জাহিলি যুগেও কমান্ডার ছিলেন, ইসলামে এসেও কমান্ডার হয়েছিলেন। বরং তিনি জাহিলি যুগে হাতে গোনা কয়েক জন 'জাররার'-এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সে সময়ে তিনি আরবের একজন বড় নেতা ছিলেন।

জাহিলি যুগে গোত্রের নেতৃত্বের আসনে বসেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তারই স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ওই গোত্রেরই গোত্রপ্রধান হয়েছিলেন।

রাসুল ﷺ-এর যুগে এসে তিনি নেতৃত্বের আসনে বসেননি; বরং জাহিলি যুগেই তিনি আরবের একজন ঐতিহ্যগতভাবে গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। তামিম গোত্রের যারা জাকাত আদায়ে অস্বীকার করেছিল, তাদের জাকাত উসুল করার জন্য তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।

ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের পরেও যুদ্ধের ময়দানে তার ছিল দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। কখনো বিজয়ী হয়ে কখনোবা পরাজিত হয়ে। বিশেষত মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে। এ ক্ষেত্রে তার পরাজয়টা ছিল ধারাবাহিক পর্যায়ের। তাই তার ইসলাম গ্রহণটা হয়েছিল একপ্রকার বিজয়ী প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত পক্ষের আত্মসমর্পণের মতো। অথচ এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কত কষ্ট এবং পরিশ্রমই না ব্যয় করেছেন!

সমর বিষয়ে তার অর্জিত জ্ঞানের প্রমাণ হচ্ছে, তিনি আরবের অন্যতম এক গোত্রপতির সন্তান। যার অন্যান্য আরব গোত্রের সাথে ছিল বিভিন্ন সমস্যা। যে সমস্যাগুলোর কোনো শুরু ও শেষ ছিল না। এমন গোত্রপ্রধানেরই সন্তান ছিলেন উয়াইনা বিন হিসন। পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন অনেক সমস্যা, তারপরে নিজেও তৈরি করেছিলেন নতুন অনেক সমস্যা। বেশির ভাগ যুদ্ধ কেবল সেই নতুন ও পুরাতন সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যেই সংঘটিত হতো। সে সময় যুদ্ধই ছিল গোত্রগুলোর মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তার মূলনীতি। তরবারি ছাড়া শত্রুর সাথে কোনো কথা চলত না। তাই যুদ্ধবাজের পুত্র যুদ্ধের কলাকৌশল রপ্ত করবেন এটাই স্বাভাবিক।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহজাত যোগ্যতা। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার সহজাত যোগ্যতা ছিল কি না, এটা নিশ্চিত করা একটু কঠিন। কারণ তিনি এমন কোনো চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হননি, যেখানে তার সহজাত যোগ্যতা প্রদর্শন করতে হয়। ইসলামের পূর্বে জাহিলি যুগে যে সকল যুদ্ধে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন এবং ইসলামের পরে যে যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেগুলো তার যোগ্যতা প্রমাণ করে না ঠিক; কিন্তু অস্বীকারও করে না।

নেতৃত্বে তার শাখাগত বৈশিষ্ট্যাবলি হচ্ছে, দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তবে পাশাপাশি ভারসাম্যের চেয়ে ভারসাম্যহীনতাই তার মাঝে বেশি ছিল।

তার মাঝে বীরত্বের গুণ ছিল, এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তিনি ছিলেন অবিচল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। দায়িত্ব আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি। নিজের স্থান, বংশ ও ব্যক্তিত্বের কারণে খুব বেশি পরিমাণে দায়িত্ব পছন্দ করতেন। পরামর্শের ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

জয় ও পরাজয়ে তার মনে পরিবর্তন আসত। বিজয় তাকে আন্দোলিত করে তুলত এবং মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটাত। পরাজয় তাকে পীড়া দিত, মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটাত। এবং তার কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ত।

তার দূরদর্শিতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। তিনি ছিলেন তাড়াহুড়াপ্রবণ, অস্থির চিত্তের কমান্ডার। স্বীয় সৈনিকদের মানসিক অবস্থা ও যোগ্যতা সম্পর্কে তার জানাশুনার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ তিনি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। নিজেকে আসল গণ্য করে সৈনিকদের অতিরিক্ত মনে করতেন। সৈনিকদের প্রতি তার কোনো গুরুত্ব থাকত না। তাই সৈনিকদের ভরসা ও ভালোবাসা পাওয়ার ব্যাপারে সংশয় হয়। ইসলামের সেবায় তার কোনো কার্যকর ও সম্মানজনক অবস্থান ছিল না।

তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় আসি। তিনি আক্রমণাত্মক আক্রমণের নীতি অনুসরণ করতেন। তার প্রায় সব আক্রমণই ছিল আক্রমণাত্মক। আকস্মিক আক্রমণকে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে মেনে চলতেন। আমরা দেখেছি, কীভাবে বনু তামিম গোত্রের ওপর আকস্মিক হামলা করেছিলেন।

সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি নিয়ে নিতেন। এটাকে গুরুত্ব দিতেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। যাতে সময় ও স্থান বিবেচনায় যথাসম্ভব বড় ধরনের শক্তি সঙ্গে রাখা যায়। সেই সাথে গর্ব-অহংকার ও বড়ত্বের ভালোবাসায় ব্যক্তিগত প্রবণতাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এর জন্য তিনি ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি ব্যয়ের নীতির বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করতেন।

নিরাপত্তার নীতির কোনো গুরুত্ব ছিল না তাঁর কাছে। ফলে তার পরিকল্পনাগুলো হতো অগোছালো। নিষ্প্রাণ, অফলপ্রসূ, পরিবর্তন ও রূপান্তরহীন।

প্রশাসনিক বিষয়ে শুধু অতটুকুই গুরুত্ব দিতেন, যতটুকুতে তাঁর ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল হতো।

নেতৃত্বে ছিলেন বেদুইন। ফলে নতুন ইসলামি সমাজে তাঁর অতি সামান্যই প্রভাব পড়েছিল।

ইতিহাসে উয়াইনা ﵁

তিনি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনিই প্রথম বেদুইন কমান্ডার, যিনি রাসুল ﷺ-এর একটি অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় অন্য কোনো বেদুইন নেতৃত্বের এই আসন লাভ করতে পারেনি। তাঁর পরে কেবল দাহহাক বিন সুফিয়ান কিলাবি এই আসন লাভ করেছিলেন।

রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর তিনি মুরতাদ হয়ে পুনারায় ইসলামে ফিরে এসেছিলেন। তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল। যা তাঁকে এই মর্যাদায় উন্নীত করেছে। তিনি জাহিলি যুগে হাতে গোনা কয়েকজন কমান্ডারের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য সম্পদ দেওয়া হতো।

আল্লাহ তাআলা এই বেদুইন কমান্ডার সাহাবির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং ইসলামের জন্য যতটুকু খিদমত করেছেন, তার উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

কমান্ডার

কুতবাহ বিন আমির আল-খাজরাজি ﷺ

তাঁর বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

কুতবাহ বিন আমির বিন হাদিদা বিন আমর বিন সাওয়াদ বিন গানম বিন কাব বিন সালিমা[১৩৬৩] আনসারি খাজরাজি সালিমি। তাঁর উপনাম ছিল আবু জাইদ।[১৩৬৪]

তাঁর মাতা : জাইনাব বিনতে আমর বিন সিনান বিন আমর বিন মালিক বিন বুহাসা বিন কুতবা বিন আওফ বিন আমির বিন সালাবা বিন মালিক।[১৩৬৫]

তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনী সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারিনি। তিনি ছিলেন খাজরাজ গোত্রের সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছয় ব্যক্তির একজন। রাসুল ﷺ হজের মৌসুমে এই ছয় আনসারির সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁরা সকলে ছিলেন খাজরাজ গোত্রের। তাঁদের একজন ছিলেন কুতাবাহ বিন আমির ﷺ। রাসুল ﷺ তাঁদের ইসলামের দাওয়াত দিলে তাঁরা ইসলাম কবুল করেন। এরপর মদিনায় ফিরে এসে দাওয়াতের কাজ করেন। একপর্যায়ে তাঁদের মাঝে ইসলামের প্রসার ঘটে। ফলে আনসারিদের এমন কোনো ঘর বাকি

১৩৬৩. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৭৮, উসদুল গাবাহ : ৩/২০৫, আল-ইসতিআব : ৩/১২৮২, আল-ইসাবাহ : ৫/২৪২।

১৩৬৪. উসদুল গাবাহ : ৪/২০৫, আল-ইসতিআব : ৩/১২৮২।

১৩৬৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৭৮।

থাকল না, যেখানে রাসুল ﷺ-কে নিয়ে আলোচনা হতো না।[১৩৬৬] সুতরাং কুতাবাহ رضي الله عنه হলেন সেই ছয় ব্যক্তির একজন, যাঁরা মক্কায় সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পূর্বে আর কোনো আনসারি সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেননি।[১৩৬৭]

পরের বছর হজের সময় ১২ জন আনসারি সাহাবি আসলেন। তাঁরা রাসুল ﷺ-এর সাথে হজের দিনগুলোতে আকাবায় সাক্ষাৎ করলেন। এটি হচ্ছে আকাবার প্রথম বাইআত। এটা হয় তাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ হওয়ার আগে।[১৩৬৮] রাসুল ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির ১২ তম বছরে।[১৩৬৯] বাইআতকারীদের মাঝে কুতবাহ رضي الله عنه-ও শরিক ছিলেন।[১৩৭০] তাঁরা এ বাইআতে শপথ করেছিলেন, আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না, কারও ওপর অন্যায় অপবাদ দেবে না, ভালো কাজে অবাধ্যতা করবে না। যদি তারা এসব মান্য করে, তবে তাদের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত। এ বাইআতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ ছিল না।[১৩৭১]

রাসুল ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ তম বছরে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত সংঘটিত হয়।[১৩৭২] ৭০ জন আনসারি রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে তাঁবু থেকে গোপনে বের হয়ে আকাবায় চলে যান। সেখানে তাঁরা রাসুল ﷺ-এর হাতে এ মর্মে বাইআত দেন যে, রাসুল ﷺ-কে তাঁরা ঠিক সেভাবে রক্ষা করবেন, যেভাবে রক্ষা করেন স্বীয় স্ত্রী-সন্তানদের এবং রক্ষা করেন নিজের জীবনের। আর রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ তাঁদের কাছে চলে যাবেন। রাসুল ﷺ তাঁদের থেকে ১২ জনকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করলেন। এই দ্বিতীয় বাইআতে কুতবাহ رضي الله عنه-ও উপস্থিত ছিলেন।[১৩৭৩]

১৩৬৬. জাওয়ামিউস সিরাহ : ৬৯-৭১ পৃ., আদ-দুরার : ৭০-৭১ পৃ., সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩৮-৩৯।

১৩৬৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৭৮।

১৩৬৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩৯।

১৩৬৯. উমদাত মিন নুরিল মুস্তফা : ১৯ পৃ.। আল-বাদউ ওয়াত তারিখ : ৪/১৬৫।

১৩৭০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৪১, আনসাবুল আশরাফ : ১/১৬৫।

১৩৭১. আনসাবুল আশরাফ : ১/২৩৯, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৪১, আদ-দুরার : ৭২-৭৩ পৃ.।

১৩৭২. উমদাত মিন নুরিল মুস্তফা : ১৯ পৃ., আল-বাদউ ওয়াত তারিখ : ৪/১৬৬।

১৩৭৩. বিস্তারিত দেখুন, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৪৭-৭৫, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪০।

সকল বর্ণনামতে কুতবাহ ﵁ উভয় বাইআতে উপস্থিত ছিলেন। এতে কারও কোনো দ্বিমত নেই।[১৩৭৪]

দ্বিতীয় বাইআতের পর রাসুল ﷺ মক্কায় অবস্থানরত সাহাবিদের মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম খণ্ড খণ্ড হয়ে হিজরত করে মদিনায় পাড়ি জমালেন।[১৩৭৫]

রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরত করে মসজিদে নববি নির্মাণের পর আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও অধিকারের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন। ফলে আত্মীয়দের পরিবর্তে ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পরস্পর উত্তরাধিকারের প্রাপ্য হতেন। অবশেষে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো।

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

'যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধানমতে তারা পরস্পর বেশি হকদার।'[১৩৭৬]

ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে যে উত্তরাধিকার তাঁরা লাভ করতেন, এ আয়াত সেই উত্তরাধিকারের বিধানকে রহিত করে দেয়। কিন্তু তা ছাড়া পারস্পরিক সহমর্মিতা ও অন্যান্য অধিকার তাঁদের মাঝে বহাল থাকে। যাহোক, রাসুল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন মাজউন ও কুতবাহ বিন আমির ﵄-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব জুড়ে দেন।[১৩৭৭]

শান্তিকালীন সময়ে এবং জিহাদের ময়দানে, অবিচল বিশ্বাসে, নতুন ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে, ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় এভাবেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন কুতবাহ বিন আমির ﵁।

১৩৭৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৭৮, উসদুল গাবাহ : ৪/২০৫।
১৩৭৫. জাওয়ামিউস সিরাহ : ৮৫-৮৬ পৃ.।
১৩৭৬. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৭৫।
১৩৭৭. আদ-দুরার : ৯৯ পৃ.।

গাজওয়া ও সারিয়্যা অভিযানে

১. প্রথম হিজরির রমাদান মাসে হামজা ﷺ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কুতবাহ বিন আমির ﷺ। এটি ছিল ইসলামের প্রথম অভিযান। যার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০ জন অশ্বারোহী মুহাজির।[১৩৭৮] অপর বর্ণনামতে ১৫ জন মুহাজির ও পাঁচ জন আনসার সাহাবি।[১৩৭৯]

এ অভিযানের লক্ষ্য ছিল লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত ঈস এলাকায় মক্কা ও সিরিয়াগামী কুরাইশের বাণিজ্যিক রোডে ভীতি সৃষ্টি করা। কিন্তু মাজদি বিন আমর আল-জুহানি—যে উভয় দলের মিত্র ছিল—সে উভয় দলের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে হামজা ﷺ কোনো ধরনের যুদ্ধ ছাড়া মদিনায় ফিরে আসেন।

২. কুতবাহ ﷺ দ্বিতীয় হিজরির রমাদান মাসে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী যুদ্ধ বদরে অংশগ্রহণ করেন।[১৩৮০]

সেদিন মুসলিমদের ছিল ৭০টি উট। একেকটি উটে দুজন, তিনজন এমনকি চারজনও পালাক্রমে আরোহণ করে বদর ময়দানে পৌঁছেছিলেন। সেই হিসেবে খিরাশ বিন সিম্মাহ, কুতবাহ, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম ﷺ একটি উটে আরোহণ করেছিলেন।[১৩৮১]

তিনি সেদিন উভয় দলের মাঝে একটি পাথর ছুড়ে বলেছিলেন, 'আমি ততক্ষণ পলায়ন করব না, যতক্ষণ এই পাথরটি পলায়ন না করে।'[১৩৮২] এই দিনে কুতবাহ ﷺ তালহা বিন উবাইদুল্লাহর ভাই মালিক বিন উবাইদুল্লাহকে বন্দী করেছিলেন।[১৩৮৩] সে ছিল কুরাইশ গোত্রের শাখাগোত্র তাইমের লোক।[১৩৮৪]

১৩৭৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৬।
১৩৭৯. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৯।
১৩৮০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩৪৬, আদ-দুরার : ১৩৩ পৃ., জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৩৮ পৃ.।
১৩৮১. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৪।
১৩৮২. উসদুল গাবাহ : ৪/২০৬।
১৩৮৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজিতে এসেছে, মালিক বিন আব্দুল্লাহ বিন উসমান। সঠিক হচ্ছে মালিক বিন উবাইদুল্লাহ।
১৩৮৪. আনসাবুল আশরাফ : ১/৩০২।

৩. কুতবাহ ﷺ তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৩৮৫] এ যুদ্ধে তিনি রাসুল ﷺ-এর তিরন্দাজ বাহিনীর সদস্য ছিলেন।[১৩৮৬] যারা ওই যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন। উহুদের দিন তিনি নয়টি জখমপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।[১৩৮৭] কিন্তু তাঁর জখম তাঁকে পরের দিন রাসুল ﷺ-এর সাথে হামরাউল আসাদ অভিযান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি।[১৩৮৮]

৪. পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন কুতবাহ ﷺ।[১৩৮৯] অনুরূপ ওই বছর জিলকদ মাসে বনু কুরাইজার যুদ্ধে অশ্বারোহী হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৩৯০]

৫. অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১৩৯১] সে যুদ্ধে যখন একের পর এক তিনজন কমান্ডার শাহাদাত বরণ করল। মুসলিমদের ওপর পরাজয় নেমে আসলো এবং তাঁরা নিহত হতে লাগল, তখন কুতবাহ ﷺ চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, 'ভাইয়েরা, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে সম্মুখ সমরে নিহত হওয়া অতি উত্তম।' তিনি তাঁর সাথিদের চিৎকার করে বলতে থাকলেন; কিন্তু সে সময় তাঁর প্রতি কেউ মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাননি।[১৩৯২]

৬. তিনি মক্কা বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কুদাইদে এসে রাসুল ﷺ অনেকগুলো নিশান ও ঝান্ডা প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক গোত্রকে ঝান্ডা তুলে দেন। বনু সালিমার ঝান্ডা তুলে দেন কুতবাহ ﷺ-এর হাতে।[১৩৯৩]

৭. কুতবাহ ﷺ এ সকল সারিয়্যা ও গাজওয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

১৩৮৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৭৮ এবং ২/৩৬।
১৩৮৬. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/২৪৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩২৩।
১৩৮৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৭৯।
১৩৮৮. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৩৭।
১৩৮৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৭৮।
১৩৯০. জাওয়ামিউস সিরাহ : ১৮৫ পৃ., আদ-দুরার : ১৭৯ পৃ.।
১৩৯১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২৮।
১৩৯২. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৭৬৩।
১৩৯৩. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৮০০-৮০১। তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/ ৫৭৯।

কিন্তু বাস্তবে তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৩৯৪] তিনি কোনো যুদ্ধ থেকে পিছপা হননি। তার সাথে আবার অন্যান্য অনেক সারিয়্যা অভিযানের নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

অভিযানের কমান্ডার

নবম হিজরির সফর মাসে রাসুল ﷺ কুতবাহ ﵁-কে কমান্ডার বানিয়ে ২০ সদস্যের একটি বাহিনীকে[১৩৯৫] খাসআম গোত্রের এক এলাকায় প্রেরণ করেন। এলাকাটি ছিল তায়িফ অঞ্চলের তাবালার সীমানায় অবস্থিত তুরাবার নিকটবর্তী বিশায় অবস্থিত। রাসুল ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন, দিনে আত্মগোপন থেকে রাতে পথ চলতে। চলার সময় দ্রুত চলবে। এরপর গন্তব্যে পৌঁছে শত্রুর ওপর আক্রমণ করবে।

তাঁরা ১০টি উটে পালাক্রমে আরোহণ করে পথ চলেন। অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখেন। ফাতাকের পথ ধরে তাঁরা বাতনে মাসহা এলাকায় পৌঁছে এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করেন। সে তাড়াহুড়া করে উপস্থিত লোকদের চিৎকার দিয়ে ডাকা শুরু করে দেয়। তখন কুতবাহ ﵁ তাকে হত্যা করে দেন। সেখানে তাঁরা অবস্থান করলেন। কিছু রাত হয়ে গেলে বাহিনীর একজনকে অনুসন্ধানী হিসেবে প্রেরণ করলেন। সে দেখল, বস্তিবাসীরা গবাদি পশু লালনপালন করে। বস্তিতে অনেক গবাদি পশু ছিল। ফিরে এসে বাহিনীকে জানাল।

খবর শুনে মুসলিম বাহিনী হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। যাতে প্রহরী থাকলে তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। বস্তির কাছে এসে বস্তিবাসীদের গভীর ঘুমের মধ্যে পেল। তাকবিরধ্বনি দিয়ে আক্রমণ করে বসল।

বস্তিবাসীরা বের হয়ে তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দেয়। উভয়পক্ষে অনেক আহত ও জখমি হয়। সকাল হতে হতে অনেক খাসআমি লোক এসে পৌঁছায়। কিন্তু পাহাড়ের পানির ঢল এসে তাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে তারা পার হয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

১৩৯৪. উসদুল গাবাহ : ৪/২০৬, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৭৮।
১৩৯৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬২।

এরপর কুতবাহ ﷺ বস্তিতে এসে উট, ছাগল ও নারীদের নিয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হন। এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর তাদের একেক জনের ভাগে চারটি করে উট পড়ে। একটি উটের মোকাবিলায় তারা ১০টি মেষের তুলনা করেছিলেন।[১৩৯৬]

কারও কারও এটা মনে হতে পারে যে, তায়িফ অঞ্চল থেকে উট, ছাগল ও নারীদের মদিনায় নিয়ে আসা বেশ কঠিন ব্যাপার। কারণ উভয় অঞ্চলের মাঝে অনেক দূরত্ব। কিন্তু তায়িফ অঞ্চল থেকে কঠিন হলেও খাসআমিদের এলাকা থেকে এ সকল গনিমত নিয়ে মদিনায় আসা বাস্তবে কঠিন ছিল না। কারণ মদিনা থেকে তায়িফের খাসআমি এলাকার চৌহদ্দি পর্যন্ত তখন ইসলাম প্রসারিত হয়েছিল। তাই মুশরিকদের এই ক্ষমতা ছিল না যে, তারা ইসলামি ভূখণ্ডে এসে মুসলিম বাহিনীর পিছু ধাওয়া করবে। এতে কুতবাহ ﷺ-এর জন্য সাথি-সঙ্গী ও গনিমতের মাল নিয়ে নিরাপদে মদিনায় আসা সহজ ছিল।

কুতবাহ ﷺ অভিযানে তাঁর কমান্ডারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করে তাদের জানে-মালে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেছেন। এমন সময়ে তাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করে বসেছিলেন, যে সময়ে আক্রমণের কথা শত্রুরা কল্পনাও করতে পারেনি। ফলে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে শক্তি-সামর্থ্যে বহু সংখ্যক শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন। কুতবাহ ﷺ বাস্তবে রাসুল ﷺ-এর একজন সেরা কমান্ডার ছিলেন।

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন

১- কুতবাহ ﷺ-এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনার পরিমাণ একেবারেই কম। বিশেষত রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থসমূহে তাঁর সম্পর্কে প্রায় কোনো আলোচনাই পাওয়া যায় না।

১৩৯৬. ওয়াকিদির মাগাজি : ২/৬৫৪-৭৫৫, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৫২, উয়ুনুল আসার : ২/২০৬, আনসাবুল আশরাফ : ১/৩৮০।

তাঁর সন্তানাদি : উম্মে জামিল। তিনি ও তাঁর মা উম্মে আমর আকাবার বাইআতে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ছিলেন।[১৩৯৭]

আল্লামা বাগাবি ﷺ বলেন, 'কুতবাহ বিন আমির ﷺ-এর কোনো হাদিস সম্পর্কে আমি জানি না।'[১৩৯৮] এই কারণে হাদিসের কিতাবসমূহে তাঁর কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না।

তাঁর জন্মসন সম্পর্কে আমরা জানতে পারিনি। তিনি অবশ্য উসমান ﷺ-এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন।[১৩৯৯] মৃত্যুর সময় তাঁর কোনো উত্তরসূরি ছিল না।[১৪০০]

তাঁর মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এবং রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর একটি অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন।

২- আদর্শিক কমান্ডারের জন্য অবধারিতভাবে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। ক. স্বভাবজাত নেতৃত্বের গুণ। খ. অর্জিত জ্ঞান। গ. বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য থেকে দুটি বৈশিষ্ট্য কুতবাহ ﷺ-এর মাঝে স্পষ্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। এক. বাস্তব অভিজ্ঞতা। যেহেতু তিনি রাসুল ﷺ-এর সকল গাজওয়া ও সারিয়্যা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটা তাঁর বাস্তব দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। দুই. অর্জিত জ্ঞান। যেহেতু আরবের লোকেরা যুদ্ধের কলাকৌশল শিখে তার অনুশীলন করত। ইসলাম আসার পর ওই কৌশল ও অভিজ্ঞতাগুলো ইসলামি শিক্ষার অংশে পরিণত করে। যা রপ্ত করা এবং ধারণ করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত কুতবাহ ﷺ তিরন্দাজিতে সমবয়সিদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। ফলে রাসুল ﷺ-এর সাহাবিদের বিশেষ তিরন্দাজদের মধ্যে তাঁকেও গণ্য করা হতো।

১৩৯৭. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৫৭৮।
১৩৯৮. আল-ইসাবাহ : ৫/২৪২।
১৩৯৯. ইবনুল আসির : ৩/১৯৯, উসদুল গাবাহ : ৪/২০৬, আল-ইসতিআব : ৩/১২৮২।
১৪০০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/ ৫৭৯।

আর স্বভাবজাত নেতৃত্বের গুণকে তাঁর মাঝে সাব্যস্ত বা বিয়োজন করা কোনোটাই সম্ভব নয়। কারণ এই বৈশিষ্ট্যের গুণে গুণান্বিত করা যায় এমন কোনো সামরিক কাজে তিনি ব্যাপৃত হননি।

তাঁর শাখাগত সমর-বৈশিষ্ট্যাবলি : সম্ভবত তিনি দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন। তিনি ছিলেন অবিচল ইচ্ছাশক্তি ও বিরল বীরত্বের অধিকারী। দায়িত্ব আদায়ে যোগ্য ব্যক্তি। দায়িত্বকে ভালোবাসতেন, অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিতেন না। তাঁর মন জয় বা পরাজয় কোনো অবস্থাতে পরিবর্তন হতো না। সৈনিকদের মানসিক অবস্থা ও যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। প্রত্যেককে তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ দিতেন। সৈনিকদের প্রতি ছিল ভরসা ও ভালোবাসা এবং সৈনিকদেরও ছিল তাঁর প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা। ছিলেন দৈহিক সামর্থ্য আর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও মান্যবর ব্যক্তিত্ব।

তিনি সেই মুজাহিদ কমান্ডারদের একজন ছিলেন, যারা নিজের অবিচল বিশ্বাসের কারণে কাজ করতেন। এবং দ্বীনে হানিফের প্রসার, আল্লাহর দিকে দাওয়াহ ও ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য তাঁদের গভীর ইমান তাঁদেরকে অবিরাম ফলপ্রসূ আমলের প্রতি এগিয়ে দিত।

তিনি যুদ্ধের নীতিগুলো মেনে চলতেন। বিশেষত আকস্মিক আক্রমণের নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। টার্গেট নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতেন। আক্রমণাত্মক আক্রমণ, সুপরিকল্পনা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার নীতি বাস্তবায়ন করতেন।

সৈনিকদের নিজের সাথে তুলনা করতেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন।

ইতিহাসে কুতবাহ ﵁

তিনি খাজরাজ গোত্রের ওই ছয় ব্যক্তির একজন ছিলেন, যাঁরা প্রথম আকাবার আগের বছর মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি ছিলেন একেবারেই প্রথম সারির আনসার সাহাবিদের একজন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি মদিনায় এসে আনসারদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে এসে আকাবার প্রথম বাইআতে শরিক হয়েছিলেন। পরে দ্বিতীয় বাইআতেও উপস্থিত হয়েছিলেন।

তিনি বদরের চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাহাড়ের মতো অবিচল থেকে যুদ্ধ করেছিলেন।

তিনি রাসুল ﷺ-এর সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কোনো যুদ্ধে তিনি পেছনে বসে থাকেননি। এবং অনেক সারিয়্যা অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় রাসুল ﷺ-এর একটি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা এ মহান সাহাবির প্রতি তাঁর বিশেষ রহমত বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

দাহহাক বিন সুফিয়ান আল-কিলাবি ﵁

যিনি ছিলেন নবির তরবারি

বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

দাহহাক বিন সুফিয়ান বিন আওফ বিন কাব বিন আবু বকর বিন কিলাব বিন রবিআহ বিন আমির বিন সাসাআহ আমিরি আল-কিলাবি। তাঁর উপনাম ছিল আবু সাইদ।[১৪০১]

তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করেছেন।[১৪০২] কিন্তু আমরা জানি না, তিনি কবে ইসলাম কবুল করেছেন। তিনি মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন। মদিনার গ্রামাঞ্চলে বাস করতেন।[১৪০৩] আবার দরিয়া অঞ্চলের মাওয়ালির নাজদেও বাস করতেন।[১৪০৪] তিনি সেখানে তার কওমের ইসলাম গ্রহণকারীদের অভিভাবক ছিলেন।[১৪০৫]

১৪০১. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৬, আল-ইসতিআব : ২/৭৪২, আল-ইসাবাহ : ৩/২৬৭, তাহজিবুত তাহজিব : ৪/৪৪৪।

১৪০২. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৬।

১৪০৩. আল-ইসতিআব : ২/৭৪২, উসদুল গাবাহ : ৩/৩৬।

১৪০৪. তাহজিবুত তাহজিব : ৪/৪৪৪।

১৪০৫. আল-ইসাবাহ : ৩/২৬৭, তাহজিবুত তাহজিব : ৪/ ৪৪৪৪।

এটা স্পষ্ট যে, তিনি একজন যাযাবর বেদুইন ছিলেন। এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলে যেতেন। কখনো মদিনার গ্রামাঞ্চলে বাস করতেন। কখনো নাজদের ভূমিতে বাস করতেন। তাই উভয় বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

তিনি একজন অন্যতম বীর ছিলেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর পাশে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁকে ১০০ অশ্বারোহীর সাথে তুলনা করা হতো।[১৪০৬] রাসুল ﷺ-এর পাশে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁকে রাসুল ﷺ-এর তরবারি বলা হয়।[১৪০৭]

আম্মাজান আয়িশা ؓ উল্লেখ করেন, 'দাহহাক ؓ একবার রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন—তখন আমার ও তাঁর মাঝে পর্দার আড়াল ছিল—"উম্মে শাবিবের বোনের ব্যাপারে আপনার আগ্রহ আছে?" উম্মে শাবিব ছিল দাহহাকের স্ত্রী। রাসুল ﷺ উম্মে শাবিবের বোনকে বিয়ে করেন। কিন্তু বাসর করার আগে তাকে তালাক দিয়ে দেন। তার নাম ছিল ফাতিমা কিলাবিয়া। রাসুল ﷺ তাকে বিয়ে করে যখন তার কাছে গেলেন, তখন সে বলল, "আমি আপনার থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "তুমি মহান রবের কাছে আশ্রয় চেয়েছ। যাও, তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও।"'[১৪০৮] অষ্টম হিজরিতে মক্কা-বিজয়, হুনাইন যুদ্ধ ও তায়িফ অবরোধ থেকে ফিরে এসে রাসুল ﷺ তাকে বিয়ে করেছিলেন। জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, 'এই নারী স্বয়ং দাহহাকের কন্যা ছিল।'[১৪০৯]

চতুর্থ হিজরিতে বিরে মাউনায় যে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, সেখানে অভিযানের সকলে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাত বরণকারীদের মাঝে আবু বকর ؓ-এর আজাদকৃত গোলাম আমির বিন ফুহাইরা ؓ-ও ছিলেন। তাঁকে হত্যা করেছিল কিলাব গোত্রের এক লোক। তার নাম ছিল জাব্বার বিন সুলমা। জাব্বার উল্লেখ করেন, যখন তাঁকে আঘাত করেন, তখন আমির বিন ফুহাইর ؓ বলে উঠলেন, 'আমি সফল হয়ে গেলাম।' আমি মনে মনে বললাম,

---

১৪০৬. আল-ইসতিআব : ২/৭৪২, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/১৫০।
১৪০৭. আল-ইসাবাহ : ৩/২৬৭।
১৪০৮. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৫৪।
১৪০৯. আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৫৫।

'আমি সফল হয়ে গেলাম'—তার এ কথার অর্থ কী? এরপর আমি দাহহাক বিন সুফিয়ানের কাছে আসলাম। তাঁর কাছে ঘটনাটি খুলে বললাম। তাঁকে সে কথার অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'জান্নাত।' এরপর দাহহাক ﷺ জাব্বার বিন সুলমার কাছে ইসলাম পেশ করলে জাব্বার ইসলাম কবুল করেন। দাহহাক ﷺ আমির বিন ফুহাইরের হত্যাকারীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে পত্র লেখেন।[১৪১০]

এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাহহাক ﷺ চতুর্থ হিজরির আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তবে হ্যাঁ, আমরা নির্দিষ্ট করে তাঁর ইসলাম গ্রহণের তারিখ বলতে পারি না।

তিনি রাসুল ﷺ-কে একটি প্রচুর দুগ্ধবতী উটনী হাদিয়া দিয়েছিলেন। সে উটের নাম ছিল বুরদাহ। সে উটের চেয়ে সুন্দর ও অধিক দুধেল উট আর দেখা যায়নি। প্রচুর দুগ্ধবতী দুটি উটনী দোহন করে যে পরিমাণ দুধ পাওয়া যেত, সেই পরিমাণ ওই একটি উটনী দোহন করে পাওয়া যেত। রাসুল ﷺ-এর মেহমানদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা এই উটনী দোহন করা হতো।[১৪১১]

সম্ভবত দাহহাক ﷺ রাসুল ﷺ-এর অনেক কাছের মানুষ ছিলেন। এ কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে ভালোবাসতেন, তাঁর প্রতি আস্থা রাখতেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর তরবারিধারী। রাসুল ﷺ-এর কাছে তিনি মেহমান হতেন। তাঁর সাথে বৈবাহিক সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করতেন। রাসুল ﷺ তাঁকে তাঁর কওমের অভিভাবক বানিয়েছেন, তাঁকে হাদিয়া দিতেন। তাঁর ইসলাম কল্যাণকর হয়েছিল। তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অনেক ভালোবাসতেন।

১৪১০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ১/৩৪৯।
১৪১১. আনসাবুল আশরাফ : ১/৫১৩।

তিনি অষ্টম হিজরির রমাদান মাসে মক্কা-বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।[১৪১২] মক্কা বিজয়াভিযানে রওয়ানাকালে বনু সুলাইম গোত্রের লোকসংখ্যা ছিল ৯০০ জন। রাসুল ﷺ তাদের বললেন, 'তোমাদের এমন লোকের প্রয়োজন আছে, যে ১০০ জনের সমান। তাহলে তোমাদের সংখ্যা এক হাজারে পূর্ণ হতো? এ কথা বলে রাসুল ﷺ তাদের সাথে দাহহাক ﷺ-কে দিয়ে দিলেন। তিনি তাদের নেতা হয়েছিলেন।[১৪১৩] রাসুল ﷺ তাঁকে তাদের সকলের নেতা বানিয়েছিলেন।

দাহহাক ﷺ হুনাইন যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।[১৪১৪] রাসুল ﷺ তাঁকে সুলাইম গোত্রের সাথে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তারা তাঁর অধীন হয়ে গিয়েছিল।[১৪১৫]

তিনি তায়িফ অবরোধেও অংশগ্রহণ করেন।[১৪১৬] সাকিফ গোত্র মারওয়ান বিন কাইস দাউসির পরিবারকে আটক করেছিল। তার পূর্বেই মারওয়ান ইসলাম গ্রহণ করে সাকিফ গোত্রের বিরুদ্ধে রাসুল ﷺ-কে সাহায্য করেন। ফলে সাকিফ গোত্র ধারণা করেছিল যে, রাসুল ﷺ মারওয়ানকে বলেছেন, 'হে মারওয়ান, কাইস গোত্রের যে লোককে সর্বপ্রথম ধরতে পারবে, তাকে তোমার পরিবারের বিনিময়ে আটক রাখবে।' এই কথার ভিত্তিতে মারওয়ান উবাই বিন মালিক কুশারিকে ধরতে পারে। এরপর তার পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তাকে আটক রাখার ইচ্ছা করে। তখন এ ব্যাপারে দাহহাক ﷺ দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। সাকিফ গোত্রের সাথে কথা বলেন। তারা মারওয়ানের পরিবারকে ছেড়ে দিলে উবাই বিন মালিককেও ছেড়ে দেওয়া হয়।

শুধু এই যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণের ব্যাপারে দাহহাক ﷺ-এর আলোচনা এসেছে। অথচ তিনি চতুর্থ হিজরির আগে থেকে মুসলিম। তাই এটা যুক্তিযুক্ত যে, তিনি এসব যুদ্ধ ছাড়াও অন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের সংগ্রহে যে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ আছে তার মধ্যে সেসব যুদ্ধে তাঁর কোনো ভূমিকার কথা

১৪১২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৩৪।
১৪১৩. আল-ইসাবাহ : ৩/২৬৭, আল-মাআরিফ : ৮৯ পৃ.।
১৪১৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৭৪৩।
১৪১৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৭৬।
১৪১৬. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৫৮।

উল্লেখ হয়নি। অথচ এই গ্রন্থগুলো তাঁর সম্পর্কে চুপ থাকার মতো নয়—যেমনটা অন্যদের বেলায় চুপ থাকেনি।

যাহোক, তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।[১৪১৭] যদি বলা হয়, নাজদ অঞ্চলে তাঁর কওমের ইসলাম গ্রহণকারীদের অভিভাবকের দায়িত্ব তাঁকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে দূরে রেখেছিল, তবে সে কথা সঠিক হবে না। কারণ তাঁর ও বনু কিলাব গোত্রের মুসলিমদের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করা ছিল ফরজ দায়িত্ব। যার থেকে পিছু হটার কোনো সুযোগ নেই। সঠিক কথা হচ্ছে, তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ তার কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন এবং বাকি অংশ থেকে উদাসীনতা দেখিয়েছেন।

অভিযানের কমান্ডার

নবম হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে কুরাতা[১৪১৮] গোত্র অভিমুখে দাহহাক ﷺ-এর নেতৃত্বে রাসুল ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন আসইয়াদ বিন সালামা বিন কুরত। তাঁরা 'জুজ'[১৪১৯] নামক স্থানে এসে শত্রুর দেখা পান। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা প্রত্যাখ্যান করে। তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করেন।

আসইয়াদ ﷺ তাঁর পিতা সালামা বিন কুরতের দেখা পান। সালামা তখন জুজের একটি পুকুরপাড়ে ঘোড়ায় আরোহী অবস্থায় ছিল। আসইয়াদ ﷺ পিতাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন; কিন্তু তার পিতা তাঁকে এবং তাঁর দ্বীনকে গালি দেয়। তখন আসইয়াদ ﷺ তার ঘোড়ার পেছনের পায়ের জোড়াকে কেটে দেন। ঘোড়া পেছনের দিকে পড়ে গেলে সালামা বল্লম নিয়ে লাফ দিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। এরপর বল্লম তাক করে ধরে। এক মুসলিম সৈনিক এসে তাকে হত্যা করে। আসইয়াদ নিজে পিতাকে হত্যা করেননি।[১৪২০]

১৪১৭. আল-ইসাবাহ : ৩/২৬৭, উসদুল গাবাহ : ৩/৩৬।

১৪১৮. বনু বকর গোত্রের শাখা গোত্র। শারহুল মাওয়াবিল লাদানিয়াহ : ৩/৫৭।

১৪১৯. নাজদের দারিয়া অঞ্চলের একটি জায়গায়। ওয়াফাউল ওয়াফা : ২/৩১৭।

১৪২০. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬২-১৬৩, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৮২।

দাহহাক ﷺ এই অভিযানে তাঁর নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং নাজদের মুশরিকদের কঠিন শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে এটা তাদের মানসিক অবস্থার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এরপর তাদের মাঝে ইসলামের প্রসার ঘটে।

শাহাদাত বরণ

রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর বনু সুলাইম গোত্র মুরতাদ হয়ে যায় এবং ফুজাআহ সুলামির অনুসরণ শুরু করে দেয়। তখন দাহহাক ﷺ তাদের বললেন, 'হে সুলাইম গোত্র, কত মন্দ কাজই না তোমরা করে বসলে!' তিনি তাদের সর্বোচ্চ পরিমাণে উপদেশ দিয়ে গেলেন। কিন্তু তারা তাঁকে গালমন্দ করে তাঁর ক্ষতির ইচ্ছা করে। অথচ তিনি ছিলেন সুলাইম গোত্রের পতাকাবাহী এবং প্রধান। তখন তিনি তাদের থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। তারা অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে তাদের মাঝে অবস্থান করতে বলল। কিন্তু তিনি তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। তাদের বললেন, 'তোমাদের সাথে আমার কোনো হৃদ্যতা নেই।' সে কথা তিনি তাঁর এক কবিতায় বলেছেন।

> 'ফুজাআহ তো সুলাইম গোত্রে টেনে আনল লাঞ্ছনা-অপমান, যা যুগ যুগ ধরে বাকি থাকল।'

দাহহাক ﷺ মুসলিমদের সাথে সুলাইম গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করেন এবং সেই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[১৪২১] এ যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল ১১ হিজরিতে। ফুজাআহ সুলামি বন্দী হয়। আবু বকর ﷺ তাকে হত্যা করেন। এবং তার কওমের যারা মুরতাদ হয়েছিল, তাদেরকেও হত্যা করেন।[১৪২২]

স্বীয় আকিদা-বিশ্বাসের ওপর দাহহাক ﷺ-এর একনিষ্ঠতা ও অবিচলতা বিরাট প্রভাব ফেলেছিল সুলাইম গোত্রের মুসলিম ও মুরতাদ সবার ওপর। যারা ইমানের ওপর অবিচল ছিলেন, তাদের তিনি উত্তম আদর্শ হয়ে ছিলেন। আবার মুরতাদদের জন্য হয়ে ছিলেন আপসহীন প্রতিপক্ষ। তাদের উপদেশ

১৪২১. আল-ইসাবাহ : ৩/২৬৭।
১৪২২. ইবনুল আসির : ২/৩৫০-৩৫১।

দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন এবং কঠোরতা করেছেন। কিন্তু তাঁর শান্তিপূর্ণ চেষ্টাপ্রচেষ্টা যখন কোনো কাজ দেয়নি, তখন তিনি মুসলিমদের সাথে মিলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করেছেন। নিজের আকিদা-বিশ্বাসের তরে স্বীয় জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জীবন বাঁচাতে আকিদা-বিশ্বাসের জলাঞ্জলি দেননি। ফলে জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর রক্ত বৃথা যায়নি। বরং তাঁর রক্ত মুরতাদদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। যার ফলে সুলাইম গোত্র নতুন করে আবার ইসলামে ফিরে এসেছে। এবং ইসলামের পতাকাতলে এই কবিলাগুলোর মাঝে ঐক্য ফিরে এসেছে। জীবদ্দশায় দাহহাক ﵁ সুলাইম গোত্রের ইসলামে ফিরে আসার যে তামান্না করতেন, তা বাস্তবায়িত হয়েছে। সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে নিজের প্রাণকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি হয়েছে; কিন্তু বনু সুলাইম লাভবান হয়েছে। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে বনু সুলাইমে সেই সম্মানিত আবস্থা ফিরে এসেছে, যা তিনি জীবদ্দশায় কামনা করে গেছেন।

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

রাসুল ﷺ দাহহাক ﵁-এর কাছে এ মর্মে পত্র লেখেন যে, আশিম দাবাবির স্ত্রীকে তার স্বামীর রক্তপণের সম্পদ থেকে উত্তরাধিকার দেবে। আশিম দাবাবি ভুলক্রমে নিহত হয়েছিল। দাহহাক ﵁ এ সমাধানের ব্যাপারে উমর ﵁-এর কাছে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তখন উমর ﵁ নিজের মত ছেড়ে এই মতকে গ্রহণ করেন।[১৪২৩] উমর ﵁ বলতেন, 'দিয়তের সম্পদ অভিভাবকরা পাবে। স্ত্রী তার স্বামীর দিয়ত থেকে কিছু পাবে না।' অতঃপর যখন দাহহাক ﵁ তাঁকে বললেন, 'রাসুল ﷺ আমার কাছে এ মর্মে পত্র লিখেছেন যে, আমি যেন আশিম দাবাবির স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়তের ওয়ারিস করি।'[১৪২৪] তখন উমর ﵁ নিজের মত ছেড়ে দেন। এটি সহিহ হাদিস। আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসায়িসহ অনেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি ﵀ বলেছেন, এ হাদিস হাসান সহিহ।[১৪২৫]

১৪২৩. আল-ইসতিআব : ২/৭৪২, আল-ইসাবাহ : ৩/২৬৭।
১৪২৪. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৬।
১৪২৫. তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২৫০।

তাঁর থেকে সাইদ বিন মুসাইয়িব ও হাসান বসরি ﷺ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১৪২৬] তিনি রাসুল ﷺ থেকে চারটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১৪২৭]

তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন স্বভাবগত কবি ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি না, তিনি স্বল্প কাব্যের কবি ছিলেন নাকি তাঁর কবিতার ওপর যুগের পর্দা পড়ে গেছে। ফলে তা কিছুকাল পরে স্মৃতি হিসেবে বাকি আছে। তিনি রাসুল ﷺ-এর তরবারিধারী ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর মাথার কাছে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি বীর বাহাদুরদের একজন ছিলেন।[১৪২৮] রাসুল ﷺ তাঁকে তাঁর কওমের ইসলাম গ্রহণকারীদের অভিভাবক বানিয়েছিলেন।[১৪২৯]

তায়িফ যুদ্ধের পর জিরানা থেকে মদিনায় ফিরে এসে রাসুল ﷺ জাকাত আদায়কারীদের প্রেরণ করেন। দাহহাক ﷺ-কে কিলাব গোত্রের জাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন।[১৪৩০] এটি ছিল নবম হিজরির মুহাররম মাসের ঘটনা।

প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ পাওয়া, এটা তাঁর পরিচালনার কাজে দক্ষতা ও আমানতদারিতারই প্রমাণ।

তিনি ছিলেন দানশীল অতিথিপরায়ণ। যার অভাব থাকত না, তিনি তাকেও দান করতেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত সত্যবাদী ওয়াদা পালনকারী। ইসলামের প্রথম সারির দায়িদের একজন। তাঁর কওমের মাঝে দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজে জীবন পার করেছেন। যখন তাদের একটি অংশের অধঃপতন হলো, তখন তিনি তাদের থেকে আলাদা হয়ে ইমানের ওপর অবিচল অবস্থানকারীদের সাথে মিলিত হলেন। এরপর উভয় দলের মাঝে তরবারি মীমাংসা করে দেয়। বাতিলের ওপর সত্যের বিজয় হয় এবং অন্ধকারের ওপর আলোর।

তিনি ছিলেন অন্যতম বীর। তাঁকে তুলনা করা হতো ১০০ অশ্বারোহীর সাথে।[১৪৩১]

১৪২৬. আল-ইসতিআব : ২/৭৪৩, তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত : ১/২৫০। উসদুল গাবাহ : ৩/৩৬।

১৪২৭. আসমাউস সাহাবাতির রুওয়াত- মুলহাক বিজাওয়ামিয়িস সিরাহ লি ইবনি হাজম : ২৯১ পৃ.।

১৪২৮. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৬।

১৪২৯. আল-ইসতিআব : ২/৭৪২।

১৪৩০. ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৭৩, আনসাবুল আশরাফ : ১/৫৩১।

১৪৩১. আল-ইসতিআব : ২/৭৪১, আল-ইসাবাহ : ৩/২৬৭।

তিনি ছিলেন বিশেষ বীর বাহাদুরদের একজন। যার অবস্থা ও অবস্থান মুসলিম ও অমুসলিম কারও কাছে অস্পষ্ট নয়।

তাঁর নেতৃত্বশীল ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি ছিল অনন্য বীরত্ব। যাকে আরও শানিত ও দুর্বার করে তুলেছিল গভীর ইমান। তিনি সে বীরত্বকে পরিচালিত করেছেন কল্যাণ আর সংশোধনের পথে এবং ইনসাফ আর নির্মাণের পক্ষে। অথচ তাঁর এই বীরত্বই একসময় ছিল অকল্যাণ আর দাপটের পক্ষে এবং জুলুম আর ধ্বংসের পথে।

নেতৃত্বের মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ক. যুদ্ধবিদ্যার কলাকৌশল ও নৈপুণ্যে অর্জিত জ্ঞান। খ. বিভিন্ন যুদ্ধ-অভিযানে এবং রিদ্দার যুদ্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তথা নেতৃত্বের স্বভাবজাত যোগ্যতা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা কিংবা তাঁর থেকে বিয়োজন করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি চূড়ান্ত বিজয়ের এমন কোনো বড় যুদ্ধের নেতৃত্ব দান করেননি, যার কারণে তাঁর মাঝে নেতৃত্বের সেই স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

নেতৃত্বের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলিতে তিনি রাসুল ﷺ-এর বাকি কমান্ডারদের চেয়ে ভিন্ন হবেন না। কেননা, তাঁরা সকলে একই বিদ্যাপীঠের গ্রাজুয়েশনপ্রাপ্ত। এবং প্রতিপালিত হয়েছেন একই সমাজে, একই পরিবেশে এবং একই উম্মাহর অংশ হয়ে।

তিনি ছিলেন দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি। অস্বাভাবিক নির্ভীক দুঃসাহসী। অবিচল মজবুত ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। দায়িত্বকে ভালোবাসতেন, দায়িত্বকে ভয় পেতেন না। সুস্থ চিত্তের অধিকারী। জয়-পরাজয় কোনো অবস্থায় পরিবর্তন হতো না তাঁর মানসিক অবস্থার। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। কওমের সবার আগে ইসলাম কবুলকারী। কওমের কিছু অংশ মুরতাদ হয়ে গেলে তাদের সতর্ক করলেন, খারাপ পরিণতির কথা জানিয়ে দিলেন। সৈনিকদের মানসিক অবস্থা ও যোগ্যতা সম্পর্কে ছিল তাঁর পূর্ণ অভিজ্ঞতা। সৈনিকদের ভালোবাসতেন এবং তাদের ওপর আস্থা রাখতেন। সৈনিকদেরও ছিল তাঁর প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা। তিনি ছিলেন প্রভাবসম্পন্ন

ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পরিবেশবান্ধব মজবুত দেহাবয়বের অধিকারী। ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও মান্যবর ব্যক্তি।

যুদ্ধের নীতিগুলো মেনে চলতেন। শিকার নির্ধারণ করে তা সফল করতে এগিয়ে যেতেন। আক্রমণাত্মক আক্রমণের নীতি বাস্তবায়ন করতেন। তাঁর প্রতিটি যুদ্ধই ছিল আক্রমণাত্মক। সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করে বসতেন। আবশ্যক পরিমাণ শক্তি সাথে নিতেন। মধ্যম পন্থায় শক্তির ব্যবহার করতেন। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ থেকে নিজ শক্তি রক্ষার্থে নিরাপত্তার নীতি মেনে চলতেন।

দাহহাক ﵁ বাস্তবে ছিলেন একজন সেরা কমান্ডার।

ইতিহাসে দাহহাক ﵁

তাঁর কওমের সবার আগে তিনি ইসলাম কবুল করেছেন। কওমের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। এবং সারা জীবন এই দাওয়াতি কাজে ব্যাপৃত থেকেছেন।

সাহাবির মর্যাদার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এবং সে অভিযানে বীরবিক্রমে জিহাদ করেছেন।

তিনি রাসুল ﷺ-এর গভর্নর এবং জাকাত উসুলকারীদের একজন ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর মাথার পাশে তরবারিধারী ছিলেন। অবশেষে জীবনের সমাপ্তি করেছেন শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে। আকিদার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন; কিন্তু জীবন বাঁচাতে আকিদার জলাঞ্জলি দেননি।

আল্লাহ তাআলা এই মহান সাহাবির প্রতি তাঁর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

শহিদ কমান্ডার

আলকামা বিন মুজাজ্জিজ আল-মুদলিজি ﵁

তাঁর বংশধারা ও প্রাথমিক জীবন

আলকামা বিন মুজাজ্জিজ বিন আওয়ার বিন জাদাহ বিন মুআজ বিন উতওয়ারাহ বিন আমর বিন মুদলিজ বিন মুররাহ বিন আবদে মানাফ বিন কিনানাহ বিন কিনানি আল-মুদলিজি।[১৪৩২]

তাঁর পিতা : মুজাজ্জিজ মুদলিজি ছিলেন পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ। মুজাজ্জিজ অর্থ কর্তনকারী। তাঁকে এ জন্যই মুজাজ্জিজ বলা হতো, তিনি কাউকে বন্দী করলে তার সামনের চুল কেটে দিতেন।[১৪৩৩] তাঁর পদচিহ্নের বিবরণ শুনে রাসুল ﷺ আনন্দিত হয়েছিলেন।[১৪৩৪] আম্মাজান আয়িশা ﵂ বর্ণনা করেন, 'রাসুল ﷺ একদিন খুব প্রফুল্ল অবস্থায় তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করছিল। এরপর বললেন, "দেখছ, মুজাজ্জিজ জাইদ বিন হারিসা ও উসামা বিন জাইদের পাশ দিয়ে গেল। তখন তারা দুজন পা খুলে রেখে মাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। মুজাজ্জিজ বলল, "এই পাগুলো একটি অপরটি থেকে এসেছে।"'[১৪৩৫] (অর্থাৎ একই রকম)

১৪৩২. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৮৭ পৃ., উসদুল গাবাহ : ৪/১৪, আল-ইসাবাহ : ৪/২৬৭।
১৪৩৩. উসদুল গাবাহ : ৪/৩০৩।
১৪৩৪. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ১৮৭ পৃ.।
১৪৩৫. উসদুল গাবাহ : ৪/৩০৩।

আলকামা ﷺ-এর ভাই ওয়াক্কাস বিন মুজাজ্জিজ ষষ্ঠে হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে জি-কারাদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[১৪৩৬]

আলকামা ﷺ-এর ভাই ও বাবা দুজনই মুসলিম ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি না, আলকামা ﷺ কখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ভাই ও পিতা কখন ইসলাম কবুল করেছেন। অবশ্য আলকামা ﷺ রাসুল ﷺ-এর কাছে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে ওই শত্রু বাহিনীকে ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করেন, যারা জি-কারাদ যুদ্ধে তাঁর ভাইকে হত্যা করেছিল। যাতে তাদের কাছ থেকে ভাইয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। এর থেকে বোঝা যায়, ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসের আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাই আবশ্যকভাবেই তাঁর ইসলাম মক্কা-বিজয়ের আগে হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, 'আলকামা ﷺ সামগ্রিকভাবে আনসারি।'[১৪৩৭] এটা প্রমাণ করে, তিনি মক্কা-বিজয়ের আগে মদিনায় আনসারিদের সাথে ছিলেন।

নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থগুলো উল্লেখ করেনি যে, তিনি কোন কোন যুদ্ধে রাসুল ﷺ থেকে পেছনে বসে ছিলেন। আর যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তা অনুল্লেখ করা প্রমাণ করে না যে, তিনি সেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। যাহোক, তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবির মর্যাদা লাভের সাথে রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। উৎসগ্রন্থগুলো তাঁর জি-কারাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাঝে সীমাবদ্ধ থেকেছে।[১৪৩৮] অন্যান্য যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তার বিস্তারিত আলোচনা করেনি।

হাবশা অভিমুখে অভিযানের কমান্ডার

রাসুল ﷺ জানতে পারলেন, জুদ্দা অধিবাসী হাবশার কিছু লোকের অপতৎপরতা দেখতে পেয়েছে। তখন রাসুল ﷺ নবম হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে আলকামা ﷺ-এর নেতৃত্বে ৩০০ যোদ্ধার একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সাথিদের নিয়ে সাগরের একটি দ্বীপে পৌছেন। সাগরটি হাবশা পর্যন্ত পৌছে

১৪৩৬. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১৭।
১৪৩৭. আল-ইসাবাহ : ৪/২৬৭।
১৪৩৮. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১৭।

গেছে। মুসলিম বাহিনীর খবর শুনে শত্রুরা পলায়ন করে। তিনি সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসেন। এর মাঝে তাঁর কোনো যুদ্ধবিগ্রহের মুখোমুখি হতে হয়নি।

ফেরার পথে কিছু সৈনিক পরিবারের কাছে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করতে লাগল। তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা সাহমি ﵁-ও তাদের সাথে তাড়া করতে লাগলেন। তাই আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা ﵁-কে তাদের আমির বানালেন।

আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা ﵁ একটু রসিক মানুষ ছিলেন। পথে এক স্থানে যাত্রাবিরতি করে আগুন জ্বালালেন। সে আগুনে তাঁরা তাপ নিতে লাগলেন এবং খাবার তৈরি করলেন। আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা ﵁ সাথিদের বললেন, 'আমি তোমার কাছে শ্রবণ ও আনুগত্যের অধিকার রাখি না?' সাথিরা বলল, 'অবশ্যই।' আব্দুল্লাহ ﵁ বললেন, 'তাহলে আমি তোমাদের কোনো কাজের আদেশ করলে তোমরা তা করবে তো?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, করব।' আব্দুল্লাহ ﵁ বললেন, 'আমি তোমাদের ওপর আমার অধিকার ও আনুগত্যের শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দাও।' তখন কিছু সাথি আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রস্তুতি নিল। তিনি ধারণা করলেন, তারা সত্যি সত্যি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে দেবে। তখন তাদের বললেন, 'বসুন। আমি কেবল তোমাদের সাথে মজা করছিলাম।'

রাসুল ﷺ-এর কাছে আসার পর সে কথা তাঁকে বলা হলে তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ তোমাদেরকে কোনো গুনাহের আদেশ করলে, তোমরা তার আনুগত্য করবে না।'[১৪৩৯]

আরব দেশের যুদ্ধসমূহকে হাবশার লোকেরা বিনোদন হিসেবে দেখত। কারণ সে সময় ইয়েমেনে তাদের বেশ শক্তি ছিল। আবার রাসুল ﷺ-এর জন্মের বছর অর্থাৎ হস্তীবাহিনীর বছর মক্কায় তাদের একই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পরে বিষয়টি একেবারে উলটে যায়। তখন আরব দেশে ভিনদেশিদের কোনো কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকেনি। আর নবম হিজরিতে

১৪৩৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৩১৭-৩১৮, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬৩, ইমাম ওয়াকিদির মাগাজি : ৩/৯৮৩-৯৮৪, উয়ুনুল আসার : ২/২০৭।

হাবশার কিছু লোকের তৎপরতা আলকামা ﷺ-এর একটি অভিযানেই লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

আলকামা ﷺ ভিনদেশিদের সাথে মোকাবিলার জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ফলে যোদ্ধারা গনিমত লাভের চেয়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার মধ্যেই সন্তুষ্ট হতেন। এবং শত্রুরা বসতি স্থাপন না করে ফিরে গেলেই যথেষ্ট মনে করতেন।

নবি ﷺ-এর পরে

১৩ হিজরিতে খালিদ ﷺ-এর নেতৃত্বে আলকামা ﷺ ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১৪৪০]

আবু বকর সিদ্দিক ﷺ শামের আমিরদের প্রত্যেকের জন্য জিহাদের অঞ্চল নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﷺ-এর জন্য হিমস। ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান ﷺ-এর জন্য দামেশক। শুরাহবিল বিন হাসানা ﷺ-এর জন্য জর্ডান। আমর ইবনুল আস ও আলকামা বিন মুজাজ্জিজ ﷺ-এর জন্য ফিলিস্তিন।[১৪৪১] প্রত্যেক আমিরের সাথে ছিল বিরাট সৈন্যবহর। তাঁরা শামের নিকটবর্তী হলে পরামর্শ করেন। পরামর্শে সকলে একমত হন যে, সকলে এক স্থানে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের সম্মিলিত বাহিনীর মাধ্যমে মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করবে। এরপর তাঁরা একসাথে ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এভাবে মিলিত হয়ে যুদ্ধে অবতরণ না করলে হয়তো কখনো বিজয় অর্জন করা সম্ভব হতো না।[১৪৪২]

আলকামা ﷺ 'জাবিয়া'র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধই মুসলিমদের জন্য দামেশকের দ্বার খুলে দিয়েছিল। এ যুদ্ধ হয়েছিল ১৩ হিজরিতে।

আলকামা ﷺ গাজায় রোমের গভর্নর ফিকারকে অবরোধ করেন। তার সাথে পত্রের আদানপ্রদান করতে থাকেন। কিন্তু কেউই কারও দাবি পূরণে সাড়া

১৪৪০. আল-ইসাবাহ : ৪/২৬৭, তাবারি : ৩/৩৯৪, ইবনুল আসির : ২/৪১০।
১৪৪১. দেখুন, কাদাতু ফাতহিশ শাম ওয়া মিসর।
১৪৪২. আত-তাবারি : ৩/৩৯৪।

দেয় না। অতঃপর আলকামা ﷺ নিজেই বার্তাবাহকের বেশে ফিকারের কাছে যান। এরপর তাকে বলেন, 'আমার সাথে একদল লোক আছে, যারা আমাদের প্রধানকে মতামত প্রদানে আমার সমপর্যায়ে। আমি ফিরে গিয়ে তাদেরকে আপনার কাছে নিয়ে আসব।' এর আগে আলকামা ﷺ-কে হত্যার জন্য ফিকার পথিমধ্যে এক লোক ঠিক করে রেখেছিল। সে আলকামা ﷺ-এর এমন কথা শুনে ধোঁকা খায়। তাই সে লোকের কাছে খবর পাঠায়, তাকে যেন হত্যা না করে। আলকামা ﷺ ফিকারের কাছ থেকে চলে আসেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আসার কথা বলে আর আসেন না।[১৪৪৩] এ ঘটনা ঘটে ১৫ হিজরিতে।[১৪৪৪] এরপর ওই বছরেই আমর ইবনুল আস ﷺ গাজা জয় করেন।[১৪৪৫]

উমর ﷺ কুদস বিজয় উপলক্ষে মদিনা থেকে শামে আসেন। তখন মুসলিম বাহিনী কুদসকে ঘেরাও করে রেখেছিল। মুসলিমদের জন্য কুদসের দরজা খুলে দিয়ে প্রতিরোধকারীরা মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। উমর ﷺ এসে ফিলিস্তিনকে দুজন ব্যক্তির মাঝে ভাগ করে দেন। আলকামা বিন হাকিম ﷺ-কে দায়িত্ব দেন ফিলিস্তিনের উত্তর অংশে এবং রামলা এলাকায় তাঁর বসবাসের স্থান নির্ধারণ করে দেন। আর আলকামা বিন মুজাজ্জিজ ﷺ-কে দায়িত্ব দেন ফিলিস্তিনের দক্ষিণ অংশে এবং ইলিয়া এলাকায় তাঁর বসবাসের স্থান নির্ধারণ করে দেন। ফলে তিনি দক্ষিণ ফিলিস্তিনের গভর্নর হয়ে যান। যার হেডকোয়ার্টার হয় কুদস। এটি ছিল ১৫ হিজরির ঘটনা।[১৪৪৬]

আলকামা ﷺ ১৭ হিজরিতে পুরো ফিলিস্তিনের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন[১৪৪৭] এবং পরিচালনার দায়িত্বশীল হওয়ার সাথে সামরিক বিভাগেরও দায়িত্বশীলে পরিণত হন। সুতরাং তিনি একই সময়ে গভর্নর আবার কমান্ডার। শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পরিচালনার দায়িত্ব আদায় করতেন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধের ময়দানে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করতেন।

১৪৪৩. আত-তাবারি : ৩/৬০৪, ইবনুল আসির : ২/৪৯৬।
১৪৪৪. ইবনুল আসির : ২/৪৯৭।
১৪৪৫. ইবনুল আসির : ২/৪৯৭।
১৪৪৬. আত-তাবারি : ৩/৬১০, ইবনুল আসির : ২/৫০১।
১৪৪৭. আত-তাবারি : ৪/৬৭, ইবনুল আসির : ২/৫৩৬।

শাহাদাত বরণ

আলকামা ﵁ ফিলিস্তিনে উমর ﵁-এর গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৪৪৮] অতঃপর ২০ হিজরিতে উমর ﵁ তাঁকে হাবশায় প্রেরণ করেন। কারণ মুসলিমদের কিছু এলাকা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কিছু মুসলিম আক্রান্ত হন। উমর ﵁ আলকামা ﵁-কে সমুদ্রপথে হাবশার যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন।[১৪৪৯] মুসলিম বাহিনী সাগরে ডুবে সকলে মৃত্যুবরণ করেন।[১৪৫০] এরপর উমর ﵁ নিজের ওপর আবশ্যক করে নেন যে, কোনো মুসলিমকে আর সমুদ্রপথে যুদ্ধে পাঠাবেন না।[১৪৫১] হুওয়াস আল-আজরি আলকামা ﵁-এর শোকগাথায় বলেন :

> 'সকল সালাম ও উত্তম সম্ভাষণ প্রেরিত হোক সকাল-সন্ধ্যায় মুজাজ্জিজের পুত্রের ওপর।'

ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের মাধ্যমে এভাবেই আলকামা ﵁-এর জীবনের সমাপ্তি হয়। শাহাদাত ছিল তাঁর জীবনে সর্বোচ্চ চাওয়া। তাঁর সে আশা পূরণ হয়েছে। তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষায় জীবনের নজরানা পেশ করেছেন।

তিনি শাহাদাত লাভ করেন ২০ হিজরি মোতাবিক ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে।

ব্যক্তি ও কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন

আলকামা ﵁ ছিলেন রাসুল ﷺ-এর একজন কমান্ডার এবং আমির।[১৪৫২] আবু বকর ﵁-এর গভর্নর এবং কমান্ডার। উমর ﵁-এর গভর্নর এবং কমান্ডার। অতএব তিনি রাসুল ﷺ-এর যেমন আস্থাভাজন ছিলেন, তেমন তাঁর পরে তাঁর খলিফাদেরও আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা তাঁকে ত্যাগ করেননি। বরং শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন উভয় সময়ে সামরিক ও প্রশাসনিক কাজে তাঁর থেকে সহযোগিতা নিয়েছেন।

১৪৪৮. আল-ইসাবাহ : ৪/২৬৭।
১৪৪৯. আত-তাবারি : ৪/১১২, ইবনুল আসির : ২/৫৬৯, আল-ইসাবাহ : ৪/২৬৭।
১৪৫০. উসদুল গাবাহ : ৪/১৪।
১৪৫১. আত-তাবারি : ৪/১১২, ইবনুল আসির : ২/৫৬৯, আল-ইসাবাহ : ৪/২৬৭।
১৪৫২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/ ১৪৩।

তিনি ছিলেন আলোচিত দানবীর। যার অর্থের প্রয়োজন হতো না, তাকেও দান করতেন। অনেক অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাঁর দরজা থেকে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যেত না। প্রত্যেকেরই আশা পূরণ করতেন। কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না। এ কারণে কবিগণ জীবদ্দশায় যেমন তাঁর প্রশংসা করেছেন, তেমন মৃত্যুর পরেও শোকগাথায় তাঁর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত কবিতামালা হয়তো বিস্মৃতির বালির নিচে হারিয়ে গেছে।

এটা স্পষ্ট যে, আলকামা ﷺ মানবিক অর্থে বাস্তবে একজন প্রাচুর্যময় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সকল মানবিক ও আর্থিক শক্তি-সামর্থ্য জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। যেন তিনি নিজের স্বার্থের কথা ভুলে শুধু ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণেই সৃষ্টি হয়েছেন। ফলে নিজেকে হাদিসও বর্ণনায় মশগুল করেননি। আর হাদিসের কোনো কিতাবে তাঁর কোনো বর্ণনাও পাওয়া যায় না। স্বয়ং তাঁর নিজের আলোচনা এসেছে অন্যের মুখে। এ কারণে হাদিস ও মুহাদ্দিসগণের উৎসগ্রন্থে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আমরা জানি না, তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কবে ইসলাম কবুল করেছেন। মানুষ হিসেবে তাঁর জীবনের ওপর আলোকপাত কেবল তাঁর সামান্য বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করতে পারে।

তবে তাঁর মর্যাদার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার সাথে সাথে রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এবং তাঁর একটি অভিযান পরিচালনা করার মর্যাদা লাভ করেছেন। আবু বকর ও উমর ﷺ, এই দুই শাইখের খিলাফতের কাজে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ও নেতৃত্বদানের মর্যাদা লাভ করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি বিরাট মর্যাদা।

পুরো জীবনটাই তিনি মুজাহিদ অবস্থায় কাটিয়েছেন। কখনো মুসলিমদের সৈনিক হিসেবে, কখনো কমান্ডার হিসেবে। অবশেষে আল্লাহর পথে তরবারি হাতে রেখে তাঁর প্রাণ মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে।

রাসুল ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর ও উমর ﷺ-এর খিলাফতকালে তাঁর নেতৃত্বের দায়িত্ব লাভ করা প্রমাণ করে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় একজন অভিজ্ঞ

ব্যক্তি ছিলেন। সেই সাথে তিনি নেতৃত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য তথা অর্জিত জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তথা নেতৃত্বের স্বভাবজাত যোগ্যতাকে আমরা তাঁর জন্য সাব্যস্তও করতে পারছি না এবং তাঁর থেকে বিয়োগও করতে পারছি না। কারণ তিনি এমন কোনো চূড়ান্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেননি, যার কারণে আমরা তাঁর জন্য এ বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করতে পারি। আবার এমন নেতৃত্বে তাঁর অনুপস্থিতি সেই বৈশিষ্ট্যকে নাকোচও করতে পারে না।

ইসলামি বিজয়াভিযানের কমান্ডারদের সম্পর্কে অধ্যয়নকালে আমার ইচ্ছা ছিল আলকামা ﵁-কে শামের বিজয়ী কমান্ডারগণের তালিকায় যুক্ত করব। কারণ তিনি সেই কমান্ডারগণের একজন ছিলেন, যারা শামে আবু বকর ﵁-এর নিযুক্ত অগ্রগামী কমান্ডার ছিলেন।

কিন্তু আমি তাঁর নেতৃত্বে সেই ধরনের কোনো বিজয় অর্জন পাইনি, যেমনটা অন্যদের বেলায় পেয়েছি। তাই শাম বিজয়ের কমান্ডারগণের তালিকায় তাঁকে যুক্ত করতে পারিনি। ফলে তিনি এই কিতাবে তথা নবিবি কাফেলায় যুক্ত হয়েছেন। বিজয়ী কমান্ডারগণের তালিকায় যুক্ত হওয়ার চেয়ে এটাই তাঁর অধিক উপযুক্ত। কারণ কমান্ডার হিসেবে অন্যের প্রত্যায়নপত্রের চেয়ে রাসুল ﷺ-এর প্রত্যায়নপত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। এটি অনেক বড় মর্যাদার কারণ।

রাসুল ﷺ কেবল সেই সাহাবিকেই নেতৃত্বের আসনে বসাতেন, যার মাঝে নেতৃত্বের পূর্ণ যোগ্যতা দেখতেন। উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বসানোর নীতি পালনে রাসুল ﷺ ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। যেন তাঁর অনুসারীগণ এই বাস্তববাদী নীতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। এবং যাতে প্রতিটি সময় ও স্থানে এটি তাদের জন্য উত্তম আদর্শ হয়ে থাকে।

রাসুল ﷺ স্বীয় আমানত আদায় করেছেন এবং রিসালাতের দায়িত্বও পৌছে দিয়েছেন। তাঁর বাণী ও কর্ম মুসলিমদের আদর্শ। উম্মাহর এক অংশ সে আদর্শের ওপর চলেছেন; ফলে তাঁরা উম্মাহকে শান্তি দিয়েছেন এবং নিজেরাও শান্তি পেয়েছেন। আরেকটি অংশ সে পথে চলতে অক্ষম হয়েছে; ফলে নিজেরাও ধ্বংস হয়েছে এবং উম্মাহকেও ধ্বংস করেছে। নিজেরাও কষ্ট সহ্য করেছে

এবং উম্মাহকেও কষ্টের মাঝে ফেলেছে। যেসব নেতা রাসুলুল্লাহর এই আদর্শ অনুসরণ করেছেন, তারা উম্মাহকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করেছেন। আর যেসব নেতা রাসুলুল্লাহর এই আদর্শ অনুসরণে অক্ষম হয়েছে, তারা উম্মাহকে ধ্বংস আর বরবাদির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আলকামা ﵁-এর বৈশিষ্ট্যাবলি হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি গভীর ইমান ও নিরঙ্কুশ আস্থা। ছোট-বড় সকল কাজে তিনি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতেন। তিনি সেই সব মুমিনের একজন ছিলেন, যারা আকিদার জন্য আমল করতেন। নিজের স্বার্থের জন্য আকিদাকে ব্যবহার করতেন না।

দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন। কারণ প্রথমত তিনি ছিলেন দীপ্তিমান মেধার অধিকারী। দ্বিতীয়ত তিনি শত্রুর শক্তি, নেতৃত্ব, ভূমি ও মতলব বোঝার জন্য অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করতেন।

আলকামা ﵁ গাজা অবরোধকালে গাজার গভর্নরকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য যা করেছিলেন, তা একেবারে অভূতপূর্ব কর্ম ছিল। তাঁর পূর্বে এমন কাজ খুবই অল্প কজন কমান্ডার করেছেন। ঘটনাটি এমন ছিল। আলকামা ﵁ গাজা অবরোধ করে তার গভর্নর ফিকারের সাথে পত্র-বিনিময় করছিলেন। কিন্তু কেউ কারও আবেদনে সাড়া দিচ্ছিল না। ফলে আলকামা ﵁ নিজেই তার কাছে যান। যেন তিনি নিজেই বার্তাবাহক। কিন্তু ফিকার তার এক লোককে পথে ঠিক করে রাখে। তাকে নির্দেশ দেয়, যখন এই লোক পথ দিয়ে যাবে, তখন তাকে হত্যা করবে। কিন্তু আলকামা ﵁ তার এ ফন্দি বুঝতে পারেন। তখন ফিকারকে বলেন, 'আমার সাথে একদল লোক আছে। আমাদের কমান্ডারকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা আমার সমপর্যায়ের। আমি গিয়ে তাদেরকে আপনার কাছে নিয়ে আসব।' এ কথা শুনে ফিকার তার সেই লোককে খবর পাঠায়, সে যেন এই ব্যক্তিকে আর হত্যা না করে। এরপর আলকামা ﵁ তার কাছ থেকে বের হয়ে আসেন। এরপর তার কাছে আর যাননি। অর্থাৎ আমর ইবনুল আস ﵁ আরতাবুনের সাথে যা করেছিলেন, আলকামা ﵁-ও ফিকারের সাথে তা করেছেন।[১৪৫৩]

১৪৫৩. ইবনুল আসির : ২/৪৯৭।

সে ঘটনাটি ছিল এমন, আমর ইবনুল আস ﷺ 'আজনাদিনে' অবস্থান করে আরতাবুনের কিছুই করতে পারছিলেন না। আবার বার্তাবাহক পাঠিয়ে কোনো সুরাহা করতে পারছিলেন না। তখন তিনি নিজেই বার্তাবাহক সেজে আরতাবুনের কাছে যান। কিন্তু আরতাবুন এটা বুঝতে পেরে মনে মনে বলে, 'এতে সন্দেহ নেই যে, এই লোকই হয়তো মুসলিম বাহিনীর আমির অথবা আমির তার পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।' তাই সে এক লোককে পথে আত্মগোপন করে থাকতে বলে। এবং ফেরার পথে আমর ইবনুল আস ﷺ-কে হত্যা করতে বলে। আমর ইবনুল আস ﷺ তার এ কূটবুদ্ধি বুঝতে পারেন। আরতাবুনকে বলেন, 'আমি আপনার কথা শুনেছি। আপনিও আমার কথা শুনেছেন। আপনার কথা আমার কাছে অনুকূল মনে হয়েছে। আমি সেই দশজনের একজন, যাদেরকে উমর ﷺ এই আমিরের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন। আমি এখন ফিরে গিয়ে তাদের নিয়ে আসব। আপনি এখন আমার কাছে যে প্রস্তাব দিলেন, যদি তারা সেটাকে ভালো মনে করে, তবে আমির ও সৈন্যরাও তা মেনে নেবে। আর যদি তারা ভালো মনে না করে, তবে তাদেরকে তাদের জায়গায় ফিরিয়ে দিলেন।' আরতাবুন বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে।' এরপর সে যাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল, তাকে ফিরিয়ে আনে। আমর ﷺ তার কাছ থেকে বের হয়ে নিরাপদে চলে আসেন। তখন সে বুঝতে পারে যে, এটা একটা কৌশল ছিল। তাকে বোকা বানানো হয়েছে। তখন সে বলে, 'এই লোক দেখি সৃষ্টির সেরা বিচক্ষণ।'

তাঁর এ বুদ্ধিদীপ্ত ঘটনার কথা উমর ﷺ জানতে পেরে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমরকে সব কল্যাণ দান করেছেন।'[১৪৫৪]

বিপদ থেকে বাঁচার পন্থা এবং লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে আলকামা ﷺ-এর বুদ্ধিদীপ্ত কাজ আমর ইবনুল আস ﷺ-এর বুদ্ধিদীপ্ত কাজ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সম্ভবত আমর ইবনুল আস ﷺ-এর কাজটি প্রসিদ্ধি পেয়েছে উমর ﷺ-এর এই উক্তির কারণে—'আল্লাহ তাআলা আমরকেই সব কল্যাণ দান করেছেন।' পক্ষান্তরে আলকামা ﷺ-এর এই কাজ সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিচিতি পেয়েছে।

১৪৫৪. ইবনুল আসির : ২/৪৯৮-৪৯৯।

আলকামা ﷺ-এর এমন বুদ্ধিদীপ্ত কাজ তাঁর ব্যক্তিগত অনুসন্ধানীর ব্যাপারে প্রবল আগ্রহকে নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে তাঁর ছিল ব্যতিক্রমধর্মী মেধা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম পরিচালনাগত যোগ্যতা। এসব বৈশিষ্ট্য একজন কমান্ডারকে একই সময়ে দ্রুত সঠিক পরিকল্পনা করতে সক্ষম করে তোলে।

তিনি ছিলেন অনন্য বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিজের অবস্থান ফাঁস হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ফিকারের অবস্থা পর্যবেক্ষণে ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান চালানো নিঃসন্দেহে তাঁর অনন্য বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

তিনি সমুদ্রপথে দুবার কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন। একবার রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায়, আরেকবার উমর ﷺ-এর শাসনামলে। পূর্বঅভিজ্ঞতা ছাড়া সমুদ্রপথে সফরের দুঃসাহসিকতার জন্য অবশ্যই বিরল সাহস থাকতে হবে।

তিনি ছিলেন অবিচল ও সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। কোনো বিষয় পরিকল্পনা করলে তা নির্দ্বিধায় বাস্তবায়ন করতেন। লক্ষ্য বাস্তবায়নে যথাসম্ভব মানসিক ও বস্তুগত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার আগে লক্ষ্য থেকে সরে দাঁড়াতেন না।

তাঁর ছিল একটি মজবুত ও সুদৃঢ় মন, জয়-পরাজয় কোনো অবস্থায় তার মাঝে পরিবর্তন হতো না। তিনি ছিলেন সেই প্রকৃত মুমিনের মানসিক শক্তির আদর্শ, যে মনে করে জিহাদ বিজয় ও শাহাদাত—এই দুই মুকুটের কোনো একটি পরিয়ে দেয়। এ দুটি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামত। তাই কোনো অবস্থায় মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের সুযোগ নেই।

তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। প্রতিটি বিষয়কে তিনি অতি সূক্ষ্ম ও সতর্কতার সাথে হিসাব করতেন। এবং সবচেয়ে মন্দ অবস্থাকে সামনে রেখে কাজ করতেন।

তিনি তাঁর সৈনিকদের মানসিক অবস্থা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন। কারণ তিনি নিজের পরিবারের চেয়ে তাঁদের মাঝেই বেশি বাস করতেন। প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও সক্ষমতা অনুসারে দায়িত্ব দিতেন। কোনো ব্যক্তিকেই তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দিতেন না।

তিনি রাসুল ﷺ-এর আস্থাভাজন ছিলেন। এবং তাঁর পরে আবু বকর ও উমর ﷺ-এরও আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় সৈনিকদেরও আস্থার পাত্র ছিলেন। সৈনিকদের সাথে ছিল তাঁর পারস্পরিক আস্থা ও ভালোবাসা। আর সৈনিক ও কমান্ডারের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও ভালোবাসা থাকা একজন সফল কমান্ডারের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

তিনি প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ভালোবাসা, আস্থা, ইনসাফ ও আদর্শিক ব্যক্তিত্ববলে তিনি কর্তৃত্ব করতেন। জবরদস্তি, জুলুম, চাপ ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কাজ নিতেন না।

ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয় সম্মানিত এবং মান্যবর ব্যক্তি। বাস্তবেই তিনি তাঁর পুরো জীবন আকিদার ও আদর্শের সেবায় অতিবাহিত করেছেন। ইখলাস, আমানতদারিতা ও আকিদার সেবায় কিছু ভুলতে হলে প্রথমে নিজেকেই ভুলে যেতেন।

তিনি সেই কমান্ডারগণের একজন ছিলেন, যারা নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনা ও অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মনে করতেন না; বরং সৈনিকদের সাথে পরামর্শ করে তাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেন।

তিনি যুদ্ধের অধিকাংশ নীতি বেশ দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথেই বাস্তবায়ন করতেন।

টার্গেট নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের নীতি মেনে চলতেন। কোনো রকম অস্থিরতা ও দ্বিধাহীনভাবে সঠিক গন্তব্যে লক্ষ রাখতেন। এ ছাড়া কোনো নড়াচড়া করতেন না।

তাঁর সকল পরিকল্পনা হতো আক্রমণাত্মক। রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরে দুই খলিফার যুগে সামরিক জীবনে তাঁর কোনো পরিকল্পনা আত্মরক্ষামূলক ছিল না।

আকস্মিক আক্রমণের নীতি ফলো করতেন। রাসুল ﷺ-এর সমুদ্রপথের অভিযানের নেতৃত্বে তিনি হাবশার লোকদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করেছিলেন। গাজার গভর্নরের সাথে সাক্ষাতে অপ্রত্যাশিতভাবেই কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে তাঁর

বাস্তবতা কেবল তার সক্ষমতার বাইরে আসার পরই বুঝতে পারে। যার কারণে গভর্নরের শক্তিতে ফাটল ধরে এবং মানসিক অবস্থার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। কেনইবা এমন হবে না, সে তো দেখতে পেয়েছে, মুসলিমরা বিপদ এড়িয়ে যায় এবং নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়।

তিনি পূর্ণ শক্তি অর্জনের নীতি মেনে চলতেন। নিজের দায়িত্ব আদায়ে পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে নিতেন। সাথে পরিমিত শক্তি ব্যয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যাতে অযথা শক্তির ক্ষয় না হয় এবং উপযুক্ত শক্তির ব্যবহারও ব্যাহত না হয়।

নিরাপত্তার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। এ কারণে কোনো যুদ্ধে শত্রু তাঁর শক্তির ওপর আকস্মিক আক্রমণ করেছে বলে আমরা জানি না।

সুশৃঙ্খলার নীতি পালন করতেন। তাঁর পরিকল্পনাগুলো হতো যুদ্ধের অনুকূলে চলমান ধারার উপযুক্ত করে। একরোখা অপরিবর্তনশীল করে হতো না।

তিনি পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি মেনে চলতেন। ঐতিহাসিক ইয়ারমুক যুদ্ধে ও ফিলিস্তিন বিজয় যুদ্ধে তাঁর এই পারস্পরিক সহযোগিতা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

সৈনিকদের মানসিক অবস্থা চাঙা রাখার নীতিও বাস্তবায়ন করতেন। চাঙা রাখতেন আদর্শিক ব্যক্তিত্ব, গভীর আকিদা-বিশ্বাস, প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে। তিনি প্রশাসনিক নীতিমালারও অনুসরণ করতেন। ফলে পরিচালনা বিভাগে তাঁর শক্তি ত্রুটির মুখোমুখি হয়নি।

আলকামা ﵁ বাস্তবে একজন সেরা কমান্ডার ছিলেন, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ তিনি তো রাসুল ﷺ-এরই একজন অন্যতম কমান্ডার ছিলেন।

তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর ঝান্ডাতলে জিহাদ করার মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর অন্যতম কমান্ডার এবং গভর্নর। আবু বকর সিদ্দিক ও উমর ﵄-এর গভর্নর এবং কমান্ডার।

তিনি তাঁর পুরো জীবন ইসলামের জন্য দান করেছেন। অবশেষে হাতে তরবারি ধারণ করা অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এই মহান সাহাবির প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। আমিন।

নববি বাহিনী

সিরাহ সারসংক্ষেপ

নবিজি ﷺ-এর সিরাহ ও জীবনী মুবারকের সারাংশ হচ্ছে, তাওহিদ ও জিহাদ।

নবিজি ﷺ মক্কায় নবুওয়াতপ্রাপ্তি থেকে মদিনায় হিজরত পর্যন্ত জিহাদের জন্য সবকিছু একত্রিত করেছেন, তাওহিদ দ্বারা সকলের চিন্তাধারা একত্রিত করেছেন, তাওহিদ দ্বারা সেনা সারিগুলো একত্রিত করেছেন, তাওহিদ দ্বারা লক্ষ্যসমূহকে একত্রিত করেছেন, তাওহিদ দ্বারা সকল জোটকে একত্রিত করেছেন, তাওহিদ দ্বারা মানুষদের গড়ে তুলেছেন, তাওহিদ দ্বারাই জাহিলিয়াতের আওয়াজকে বিলুপ্ত করেছেন, তাওহিদ দ্বারা ত্যাগ ও কুরবানির মানসিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং সকল মুসলিমকে এই তাওহিদ দ্বারাই সিসাঢালা প্রাচীরের মতো প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নবিজি ﷺ মুক্কা মুকাররমার পবিত্র জীবনকালে জিহাদের জন্য সবকিছু ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত করেছেন।

অতঃপর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর থেকে আপন রবের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই তাওহিদের জন্য জিহাদ করে গেছেন। যেখানে তাঁর লক্ষ্য ছিল সমস্ত মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছে দেওয়া এবং পুরো বিশ্বে আল্লাহর কালিমা পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করা।

নবিজি ﷺ-এর নিজের উঁচু হিম্মত এবং বস্তুগত ও মানসিক পূর্ণ শক্তি আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও তাওফিকে একটি স্পষ্ট ও চূড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে

সর্বদা ব্যস্ত রেখেছেন, তা হলো, (সাহাবিদের মাঝে মুসলিম ব্যক্তিসত্তা গড়ে তোলা।) যাতে তাঁরা শান্তি ও যুদ্ধে, চরিত্র ও আচরণে, পারস্পরিক মুআমালা ও কর্মপদ্ধতিতে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে দুনিয়া-আখিরাতের জীবন পরিচালনাসহ সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য আদর্শ হতে পারেন।

এই মুসলিম ব্যক্তিসত্তা বিনির্মাণে আল্লাহর নবির কৌশল ছিল, জিহাদের জন্য তাওহিদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং তাওহিদের জন্য জিহাদ চালিয়ে যাওয়া।

তাওহিদের বদৌলতেই ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিমদের মাঝে চিন্তাধারার সামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠা হয়। আর এই চিন্তাগত সামঞ্জস্যতা তাদের মাঝে দৃঢ় পারস্পরিক সহযোগিতার সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়। কেননা, মতানৈক্য ও দ্বন্দ্বকে ত্যাগ করে ব্যক্তিগত চাহিদা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম এমন চিন্তাগত সামঞ্জস্য ব্যতীত কোনো দৃঢ় পারস্পরিক সহযোগিতার ধারা তৈরি করা যায় না।

অতঃপর এই আকিদাগত সামঞ্জস্যতার ফলে সফলভাবে এমন জিহাদ শুরু হয়, যা পুরো অর্ধ-বিশ্ব বিজয়ের দিকে ধাবিত করেছে এবং সাফল্য ছিনিয়ে এনেছে। কেননা তাওহিদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র জিহাদ ও পারস্পরিক সহযোগিতা মুসলিমদের এমন শক্তিতে পরিণত করে, যা কখনোই পরাভূত করা সম্ভব নয়। আর এভাবেই মহান নেতা রাসুল ﷺ পুরো জাজিরাতুল আরবকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেন। আর সেই নববি বাহিনী, যা তিনি গড়ে তুলেছেন এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরাই তাঁর পরবর্তী সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ইসলামের পতাকা বহন করে নিয়ে গেছেন। মাত্র ৮৯ বছরের মধ্যে (১১ হি.-১০০ হি.) ইসলামের মহান বিজয়কে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন পূর্বে চীন থেকে পশ্চিমে ফ্রান্সের মধ্যভাগ এবং উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত। তাঁদের এই সব বিজয় ছিল স্থায়ী ও চলমান। কেননা বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ এই ১৪শ বছরের বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিন্নতা ও সময়ের পালাবদল সত্ত্বেও কোনো অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গুটিয়ে আসতে হয়নি। তবে আন্দালুসের পরাজয় ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক পরাজয়। এ ছাড়া অন্য সকল স্থানে আজও পর্যন্ত ইসলাম মানুষের চিন্তাগত, সভ্যতা ও সামাজিক স্তরে অটল ও অবিচল রয়েছে।

নববি বাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নববি বাহিনীর ইতিহাস রাসুল ﷺ-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির দিন থেকেই শুরু হয়েছে। কেননা, তিনি সেই সময় থেকেই সাথিদের পূর্ণ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার মেহনত করে গেছেন। যাঁরা হবে মুসলিম মুজাহিদ কমান্ডার ও সেনা। কিন্তু বাস্তব জিহাদের ইতিহাস ছিল মাত্র ১০ বছরের, যা মদিনাতে হিজরতের পর থেকে শুরু হয়েছে।

নবিজি ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন এবং তাঁর সাথিদেরকেও সেদিকে হিজরতের আদেশ দিয়েছেন, তখন থেকেই ইসলামি বাহিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, অস্ত্রসজ্জিত করা ও প্রস্তুত করা শুরু হয়। তাঁদেরকে এমন সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়া শুরু হয়, যাঁদের কাঠামো এক, লক্ষ্য এক, চিন্তাধারা এক এবং নেতৃত্বও এক।

সামরিক বিশ্লেষণ হিসেবে মদিনায় হিজরতের অর্থ ছিল বাস্তব জিহাদ শুরুর প্রস্তুতিস্বরূপ মুজাহিদদের নিরাপদ ঘাঁটিতে একত্রিত করা।

মদিনা মুনাওয়ারাতে স্থির হওয়ার পর সাথে সাথেই নবিজি ﷺ মসজিদ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করেন। অতঃপর ইট বানানো শুরু করেন এবং তাঁর সাথিরা ইট ও পাথর বহনে অংশগ্রহণ করেন। ফলে একসময় মুসলিমদের জন্য মসজিদ নির্মাণ শেষ হয়। এর বিছানা ছিল বালু ও নুড়ি পাথর এবং ছাউনি ছিল খেজুরের ডাল, আর খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ড।[১৪৫৫]

মদিনা মুনাওয়ারাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদ নির্মাণের দ্বারা একই সাথে নববি বাহিনীর জন্য সেনানিবাস তৈরিও শেষ হয়, যা ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম সেনাছাউনি।

অতঃপর মসজিদে নববি থেকেই মানুষদেরকে পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে গঠনের কাজ শুরু হয়। যাঁদের একাংশ ছিল মুসলিমদের ছোট সন্তান, যাঁরা তখন

১৪৫৫. বিস্তারিত দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৩৯, সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/১১৪, তাবারি : ২/৩৯৭, ইবনে আসির : ২/১০৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/২১৪, ইবনে খালদুন : ২/৭৪০, মুখতাসারু তারিখিল বাশার : ১/১২৭, উয়ুনুল আসার : ১/১৯৫, খুলাসাতুল ওয়াফা : ১৪৬ পৃ., মুখতাসার কিতাবুল বুলদান লি-ইবনি ফাকিহ : ২৪ পৃ.।

জিহাদ করতে অক্ষম হলেও তাঁরা ছিল ভবিষ্যতের ইসলামি বিজয়ের সেনা ও কমান্ডার। আর অপর অংশ ছিল জিহাদের সক্ষম মুসলিম যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ, যাঁরা ছিলেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাহিনী, ইসলামি বিজয়ের সেনা ও কমান্ডার। মসজিদে নববিতে জিহাদে সক্ষম ও অক্ষম প্রত্যেক মুসলিমই জিহাদের জন্য বস্তুগত ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। যাতে তাঁরা জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী প্রথম স্তরের মুসলিম মুজাহিদ হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে মুসলিমদের যুদ্ধের অনুমতি দেননি; যদিও তাঁরা সেখানে অনেক অত্যাচার-নির্যাতন, চাপ ও দেশান্তরের শিকার হয়েছেন। একবার মদিনার প্রায় ৭০ জন ব্যক্তি মক্কার আকাবাতে[১৪৫৬] নবিজি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, যাকে আকাবার দ্বিতীয় বাইআহ বলা হয়। সেখানে এক মুশরিক—যে তখন ব্যাবসায়িক তাঁবুগুলোর মাঝে ঘুরাফেরা করছিল—নবিজি ﷺ ও মদিনা থেকে আগত মুসলিমদের কথোপকথন শুনে ফেলে। ফলে সে উঁচু আওয়াজে চিৎকার করে মক্কাবাসীকে সতর্ক করতে থাকে (মুহাম্মাদ ও ধর্মত্যাগীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়েছে)।

তখন মদিনা থেকে আগত মুসলিমরা তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ হওয়াতে কোনো ভয় পায়নি; বরং তারা কুরাইশ ও অন্যদেরকে অস্ত্র দ্বারা আক্রমণের ইচ্ছা করে। কিন্তু নবিজি ﷺ তাদেরকে দ্রুত পৃথক হয়ে সওয়ারির কাছে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন, কেননা তখনও তাদের জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি।[১৪৫৭]

অতঃপর মদিনাতে হিজরতের পরেই সর্বপ্রথম যুদ্ধের আয়াত অবতীর্ণ হয়—

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ.

১৪৫৬. আকাবা, এমন লম্বা পাহাড়কে বলা হয়, যা রাস্তার মধ্যে অবস্থিত। যে পাহাড়ে আরোহণ করা অনেক কঠিন হয়ে থাকে। যে আকাবাতে বাইআত নেওয়া হয়েছে তার অবস্থান মক্কা ও মিনার মাঝে। মক্কা ও এর মাঝে দুই মাইলের দূরত্ব। সেখানে একটা মসজিদ রয়েছে এবং সেখানে জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপ করা হয়। বিস্তারিত দেখুন, মুজামুল বুলদান : ২/১৯২, মুশতারাক : ৩১১ পৃ.।

১৪৫৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৫৪-৫৮।

'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে, শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, "আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।"'[১৪৫৮]

ফলে রাসুল ﷺ মদিনাতে হিজরতের ১২ তম মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সফর মাসে যোদ্ধা হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। তখন থেকেই ইসলামের বাস্তব যুদ্ধ শুরু হয়।[১৪৫৯]

সামরিক মসজিদের বার্তা

নবিজি ﷺ মক্কার জীবনের পবিত্র ১২টি বছর ও মদিনায় হিজরতের পরবর্তী এক বছর সাহাবিদেরকে পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে মেহনত করেছেন। জিহাদের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশকে বাস্তবায়ন করেছেন।

অতঃপর মদিনার ১০ বছরের মুবারক জিন্দেগিতেও সাথিদেরকে মুসলিম মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলেছেন এবং সেই সাথে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ময়দানে জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য যুদ্ধ করেছেন।

নবিজি ﷺ ৪০ বছরে নবুওয়াত লাভ করেন এবং ৬৩ বছরে মহান রবের সাথে মিলিত হন। প্রথম ১৩ বছর তিনি ছিলেন নবি ও রাসুল, শিক্ষক ও নেতা এবং আদর্শ ও উত্তম নমুনা। বাকি ১০ বছর ছিলেন নবি ও রাসুল, শিক্ষক ও নেতা এবং যুদ্ধের কমান্ডার ও জেনারেল। মুবারক জীবনের পুরো সময়েই দুটি মৌলিক ক্ষেত্রে রিসালাতের বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং আমানত আদায় করেছেন। একটি হলো সমাজকে মুসলিম মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং অপরটি হলো জানমাল দিয়ে জিহাদ করা। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন সমাজকে পরিপূর্ণ মুমিন ও মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে মূল কাজ। তবে যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতীত এই লক্ষ্যে পৌঁছা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া এবং

১৪৫৮. সুরা আল-হাজ, ২২ : ৩৯-৪০।

১৪৫৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২২৩, আদ-দুরার ১০৩, আর-রাসুলুল কায়িদ : ২৭-২৮ পৃ.।

দ্বীন-ইমান রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেননা, শক্তি ছাড়া কখনো হক জমিনের বুকে টিকে থাকে না এবং শক্তি কখনো সত্যবাদী মুজাহিদ ব্যতীত সফল হয় না।

সত্যবাদী মুজাহিদ হচ্ছে যারা প্রথমেই নিজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে ইসলামি আকিদাকে ধারণ করে; যাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যোদ্ধাবাজ পবিত্র অন্তর নিয়ে বিজয়ী হতে পারেন। যারা কখনো সংখ্যা ও সরঞ্জামের আধিক্যের কারণে বিজয় লাভ করেন না। কেননা, নবিজি ﷺ-এর সময়কাল থেকে মহান ইসলামি বিজয়ধারা চলমান থাকার সময় কখনোই মুসলিমরা সংখ্যা ও সরঞ্জামের আধিক্যের দ্বারা শত্রুর ওপর বিজয়ী হননি; বরং তাঁরা সত্য দ্বীনের সকল শিক্ষাকে অন্তর ও বাহ্যিক আমলে পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সর্বদা বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু যখন তারা তাওহিদকে আঁকড়ে ধরা ও দ্বীন বাস্তবায়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন থেকেই তাদের লাঞ্ছনা শুরু হয়েছে এবং বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে তারা কোথাও সফল হয়নি।

নববি বাহিনীর ইতিহাস মুস্তফা আলাইহিস সালামের ওপর প্রথম ওহি নাজিলের সময় থেকে শুরু হয়েছে। মক্কাতে তিনি সেনা ও কমান্ডারদের আলাদা আলাদাভাবে গড়ে তুলেছেন। অতঃপর যখন মদিনায় হিজরত করেন, সেখানে মসজিদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তখন থেকে নববি বাহিনীর এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তা ছিল কমান্ডার ও সেনাদের জিহাদের জন্য সংগঠিতভাবে প্রস্তুত করা। মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই নববি বাহিনী পরিপূর্ণ সংগঠিত হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যায়। যাঁরা ছিল সংখ্যায় কম; কিন্তু অধিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মদিনা মুনাওয়ারার নিরাপদ ঘাঁটিতে তাঁরা জিহাদের জন্য একত্রিত হতেন, এখান থেকে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতেন, যুদ্ধশেষে এখানেই ফিরে আসতেন। এখানেই তাঁরা সেনা ও যুদ্ধসরঞ্জাম একত্রিত করতেন।

নবিজি ﷺ মসজিদে নববিকেই নেতৃত্বের হেডকোয়ার্টার বানিয়েছিলেন। এখানেই সামরিক পরিকল্পনা করতেন। এর চত্বরেই জিহাদি আলোচনার বৈঠক করতেন। এখানেই সত্যবাদী মুজাহিদদের গড়ে তুলতেন। এখান থেকে দিতেন আদেশ, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা এবং এখানেই চিন্তাশীল সাথিদের মতামত শুনতেন এবং সকল বিষয়ে পরামর্শ করতেন।

তিনি সাথিদের বস্তুগত ও মানসিক শক্তি দ্বারা উজ্জীবিত করার জন্য মসজিদে একত্রিত করতেন; যাতে তাঁদের অন্তর শুকিয়ে না যায়। মুমিনদের কিতালের প্রতি তাহরিজ (উদ্বুদ্ধ) করতেন। তাঁদের অটল ও অবিচল থাকার আদেশ দিতেন এবং পলায়ন করার থেকে নিষেধ করতেন। তাঁদেরকে বিচ্ছিন্নতা ও দ্বন্দ্ব করা থেকে সতর্ক করতেন। আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধতার কঠিন আদেশ দিতেন। তাঁদের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন মহব্বত, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব।

গাজওয়া ও সারিয়্যাগুলো মসজিদ থেকেই যাত্রা শুরু করত এবং মসজিদেই মুজাহিদদের জন্য পতাকা ও নীতিমালা প্রদান করা হতো। এখানে অস্ত্র ও সরঞ্জাম বণ্টন করা হতো। সাহাবিগণ যেকোনো বিপদের সময় মসজিদেই একত্রিত হতেন। মুজাহিদরা গাজওয়া ও সারিয়্যা থেকে মসজিদেই ফিরে আসতেন। আহতদের সেবা করা হতো মসজিদেই এবং এই মসজিদেই মুসলিমদের শিক্ষা দেওয়া হতো জিহাদের বিধান।

গাজওয়া ও সারিয়্যার মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, গাজওয়া এমন যুদ্ধ, যাতে নবিজি ﷺ নিজেই নেতৃত্ব প্রদান করতেন এবং সারিয়্যা হলো এমন যুদ্ধ বা অভিযান, যাতে তাঁর কোনো সম্মানিত সাহাবি নেতৃত্ব দিতেন।

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ « لَنْ تُرَاعُوا، لَنْ تُرَاعُوا ». وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ

'নবিজি ﷺ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবার চাইতে অধিক দানশীল এবং লোকদের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী ছিলেন। একদা রাতের বেলায় (এক বিরাট আওয়াজ শুনে) মদিনাবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই লোকেরা সেই শব্দের দিকে রওয়ানা হয়। তখন

তারা নবিজি ﷺ-কে সামনাসামনি পেলেন। তিনি সে আওয়াজের দিকে লোকদের আগেই বের হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, "তোমরা ঘাবড়াবে না, তোমরা ঘাবড়াবে না।" এ সময় তিনি আবু তালহা رضي الله عنه-এর জিনবিহীন ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন। আর তাঁর কাঁধে একখানা তলোয়ার ঝুলছিল।'[১৪৬০]

রাসুল ﷺ সবার পূর্বে ভীতিকর আওয়াজের দিকে এগিয়ে গেছেন। সাহাবিরা তখন মসজিদে একত্রিত হয়েছিলেন আল্লাহর নবির পক্ষ থেকে আদেশ ও নির্দেশনার অপেক্ষায়।

নবিজি ﷺ-এর মসজিদ ছিল মুজাহিদ কমান্ডার ও সেনাদের মিলনায়তন। সামরিক পরিভাষায় মিলনায়তন হচ্ছে, যেখানে কমান্ডার তাঁর সেনাদের সাথে একত্রিত হয়ে আদেশ প্রদান করে এবং মতামত গ্রহণ করে। মুসলিমরা যখন অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত কোনো বিপদের সম্মুখীন হতেন, তখন আহ্বান করা হতো, সালাতের জন্য একত্রিত হও... সালাতের জন্য একত্রিত হও। ফলে মুজাহিদরা একাকী ও দলে দলে ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে সারিবদ্ধ হতেন। তাঁরা তখন পরিপূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত থাকতেন এবং মসজিদের বাইরে বেঁধে আসতেন ঘোড়া, উটনী বা আরোহণ-জন্তু। তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হতো; যাতে তাঁরা খুব দ্রুত শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন এবং সেই বিপদকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। তাঁরা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় তাঁদের কমান্ডারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতেন এবং এক লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতেন।

নবিজি ﷺ সাহাবিদের পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন তিনটি উপাদানের ভিত্তিতে : দৃঢ় আকিদা, উত্তম আদর্শ ও উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারণ।

ইসলামের আকিদা হচ্ছে এমন একটি মৌলিক ভিত্তি, যা সকল স্থান ও কালের জন্য প্রযোজ্য। যা বস্তুজগতের তুলনায় অন্তরকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং পার্থিব জীবনের পরিবর্তে আখিরাতের জীবনকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়। ইসলাম মানুষের

১৪৬০. সহিহুল বুখারি : ৬০৩৩, সহিহু মুসলিম : ২৩০৭।

মন-মানসে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের বীজ বপন করে। উত্তম আখলাক ও সুন্দর আচরণসহ অন্যান্য উত্তম কাজগুলোতে অভ্যস্ত করে তোলে। ইসলাম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার আদেশ করে এবং পলায়ন ও কাপুরুষতা থেকে বাধা দেয়।

অপরদিকে উত্তম আদর্শ হচ্ছে আরেকটি মৌলিক উপাদান। এই ক্ষেত্রে নবিজি ﷺ-এর চরিত্র ও আদর্শ ছিল কুরআন। তিনি ছিলেন জমিনের বুকে ইসলামের শিক্ষাগুলোর জীবন্ত নমুনা। তিনি কোনো বিষয়ে আদেশের পূর্বে নিজেই তা সর্বোচ্চ পূর্ণতার সাথে পালন করতেন এবং কোনো বিষয়ে নিষেধের পূর্বে নিজেই তা থেকে পূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখতেন। তিনি ছিলেন সাহসিকতা ও অগ্রগামিতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। তাঁর সকল সাহাবি আমল ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বোত্তম এবং তিনি ছিলেন তাঁদের তুলনায় আকাশের চাঁদের সমতুল্য।

তিনি কল্যাণ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সাথিদের প্রাধান্য দিতেন; কিন্তু বিপদ ও কষ্টের ক্ষেত্রে নিজেই অন্যদের পূর্বে এগিয়ে যেতেন। তিনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান প্রাপ্তির সকল আমলের ক্ষেত্রে সাথিদের জন্য ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। ফলে নববি যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ, কেননা সাহাবিদের ওপর আল্লাহর নবি ﷺ-এর সরাসরি প্রভাব ছিল অনেক বিশাল।

উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় আদর্শ। নেতা, কমান্ডার, দায়িত্বশীল, কাজি ও গভর্নর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই নেক আমল, দৃঢ় ইমান, ত্যাগের মানসিকতা, উন্নত ও উঁচুমানের যোগ্যতা ও উত্তম অতীতের প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন।

যে বিভিন্ন যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের ইতিহাস পাঠ করবে এবং তাদের পক্ষ থেকে অনুসারীদের বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টনের পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করবে, তাহলে সে দেখতে পাবে, তাদের কার্যক্রমের সাথে নবিজি ﷺ-এর সাথিদের মধ্যে সামাজিক ও সামরিক দায়িত্ব বণ্টনের উত্তম পদ্ধতির কোনো তুলনাই নেই।

নবিজি ﷺ বলেছেন, 'যার কাছে মুসলিমদের কোনো বিষয়ের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়, আর সে তা এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করে, যার থেকে উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তি সেখানে রয়েছে, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে খিয়ানত করল।'

অপর হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি এমন কাউকে কোনো জামাআতের নেতৃত্ব অর্পণ করে, যেখানে তাঁর থেকে অধিক যোগ্য ও উত্তম ব্যক্তি রয়েছে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলা, রাসুল ও মুমিনদের সাথে খিয়ানত করল। (আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ লি ইবনি তাইমিয়া, ১০)

রাসুল ﷺ-এর বাণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, নেতৃত্ব হচ্ছে আমানত, যা পূর্ণ আদায় করা আবশ্যক। রাসুল ﷺ আবু জার গিফারিকে নেতৃত্বের ব্যাপারে বলেছেন, 'এটি হচ্ছে আমানত, যা কিয়ামতের দিনের অপদস্থতা ও অনুশোচনা—তবে সে ব্যতীত, যে তার পূর্ণ হক আদায় করবে।'

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন, 'যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করো।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কীভাবে আমানতের খিয়ানত করা হবে?' বললেন, 'যখন নেতৃত্ব অযোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।'

রাসুল ﷺ কোনো ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির ওপর কোনো যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রাধান্য দিতেন না। তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর উপযুক্ত কাজের জন্য বাছাই করতেন। ফলে তিনি বাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করতেন এমন ব্যক্তির কাছেই, যার রয়েছে জন্মগত প্রতিভা, অর্জিত জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই সেই সকল কমান্ডার সফল হয়েছিলেন, যাঁদেরকে নবিজি ﷺ সারিয়্যা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। অতঃপর নবিজির ওফাতের পর সেই কমান্ডারগণই ইসলামি বিজয়ের মূল নেতৃত্বে পরিণত হন। কেননা তাঁরা ছিলেন ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

নবিজি ﷺ খালিদ رضي الله عنه-এর ইসলাম গ্রহণের পরেই খুব দ্রুত তাঁকে অন্য সাহাবিদের ওপর নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[১৪৬১]

খালিদ رضي الله عنه-এর সাথে কৃত আচরণ আমর ইবনুল আস رضي الله عنه-এর সাথেও করা হয়েছিল।[১৪৬২] তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সময় বলেছিলেন, 'মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলোকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।'[১৪৬৩]

১৪৬১. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৮২, আল-ইসতিআব : ৭/১০৩৪।
১৪৬২. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৮২, আল-ইসতিআব : ৭/১০৩৪।
১৪৬৩. উসদুল গাবাহ : ৩/৩৮২, আল-ইসতিআব : ৭/১০৩৪।

উসমান বিন আফফান ﷺ ছিলেন ধনী ব্যক্তি। তাই মুসলিমরা তাঁর ধনাঢ্যতা থেকে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু আমরা ইতিহাসে এমনটা পাইনি[১৪৬৪] যে, আল্লাহর নবি ﷺ কখনো উসমান ﷺ-কে যুদ্ধের কোনো দায়িত্ব, এমনকি অস্ত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন।

হাসসান বিন সাবিত আনসারি ﷺ ছিলেন অনেক উন্নত মানের কবি। তাই মুসলিমরা তাঁর কাব্যপ্রতিভা থেকে উপকৃত হয়েছে; কিন্তু নবিজি ﷺ যখন যুদ্ধে যেতেন, তখন তাঁকে নারীদের মাঝে রেখে যেতেন।

নবিজি ﷺ-এর অনেক সাহাবি ছিলেন অনেক দুঃসাহসী বীর। কিন্তু তাঁরা সর্বদাই মুসলিম বাহিনীর মাঝে সেনা হিসেবেই রয়ে গেছেন। তাঁরা কখনোই নেতৃত্বের স্থান দখল করেননি। কেননা তাঁরা উত্তম সেনা ছিলেন ঠিক; কিন্তু উত্তম নেতা ছিলেন না।

নবিজি ﷺ-এর অনেক সাহাবি ছিলেন লিখন ও পঠনে অনেক দক্ষ। ফলে তিনি তাঁদেরকে ওহী লিপিবদ্ধ করা ও রাজা-বাদশাহদের কাছে পত্র লেখার দায়িত্ব দিতেন।

তাঁদের মাঝে অনেকেই ছিল যোগ্য দায়ি, কাজি ও প্রশাসক। যাঁদের প্রত্যেককে তিনি তাঁদের যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করতেন।

নবিজি ﷺ সাহাবিদের সকল বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ছিলেন, তাই তাঁদের প্রত্যেকের দক্ষতা থেকে উপকৃত হতেন এবং উপযুক্ত স্থানে নিযুক্ত করতেন।

তিনি সাহাবিদের উত্তম বিষয়গুলোর প্রশংসা করতেন। তবে পাশাপাশি তাঁদের অপূর্ণাঙ্গ দিকগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতেন। সেগুলো গোপন রাখতেন। তাঁদের থেকে প্রকাশিত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। সেগুলো কখনোই প্রকাশ্যে আলোচনা করতেন না। বরং তিনি তাঁদের শুধু ভালো বৈশিষ্ট্যগুলোই উল্লেখ করতেন। সাহাবিদেরকেও তিনি অপরের শুধু গুণাগুণ আলোচনার আদেশ দিতেন।

১৪৬৪. সুনানুন নাসায়ি : ২/১২৪, সুনানুন নাসায়ির হাশিয়ায়ে সিন্ধি : ২/১২৪।

নবিজি ﷺ প্রত্যেক মুসলিম সদস্যের যোগ্যতা থেকে উপকৃত হতেন এবং সেগুলো নতুন ইসলামি সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। তিনি ইসলামি সমাজের প্রতিটা ইটকে উপযুক্ত স্থানে রাখতেন। আর এভাবেই মুসলিম ভিত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

এটাই ছিল নবিজি ﷺ-এর রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে যুদ্ধ ও শান্তি সব সময় ও সর্বক্ষেত্রে বিজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ।

তিনি মহান রবের সাথে সাক্ষাতের সময় পেছনে রেখে গেছেন মুসলিমদের মধ্যে অগণিত যোগ্য কমান্ডার, নেতা, গভর্নর, দায়ি, আলিম, ফকিহ ও মুহাদ্দিস। যারা মুসলিম উম্মাহকে সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও চিন্তা সর্বক্ষেত্রে ইজ্জত-সম্মান, উন্নতি ও সফলতার দিকে পরিচালিত করেছেন। তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন বিজয়, সাহায্য ও তাওফিকের দিকে। তাঁদের অটল রেখেছেন হক ও সত্য পথের ওপর।

তাঁরা ছিলেন এমন নেতা ও কমান্ডার, যাঁরা সরাসরি নবিজি ﷺ-এর হাতে গঠিত। রাসুল ﷺ নিজেকে ভুলে গিয়েছিলেন এবং সমস্ত চিন্তা দ্বীনের স্বার্থে ব্যয় করেছেন। তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে ভুলে মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক স্বার্থের পেছনেই সর্বদা ব্যস্ত থেকেছেন। যার ফলে বিভিন্ন পদ-দায়িত্বের ক্ষেত্রে যোগ্য ও উপযুক্ত নেতৃত্বের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রথম উপাদান দৃঢ় আকিদার মাধ্যমে সকল মুসলিমকে আন্তরিকভাবে সদা প্রস্তুত দ্বীনের প্রহরী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। যারা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেবে। যারা ইসলামি সমাজকে আল্লাহ তাআলার জন্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবে।

দ্বিতীয় উপাদান উত্তম আদর্শের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিমকে এটা বিশ্বাস করিয়েছেন যে, আদর্শ সমাজ সেটাই, যেই সমাজ ইসলামের আদর্শ আকিদাকে ধারণ করে। যা মূলত মুমিন ও সকল মানুষের কল্যাণের বার্তা নিয়ে এসেছে।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

'এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী সম্প্রদায় বানিয়েছি; যাতে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।'[১৪৬৫]

তৃতীয় উপাদান উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারণের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিমকে তাদের নিজেদের যোগ্যতা, সক্ষমতা ও অগ্রগামিতার প্রতি বিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। যারা তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও আদর্শ থেকে কখনোই বিচ্যুত হবে না।

মুসলিম সমাজের সাধারণদেরকে তাদের নেতৃত্বের ন্যায়পরায়ণতা ও নিজস্ব চাহিদার আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এভাবে আল্লাহর নবি ﷺ প্রত্যেকজন মুসলিম ও মুজাহিদ ইসলামি বাহিনীর সেনাকে গড়ে তুলেছেন এবং প্রস্তুত করেছেন। যারা তাদের দৃঢ় আকিদায় বিশ্বাসী এবং তাঁর নেতৃত্বের আমানতদারিতার প্রতি বিশ্বস্ত। যে ভবিষ্যতে তার নেতৃত্ব থেকে জুলুম বা বিচ্যুতির কোনো ভয় করে না। যে তার বর্তমানের প্রতি সন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতের প্রতি পূর্ণ আশ্বস্ত।

এদের মাধ্যমেই গঠিত হয়েছিল প্রথম মুসলিম সমাজ এবং তাঁরাই ছিলেন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী, যাঁরা আল্লাহ তাআলার কালিমাকে বিজয়ী করার জন্য জিহাদ করে গেছেন।

তাঁদের মধ্যে দৃঢ় আকিদার ভিত্তিতে চিন্তাগত সামঞ্জস্যতা পূর্ণ মাত্রায় ছিল। যারা তাঁদের নেতৃত্বের প্রতি ছিলেন পূর্ণ আশ্বস্ত। কারণ তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিরা। যাঁরা হতেন সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও প্রতিভাসম্পন্ন। যাঁদের ছিল দৃঢ় ইমান ও উজ্জ্বল অতীত। এই নেতাগণ তাঁদের আকিদার প্রতিরক্ষা করতেন। মানুষের ওপর আকিদা চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং আকিদাকেই মানুষের কাছে বহন করে নিতেন। তাঁরা তাঁদের দ্বীন ও সম্মানের প্রতিরক্ষা করতেন। আমি এখানে তাঁদের সম্পদের প্রতিরক্ষার কথা বলছি না, কেননা এক মুসলিমের সম্মান সকল মুসলিমের সম্মান। প্রতিটি মুসলিম

১৪৬৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৪৩।

তার অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে সমান। তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর দায়িত্ব আদায়ের চেষ্টা করে যেতেন। তাঁরা ছিলেন এমন ব্যক্তি, যাঁদের প্রত্যেক সদস্য সমান। যাঁদের মাঝে কোনো স্তর বা রক্তের ভিন্নতা ছিল না। তাঁরাই ছিলেন নববি বাহিনী। এই বাহিনী কখনোই পরাজিত হয় না বা প্রকম্পিত হয় না।

বাহিনী গঠনের ধাপসমূহ

মুসলিমদের প্রথম বাহিনী ইতিহাসে চারটি ধাপ পাড়ি দিয়েছে। এই ধাপগুলো পাড়ি দিয়ে তাঁরা দুর্বলতা থেকে শক্তির দিকে এগিয়ে গেছেন। প্রতিরক্ষা থেকে আক্রমণের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে ধাপে ধাপে তাঁরা এমন আক্রমণকারী শক্তিতে পরিণত হয়েছেন, যাঁদের ছিল দৃঢ় আকিদা ও উঁচু মানসিকতা। যাঁরা একক নেতৃত্বের অধীনে কাজ করতেন। একই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতেন।

চারটি ধাপ সময়ক্রম হিসেবে

প্রথম ধাপ সেনা সংগ্রহের যুগ : এটা নবুওয়াত প্রাপ্তির (৬১০ হি.) পর থেকে মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত (৬২২ খ্রি.) এবং সেখানে স্থির হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই ধাপে নবিজি ﷺ শুধু দাওয়াহ ও দ্বীন ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন। মানুষকে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন। তাদের অন্তরে আকিদা দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিয়েছেন। সমস্ত শক্তি দিয়ে দাওয়াহ পৌঁছে দিয়েছেন এবং ইসলাম প্রচার করেছেন।

এর মাধ্যমেই তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রথম ভিত্তিকে গড়ে তুলেছেন। অতঃপর মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে তাঁদেরকে সেখানে একত্রিত করেছেন। ফলে মদিনা ছিল মুসলিম বাহিনীর জন্য সর্বপ্রথম নিরাপদ দুর্গ।

দ্বিতীয় ধাপ আকিদার প্রতিরক্ষার যুগ : এই যুগে হিজরতের প্রথম বছর ইসলামি বাহিনীকে সংগঠিত করেছেন এবং জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

একসময় অনুমতির আয়াত নাজিলের পর জিহাদ শুরু করেছেন :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ - الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ

'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে, শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, "আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।"'[১৪৬৬]

তখন তিনি সাহাবিদের নেতৃত্বে সারিয়্যা প্রেরণ করতেন এবং নিজেই গাজওয়া পরিচালনা করতেন। এই যুগ অর্থাৎ আকিদার প্রতিরক্ষার যুগ—যা শেষ হয় পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের পর মদিনা থেকে কাফিরদের জোটবদ্ধ বাহিনীর প্রস্থানের পর।[১৪৬৭] কেউ বলেছেন, জিলকদ মাসে।[১৪৬৮] এই যুগ প্রায় চার বছর চলমান ছিল।

এই ধাপেই সাংগঠনিকভাবে ইসলামি বাহিনীর জন্ম হয়। যারা মসজিদে নববির ছায়াতলে মুজাহিদ বাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠেন। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা দ্বিতীয় হিজরির রমাদানে বদরের যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন।[১৪৬৯] এই যুদ্ধে তাঁরা ইসলামি আকিদার প্রতিরক্ষায় নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেন। মুসলিমদের তুলনায় সংখ্যা ও সরঞ্জামে অধিক মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদি শত্রুদের সামনে এটা প্রমাণ করেন যে, ইসলামের দাওয়াহকে ছড়িয়ে দেওয়ার সক্ষমতা ও যোগ্যতা তাঁদের রয়েছে।

এই যুগে সদ্য প্রস্ফুটিত ইসলামি বাহিনী বিশাল সফলতা ও চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে অনেক কঠিন সময় পার করেছে। বদর প্রান্তরে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে এই

১৪৬৬. সুরা আল-হাজ, ২২ : ৩৯-৪০।

১৪৬৭. আদ-দুরার : ১৭৯ পৃ., উয়ুনুল আসর : ২/৫৫।

১৪৬৮. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৬৫, ওয়াকিদি ﷺ-এর মাগাজি : ২/৪৪০।

১৪৬৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৬৬, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১২, আদ-দুরার : ১১০ পৃ., মাগাজি : ১/২ ও ১/২১, উয়ুনুল আসর : ১/২৩৫।

দুরবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেই নবিজি ﷺ রবের কাছে ফরিয়াদ করেছেন, 'হে আল্লাহ, যদি এই দল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আপনার ইবাদত করা হবে না।'[১৪৭০] অতঃপর খন্দকের যুদ্ধের পর মুসলিমরা ভীতিকর অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে শক্তি ও সামর্থ্যের অবস্থায় উপনীত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, 'এখন থেকে আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করব, তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করবে না। এখন আমরা তাদের দিকে অগ্রসর হব।'[১৪৭১]

তৃতীয় ধাপ অগ্রবর্তী হামলার যুগ : এটি খন্দকের যুদ্ধ থেকে অষ্টম হিজরি[১৪৭২] হুনাইনের[১৪৭৩] গাজওয়া পর্যন্ত চলমান থাকে।

এই ধাপে ইসলাম পুরো জাজিরাতুল আরবে ছড়িয়ে পড়ে। আরবের রাষ্ট্রসমূহে মুসলিম বাহিনী এক আঘাতকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়, যাদের অনেক প্রভাব, মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যারা মুসলিমদের পথ রোধকারী সকল মুশরিক ও ইহুদি শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

চতুর্থ ধাপ পূর্ণতার যুগ : হুনাইন থেকে নবিজি ﷺ-এর অফাত পর্যন্ত।

এই ধাপে মুসলিমদের শক্তি পূর্ণতা পায়। ফলে তাঁরা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া পুরো জাজিরাতুল আরব পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইসলামের পতাকাতলে আরবকে একতাবদ্ধ করেন।

অতঃপর এই শক্তি জাজিরাতুল আরবের বাইরে তাঁদের প্রতিপক্ষ খুঁজতে শুরু করে। এই হিসেবে নবম হিজরির রজব[১৪৭৪] মাসে তাবুক[১৪৭৫] যুদ্ধ ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলামি পরাশক্তি জন্মের ঘোষণা।

১৪৭০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৬৭, উয়ুনুল আসর : ১/২৫৫।

১৪৭১. উয়ুনুল আসর : ২/৬৬।

১৪৭২. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৪৯, ওয়াকিদি রহ.-এর মাগাজি : ১/২, জাওয়ামিউস সিরাহ : ২৪১ পৃ।

১৪৭৩. হুনাইন হচ্ছে তায়িফের পূর্বের একটি উপত্যকা, মক্কা থেকে তিন রাতের দূরত্ব। মুজামুল বুলদান : ৩/৩৫৪।

১৪৭৪. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/১৬৫, আদ-দুরার : ২৫৩ পৃ.।

১৪৭৫. তাবুক হচ্ছে ওয়াদিয়ে কুরা ও শামের মাঝে একটি অঞ্চল। এটা একটি দুর্গ, যাতে ঝরনা ও খেজুর বাগান আছে। মুজামুল বুলদান : ২/৩৬৫।

এখানে নেতৃত্ব ও সামরিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যোগ্যতার প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন, (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) 'আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি কোথায় তাঁর রিসালাত অর্পণ করবেন।'[১৪৭৬] নবিজি ﷺ-এর নেতৃত্ব, সামরিক ও অন্যান্য যোগ্যতা ও প্রতিভা এতটাই বিরল অতুলনীয়, যার কখনোই পুনরাবৃত্তি হয় না।

তিনি নিজেই ২৭টি যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, এক বর্ণনামতে ২৫টি যুদ্ধ।

তবে আমি সিরাত, মাগাজি ও ইতিহাসের বর্ণনা থেকে হিসেবে করে পেয়েছি, নবিজি ﷺ নিজে যে সমস্ত যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁর সংখ্যা ২৮টি। মনে হয় সিরাতবিদদের একাংশ ভুলে একটি যুদ্ধ হিসেবে আনেননি। অপর অংশ একাধিক যুদ্ধ ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলো ঘেঁটে পেয়েছি সে সংখ্যা ছিল ২৮টি।

নয়টি গাজওয়াতে যুদ্ধ হয়েছে। বদর, উহুদ, মুরাইসি, খন্দক, কুরাইজা, খাইবার, মক্কা-বিজয়, হুনাইন ও তায়িফ। আল্লাহর রাসুলের বাকি ১৯টি যুদ্ধে মুশরিকরা যুদ্ধ না করেই পলায়ন করেছিল।

তিনি ৪৭টি সারিয়্যা প্রেরণ করেছেন, কোনো বর্ণনামতে এই সংখ্যা আরও বেশি।

রাসুল ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর একটানা সাত বছর নিজেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম যুদ্ধ 'ওয়াদ্দান'-এর দিকে দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে বের হয়েছেন। নবম হিজরির রজব মাসে সংঘটিত তাবুক যুদ্ধ ছিল তাঁর পরিচালিত সর্বশেষ যুদ্ধ। এই সকল যুদ্ধের ফলেই ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইসলামের পতাকাতলে পুরো জাজিরাতুল আরব একত্রিত হয়।

১৪৭৬. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১২৪।

মহান বিজয়ের নেতা

নবিজি ﷺ ইসলামের মহান বিজয়ের জন্য পরিকল্পনা শুরু করেন। তিনিই সেই প্রারম্ভিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, যা বাস্তবায়নে মুসলিম বাহিনী ছুটে গিয়েছিল শাম বিজয়ের দিকে, যা বর্তমানে ফিলিস্তিন, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননে বিভক্ত। এই পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতেই ভূমধ্য সাগরের পূর্ব তীরে জাজিরাতুল আরবের বাইরে ইসলামি শাসনের সর্বপ্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়।

কারণ নবিজি ﷺ একদিকে যেমন বিশ্বের সকল নেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ পাঠিয়েছেন। পারস্যের কিসরা, কনস্টান্টিনোপলের কাইসারসহ ইরাক, শাম, মিসর, আরব উপদ্বীপ, ইয়ামান ও হাবশার বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছিয়েছেন। তেমনই তিনি ছিলেন অনেক দক্ষ ও সচেতন কমান্ডার। ফলে তাঁর দৃষ্টি থেকে এমন কোনো শত্রুতার চিহ্ন এড়িয়ে যেত না, যা এই দাওয়াতের মর্যাদাকে আঘাত করতে পারে বা যা একে ধ্বংস করে দিতে পারে অথবা তার স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে পড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

তাই তিনি বসরাতে[১৪৭৭] অবস্থানকারী গাসাসিনাদের বাদশাহর দরবারে প্রেরিত দূতের শাহাদাতের খবরে নিশ্চুপ বসে থাকেননি। অষ্টম হিজরি ৬২৯ সালে প্রিয় একজন কমান্ডারকে বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। তিনি জাইদ বিন হারিসা ﷺ-কে তিন হাজার যোদ্ধাসহ আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা মুতায় প্রেরণ করেন। যেখানে মুসলিমরা রোমের বাহিনী ও তাদের মিত্র গাসাসিনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

মুতা যুদ্ধের ফলাফল যেটাই হোক, তাঁর অনেক দূরবর্তী প্রভাব ও ফলাফল ছিল। যদিও রোমানরা এই আক্রমণকে বেদুইনদের থেকে মাঝে মাঝে পরিচালিত সাধারণ আক্রমণের মতোই গণ্য করছিল; কিন্তু বাস্তবে জাইদ ﷺ-এর সারিয়্যা ছিল অনেকটাই ভিন্ন ধাঁচের। রোমান সাম্রাজ্য যার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। এটা ছিল একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ যুদ্ধ, যার একটি নতুন বিশেষ কার্যকারিতা ছিল। কারণ তা মুসলিমদের শামের ভূমি বিজয়ের জন্য চূড়ান্তভাবে আকাঙ্ক্ষিত করে তোলে।

১৪৭৭. দামেশকের একটি অঞ্চল।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবম হিজরিতে নবিজি ﷺ নিজেই তাবুক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সেখানে তারা ওত পেতে থাকা রোমানদেরকে মুসলিমদের শক্তি প্রদর্শন করেন। অতঃপর সেখান থেকে মদিনায় ফিরে আসেন। এই যুদ্ধটা ছিল অনুসন্ধানমূলক। সেই সাথে রোমান ও তাদের মিত্র গাসাসিনাদের ওপর এর প্রভাব ছিল বিশাল। ১১ হিজরিতে নবিজি ﷺ উসামা বিন জাইদ ﷺ-এর নেতৃত্বে রোমানদের আক্রমণের জন্য একটা বাহিনী প্রস্তুত করেন। যেখানে তিনি মুসলিমদের নির্দিষ্ট দিকে অভিমুখী করেন এবং তাদের সামনে সেই যুদ্ধের লক্ষ্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেন। অতঃপর তাদের সুদৃঢ় আদেশ প্রদান করেন।

এভাবেই নবিজি ﷺ তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে সেই দিকে নিবদ্ধ করেন, যা ইসলামের দাওয়াহ ও শাসনের ওপর সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যার উৎস হলো শাম, যেখানে ছিল রোমান ও তার মিত্র গাসাসিনা। পরবর্তী সময়ে ইসলামের বিজয়ের ঘটনাগুলো এই ইঙ্গিতের সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ রোমানরা ছিল অনেক জেদি শত্রু।[১৪৭৮]

এটাই ছিল প্রথম মুসলিম বাহিনীর ইতিহাস। যাঁদের তিনি গঠন করেছেন এবং নির্ঘুম প্রতিপালন করেছেন। তাঁদের প্রশিক্ষিত করেছেন, প্রস্তুত করেছেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। তাঁদের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব প্রস্তুত করেছেন। তাঁদের মাঝে দৃঢ় আকিদার মাধ্যমে উঁচু মানসিকতা ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁরা এমন এক বাহিনীতে পরিণত হয়েছেন, যাঁরা স্বল্পতা ও আধিক্যের ফলে পরাজিত হন না। তাঁদের মাঝে শক্তিশালী ঐক্য গঠন করেছেন। তাঁদেরকে এক মহান উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। যাঁরা আল্লাহ তাআলার শক্তি, সম্মান, ইচ্ছা ও হিদায়াতের দ্বারা দৃঢ় আকিদার ওপর অটল-অবিচল ছিলেন।

এই বাহিনী গঠিত হয়েছে মসজিদে, বেড়ে উঠেছে মসজিদে, নিজ পায়ে স্থির হয়েছে মসজিদে, তাঁরা শিক্ষা লাভ করেছে মসজিদে। আর আল্লাহ তাআলা পুরো জমিনকেই করে দিয়েছেন মসজিদ ও পবিত্র।

১৪৭৮. দাউলাতুল ইসলামিয়া ওয়া ইমব্রাতুরিয়্যাহ রোম : ৩১।

মদিনাতে মসজিদে নববি থেকে মুজাহিদদের প্রথম বাহিনী ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় বের হয়। অতঃপর তাঁরা ইসলামের দাওয়াহ মানুষের কাছে পৌঁছানো ও তার ছড়িয়ে পড়ার পথে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বের হন। তাঁরা ইসলামের অস্তিত্বকে রক্ষার জন্য বের হন। ইসলামি শাসনের অবস্থান, ভূমি ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব নেন। মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ ও জাজিরাতুল আরবকে ঐক্যের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনার জন্য বের হন। তাঁরা ইসলামের মহান বিজয়ের দায়িত্বকে কাঁধে নেন, যা সংকল্প, দৃঢ়তা ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে ছিল সর্বোচ্চ। মুসলিমরা এই বিশাল ইসলামি বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত জাতির কাছে পৌঁছে যান। তাঁরা সেই জাতিগুলোর ওপর ইসলামকে চাপিয়ে দেননি। তাই ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছিল উত্তম আচরণের মাধ্যমে, বাধ্য করে নয়।

এই বাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আল্লাহ তাআলার তাকওয়া ও সন্তুষ্টির ওপর। ফলে তাঁরা এমন চোখধাঁধানো বিজয় অর্জন করেন, যা ইতিহাসে আজও এক আশ্চর্যজনক বিষয় হিসেবেই রয়ে গেছে। তাঁরা এমন মহা বিজয় অর্জন করেন, যার প্রভাব আজও বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন :

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'যে তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠা করল, সে কি উত্তম, না ওই ব্যক্তি, যে তার গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায়? অতঃপর তাকে নিয়ে তা ধসে পড়ল জাহান্নামের আগুনে। আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।'[১৪৭৯]

প্রথম ইসলামি বাহিনী অর্থাৎ নববি বাহিনীর ইতিহাস থেকে আমরা যে শিক্ষা অর্জন করতে পারি তা হলো, আমরা বর্তমান ইসলামি বাহিনীগুলোকে সঠিক দ্বীনের শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে তুলব। যাতে এই বাহিনীর প্রতিটা সেনাসদস্য সেই উঁচু মানসিকতা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে, যা এই শিক্ষার ভেতরে রয়েছে।

১৪৭৯. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১০৯।

তাদের জন্য সত্যিকারের মুমিন নেতৃত্ব নির্বাচন করব। যারা হবে আল্লাহ-প্রদত্ত প্রতিভার অধিকারী এবং যাদের থাকবে অর্জিত জ্ঞান ও জ্ঞানভিত্তিক অভিজ্ঞতা। তারা হবেন এমন নেতা, যারা নিজের দ্বীন ও উম্মাহর স্বার্থকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেবেন।

আমরা সেই বাহিনীর জন্য সর্বাধুনিক অস্ত্র-সরঞ্জাম প্রস্তুত করব এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করব। তাদেরকে সফলতার জন্য দীক্ষিত করে তুলব এবং উত্তমভাবে প্রস্তুত করব। তাদের খুব সূক্ষ্মভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করব।

আমরা মসজিদের মূল অবস্থান ফিরিয়ে আনব। যেন এখানে দৃঢ় আকিদা ও উঁচু মানসিকতার বীজ বপনের বার্তাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। মসজিদ জমিনে থাকবে; কিন্তু আকাশ তার ভেতরে থাকবে। মুমিনের অন্তর স্পঞ্জের (সামুদ্রিক প্রাণী) মতো পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না; বরং তাঁর অন্তর মসজিদের আধ্যাত্মিকতায় শান্তি অনুভব করে।

যে মসজিদ তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মুসলিম বাহিনীর ব্যারাক ও মাদরাসা। সুতরাং মুসলিমরা কখন মসজিদে ফিরে আসবে? যাতে তার অবস্থান ফিরিয়ে আনতে পারে এবং তার শাশ্বত বার্তাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে?!

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلي الله علي إمام المجاهدين الصادقين وعلي آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

দুই দুইটি সুপার পাওয়ারের দম্ভ যাঁরা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন, জাহিলিয়াতের ধ্বংসস্তূপের ওপর যাঁরা উড়িয়েছিলেন দ্বীনে ইসলামের বিপ্লবী ঝান্ডা, ইতিহাসের সেই সব মহানায়কদের সম্পর্কে জানতে আপনার মন কি কৌতূহলী হয়ে ওঠে না? তাঁদের জন্ম ও বেড়ে ওঠার রোমাঞ্চকর সময়গুলো—তাঁদের সংগ্রামমুখর জীবনের উত্তাল দিনগুলো সম্পর্কে জানতে আপনার মন ব্যাকুল হয় না? তাঁদের দুঃসাহসিক অভিযানগুলোর গল্প শুনতে কি আপনার মন আকুলি-বিকুলি করে না? তাদের কুরবানি ও শাহাদাতের লোমহর্ষক দৃশ্যগুলো দেখতে আপনার হৃদয়ে কি উৎসাহের ঢেউ জাগে না?

প্রিয় ভাই ও বোন,

আমরা তো এই মহান লোকদেরই ভাগ্যবান বংশধর। এই ইতিহাস তো আমাদেরই পূর্বপুরুষদের ইতিহাস। আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের এই আলো-ঝলমলে পাতাগুলো কি আমরা উলটাব না?

প্রিয় পাঠক,

ইতিহাসের এই আলোকিত দৃশ্যগুলো নিয়েই আপনাদের প্রিয় প্রকাশনী রুহামার নতুন আকর্ষণ, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সমরবিদ ও সিরাত-গবেষক শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাবের এক অমর অজর রচনা 'কাদাতুন নাবিয়্যি ﷺ'—'নববি কাফেলা'। গোটা ইসলামি কুতুবখানার দিকে হাত বাড়ালে এমন সমৃদ্ধ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ খুব বেশি দেখা যায় না।

শাইখ খাত্তাবের সামরিক প্রতিভা, গবেষকসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও বিপুল অধ্যয়নের ছাপ পাওয়া যায় বইটির পাতায় পাতায়। আল-মাদরাসাতুন নাবাবিয়াহ থেকে উত্তীর্ণ সামরিক ও প্রশাসনিক সাহাবি নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক কর্মগাথার রীতিমতো একটি বিশ্বকোষ এই বই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হাতে গড়া ৩১ জন মহান সামরিক কমাণ্ডার এবং প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দের জীবন, কর্ম ও অবদান নিয়ে ধাপে ধাপে নির্মাণ করা হয়েছে এই মূল্যবান গ্রন্থটি।

আসুন, আমরা আমাদের এই মহান পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জানি, কদম রাখি তাঁদের মতোই সাফল্যলাভের পথে—জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও যে পথের পথিকদের মুখে উচ্চারিত হয়, 'কাবার রবের শপথ, আমি সফলকাম হয়েছি!'...